# উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ঃ
# আলোচনা ও নির্বাচিত সংকলন

অমলকান্তি রায়




উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা) উপাধির
জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

২০০৭

202077

# সূচিপত্র


ভূমিকা ক-খ

**প্রথম পরিচ্ছেদ**

লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং নাগরিক নাট্যকলার সঙ্গে পার্থক্য বিচার। ১-২৩

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ঃ বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা এবং উপস্থাপন রীতি। ২৪-১৮৫

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ**

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ ও বৈচিত্র্য। ১৮৬-২১৮

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ**

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের ভাষা। ২১৯-২৩৩

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ**

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে লোকজীবন। ২৩৪-২৫৭

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ**

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের রূপান্তর এবং আধুনিক বাংলা নাটকে তার প্রভাব। ২৫৮-২৬৯

**উপসংহার** ২৭০-২৮১

**নির্বাচিত লোকনাটক সংকলন** ২৮২-৬৩৩

**নির্বাচিত আঞ্চলিক শব্দের পরিচিতি** ৬৩৪-৬৪১

**গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা** ৬৪২-৬৫০

# ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সম্পদে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার জনসমাজ দীর্ঘদিন ধরে নিজের ঐতিহ্য রক্ষা করে সংহত জীবন-যাপন করে এসেছে। দীর্ঘকালের সংহত সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এখানকার লোকসাহিত্য। নদী, অরণ্য এবং পর্বত — ভূপ্রকৃতির এই বৈচিত্র্য এখানকার জনজীবনকে বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানকার লোকসাহিত্যের রূপ যেমন বিচিত্র তেমনি গভীর তার আবেদন। আধুনিকতার অভিঘাত এখানে এসেছে একটু দেরীতে। তার ফলে নিজের ঐতিহ্য-নির্ভর এই মৌখিক সাহিত্য দীর্ঘকাল এই সমাজে লালিত হয়েছে।

কিন্তু গত ২৫-৩০ বছরে এখানকার সমাজ ব্যবস্থার উপর আধুনিকতার অভিঘাত প্রবলতর হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আগমন, যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতি এবং গণমাধ্যমের প্রসারের ফলে এই অঞ্চল তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারছে না। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সংহত সমাজ ভেঙ্গে পড়ছে। যদিও এই এলাকা তার পুরানো লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য এখনো রক্ষা করে আছে, তবু তার ভেতরে ভেতরে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে আমরা উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ লোকনাট্যকে গবেষণা প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করি। লোকনাট্যগুলির মৌখিকরূপ সংগ্রহ করে নিতে আমাদের অনেক সময় লাগলো। এই সংগ্রহটা একটা দুরূহ কাজ। তার কারণ লোকনাটকগুলির কোনো লিখিতরূপ থাকে না। এগুলি মৌখিকরূপেই প্রচলিত। নাট্যদলের কাছে অভিনয়ের একটা 'থিম' থাকে। নাট্যমঞ্চে অভিনয় করার সময় এই থিমটিকে মনে রেখে অভিনেতারা প্রধানত তাৎক্ষণিক সংলাপের দ্বারাই এই অভিনয় করেন। গানগুলি মোটের উপর প্রচলিত থাকলেও অনেক সময় সাধারণ সংলাপও সুরারোপিত হয়ে গান হিসেবে পরিবেশিত হয়। এর ফলে একই বিষয় নিয়ে যে লোকনাটকের পরিবেশন হয়, বিভিন্ন জায়গায় তার রূপ স্বতন্ত্র হয়ে পড়তে পারে। এইসব কারণে লোকনাটকের নির্দিষ্ট রূপ থাকে না। আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যদলের সঙ্গে দীর্ঘদিন একটা যোগাযোগ রক্ষা করে লোকনাটকগুলিকে লিখিত আকারে সংগ্রহ করেছি। এখানে বলে রাখা দরকার এই সংগ্রহের মধ্যেও কিছু ফাঁক থেকে যাওয়া সম্ভব। কারণ নাট্য অভিনয়ের সময় এগুলিকে যথাযথরূপে সংগ্রহ করা যায়নি। তবুও যথাসম্ভব নাটকগুলির মূলানুগতরূপ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। সংগৃহীত এই লোকনাটকগুলিকে নির্ভর করেই আমরা নাটকের উপস্থাপন রীতি, বিষয়-বিন্যাস, সঙ্গীতের প্রয়োগ, সমাজ-সম্পর্ক এবং তার ভাষারীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু নানা কারণে আমাদের আলোচনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। যে পরিমাণ সময় এ-কাজে দিতে পারলে প্রকল্পটিকে আরো সুন্দর করে তোলা যেত, প্রশাসনিক দায়িত্বের ব্যস্ততার মধ্যে তা দিয়ে উঠতে পারিনি। লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আমাকে এই কাজে টেনে এনেছে। মা-র কোলে বসে এই লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, যা আমার জীবন-বিকাশের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে — সেটাই আমার প্রেরণা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা সম্পন্ন করেছি। প্রথম থেকেই তাঁর উপদেশ, নির্দেশ এবং পরামর্শ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছি। তাঁর সাহচর্য, প্রশ্রয় এবং অফুরন্ত সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব হত না। তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই। আমার বন্ধু, চন্দননগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক উদয়শংকর বর্মা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বই-পত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই গবেষণার কাজে বিস্তর সুযোগ করে দিয়েছে আমার স্ত্রী পাঞ্চালী।

বহু নাট্যদল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সরল এবং আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। দোতরা, কুশান, বিষহরি, শাস্তরী, চোর-চুন্নী, পালাটিয়া, নটুয়া, রাজধারী, খন, রামবনবাস, গম্ভীরা এবং আরো অন্যান্য লোকনাটকের নাট্যদলের মূলগায়ক, দোয়ার, নর্তকী এবং বাজানদারদের কাছ থেকে লোকনাট্য বিষয়ে যতরকম সাহায্য পেয়েছি তার বর্ণনা অল্প কথায় সম্ভব নয়। এই সকল লোক-শিল্পীদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। কম্প্যুটার জোনের রতন শর্মা যত্নসহকারে এই অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ সম্পন্ন করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

৪ এপ্রিল ২০০৭

অমলকান্তি রায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

# লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং নাগরিক নাট্যকলার সঙ্গে পার্থক্য বিচার

লোকনাট্য নিয়ে আলোচনা লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার আলোচনার অনেক পরে শুরু হয়েছে। অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তীর দেওয়া তথ্যানুসারে গুরুসদয় দত্তের 'বোলান' সম্পর্কিত আলোচনা The Folk Dances of Bengal (1954)-এ লোকনাট্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়[১]। কিন্তু গুরুসদয় দত্ত 'বোলান'কে Ballad Dance বলেছিলেন, লোকনাট্য বলেননি। কাজেই ঠিক লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনা একে বলা যায় না। লোকনাট্য সম্পর্কে যতদূর জানা যায় — উল্লেখযোগ্য আলোচনা শুরু করেন অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ। ১৯৭০ সালে 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে 'বাংলার লোকনাট্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। তার আগে বাংলার লোকশ্রুতিবিদেরা লোক সাহিত্যের অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমনকি গম্ভীরা বা লোকনাট্যের অন্যান্য রূপ নিয়ে ও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে লোকনাট্যের ধারায় সংগ্রহিত করে যে আলোচনা তার জন্য সময়ের অপেক্ষা ছিল। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসাহিত্য নিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। কিন্তু লোকনাট্য নিয়ে সেখানে কিছু আলোচনা ছিল না। বাংলা প্রবাদ, ছড়া, গান বা গীতিকা নিয়ে আলোচনার একটা সুবিধে এই যে এগুলি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ হিসেবেই প্রচলিত। কিন্তু লোকনাট্য সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। লোকনাট্যকে অনেকে সঙ্গীতরূপে দেখেছেন, অনেকে নৃত্যরূপে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নৃত্য ও সঙ্গীত লোকনাট্যের দুটি আবশ্যিক উপাদান; তৃতীয় উপাদান সংলাপ। এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে লোকনাট্য। যাঁরা প্রথমদিকে সঙ্গীতরূপে একে দেখেছেন তাঁরা এর গীতাংশের উপর জোর দিয়েছেন, যাঁরা একে নৃত্যরূপে দেখেছেন তাঁরা তার নাট্যরূপ লক্ষ করেননি। হারাধন দত্ত ১৯৫৭ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে 'বোলান'কে নদীয়ার পল্লীগীতি[২] বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার তার কাহিনীগত গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে তাকে গীতিকা বলেছিলেন। গীতিকায় গল্প বলা হয়। তাতে নাটকীয়তা যথেষ্ট থাকে, কিন্তু তা ঠিক লোকনাট্য নয়। অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তীর কথায় "গীতিকা যেমন নাট্যধর্মী, বোলানেও নাট্যধর্ম বিদ্যমান"[৩]। আসলে নাট্যধর্ম গীতিকায় আছে, বোলানেও আছে। কাজেই তা গীতিকারূপে পরিচায়িত হয়েছিল; তার বর্তমান পরিচয়ে নাট্যধর্মের উপরে জোর পড়েছে; তাই তাকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু হারাধন দত্ত নন, মণি বর্ধন[৪] তাঁর বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য' গ্রন্থে বোলানকে লৌকিক প্রেমসঙ্গীত রূপেই অভিহিত করেছেন।

'লোকনাট্য' ধারণাটি সম্ভবত তখন এতটা প্রচলিত হয়নি। লোকনাট্যে সঙ্গীতের ভূমিকা এবং পরিণামের গুরুত্ব বিবেচনা করে তখন লোকসঙ্গীত রূপেই তার মূল্যায়ন করা হত। ১৯৭০-এ 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনা জোর পেয়েছে। লোকনাট্য সম্পর্কে এই যে ধারণা গড়ে উঠেছে তার মূলে হয়তো লোকসাহিত্যের এই অঙ্গটির নাটকীয়তা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও কিছুটা দায়ী। পূর্বে যে নাট্যধর্মের উপরে জোর পড়ত না এখন তাতে জোর পড়েছে। দ্বিতীয়ত নাটক সবসময়ই একটা মিশ্র শিল্প এবং যৌথ শিল্প। মিশ্র শিল্প বলেই তার মধ্যে থাকে নানা কলাবিদ্যার মিশ্রণ; তাতে সঙ্গীত, নৃত্য সংলাপ, বাদ্য, কাহিনী বর্ণনা সবই থাকে। তা যৌথ শিল্প কেননা — বহু শিল্পী, অভিনেতা বাদ্যকার এবং প্রযোজকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা যেমন গড়ে ওঠে তেমনি তার মঞ্চরূপায়ণ থাকে — আর থাকে দর্শকদের ভূমিকা। কাজেই অভিনেতা প্রযোজক মঞ্চরূপায়ণের রূপকার আর দর্শক — সকলের সম্মিলিত ভূমিকা থাকে বলেই তা যৌথ শিল্প। লোকনৃত্য বা সঙ্গীতের এই মিশ্রচরিত্র যেখানে প্রকাশিত হয় সেখানেই লোকনাট্যের সম্ভাবনা দেখা যায়। বর্তমানে গবেষকগণ এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তারিত করে চলেছেন বলেই লোকনাট্যের সীমানায় নূতন নূতন বিষয় স্থান পাচ্ছে। ১৯৭০ সালের পরে অনেকেই লোকনাট্য নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছেন। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' নামক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ১৯৭২ সালে। লোকনাট্য নিয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধ লিখেছেন মানিক সরকার। ১৯৭০-এর পর থেকে আরও অনেকে এবিষয়ে আলোচনায় এগিয়ে এসেছেন। অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক, অধ্যাপক মানস মজুমদার, অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক তরুণ গবেষকও একাজে অগ্রণী হয়েছেন।

লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনার একটি দিক তার উদ্ভবের ইতিহাস গড়ে তোলা। একাজে প্রমাণ অল্প; সেই স্বল্প প্রমাণকে অবলম্বন করে যাঁরা তার উৎস সম্পর্কে সন্ধান করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা অনেকেই আদিম সমাজের আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় উৎসবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে তারা সেই প্রাচীন লোকসমাজের যাদু-প্রক্রিয়ার প্রভাবের কথা বলেছেন। অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী লিখেছেন লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে যে যাদু অনুষ্ঠানের ভূমিকা সক্রিয় তা এক স্বীকৃত সত্য[১]। আবার পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন "নাচ গান চিত্রকলা প্রভৃতির আড়ালে শুরুতে যেমন জাদুর সংস্কার এবং তারপর ধর্মীয় প্রতীতির অস্তিত্ব অবিসংবাদিতভাবে দেখা গেছে, ঠিক তেমনিভাবেই নাটকের উদ্ভবের প্রেক্ষিতেও ঐ ব্যাপার দুটি লুকিয়ে ছিল ক্রমান্বয়ে[২]। তিনি কেবল লোকনাট্য নয় লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মূলেও জাদুবিশ্বাসের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। মানস মজুমদার জাদু অনুষ্ঠান থেকে লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর কথায় — "লোকনাট্যের ধারাটি একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর উৎস সুদূর অতীতে নিহিত। যাদু অনুষ্ঠান, উৎসব অনুষ্ঠান ক্রীড়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি হল লোকনাট্যের সম্ভাব্য

উৎস।"[৬]

তিনি যাদু অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ আলোচনা করে বলেছেন — "বাংলার স্ত্রী সমাজে প্রচলিত বসুধারা এমনই এক যাদুমূলক ব্রতানুষ্ঠান। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে খালবিল পুকুর নদী যখন শুকিয়ে যায়, তখন বৃষ্টি কামনায় এ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।... এই যে মাটির ঘটকে মেঘ কল্পনা করে বারিবর্ষণের অনুকরণ এবং বিশ্বাস এর ফলে আসল মেঘ থেকে বারিবর্ষণ ঘটবে, এখানেই অনুকরণমূলক যাদুবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। এখানে নাটক নেই কিন্তু নাটকের ভিত্তি যে অনুকরণমূলকতা তা এখানে পাওয়া গেল।"[৮]

এসব আলোচনার শেষে তিনি তাঁর বক্তব্যের যে সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন তাতে পাই "অনুকরণাত্মক অনুরূপ বহু অনুষ্ঠান সুপ্রাচীনকাল থেকেই লোকসমাজে প্রচলিত। খুব সম্ভব এ ধরনের যাদু অনুষ্ঠান কালক্রমে লোকনাট্য সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে।"[৯]

অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিকও লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে জাদু অনুষ্ঠানের ভূমিকা স্বীকার করেন। "মেছেনী : লোকনাট্যের সম্ভাবনা" প্রবন্ধে তিনি লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে একাধিক কারণ আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১০] তার একটি কারণ যে যাদু-অনুষ্ঠান সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — লোকনাট্যের উদ্ভবের পেছনে এই জাদু-অনুষ্টানের ভূমিকা সকলেরই কিছু-কিছু জানা আছে। মেছেনী ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে সেই জাদুর যোগটি এমনিতর : যেহেতু এই ব্রত কৃষিকর্মের সহায়করূপে নদীর উপাসনা, সেই হেতু সেই নদীর জলের জন্য বৃষ্টির অনুকরণ ও অভিনয় এই ব্রতের একটি বিশিষ্ট দিক।[১১]

যাদু ছাড়াও ক্রীড়ানুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রভৃতিও লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। যাদু অনুষ্ঠানের যে ভূমিকাই আদি নৃত্য বা সঙ্গীতের উদ্ভবের মূলে থাকুক না কেন বর্তমান লোকনাট্যগুলির সঙ্গে তার যোগ প্রায় ছিন্ন। এই যাদু-অনুষ্ঠানগুলি লোকসমাজে নাট্যবিকাশের ঊষাকালের সূত্র সন্ধানে কিছু ভূমিকা পালন করতে পারে। যাদু অনুষ্ঠানগুলি ক্রমে ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই ধর্মীয় আচারগুলি যথাযথ রূপে পালন করবার জন্য এই সঙ্গীত নৃত্য স্তব ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ধর্মীয় কৃত্য যে লোকনাট্যের উৎস সে বিষয়ে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের বিশ্লেষণ — "ভারতের নানা তিথি পার্বণ, বছরের এক একটি সময় ও ঋতুকে কেন্দ্র করে নানা যাত্রা ও উৎসব ইত্যাদিকে ভিত্তি করেই আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য মূলত গড়ে উঠেছে।"[১২]

লোকজীবনের নানা অনুষ্ঠান — যেমন গ্রামদেবতার পূজা পূর্বপুরুষের স্মরণ শস্য রোপণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ আলোচনা করে তিনি বলেছেন। "এই সব অনুষ্ঠানের কালে নানা সামাজিক ও সাময়িক ব্যাপার নিয়ে উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত কিন্তু অলিখিত মৌখিক নাট্য নাটিকা অভিনীত হত, এখনও হয়।"[১৩]

নির্মলেন্দু বুর উপরোক্ত মন্তব্যের পাশে আর একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি 'মেছেনী লোকনাট্যের সম্ভাবনা' প্রবন্ধে লিখেছেন — ' লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে একাধিক ঘটনা ও কারণ আছে। তার মধ্যে একটি কারণ : Play-Molif'[১৪] কাজেই লোকশ্রুতিবিদ্‌দের ধারণা অনুসরণ করে লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে যে কারণ পাওয়া যায় তার মূল নিহিত আছে লোককৃত্যের মধ্যে। একথা ঠিকই যে প্রাচীন যাদু-বিশ্বাস প্রায় সব জাতির মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে প্রচলিত ছিল। তার পাশাপাশি নাট্য ধর্মোৎসব বা ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যে অনুকরণমূলক অনুষ্ঠান পালিত হত। এইগুলির অনুকৃতির দ্বারা লোকনাট্য সৃষ্টি হওয়া অনুমাননির্ভর হলেও তা যুক্তি বিরোধী নয়।

অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'নটনাট্য নাটক' গ্রন্থে ঋগ্বেদের কোনো কোনো সূক্তের সংলাপের মধ্যে নাট্যবীজ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি ইন্দ্র-বসুও সংবাদ বা জুয়াড়ির দশা ইত্যাদি আখ্যানগুলির মধ্য থেকে এই নাট্যবীজের সন্ধান পেয়েছেন। এরকম অনেকগুলি উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সূক্ত ঋগ্বেদে দেখা যায় যার ভিতর একটা গল্পও আছে। এই সংলাপাত্মক সূক্তগুলির মূল তাৎপর্য আবিষ্কার করা দুরূহ। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এই সব উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে নাট্যবীজ খুঁজেছেন। ম্যাক্সমূলার ঋগ্বেদের এরকম একটি সূক্তে (১.১৬৫) প্রাচীন অভিনয় প্রয়াস বা অনুকরণ ধর্ম দেখেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এই সূক্তটি যেন পুরোহিতেরা অনুকরণ বা অভিনয় করছেন। এই মত Sylva Levi মেনে নিয়েছিলেন এবং A.B. Keath এগুলির মধ্যে পেয়েছিলেন নাট্য দৃশ্য, যেগুলিতে পুরোহিতেরা assumed the roles of gods and sages in order to imitate on earth the events of the heavens.[১৫] বৈদিক ক্রিয়ার মধ্যেও যে নাট্যধর্ম ছিল কীথের লেখা থেকে তা জানতে পারি। সুকুমার সেন এইসব সংলাপাত্মক সূক্তগুলিকে বলেছেন 'কথাকাব্যনাট্য' বা 'নাট্যকাব্য কণিকা'[১৬]।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। লোকনাট্যই সবনাট্যের আদিরূপ। সেই লোকনাট্যই কালক্রমে সাহিত্যিক পূর্ণতা লাভ করেছে নাগরিক পরিবেশে। পৃথিবীর সব দেশেই এইভাবে আদি ধর্মানুষ্ঠান বা লোক-কৃত্যের ভিতর থেকে নাট্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। আচার মূলক নৃত্য ও গীত এবং সংলাপ থেকে ক্রমে এই নাট্যরূপের জন্ম হয়েছে। কালক্রমে তার আদি ধর্মীয় সংস্রব বা কৃত্য সম্পর্কিত আচারের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয়েছে কিন্তু তার ধর্মীয় সূত্র একেবারে ছিন্ন হয়নি — যাত্রার ভিতরে তার সেই মধ্যকালীন পর্ব রয়ে গেছে। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ বাংলা লোকনাট্য আলোচনা প্রসঙ্গে একটু ভিন্নভাবে লোকনাট্যের উৎস বিচার করেছেন। তিনি নাটকের উৎস সন্ধান করেছেন মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। তিনি বাহ্যত যাদু অনুষ্ঠানের নামোল্লেখ করেননি। তিনি নাটকের উৎস বিচারে মানুষের ভাবাভিব্যক্তির উপর নির্ভর করেছেন। "নাটকে মানুষের চিত্তবৃত্তির সংঘাতময় গতিশীল ও উদ্বেজিত অবস্থার প্রকাশ ঘটে।"[১৭] এই চিত্তবৃত্তির রূপ যেখানেই প্রকাশ পায় সেখানেই

আছে নাটকের বীজ। নাটক সৃষ্টির প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছেন — "যখনই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ কোনো আনন্দ অথবা বেদনায় প্রবলভাবে আলোড়িত হয় তখন তার স্নায়বিক উত্তেজনাকে সে শুধু নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমেই ব্যক্ত করতে পারে।... নাটকের মধ্যে সম্মিলিত মানুষের আকস্মিক আঘাতে উদ্বেলিত চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশীলতার পরিচয়ই পাওয়া যায়।"[১৮]

নাট্য সৃষ্টির আগে মানুষের এই চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটত নৃত্যে। সুতরাং তিনি নৃত্যের মধ্যে নাটকের উৎস সন্ধান করবার পক্ষপাতী। ফ্রেজারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি আদিম জাতির নানা সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠানে প্রচলিত নৃত্যের কথা বলেছেন। যুদ্ধে জয় বা বৃষ্টি আনয়ন ইত্যাদি ক্রিয়ার জন্য নৃত্যই ছিল প্রচলিত পদ্ধতি। এসব ক্ষেত্রে যাদু-ক্রিয়ার কথা অন্য গবেষকেরা উল্লেখ করলেও তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তার বক্তব্যের গহনে হয়ত সেই যাদু-প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াদি অনুকরণ করে দেখানো হত এই অনুকরণের মধ্যেই নাটকের বীজ নিহিত ছিল। যারা অনুকরণ করত তারা ক্রমে ক্রমে এক একটি নাটকীয় চরিত্রে পরিণত হত। শত্রুহননের সমস্ত জয়ী যোদ্ধার শক্তি ও পরাক্রম যেমন ভাবাভিব্যক্তিপূর্ণ নৃত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হত তেমনি পরাজিত ও পলায়নরত শত্রুর দুর্বল ও ভয়ত্রস্ত ভাবও অনুকরণ করা হত...। অসভ্য জাতিদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা ঘটনা নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হত।[১৯]

ক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হল সঙ্গীত। দ্রুত লয়ের অঙ্গ সঞ্চালন সংযত হয়ে ধীরে ধীরে ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের স্থানে আসে আবৃত্তি। এই আবৃত্তি ইচ্ছ ও আবেগ-প্রকাশক ভাষারূপ আশ্রয় করে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে একটা কাহিনীগত ঐক্য গড়ে তোলে। "এই ভাব প্রকাশক অঙ্গ সঞ্চালন, অর্থজ্ঞাপক আবৃতি এবং ঐক্যবদ্ধ কাহিনী থেকেই জন্ম নিল নাটক।"[২০]

এই নৃত্য গীতানুষ্ঠানের আলোচনা সূত্রে তিনি গ্রীক নাটক, চীনা নাটক জাপানী নাটক ও ভারতীয় নাটকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং এসবক্ষেত্রে নৃত্যের ও সঙ্গীতের ভূমিকাই যে কালক্রমে নাট্যরূপে বিকশিত হয়েছে তার কথা বলেছেন।

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ নাটকের উদ্ভবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার পিছনে আনুষ্ঠানিকতা অপেক্ষা চিত্তবৃত্তির উত্তেজনার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ড. ঘোষের মতানুসরণ করে আমরা বলতে পারি এই লোকনাট্যই হল আদি নাট্যরূপ। কালক্রমে তা থেকে নাগরিক নাট্যরূপের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু লোকনাটকগুলি লোকসমাজের মধ্যেই পুরানো রূপে বা সামান্যকিছু পরিবর্তিত হয়ে থেকে গেছে। লোকনাট্যগুলির ভিতর থেকেই এসেছে যাত্রানুষ্ঠান। কিন্তু কালক্রমে তারও নানা পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলি দীর্ঘকাল

ধরে এ অঞ্চলের মানুষের নাট্য রসপিপাসা মিটিয়ে আসছে। কিন্তু তার প্রাচীন রূপেও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। মঞ্চ চরিত্রের সাজসজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন দেখা যায় তবু সেখানে লোকনাট্যের প্রাচীন রূপটি অনেকটাই অবিকৃত থেকে গেছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও লোকনাট্যের সূত্র থাকতে পারে। বিবাহ অনুষ্ঠান, লোকক্রীড়া বা বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে তার উৎস যে থাকা সম্ভব সে বিষয়ে আগেই পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহ করেছি। এখানে একটি দৃষ্টান্ত চয়ন করা যেতে পারে। মানস মজুমদার লিখেছেন —

বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গেও লোকনাট্যের যোগ আছে। বাংলা বিহার সীমান্ত অঞ্চলে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের গ্রামে উপস্থিত হলে উভয়পক্ষে যুদ্ধে অভিনয় হয়। যুদ্ধে কন্যাপক্ষকে পরাজিত করে বলপূর্বক কন্যাকে নিয়ে যাওয়াই হল পাত্রপক্ষের উদ্দেশ্য। বলপূর্বক কন্যা অপহরণ বিয়ের একটি আদিম প্রথা। অতীতের সেই প্রথা স্মরণেই ঐ অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন।[২১]

লক্ষণীয় যে বিবাহের আচার পালন হল একটি পুরানো প্রথার অনুকরণমূলক অনুষ্ঠান। আমরা যখনই কোনো আচার পালন করি সেই পুরানো প্রথাটিকেই যথাযথরূপে অনুকরণ করতে চাই। এটি প্রাচীন প্রথার লোকাভিনয়। সামাজিক নানা ক্রিয়াকর্মে এই অনুকরণমূলক অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। যেমন গাছ প্রতিষ্ঠা, বন্ধুত্ব স্থাপন, পূজা উৎসব — সবই এক অর্থে পুরানো প্রথার অভিনয়। প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়ার সংলাপগুলিকে সেই প্রাচীন নাট্যের অভিনয় বলা যেতে পারে।

লোকনাট্যের উৎস সম্বন্ধে মোটের উপর একটা ধারণা নেবার পর এই লোকনাট্যের প্রকৃতিবিচার করা দরকার। এ বিষয়ে বিদ্বজনের ধারণা অনুসরণ করেই আমরা তার প্রকৃতি পরিচয় গ্রহণ করব।

লোকনাট্য সম্পর্কে প্রথমেই আশুতোষ ভট্টাচার্যের ধারণা উল্লেখ করা যায়। লোকনাট্য সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছেন - দুটি রচনা অনুসরণ করে আমরা সে ধারণার পরিচয় দেব। উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি বর্তমানে সনৎমিত্র সম্পাদিত বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই লেখাটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৭৫ সালের রচনা হওয়া সম্ভব। এ ছাড়া ১৯৮২ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থ 'বাংলার লোকসংস্কৃতি'তে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই দুই সূত্র থেকে ধারণা গ্রহণ করে লোকনাট্যের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

কুশান যে রামায়ণনির্ভর নাটক সেকথাও উল্লেখ করেছেন। 'উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন — "গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।"[২২]

এই প্রসঙ্গের আলোচনা সূত্রে তিনি আরও বলেছেন তার ''বিষয়বস্তু জনসাধারণের জীবনভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্মপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলেও তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না।''[২৩] এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন পৌরাণিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের মনে একটি অপরিবর্তনীয় সংস্কার আছে। তাই তার লোকনাট্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে ওঠার পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই কারণে উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, আলকাপ কুশান এবং বিষহরা গানকে লোকনাট্য বলে মেনে নিতে চাননি। ''এদের মধ্যে একটিকেও লোকনাট্য বলে গ্রহণ করা যায় না।'' গম্ভীরা ও আলকাপে আনুপূর্বিক কাহিনীর অভাব এবং কুশান ও বিষহরার[২৪] পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে নাট্যরূপ গড়ে ওঠার কারণে এগুলিকে তিনি লোকনাট্য বলে স্বীকার করতে চাননি।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলিকে আমরা এভাবে সাজিয়ে দিলাম —

১। নায়ক নায়িকা এবং সকল চরিত্রই গ্রাম্য নরনারীর প্রতিনিধি।

২। নাটকের বিষয় গ্রামজীবনভিত্তিক। যে বৎসর গ্রামে যে সব প্রণয়মূলক ঘটনা ঘটে তাই নাট্য কাহিনীতে সঙ্গীতে সংলাপে ও নৃত্যের মধ্যে রূপায়িত হয়। সুগভীর প্রণয়মূলক কাহিনীই এর বিষয়। সত্যমূলক ঘটনাই তাদের ভিত্তি।

৩। প্রয়োগ পদ্ধতি বা উপস্থাপনার কৃত্রিমতা নেই।

৪। সাজ সজ্জার ও পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর নেই

৫। সাজঘর নেই

৬। সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের মধ্যে বসে এবং প্রয়োজনমত অভিনয় করে।

৭। সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়।

৮। কাহিনীর সূচনা ক্রমোন্নয়ন ও স্পষ্ট পরিণতি আছে।

৯। প্রতি বছরই নূতন কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ হয়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি লোকনাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য বলেছেন। যে নাটকে এ বৈশিষ্ট্যের অভাব তাকে তিনি লোকনাট্য বলতে রাজী নন।

অবশ্য ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে সংজ্ঞা একরকম রেখেও

বিচারে একটু শিথিল মনোভাব দেখিয়েছেন। সেখানে লোকনাট্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেছেন এভাবে : লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী তার ভিতরে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়। তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোনো ধারা কিংবা ঐতিহ্যও থাকে না।[২৫]

লক্ষণীয় যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বাংলা লোকসাহিত্যের একজন বহু খ্যাত গবেষক। তিনি যে সংজ্ঞাটি নিরূপন করে দিয়েছেন তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। লোক জীবনাশ্রিত সাহিত্য অর্থেই তিনি লোকসাহিত্য কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। তাতে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুপ্রবেশ স্বীকার করতে চাননি। যে নাট্যরূপ লোক জীবনাশ্রিত তাই তাঁর মতে লোকনাট্য। কাজেই তার সংজ্ঞাটিকে বলা যায় লোকসাহিত্যের ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা লোকনাট্যের সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটিকে লোকনাট্যের ক্লাসিক সংজ্ঞা বলা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থেই তিনি এই সংজ্ঞাটি থেকে কিছুটা সরে গিয়েছেন এবং একটু শিথিল ভাবেই লোকনাট্যের বিচার করেছেন। তিনি লিখেছেন "গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণীর নাটক অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে।"[২৬] এবং সাধারণ দর্শকদের মধ্যে এমন অনেক নাটক লোকনাট্য হিসাবে গৃহীত হচ্ছে যার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর অভাব রয়েছে। তিনি লোকনাট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সেখানে কুশান গম্ভীরা আলকাপকেও গ্রহণ করেছেন। তবে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের স্বপক্ষে একটা কথা বলা যেতে পারে। 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' একটি ছোট handbook মাত্র। এখানে গবেষণা নির্ভর প্রকৃতিনির্ধারণ অপেক্ষা তার পরিচয় দেওয়াই বড় কথা। হয়তো সে কারণেই তিনি এর মধ্যে একটু শিথিলতা দেখিয়েছেন। 'উত্তরবাংলার গ্রামীণ লোকনাটক' তেমন রচনা নয়। কাজেই অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতামত সেখানে অত্যন্ত দৃঢ়।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতটি অবশ্য উত্তরকালের গবেষকেরা আর তেমন কঠোর ভাবে প্রয়োগের পক্ষপাতী নন। ড. সনৎকুমার মিত্র তাঁর গ্রামীণ লোকনাটক নিবন্ধে এ প্রসঙ্গেই বলেছেন "অত সংকুচিত সংজ্ঞায় বেঁধে বাঙলার গ্রামীণ লোকনাটকগুলিকে বিচার করতে চান না।"[২৭]

অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা' বইতে লোকনাট্য সম্পর্কে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মোটের উপর আশুতোষ ভট্টাচার্য নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলির অনুরূপ। সংক্ষেপে এগুলির মূল কথা হল :

১। লোকনাট্য গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যেই উদ্ভূত হয় এবং সাধারণ লোকেদের কাছে পরিবেশিত হয়। রচয়িতার নিজস্ব ভাবপরিকল্পনা এতে প্রাধান্য পায় না ঐতিহ্যগত কাহিনীই এতে অবলম্বন করা হয়। কোনো আঞ্চলিক মানবগোষ্ঠীর আদিম বীরত্ব ও কীর্তিগাথা এর কাহিনীধারার মধ্যে মিশে থাকে।... লোক নাট্যের

মধ্যে আঞ্চলিক পটভূমি জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে। স্থানীয় প্রকৃতি ও লোকজীবনধারার চিত্র এতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

২। লোকনাট্যে নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাধান্য দেখা যায়।

নৃত্য ও সঙ্গীত সম্মিলিতভাবে পরিবেশিত হয়।

৩। লোকনাট্যের সংলাপ সুরেলা ও আবৃত্তিধর্মী; তার ভাষা আঞ্চলিক ভাষা সংলাপে কবিত্বের ভার প্রায়ই থাকে না।

৪। "লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মমূলক। দেবদেবীর মহিমা, মানবশক্তির উপর দৈব শক্তির প্রাধান্য এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়। ... পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয়, নীতির পুরস্কার ও দুর্নীতির শাস্তি... দেখানো হয়। মানুষের বিশ্বাস, ত্যাগ ও ভক্তি জাগিয়ে তোলাই লোকনাটকের উদ্দেশ্য। তাই লোকনাট্যের প্রধান লক্ষ্য হল লোকশিক্ষা।"

৫। খোলা আসরে লোকনাটকের অভিনয় হয়। সূক্ষ্মভাবের অভিব্যক্তির চেয়ে একটু অতিরঞ্জিত — অতি নাটকীয় অভিনয়ই লোকনাট্যের বিশিষ্ট্য।

লক্ষণীয় যে অধ্যাপক অজিত ঘোষ যেভাবে বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করেছেন তাকে বলা যেতে পারে লোকনাটকের বর্ণনামূলক পরিচয়। আশুতোষবাবু লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছিলেন অনেকটা নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি মনে ভেবেছিলেন লোকনাট্য লোকজীবনের কথা বলে তাতে পৌরাণিকতা বা ঐতিহাসিকতার প্রবেশ নিষেধ। তাকে হতে হবে লোকজীবনের লোক অভিনীত লৌকিক কাহিনী নির্ভর নাটক। অজিতবাবু তা করেননি। আশুতোষবাবুর সঙ্গে যেখানে তিনি আলাদা তা এই কাহিনীর চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে। আশুতোষবাবু পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর নাটককে লোকনাট্য বলতে চান না, অজিতবাবু তাকে অম্লানবদনে স্বীকার করে নিতে রাজী আছেন। বিশেষত স্ত্রীপুরুষঘটিত প্রেম কাহিনীকেই আশুতোষবাবু লোকনাট্যের কাহিনী বলেন — অজিতবাবুর সে সম্বন্ধে কোন বাছবিচার নেই। সাজসজ্জা, পোষাক পরিচ্ছিদ, মুক্ত মঞ্চ ইত্যাদি ব্যাপারে দু'জনের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আশুতোষবাবু যেখানে সংলাপকে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত বলতে চান (entempore) অজিতবাবু কিন্তু তাতে একটু আধটু অলংকার এবং কবিত্ব থাকতে দেখেন — তাৎক্ষণিকতার দাবী নেই তাঁর। যেহেতু লোকনাট্যের কোনো নির্দেশিকা তিনি রচনা করছেন না — কাজেই পূর্ব রচিত বা পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর নাটক সম্পর্কেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আশুতোষবাবু যেখানে গোষ্ঠীজীবনের সম্মিলিত প্রয়াসের কথা আলোচনাই করেন না সেখানে অজিতবাবু সেই বৈশিষ্ট্যটি লোকনাট্যে রূপায়িত হতে দেখতে চান। আশুতোষবাবু যেখানে লোকানাট্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব সেখানে

আজিতবাবু লোকশিক্ষাকে লোকনাট্যের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখতে চান।

এঁদের পর যাঁরা লোকনাট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের আলোচনা মোটের উপর এই দুই আলোচনার ধারাই অনুসরণ করে চলেছে। কিংবা বলা যায় এঁদের আলোচনার মধ্যেই লোকনাট্যের মূলসূত্রগুলির কথা বলা হয়ে গিয়েছিল — কাজেই পরবর্তী আলোচকেরা সেগুলিকেই নিজের মতো করে বলেছেন। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ গ্রন্থ (১৯৯৫) লিখেছেন। ''লোকনাট্য মুক্ত অঙ্গনে — ... অভিনীত হয়। মোটামুটি একটা কাহিনী বাঁধা থাকলেও সংলাপের অনেকাংশই তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় বহু সময়ে। গান, নাচ এবং সংলাপ এখানে হামেশাই একে অন্যের বিকল্প-বা-পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় কাহিনী, পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং সামাজিক অসঙ্গতিই মোটামুটিভাবে এই জাতীয় নাটকের উপজীব্য। আর প্রায়শই, এগুলি প্রকারান্তরে লোকশিক্ষা-তথা-গণজ্ঞাপন মাধ্যম রূপে গণ্য হয়। অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং পরিণামে জয়লাভ — এই নাটকগুলির বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ।''[২৮]

এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশক বাক্যগুলিতে পূর্ববর্তী অধ্যাপক অজিত ঘোষ নির্দেশিত লক্ষ্মণগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু দুটি নূতন কথা এতে যুক্ত হয়েছে। এগুলি 'সামাজিক অসঙ্গতি'কেই তুলে ধরে আর অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং পরিণামে জয়লাভ এগুলির চরিত্রলক্ষণ। বলাবাহুল্য এই দুটি কথা যুক্ত হবার ফলে লোকনাট্যের চরিত্রও গণনাট্যের কাছাকাছি এসে গিয়েছে। কারণ যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের কথা এইসব নাটকে দেখানো হয় এবং পুণ্যের জয়ই তার শেষ লক্ষ্য তবু তাকে প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটক বলা যায় না। এখানে লোকনাট্যের চরিত্র লক্ষণ ঠিক বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত হয়নি হয়েছে অনেকটা নির্দেশমূলকভাবে। অন্যলক্ষণগুলিতে বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে নি।

অধ্যাপক মানস মজুমদার লোকনাট্যের প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। এগুলিকে সংক্ষেপে সাজিয়ে নিলে পাই —

১। লোকনাট্য লোকসংস্কৃতিরই একটি দিক।

২। তার বিষয়বস্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা দৈনন্দিন জীবননির্ভর।

৩। তার প্লট শিথিল, চরিত্রগুলি দেশের জল মাটি থেকে উদ্ভূত।

৪। সংলাপ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এবং বহুক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক।

৫। নৃত্যগীত ও সংলাপের ত্রিবেণী সংগম তাতে ঘটেছে।

৬। মুক্ত মঞ্চেই তার অভিনয় হয়।

৭। নিছক মনোরঞ্জন তার উদ্দেশ্য নয়; অন্যায় অবিচার শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে তাতে প্রতিবাদ করা হয়।

লক্ষণীয় এই বৈশিষ্ট্যগুলি মোটের উপর সব লোকনাট্য-বিশেষজ্ঞের লেখাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রকৃতি নির্দেশ থেকে যেখানে আধুনিককালের বিশেষজ্ঞদের প্রভেদ তা হল এই যে এঁরা তার মধ্যে মনোরঞ্জনই শুধু দেখেন না অন্যায় অবিচার শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে ও দেখতে পান। আমাদের এই অভিসন্দর্ভে কয়েকটি নির্বাচিত লোকনাট্যের সংকলন সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলিতে ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্বে, পাপ-পুণ্যের বিরোধে ন্যায় বা পুণ্যই জয়যুক্ত হয় বটে কিন্তু প্রতিবাদ প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত এতে দেখা যায় না। একথা ঠিক এই নাট্যগুলির বাইরে বৃহৎ বঙ্গে এমন কিছু দৃষ্টান্ত নিশ্চয় আছে। যেখানে এরকম প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। আমাদের আলোচ্য গম্ভীরা লোকনাটকেও তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটা লক্ষণীয় জিনিস হল এই যে আশুতোষবাবুর সংজ্ঞায়নে বা প্রকৃতি লক্ষণে এর উল্লেখ ছিল না। সনৎকুমার মিত্র আশুতোষবাবুর সংজ্ঞার ভিত্তিতে যে দশটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন সেগুলিকে নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হল —

১। মুক্ত মঞ্চে লোকনাটকের অভিনয় হয়; তাতে সাজঘর নেই

২। বাদ্যকারেরা মঞ্চের মাঝখানে বসে বা দাঁড়িয়ে বাজনা বাজান; অভিনেতারা তাঁদের ঘিরে অভিনয় করেন।

৩। প্রত্যেকটি পালাই আঞ্চলিক।

৪। সংলাপগুলি আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত।

৫। লোকনাট্যগুলি সবই সঙ্গীতনির্ভর।

৬। "গ্রামীণ লোকনাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এরা একান্তভাবেই অসাম্প্রদায়িক কোন ধর্ম-সম্প্রদায়কে কোনো ভাবেই আঘাত বা ব্যঙ্গ করে না। এদের দর্শকেরাও কোনভাবেই সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়।"

৭। আঞ্চলিক ও লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার।

৮। পোষাকের আড়ম্বর নেই।

৯। "কোন কোন পালা আনুষ্ঠানিক, একটা ritual-কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় (যেমন গম্ভীরা, বোলান ইত্যাদি) আবার কোনটি বা কেবলই আনন্দোপভোগ করবার জন্য (functional)।"

১০। "গ্রামীণ লোকনাটকের প্রায় অনেকগুলিতে একটি ভাঁড় চরিত্র উপস্থিত থাকে। বিচিত্র তার সাজপোষাক।

... সে প্রায় সারা পালায় সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে। মূল নাট্য সংলাপের এক আধটা শব্দ তুলে নিয়ে সরস মন্তব্য করে। দর্শকেরা প্রাণভরে হাসতে থাকে।''[২৯]

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ধরা পড়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে বিশিষ্ট্য এতে ধরা পড়েছে তা হল লোকনাট্যের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। লোকসাহিত্যের যে কোনো রূপই অসাম্প্রদায়িক। তা লোকের সৃষ্টি, লোকের জন্য সৃষ্টি কিন্তু তাতে লোক চরিত্রের জাতিবর্ণ সম্প্রদায়ভেদ নেই। এখানে তার বড় জিৎ। সনৎবাবু এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করেছেন। কিন্তু সনৎবাবুর লেখার মধ্যেও লোকনাট্যের প্রতিবাদী চরিত্র লক্ষণের কোনো কথা নেই। তিনি বরং পালাকে আনুষ্ঠানিক ও আনন্দোপভোগের জন্য রচিত বলে তার দুই ধরনের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন। যে পালাগুলিকে তিনি আনুষ্ঠানিক বলেছেন সেগুলির আনুষ্ঠানিক চরিত্রও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সেসব গম্ভীরাকে তিনি আনুষ্ঠানিক পালা বলেছেন। কিন্তু গম্ভীরা পালা যে আনুষ্ঠানিকতার সংশ্রব হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ড. প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ গম্ভীরা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন — ''একদা গম্ভীরা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে সেই সম্পর্ক হারিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।''[৩০]

পুষ্পজিৎ রায়ও লিখেছেন ''উৎসব-অনুষ্ঠান-নিয়মবিধি এবং গম্ভীরাকেন্দ্রিক আরও অন্যান্য আচার আচরণের সঙ্গে লোকনাটক গম্ভীরা গানের অর্থাৎ পালাধর্মী গম্ভীরা গানের সম্পর্ক শিথিল হয়ে এসেছে।''[৩১]

কাজেই লোকনাট্যের যে অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কথা সনৎবাবু লিখেছেন সে বিষয়ে কোনো মত পার্থক্যের কারণ নেই। ড. সনৎ কুমার মিত্র আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। সেটি হল ভাঁড় চরিত্রের উপস্থিতি। এই শ্রেণীর একটি চরিত্র উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলিতে অন্য নামে উপস্থিত থাকে। সে দোয়ারি। তার কাজ মূল গীদালের সহযোগিতা করা। সে মূল গীদালের গানের কথা নিয়ে প্রশ্ন করে ব্যাখ্যা করে রসিকতা করে। ''দোয়াড়ী'' হাস'য়-কাঁদায়, আনন্দে ভাসায়।[৩২] উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যে হাস্যপরিহাস ব্যঙ্গ রসিকতা করবার মতো একটি চরিত্র। সুতরাং সনৎ কুমার মিত্রের এই মন্তব্য খুবই ঠিক যে লোকনাট্যে ভাঁড় জাতীয় একটি চরিত্রের উপস্থিতি থাকে। প্রয়োজন বিশেষে তার মাধ্যমে অন্য কোনো ভূমিকারও অভিনয় করানো হয়।

সনৎবাবুর বক্তব্যের সার সংকলন করলে মোটের উপর লোকনাট্যের মনোরঞ্জনকারী প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়। আর অজিতকুমার ঘোষ যে বলেছিলেন তাতে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় দেখনো সেও এই লোকনাট্যের বিষয়ের মধ্যে দেখা যায়। পাপের পরাজয় অপেক্ষা বরং মন্দ চক্রান্তকারীর চক্রান্ত ভেস্তে যাওয়ার এবং পরিণামে খেসারত দেবার ব্যাপার লোকনাট্যের পালায় দেখানো হয়। যেমন পালাটিয়া খাস পাঁচালী

নাটকে লোভী জোতদার পালায় লোভী জোতদারের পরস্ত্রী লিপ্সা যেভাবে প্রতিরুদ্ধ হয় এবং যেভাবে তার কন্যার বিয়ে দিয়ে একটা সুখী এবং আনন্দকর পরস্থিতিতে নাটক শেষ হয় তাতে দর্শককুল আনন্দ নিয়েই ঘরে ফেরেন। লোভী জোতদারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া এবং তার কিঞ্চিৎ খেসারত দেওয়ার জন্য সাধারণ দর্শকের মনে একটা পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে। তবে কোচবিহারের দোতরা পালা 'আলম সাধু'তে শেষ পর্যন্ত রহিম সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু কাহিনী বিন্যাস লক্ষ করলে তাকে ঠিক পাপের পরাজয় বলা যায় না।

লোকনাট্যের সম্বন্ধে মানিক সরকার অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি 'বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও আলকাপ' নামক একটি প্রবন্ধে অজিতকুমার ঘোষ নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছেন। সে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের আলোচনায় আগেই অন্যান্য গবেষকের কথা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন —

১। লোকনৃত্য লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অংশ।

২। ব্যঙ্গবিদ্রূপ হাস্য কৌতুক তার একটি লক্ষণ।

৩। লোকনাট্যগুলি প্রধানত অলিখিত।

বলা বাহুল্য এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রথমটি অজিতকুমার ঘোষ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। লোকনট্যের সাধারণ লক্ষণ প্রসঙ্গে "তিনি লিখেছেন লোকনাট্য প্রায় সর্বত্রই সংগীত সম্বলিত নৃত্য থেকে উৎপন্ন হয়"[৩৩]। কাজেই মানিকবাবুর সংযোজনটি তাৎপর্যহীন। লোকনাট্যের অলিখিত রূপের তত্ত্ব আশুতোষবাবুর মূলতত্ত্ব। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে লিখিত সংলাপ বলার আবশ্যকতা না থাকলেও লোকনাট্যের একটা লিখিত খসড়া অনেক সময় পাওয়া যায়। বরং অজিতবাবুর যে মতটি সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন তা হল কাহিনীর ধর্মীয় চরিত্র। তিনি বলেছেন "লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মমূলক"[৩৪]। সম্ভবত তিনি 'ধর্মমূলক' কথাটির দ্বারা বিষহরা নাটকের দেবী মনসার কথা মনে রাখেন তেমনি গম্ভীরার শিবের প্রসঙ্গও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। উপরন্তু কাহিনী হিসেবে কুশাণগানে রামায়ণ কথার ব্যবহারও এসে যায়। কাজেই ধর্ম কথাটিকে ঠিক religion অর্থে ব্যবহার না করে একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। অজিতবাবু হয়তো সেই কারণেই ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের কথা এনেছেন এবং পুণ্যের জয় দেখানোর কথা বলেছেন। লোকশিক্ষা তাঁর মতে লোকনাট্যের উদ্দেশ্য; তিনি অবশ্য প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথ ধরেন নি।

লোকনাট্য সম্পর্কে এখন পণ্ডিতমণ্ডলী ও গবেষকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অনেকেই এসব বিষয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু এই আলোচনাগুলি মোটের উপর পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যানুসারী। সেখানে হয়ত নূতন

কোনো কথা বলবার বিশেষ অবকাশও নেই। এই প্রেক্ষিতে আমরা লোকনাট্যের প্রকৃতিকে কয়েকটি সূত্রে নিরূপিত করে নিতে পারি। বলা বাহুল্য এ কেবল গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা মাত্র।

লোকনাট্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় —

১। এগুলির বিষয়বস্তু পুরাণ কিংবদন্তি বা লোকজীবন থেকে গৃহীত হয়। মানব-রসই এসব কাহিনীর উপজীব্য। এর বিষয়বস্তুকে মানস মজুমদার সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল —

(ক) পুরাণ নির্ভর

(খ) লৌকিক দেবদেবী মহাপুরুষ ও পীর মাহাত্ম্যমূলক

(গ) রূপকথা আশ্রয়ী

(ঘ) আরব-পারস্যের কাহিনী-আশ্রয়ী

(ঙ) স্থানীয় ইতিহাস আশ্রয়ী

(চ) সামাজিক প্রসঙ্গ আশ্রয়ী

(ছ) হাস্যকৌতুক মূলক

লক্ষণীয় যে বর্তমান গবেষণায় কেবল অবৈধ প্রেমের সামাজিক কাহিনীকেই আর লোকনাট্যের বিষয় বলে গ্রহণ করা হচ্ছে না। কিংবা ধর্মীয় প্রসঙ্গকেও লোকনাট্যের বিষয় বহির্ভূত বিবেচনা করা হচ্ছে না। এখনকার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ব্যাপক — এবং তার ভিতরে লোকনাট্যের প্রচলিত সব কাহিনীকেই ধরে নেবার প্রবণতা আছে। লোকনাট্যের কাহিনী যেখান থেকেই আসুক না কেন লোকজীবন ধর্মানুগত তার প্রয়োগ পদ্ধতিই লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য।

২। তাই লোকনাট্যে চরিত্রগুলি যেখান থেকেই আসুক না কেন তাতে লোক জীবনেরই প্রতিফলন দেখা যায়। মানসবাবুর মত এই যে "লোকনাট্যের চরিত্রগুলি দেশের মাটি জল থেকে উদ্ভূত"[৩৫] হবে একথা স্বীকার্য। আমাদের কোচ কিশান পালার রাম লক্ষ্মণ, রাজধারী পালার রাম রাবণ গম্ভীরা পালার শিব সবই এই উত্তরবঙ্গের জল মাটির মানুষ। তারা পুরাণ থেকে এলেও কোনো পৌরাণিক মহিমা তাদের চরিত্রে নেই। এই উত্তরবাংলার একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো পার্থক্য নেই।

৩। লোকনাট্যের সংলাপ অঞ্চলিক ভাষায় রচিত এবং লোকমুখের কথিত ভাষা। তাতে গদ্য পদ্য সঙ্গীত তিনেরই প্রয়োগ হয়। গদ্য পদ্যে সংলাপ সংগীতে পুনরুক্ত হয়ে থাকে। মূল গীদাল যা পদ্যে বা সঙ্গীতে

ধারাবহী গ্রামীণ মানুষকেই বোঝায়। লোকসংস্কৃতি সামগ্রিক লোকসমাজের সংস্কৃতি, সংহত সমাজের সমষ্টিগত জীবনচর্যার সামগ্রিক কৃতি[৩৬] লোকসাহিত্যের সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছিলেন তা ''সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়''[৩৭]। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। একে কেউ বলেছেন লোক ঐতিহ্যের একটি দিক[৩৮] কেউ বলেন এর মধ্যে ''সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত চিন্তা ও অনুভূতিই প্রতিফলিত হয়।[৩৯]

উচ্চ সংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে লোকসংস্কৃতির স্থান। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় তার স্থান আদিম সংস্কৃতির (Primitive Culture) পরের ধাপে; তার ভিতর থেকেই ক্রমে উচ্চ সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই মধ্যস্তরের সভ্যতাকে আশুতোষবাবু বলেছিলেন সংহত সমাজের সংস্কৃতি, তাদের সংহত সমাজের পট ভূমিতে ''সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবন প্রয়াসের সূত্রে ঐতিহ্যমূলক লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ''[৪০]। সংহত সমাজের ধর্ম ঐতিহ্যরক্ষা করে চলা, অল্পসল্প বহিরাগত উপকরণসমূহ সে ''নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে''[৪১]। ''কৃষিভিত্তিক পল্লীসমাজের সমষ্টিগত পর'পর সাপেক্ষ আর্থ সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ জনসমাজই মুখ্যত সংহত সমাজ।''[৪২] লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য এই সমাজের সৃষ্টি। লোকসংস্কৃতির বিপরীত কোটিতে অবস্থিত যে উচ্চ সংস্কৃতি তা এই লোকসংস্কৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিয়েছে। তা প্রধানত নাগরিক সমাজের সংস্কৃতি। নগরপত্তনের ফলে এই লোকসংস্কৃতির ধারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে লোকসংস্কৃতি অন্যভাগে উচ্চ নাগরিক সংস্কৃতি। এই উচ্চ নাগরিক সংস্কৃতির একটি প্রকাশরূপ হল আধুনিক নাটক। লোকনাটক গোষ্ঠী জীবনের কথা বলে।

একটি জাতি বা গোষ্ঠীর মৌল সংস্কারগুলি লোকনাটকের মধ্যে নিহিত থাকবার ফলে ঐতিহ্যের পরিণাম তার মধ্যে অধিক। নতুন চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ সেখানে থাকত সামান্যই। অথচ আধুনিক নাটকে ঐতিহ্য ব্যাপরটি কেবল একটি সূত্রমাত্র, বাকি সবটাই বাইরের প্রভাব এবং নাট্যকারের নিজস্ব সৃজন শক্তির যোগফল। নাটক সমপর্কে যাঁর জ্ঞান বেশি, অভিনয় ক্ষমতা যাঁর আয়ত্তে এবং কল্পনাশক্তিতে যিনি ধনী তিনিই হতে পারেন আধুনিক নাটকের স্রষ্টা। স্রষ্টা কথাটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে লোকনাটকের কোনো লিখিতরূপ নেই। তা হলো মৌখিক। মৌখিকস্তরে কোনো সৃষ্টিকার্যই কখনও পূর্ণাঙ্গতা ও সার্থকতালাভ করতে পারে না, যেহেতু সংস্কারের, মার্জনার কোনো সুযোগ থাকে না সেখানে। কিন্তু আধুনিক নাটক লিখিত হয়। যতবার খুশি সংশোধন, পরিমার্জন ও রূপান্তর সাধন করে নাট্যকার তার অভীষ্ট শিল্পসিদ্ধিতে পৌঁছাতে পারেন। এমনকি কয়েকবার অভিনয়ের পরও এই রূপান্তর সম্ভব। শেকস্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকের ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে।

অন্যপক্ষে লোকনাটকের যে পরিমার্জন তা ঠিক এভাবে হয় না। মৌখিকরূপে থাকে বলে তা পরিবেশন করবার সময় প্রত্যেকবারই কিছু কিছু ভাবে বদলে যায়। লোক সাহিত্যের প্রধান ধর্মই এই যে "ইহার ধারা ক্রম পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মৌখিক আবৃত্তি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার জীবনীশক্তি রক্ষা পায়"[৪৩]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে লোকনাটকের সঙ্গে আধুনিক নাটকের পার্থক্য খুব স্পষ্ট। লোকনাটক তার বিষয় নিয়েছে প্রাচীন পুরাণ থেকে, মিথ থেকে, ধর্মগ্রন্থ থেকে। লৌকিক প্রণয় কাহিনীও সে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যেখান থেকেই কাহিনী গৃহীত হোক না কেন তার মধ্যে লোকজীবনের ভাবনাই প্রধান। তাতে লৌকিক অভিজ্ঞতা, লোকজীবন ধর্ম এসবই বড় হয়েছে। কৃত্রিমতার জায়গায় তাতে এসেছে সহজসরল জীবনের বাস্তবতা। আধুনিক নাটক লোকনাটকের বিষয় গ্রহণ করেই ক্ষান্ত নয়। পুরাণ, মিথ ও কাল্পনিক বৃত্তান্ত ছাড়াও আধুনিক নাটকের বিষয়ের অভাব নেই। সমকালীন ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে প্রচুর একালে নাটক লেখা হয়েছে। মানুষের জীবনের জটিলতা, তার অবস্থাগত এবং ভাবগত সংকট একালের নাটকের বিষয়। সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সবই তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সমাজ বাস্তবতাই তার মুখ্য বিষয়।

এ জন্য বলা যায়, লোকনাটকের আর আধুনিক নাটকের ভাবগতরূপ এক নয়। লোকনাটক প্রচলিত ধর্মবিধান, নীতিশাস্ত্র ও মূল্যবোধকে মান্য করে। উচ্চ সংস্কৃতির নাটক নতুন জীবনবোধ, ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের জন্ম দেয়। প্রচলিত পাপপুণ্যবোধ এনাটকে অস্বীকৃত হতে পারে। এমনকি পুরাণকে ভিত্তি করেও নাট্যকারেরা যখন নাটক লেখেন তখন পুরাণের অনেক ধারণা পাল্টে যায়, নতুন ভাষ্য রচিত হয়। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা, পাষাণী, ভীষ্মে'র কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু লোকনাটকের সেই অর্থে রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। অথচ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করে একালে প্রচুর নাটক লেখা হয়।

আঙ্গিকের দিক থেকেও লোকনাটকের সঙ্গে আধুনিক নাটকের পার্থক্য বহুবিধ। এর সঙ্গে অবশ্যই মঞ্চব্যবস্থা জড়িত হয়ে আছে। খুব প্রাথমিক এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে লোকনাটক অখ্যানধর্মী। একটা ঢিলেঢালা গল্প বর্ণনা তার প্রধান আকর্ষণ। কখনও বা ব্যালাডধর্মী সঙ্গীতময়তায় তার পরিণতি। এমনকি মুখোশ নৃত্যের, পুতুলনাচের মোটা দাগের বর্ণনাকৌশলও গ্রহণ করে লোকনাটক। কিন্তু উচ্চসংস্কৃতির নাটক ভরতমুণির ভাষায় 'পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্'। অ্যারিষ্টটলের ভাষায় আদি মধ্য অন্ত্যসমন্বিত একটি নিটোল কাহিনীবৃত্ত বিশেষ বিদগ্ধ নাট্যকারদের বহু চর্চার মধ্য দিয়ে নাটক আজ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে পঞ্চ অঙ্কের মধ্যে দৃশ্যান্তর, সূচনা, অবরোহন, আরোহন, উপসংহার, ইত্যাদি কত যে সূক্ষ্মতর পর্যায় বিন্যাস আছে তা আঙ্গিক সচেতন মানুষ মাত্রই বোঝেন। আর সমস্ত কিছুই এ নাটকে ঘটে কার্যকারণ শৃঙ্খলা মেনে। অথচ লোকনাটকে ঐ সব সূক্ষ্ম ক্রমপরম্পরাই যে নেই তা-ই নয়, কার্যকারণ সাযুজ্য রক্ষার ব্যাপারটিও সেখানে

202077

বলেন চরিত্রগুলি আবার কথোপকথনে তার প্রয়োগ দেখাতে পারে।

৪। লোকনাট্যের মঞ্চ সজ্জার কোনো আড়ম্বর থাকে না। সাধারণ মঞ্চে দর্শক পরিবেষ্টিত হয়েই তার উপস্থাপনা হয়। তবে ইদানীং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কখনো কখনো উচ্চমঞ্চে সেগুলির অভিনয় হচ্ছে। নূতন মঞ্চব্যবস্থা এখনো লোকনাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অভিনবত্ব সৃষ্টি করেনি। তবে মঞ্চ সজ্জার এই পদ্ধতি কার্যকরী হলে তার ঐতিহ্যানুসারী প্রয়োগ ব্যবস্থার বদল হতে বাধ্য। মঞ্চের আলোক সজ্জার এখনো কোনো বদল ঘটেনি।

৫। সাজপোষাকে বা মেকআপে কোনো আড়ম্বর নেই। সাজঘর নেই ঠিক বলা যায় না। কোন না কোনো ভাবে একটা সাজঘর থাকে। সেখানে শিল্পীরা বসেন — পোশাক পরিচ্ছদ বা মেকআপ করে থাকেন।

৬। নৃত্য লোকনাট্যের একটা আবশ্যিক উপাদান। মূল গীদাল গান করবার সময় ঠিক নৃত্য না করলেও তার অঙ্গভঙ্গিতে নাচের ছন্দ ফুটে ওঠে। দোয়ারি নৃত্য করেন। আবার ছুকরিদের নৃত্য উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দিক। নৃত্যে আছে লোকজীবনের সরল ছন্দের ললিায়িত দেহভঙ্গির ব্যবহার। পদচারণায় এবং হাতের লীলায়িত ভঙ্গিমার ব্যবহারের বৈচিত্র্য তেমন কিছু নেই কিন্তু তার সৌন্দর্য অনস্বীকার্য।

৭। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রভৃতির দ্বারা হাস্যরসের পরিবেশন এই নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রধানত দোয়ারিই এই ভূমিকা পালন করে

৮। লোকনাট্য বিশেষভাবে অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির রচনা। লোকসাহিত্যের যে কোন শাখা সম্বন্ধেই সে কথা বলা চলে। দেবদেবীর কথা থাকলেও তা নিয়ে কোনো সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর কিছু দেখা যায় না।

৯। লোক বাদ্যযন্ত্ররই এগুলির প্রধান উপকরণ।

১০। লোকনাট্যের উদ্দেশ্য লোক মনোরঞ্জনের দ্বারা লোকশিক্ষা। সাধারণত সহজ জীবননীতি ও সমাজ অনুমোদিত নীতিশিক্ষাই এর উদ্দেশ্য। আজকাল কিছু নাটক লেখা হচ্ছে — যা লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার করে — তার দ্বারা নানা ব্যবহারিক শিক্ষা — যেমন সর্ব শিক্ষার গুরুত্ব, জন্মনিয়ন্ত্রণ জন-স্বাস্থ্য পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচার করছে। এগুলি ঐতিহ্যবাহিত লোকনাট্য নয়।

লোকনাটকের সঙ্গে নাগরিক নাট্যকলার পার্থক্য আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি মৌলিক ধারণার কথা বলতে হয়। লোকনাট্য লোকসংস্কৃতিরই একটি প্রকাশ রূপ। লোকসংস্কৃতির লোককথাটি ঐতিহ্য

অবান্তর। ফলতঃ, চরিত্রায়ণের ব্যাপারটিও এই দুই রীতির নাটকের মধ্যে দুই রকম। লোকনাটকের চরিত্র সমতল (Flat) ধরনের; কখনও বা টাইপ চরিত্র। আবার এমনও দেখা যায়, একই চরিত্র নানা চরিত্রের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। একই লোক মঞ্চে বসে বা দাঁড়িয়ে একাধিক চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে যায়। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সক্রিয়তায় কিংবা কথোপকথনের গতিময়তায় লোকনাটকের চরিত্রের অগ্রসর হবার কোনো ব্যাপার নেই। সে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। বিশেষত পুরাণ বা মিথের চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের পূর্ব হতেই একটা ধারণা থাকে — সেই ধারণাকে নাটকের মধ্যে আর পরিবর্তিত হতে দেখি না আমরা। কিন্তু উচ্চ সংস্কৃতির নাটকে ঐ ধরনের চরিত্রগুলো আমাদের জানা পথ কখনও সম্পূর্ণ, কখনও বা অংশতঃ পরিত্যাগ করে। তাদের নবরূপান্তররের মাধ্যমে নাট্যকার আমাদের সামনে একটি ভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। আধুনিক নাটকে শুধু Flat বা Type চরিত্র নয়, জীবন্ত মানবিক চরিত্রও থাকে। নিজস্ব ভুলত্রুটি, মানবিক জটিলতা, বহুবিধ দ্বন্দ্ব নিয়ে, বহু ধরনের দুর্জ্ঞেয়তা দিয়ে আধুনিক নাটকের চরিত্রেরা সৃষ্ট। লোকনাটকের চরিত্ররা পূর্ব থেকেই রচিত। নাটকে শুধু তাদের নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু আধুনিক নাটকের চরিত্ররা প্রতি মুহূর্তে সৃষ্ট হয়েই চলেছে। তাছাড়া লোকনাটকে চরিত্র সংখ্যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অল্প। যে কটি চরিত্র রয়েছে তাদের মধ্যেও বেশী বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু আধুনিক নাটকের চরিত্রসংখ্যা যে শুধু প্রচুর তা-ই নয়, তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যও বড্ড বেশী। চরিত্রসৃষ্টির প্রসঙ্গেই তাদের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটিও এসে পড়ে। লোকনাটকে দ্বন্দ্ব সর্বদা থাকে না। যখনও বা থাকে বহির্দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পায়। দন্দ্বমান চরিত্রদের হুহুংকার, আন্দোলন ও অস্ত্রের ঝংকার সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করে মাত্র। অথচ আধুনিক নাটকে এই বাহ্যসংঘাতের আড়ালে চিত্তের এক গূঢ় গভীর সংকটেরও দ্যোতনা থাকে। তাকে বলা হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্রবিৎ অ্যালারডাইস নিকল যথার্থই বলেছিলেন যে, দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ। কিন্তু তা লোকনাটকের নয়, আধুনিক নাটকের।

সংলাপ রচনাতেও লোকনাটক এবং আধুনিক নাটকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। লোকনাটকের সংলাপ হতে পারে সম্পূর্ণ সংগীতে রচিত অন্ততঃ সুরেলা। কখনও বা আবৃত্তিধর্মী। আঞ্চলিক ভাষার শব্দ, বাগ্‌বিধি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লোকনাটকের চিহ্নায়ন সম্পূর্ণ করে। এক ধরনের বাস্তবতা ও সজীবতাও দেয় তা। বক্তব্য খুব সহজ ও সবল এবং স্থূল হাস্যরসময় হয়ে থাকে। আবেগ ও উল্লাস লোকনাটকের সংলাপে এমন ভূমিকা গ্রহণ করে যে অতিনাটকীয় (melodramatic) না হয়ে আর উপায় থাকে না তার। কিন্তু আধুনিক নাটকে সংলাপ নানা ধরনের হতে পারে। কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, বাস্তববাদী নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রূপক, সাংকেতিক নাটক — এগুলি সবই আধুনিক নাটক। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সংলাপের ধরণ আলাদা। সংলাপ কবিতা বা গান বা গদ্যে যাই রচিত হোক না কেন, আধুনিক নাটকে নাটকের সূক্ষ্ম ক্রমপরম্পরাগুলি রক্ষা করা হয়। নাটকীয়তা থাকে বাস্তবভিত্তিক, অতিরেকযুক্ত নয়। ভাষা এখানে কখনও হয়

অতি সূক্ষ্ম ব্যাঞ্জনাধর্মী, কখনও বা বাস্তববাদী রুক্ষ, অমার্জিত এমনকি দুর্বোধ্যও। মানুষের মননশক্তি, মেধা এবং কল্পনাশক্তিকে আধুনিক নাটকের সংলাপই প্রতিফলিত করতে পারে। লোকনাটকের সংলাপে শুধু যে মৌখিক ভাষাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাই নয়, অনেক সময় তাৎক্ষণিক বাচনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে আধুনিক নাটকের সংলাপের মত গুছিয়ে কথা বলা হয় না এখানে। সজ্জিত শব্দশ্রেণীর সৌন্দর্য, গূঢ় উক্তি, বক্রভাষণ ইত্যাদি আধুনিক নাটকের ভাষার বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে লোকনাটকের সংলাপ যে অত্যন্ত সাদামাটা নিতান্ত লৌকিক ভাষায় কিছু কথোপকথন মাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরন্তু লোকনাটকে সংলাপের নির্দিষ্টতাও নেই। একই নাটকের সংলাপ নানান দিনে অভিনেতা বা অধিকারীর তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যাগুণে তা অনেকটাই পাল্টে যেতে পারে। এমনকি সংলাপের মধ্যে যে কাহিনীর বিস্তার থাকে, সেই কাহিনীর কালানুক্রমও লঙ্ঘিত হয়ে যায়। যেমন কুশান পালার উল্লেখ করা যায়। সেখানে লক্ষ করি, অধিকারী, দোহার এঁরা রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে সমকালের ঘটনার উল্লেখ করছেন। স্থানীয় তথ্যসঙ্গ ব্যবহার করছেন কালগত ঐক্য বা স্থানগত ঐক্য বজায় রাখার কোনো দায় নেই তাদের। অথচ আধুনিক নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে Unity of time এবং Unity of Place রক্ষা করা।

মঞ্চসজ্জা বা মঞ্চ ব্যবস্থার দিক থেকে লোকনাটক এবং একালের নাটক যেন দুটি ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে। লোকনাটক চতুর্দিকে দর্শক পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত আসরে অভিনীত হতো। এমনকি অভিনয়ের স্থানটিও প্রথমে ছিল সমতল ভূমি। পরবর্তীকালে তাকে একটি উচ্চ বেদি ভূমিতে পরিণত করা হয়। দর্শকমণ্ডলী নাটকের সঞ্চলকদের চারদিকে অবস্থান করেন। দর্শকদের মধ্যেই মিশে থাকত অভিনেতা থেকে শুরু করে, বাদ্যযন্ত্রী, নাচনেওয়ালী থেকে সবাই। কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদিকে বাদ দিলে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সাজপোশাকও থাকত অতি সামান্যই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শকদের সঙ্গে performer-দের পোশাকের ও চেহারার কোনো পার্থক্য থাকত না। তবে অনেক সময় লোকনাটকের কুশীলবেরা মুখোশ ব্যবহার করতেন। লোকনাটক অভিনীত হত খোলা আকাশের নীচে। এমনকি দিনের বেলায়। ভ্রাম্যমান লোকনাটকের দলও ছিল। যখন রাতে অভিনীত হত, তখন হয়ত সামিয়ানা ব্যবহৃত হত। যে আলো থাকত তা ছিল সাধারণ মশাল বা হ্যাজাকের আলো। সে শুধু কুশীলবদের মুখ ও শরীর দেখবার জন্য। লোকনাটকে যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত তার মধ্যে, দোতরা, বেনা, ঢোল, খোল, বাঁশী, করতাল, শিঙ্গা, সারিঙ্গা, মাটির হাঁড়ি — এগুলিই মুখ্য। আর কুশীলবদের পায়ে বাঁধা থাকত ঘুঙুর, গলায় উত্তরীয় বা গামছা, হাতের কব্জীতে বড়মাপের রুমাল। এরা সবাই সংলাপ বলতেন জোরে যাতে দূরে উপবিষ্ট দর্শকও তা শুনতে পান। প্রায় সব চরিত্রই সংলাপ আবৃত্তি করে বলতেন, বা গান গাইতেন। আর ছিল নৃত্য। সে নৃত্যে সূক্ষ্মতা তেমন ছিল না, কিন্তু একটা ছন্দ ছিল। আর নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকত। লোকনাট্যের অভিনয়রীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গই হচ্ছে এই নৃত্যবহুলতা।

গ্রীস, চীন, জাপান এবং আমাদের বৈদিক যুগ থেকেই লোকনাটকের মধ্যে এই নাচের প্রভূত প্রয়োগ লক্ষ করেছেন সমালোচক।[৪৪] নাচের মতই ব্যাপকভাবে মুখোশের ব্যবহার লোকনাটকের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। চরিত্র অনুযায়ী এইসব মুখোশের ব্যবহার করা হত। যেমন, রাবণ, হনুমান, রাক্ষস, ইন্দ্র, রাজা, রাজপুত্র, রানী প্রভৃতি। জন্তু জানোয়ারের মুখোশও প্রয়োজনবোধে ব্যবহৃত হয়েছে। মুখাভিব্যক্তি পরিস্ফুটনের ব্যাপারটি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তাই মুখোশের সহায়তা গ্রহণ করতেন লোকনাটকের প্রযোজকরা। তাছাড়া খোলা জায়গায় যেখানে — আলোক প্রক্ষেপণের ব্যাপার নেই সেখানে বহুদূর উপবিষ্ট দর্শক সাধারণের জন্য এই মুখোশ অভিব্যক্তি প্রকাশে ও চরিত্রের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন, "প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অভিনয় থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক জায়গায়, যথা বালির নৃত্যনাট্যে, ভারতের নানা অঞ্চলের লোকনৃত্য নাটকে, যথা নাগানৃত্যে, ছৌনৃত্যে, গম্ভীরা ও গাজন উৎসবের নানা নৃত্যে এই মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়।"[৪৫] আবার এমন লোকনাটকও প্রচুর আছে যেগুলিতে অভিনয়ের কোনো ব্যাপারই নেই। শুধু সংলাপ বলা ও গান করলেই সেক্ষেত্রে লোকনাটক তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে আধুনিক নাটক পরিপূর্ণভাবে মঞ্চনির্ভর। 'শৈলগুহা প্রেক্ষাগৃহ' থেকে আজ পর্যন্ত মঞ্চব্যবস্থা অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে আধুনিক নাটকেরই প্রয়োজনে। মঞ্চব্যবস্থায় আর দর্শকদের পক্ষে সম্ভব নয় যে কোনো দিক থেকে নাটক দেখা। শুধুমাত্র অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্মুখ ভাগ থেকেই নাটক উপভোগ করা সম্ভব। এখন অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে দর্শক বিচ্ছিন্ন। এখন অভিনয়কর্ম সংঘটিত হবে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে। দিনের বেলাতেও তাই প্রয়োজন আলোর। শুধু মুখ ও শরীর দেখার জন্য নয়, চরিত্রগুলির ভাবাভিব্যক্তি দেখার জন্য বটে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল আলোকসম্পাতের। নানা রঙের আলো, নানা গভীরতার আলো, নানা তির্যকতার আলো শুধু আলো নয় ধ্বনি ব্যবহারও আধুনিক নাটকের পক্ষে অপরিহার্য। আগে ধ্বনি বলতে ছিল শুধু কণ্ঠস্বর বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। এখন প্রকৃতির নানা ধ্বনি শুধু নয়, অনুভব ও বোধের প্রকাশক হিসেবেও নানা ধ্বনিসংকেত নাটকে অবশ্য প্রযোজ্য হয়ে উঠল। আধুনিক নাটকে পোশাকের বিচিত্র ব্যবহার। চরিত্র অনুযায়ী রাজার পোশাক, প্রজার পোশাক, যুদ্ধের পোশাক, বিয়ের পোশাক, সকালের পোশাক, দুপুরের পোশাক, রাত্রির পোশাক, উনিশ শতকের পোশাক, বিশ শতকের পোশাক, পৌরাণিক যুগের পোশাক, আফ্রিকার পোশাক, ভারতবর্ষের পোশাক — সবই আলাদা, ভিন্নরকমের যথাযথ নিখুঁত হওয়া চাই। শুধু মুখোশ দিয়ে আর চলছে না। ক্রমে মুখোশ উঠে যাবার ফলে আধুনিক নাটকে কুশীলবদের অভিনয় প্রক্রিয়াও পাল্টাতে হল। চোখ, গ্রীবা, ঠোঁট, মুখের পেশি এগুলিকে কসরৎ করে চরিত্র ও ভাবানুযায়ী ফুটিয়ে তুলতে হল। অভিনয়রীতি হল অনেক বাস্তববাদী, জীবন্ত ও মনোগ্রাহী। বাদ্যযন্ত্রের সীমাবদ্ধতাও আধুনিক নাটকে ঘুচে গেল। দেশি, বিদেশি সবধরনের বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও সবরকম ধ্বনি ব্যবহার করা হতে লাগল যার

উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। তবে অকারণে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কমে গেল। খুবই সূক্ষ্ম ভাবে কেবল তাৎপর্য কেন্দ্রিক ভাবে বাদ্যযন্ত্রের বা ধ্বনির প্রয়োগ হতে লাগল। ফলে নাটকের কাহিনীতে ও গতি প্রবাহে একটা অভূতপূর্ব ভারসাম্য ও রুচিবোধের প্রতিষ্ঠা হল।

বাদ্যযন্ত্রের মতই নৃত্যবহুলতাও কমে গেল আধুনিক নাটকে। আবার নৃত্যনাট্য নামক যে আধুনিক ধারার সূচনা হল সেখানে ভাবের সূক্ষ্মতা ও ব্যঞ্জনা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যে লোকনাটকের সঙ্গে তার ভাবগত ও রসগত যোজন দূরত্ব অনুধাবন করতে আমাদের আর কোনো অসুবিধাই রইল না। সাধারণ নাটকে নৃত্যের পরিমিত প্রয়োগ হতে লাগল। পরিস্থিতি ও চরিত্র অনুযায়ী নৃত্যকে বিন্যস্ত করলেন নাট্যকারেরা। বলতে কি, মুখোশও বিদায় নিল আধুনিক নাটকে। চরিত্রের অভিব্যক্তি এখন এতই স্পষ্ট আলোকপ্রয়োগ এখন এতই বহুমাত্রিক যে মুখোশের আর দরকার রইল না।

আসলে লোকনাটকে নেপথ্যের কোনো ভূমিকাই ছিল না বলা চলে। যা কিছু হত সরাসরি, প্রত্যক্ষ, তাই সেখানে রহস্য ছিল না। কিন্তু আধুনিক নাটকে নেপথ্য একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। আলো, ধ্বনি, প্রম্পটার শুধু নয়, নাট্য প্রযোজনার পিছনে নাট্যকার থেকে শুরু করে কত শিল্পী, কত কারিগর ও কত মানুষের যে অদৃশ্য হাত ও শ্রম এখানে কাজ করে তার ইয়ত্তা নেই। এ এক বিরাট সমবায় শিল্প। লোকনাটকের সঙ্গে আধুনিক নাটকের সবচেয়ে বড় পার্থক্য বোধ হয় এখানেই।

## তথ্যসূত্র


১। বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃ: ৫২৭।

২। তদেব, পৃ: ৫২৮।

৩। তদেব, পৃ: ৫২৮।

৪। তদেব, পৃ: ৫২৮।

৫। তদেব, পৃ: ৫৪৯।

৬। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ: ২২২।

৭। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৩৯।

৮। তদেব, পৃ: ১৪০।

৯। তদেব, পৃ: ১৪০।

১০। লোকশ্রুতি, সেপ্টেম্বর, মেছেনী : লোকনাট্যের সম্ভাবনা, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৯৭।

১১। তদেব, পৃ: ৯৮।

১২। 'লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলা লোকনাট্যের স্বরূপ বিচার' প্রবন্ধে লেখক মানস মজুমদার, নির্মলেন্দু ভৌমিকের প্রবন্ধ 'বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান : লোকনাট্যের একটি দিক' থেকে উদ্ধৃত করেছেন।
দ্রষ্টব্য : বিষয় প্রবন্ধ, সম্পাদক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৭।

১৩। তদেব, পৃ: ১৪৭/১৪৮।

১৪। লোকশ্রুতি, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৯৭।

১৫। The Sanskrit Drama, Oxford University Press, A.B. Keith, p. 16.

১৬। নট নাট্য নাটক, সুকুমার সেন, পৃ: ৬।

১৭। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২১০।

১৮। তদেব, পৃ: ২১০।

১৯। তদেব, পৃ: ২১১।

২০। তদেব, পৃ: ২১২।

২১। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৪২।

২২। বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১।

২৩। তদেব, পৃ: ২।

২৪। তদেব, পৃ: ৭।

২৫। বাংলার লোকসংস্কৃতি, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১২৯।

২৬। তদেব, পৃ: ১২৯।

২৭। বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক : সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃ: ৩।

২৮। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ: ২২২-২২৩।

২৯। বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃ: ৪-৫।

৩০। তদেব, পৃ: ৬৩।

৩১। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ৩১।

৩২। কোচবিহারের লোকনাটক, দিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ: ৯।

৩৩। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২১৬।

৩৪। তদেব, পৃ: ২১৭।

৩৫। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৩৫।

৩৬। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিষয় প্রবন্ধ, পৃ: ১৩৭।

৩৭। বাংলা লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১।

৩৮। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৩৮।

৩৯। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২০৯।

৪০। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিষয় প্রবন্ধ, পৃ: ১৩৭।

৪১। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১।

৪২। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিষয় প্রবন্ধ, পৃ: ১৩৭।

৪৩। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ২০।

৪৪। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২১৫।

৪৫। ঐদেব, পৃ: ২১২।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ঃ বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা এবং উপস্থাপন রীতি

### কুশান

উত্তরবাংলার লোকনাট্যজগতের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাটক কুশান পালা নাটক। কোচবিহার জেলাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ উত্তরবঙ্গে এর প্রসার। পশ্চিম আসামের গোয়ালপাড়া, বাংলাদেশের রংপুর বগুড়া এবং বর্তমান উত্তর বাংলার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার সমগ্র এলাকা জুড়ে কুশান লোক নাট্যের প্রচলন চোখে পড়ার মতো। এই 'কুশান' গানের কুশান শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোক সংস্কৃতি গ্রন্থের লোকনাট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন — "কুশান শব্দটি সংস্কৃত কুশীলব শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। কুশীলবই বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম প্রচারক। মনে হয়, তাই রামযাত্রার আদিরূপ এবং এখন পর্যন্তও তা তার প্রাচীন ধারা অনেকখানি রক্ষা করে চলেছে।"[১] ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর অসমীয়া নাট্য সাহিত্য গ্রন্থে আলোচনা করেছেন 'যে রামের পুত্র লবকুশ, এই কুশ শব্দ থেকেই কুশান গানের উৎপত্তি হয়েছে'[২]।

কুশান গান নিয়ে দীর্ঘকাল যাঁরা চর্চা করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে ভেবেছেন তাঁদের মতামতও অনুরূপ যে লবের ভ্রাতা কুশের নাম থেকেই কুশান শব্দের উৎপত্তি। কুশান-সম্রাট ললিত কুশানী (দিনহাটা), গাড্ডা কুশানী (তুফানগঞ্জ) ও কা কুশানী (নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ) কাশীনাথ কুশানী (তুফানগঞ্জ), এইসকল বিদগ্ধ পালাকারগণ যাঁদের নিজস্ব পদবীর বদলে 'কুশানী' পদবী হয়ে উঠেছে, তাঁরা সকলেই প্রায় একই মত পোষণ করেন — রামায়ণের গায়ক কুশের নাম থেকেই 'কুশান' শব্দের উৎপত্তি। ড. দ্বিজেন্দ্র ভকত অসমীয়া ভাষায় 'কুশান গান' নামে যে ছোট পুস্তিকা রচনা করেছেন তাতেও এই কথা বলা হয়েছে। 'কুশান শব্দটা সংস্কৃত কুশীলব শব্দর পরা উৎপন্ন হৈছে বুলি পণ্ডিতসকলে ধারণা করে।'[৩] কুশীলব দুই ভাই প্রথম রামায়ণ গান করেছিলেন। সেই থেকে এরকম ধারণা করা হয়েছে। কুশগান থেকে কুশান এসেছে বলে মনে করা হয়। সুকুমার সেন অবশ্য কুশীলব শব্দটিকেই ব্যাকরণ বিরুদ্ধ মনে করেন।[৪]

কুশান শব্দটির অন্য একটি অর্থ দ্বিজেন্দ্র ভকত নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন কোচ রাজাদের সময়েই কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লোকগীতি রাজসমাদর লাভ করেছিল। কোচরাজ্য রাজ্যের ১২ জন শিল্পীকে বিশেষ সম্মান

জানিয়েছিলেন। সেই সময় রচিত কিছু গ্রন্থে কোচরাজ্যের নাম হয়েছিল কোচান। এই কোচান শব্দটি কোচরাজ্যে প্রচলিত ও জনপ্রিয় রামায়ণ গান সম্বন্ধে ব্যবহৃত হত। দ্বিজেন্দ্রবাবুর শিবানন্দ শর্মার অভিমত অনুসরণ করে বলেছেন কোচান > কুচান > কুশান শব্দের রূপান্তর ঘটেছে। "...রামায়ণগীতক কোচরজা সকলর আমোলতে কুশান নাম দিয়া হয়।"[৫] কুশান শব্দটির অন্য কোনোরূপ প্রকৃতিপ্রত্যয় নিষ্পন্ন করতে না পারলে আপাতত কুশগান বা কোচরাজ্যের জনপ্রিয় গান অর্থে কথাটিকে ব্যবহার করতে হবে। কোচরাজ্যে কুশান গানের ব্যবহারও খুব প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। কুশান গানের মূল বাদ্যযন্ত্র বেনা। বেনা শব্দটি বীনা অর্থ বাচক। সম্ভবত বীণার কোনো লৌকিক রূপই বেনা। দরং বংশাবলীতে উল্লেখ আছে বিশ্বসিংহের রাজ্যাভিষেকের সময় 'রামবেনা' বাজানো হয়েছিল। এ থেকে মনে হয় বেনা যন্ত্রটি খুব প্রাচীন। যন্ত্রটির সরল — তা কতকটা একতারা জাতীয় যন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার থেকে কুশান গানকেও বেশ প্রাচীন বলে মনে করা হয়।

'কুশান' পালা গানে ১৪/১৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে থাকেন। ১৪/১৫ জন শিল্পীর মধ্যে মূল গীদাল, দোহার বা দোয়ারী, ৫ থেকে ৭ জন এবং অন্যান্যরা বাজানদার হিসাবে থাকেন। ছুকরী এবং মূল গীদালের দক্ষতা ও শৈল্পিক কৌশলের উপর নির্ভর করে চলে কুশান গান। ফলত মূল গীদালের নামানুসারের গানের দলের পরিচিতি লাভ করে। যেমন ঝাপরা কুশানি, ললিত কুশানি, ওকা কুশানি, গোবিন্দ কুশানি (রংপুর) এই সকল বিদগ্ধ শিল্পীদের নামের সঙ্গে কুশানের পরিচিতি রয়ে গেছে। তাই এই নাটক উপস্থাপনে মূল গীদালের ভূমিকাই প্রধান। মূলের হাতে 'বেনা' নামক ছোট তৈরী বাদ্যযন্ত্র থাকে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত পরিচ্ছন্ন চেহারায় আসরে উপস্থিত থাকেন মূল গীদাল।

এই পালাগানে মূল গীদালের অপরিহার্য সঙ্গী দোয়ারী। হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অর্থের গভীরতা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে কাহিনীকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি নর্তকীদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দেওয়া — প্রভৃতি কাজে দোয়ারীর ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে। হাঁটুর উপরে ধুতি অত্যন্ত সাধারণ শার্ট বা গেঞ্জি এবং গামছা দোয়ারীর জন্য নির্দিষ্ট পোষাক। অভিজ্ঞ দোয়ারীদের নাম মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। এই পালাগানেও দোয়ারীদেরও বৈরাগী বলা হয়। তুফানগঞ্জের চুড্ডা বৈরাগী, কোচবিহারের বড়শালবাড়ির হেসকারু দোয়ারী, রংপুরের বেন্দাবন দোয়ারীদের নাম বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

পাঁচ-ছয়জন ছুকরী নর্তকীদের মধ্যে ডায়না ছুকরী এবং সহকারী ছুকরী অন্যান্যদের পরিচালনা করে থাকেন। সুন্দর চেহারার ছেলেরাই মেয়েদের সাজ পোশাকে সুন্দরী মেয়েরূপে সেজে উঠতেন। বর্তমানে মেয়েরাই নর্তকীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছেন। অভিনয়, গীত এবং নৃত্যে এঁদেরকে পারদর্শী হতেই হবে। ছেলেরা শাড়ি, ব্লাউজ, কৃত্রিম স্তন, পরচুলা, পাউডার, পিউরি, আলতা, কাজল ইত্যাদি দিয়ে নিজেদেরকে সুন্দর তরুণীরূপে

সজ্জিত করে থাকেন। প্রায় বিশ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে মেয়েরা নিজেরাই এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করছেন। ললিত কুশানি নিজে তাঁর মেয়েদের এই পালাগানে এনেছিলেন। মেয়েরা যেখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন সেখানে সাজ সজ্জার ব্যাপার অতো উগ্ররূপে ধরা পড়ে না। গ্রামের গরীব ঘরের মেয়েরাই সাধারণত এই পালাগানে যোগ দিয়ে থাকেন।

কুশান গানে যাঁরা খোল বা মৃদঙ্গ বাজান তাঁদেরকে বাইন বলা হয়। ডায়না বাইন, বাঙ্গা বাইন অর্থাৎ সহকারী বাইন — এই দুইজন খোলবাদক অসম্ভব কলা-কৌশলে খোল বাজিয়ে চলেন। নৃত্য যেমন নিয়ন্ত্রণ করেন তেমনি খোল-বাজনাদারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পালন করেন। এঁদের সঙ্গে থাকেন বাঁশীদার, জুড়িদার, পালি (দলগায়ক) এবং সারিন্দা বাদক।

কুশানগানে বেনাই হলো মুখ্য যন্ত্র। সেইজন্য কুশান গানকে কোনো কোনো জায়গায় বেনা গানও বলা হয়ে থাকে। এই যন্ত্রটি তৈরী করতে পূর্বে ঘোড়ার চুল ব্যবহার করা হতো। এখন ঘোড়ার চুলের পরিবর্তে সূক্ষ্ম ইস্পাতের তৈরী তারের ব্যবহার দেখা যায়। এই বেনা যন্ত্রটি কুশানগানের মূলগীদালই ব্যবহার করে থাকেন। পরম্পরাগতভাবে শিক্ষার্থীরা এর ব্যবহার শিখে পরবর্তীতে মূল গীদাল হয়ে ওঠেন। বেনা যন্ত্রের সুর কোমল এবং মধুর। নিবিড় মনোনিবেশে এবং আধ্যাত্মিক উচ্চ-ভাবনায় নিয়ে যেতে বেনা যন্ত্রের সুর সাহায্য করে। এই পালাগানে মঞ্চ পরিকল্পনা বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তিতরূপে দেখা দিয়েছে। তিরিশের দশকে মঞ্চ-সজ্জায় ছিলো খোলা মঞ্চের চারদিকে চারটি কলাগাছ এবং মাঝখানে বিছানা। এই বিছানায় থাকতো ছেড়া চট, খড় , শত রঞ্চি বা ত্রিপল। চারদিকেই দর্শকরা মাটিতে খড়ের বিছানায় আসন গ্রহণ করতেন। বাজানদারগণ বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে আসরের মাঝখানে বসতেন। সেই সময় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার করার সুযোগ থাকতো না। প্রথমদিকে চারদিকে চারটি মশাল জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হতো। চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে কিংবা হ্যারিকেন জ্বালিয়েও রাতের পর রাত গান হতো। কিছুদিন পরে এলো হ্যাজাগের আলো। হ্যাজাগের আলো থেকে দিনের মতো পরিষ্কার আলো করার জন্য প্রবর্তন করা হলো ডে-লাইট। ডে-লাইটের ব্যবহার বহুদিন পর্যন্ত ছিল। মাইক্রোফোনের কোনো ব্যবস্থাই থাকতো না। শিল্পীগণ খালি গলায় উচ্চরবে গান ধরতেন। মূল গীদালের উচ্চনিনাদ মঞ্চের আকাশকে গম্ভীর করে তুলতো।

পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহজে গ্রহণ করার ফলে মঞ্চ পরিকল্পনার মূল কাঠামো ঠিক রেখে অন্যান্য পরিবর্তন গ্রহণ করা হলো। হ্যাজাগ লাইটের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার চলে এলো। সাউন্ড-সিস্টেমের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়লো। পূর্বে সারারাত ধরে এই অনুষ্ঠান চলতো। বর্তমানে তা করে এসে ৪ - ৫ ঘন্টায় ঠেকেছে। পালা শুরু হওয়ার কিছক্ষণ পূর্বে মূল গীদাল, দোয়ারী, নর্তকীগণ আসরে প্রবেশ করেন। বাজানদারদের বাজনা আগে থেকেই চলতে থাকে। আসরে প্রবেশ করে মূল গীদাল আসর বন্দনা

করেন। 'কুশান' গানের কাহিনী মূলত: রামায়ণ থেকে নেওয়া হয় বলে আসর বন্দনায় রামের মাহাত্ম্য যুক্ত করে আসর বন্দনা করা হয়।

দিনহাটার ললিত কুশানীর আসর বন্দনায় প্রথম বন্দনাতে পাই

রামং লক্ষ্মনং পূর্বজনং রঘুবরং
সীতা-পত্নি সুন্দরম
করুনামরং গুণানিধিং বিপ্র-প্রিয়ং ধার্মিকং
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথ ময়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকভিরামং
রঘুকুল তিলকং রাঘবং
রাবণ অরিম

(ললিত কুশানীর দ্বারা যে-ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে সেই ভবে লেখা হলো)

মূল এই সংস্কৃত শ্লোক মায়াময় সুরেলা কণ্ঠে সমস্ত শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেন। তারপরেই নৃত্যের তালে তালে আসর বন্দনা। শ্লোক শেষ হতেই আবার লম্বা টান —

জয় আহা - হা - হা
দক্ষিণে লক্ষ্মণ বন্দি
বামেতে জানকি শোভা
পুবেতে মারুতির্যস্য
তং নমামি রঘুত্তমম
রামচন্দ্র রামভদ্র বেধসে
রঘুনাথায় সীতায়াঃ পতয়েঃ নমঃ নমঃ

কুশান গান গাইতে গেলে প্রথম এই দুই স্তবক গাইতে হবেই।

তারপর রাম বন্দনা —

ব্যানা হাতে লইয়া প্রভু
লইলাম তোমার নাম
এই আসরে এসে প্রভু
দাও দরিশন
গাইব কুশান গান
মনোতে বাসনা
দয়া করে এসে প্রভু
পুরাও কামনা।

এই বন্দনার শেষে 'জয় আহা-হা' হাঁক দেওয়ার সময় গীদালের সঙ্গে অন্যান্য সকল শিল্পী সুর ধরেন। ঠিক এই জায়গাতে শুরু হয় সরস্বতী বন্দনা —

ধুয়া — মায়ের নাম লইয়া দারাইলাম আসরে
ও দয়া কর ওহে মা জননী

পদ — ও - মা - গো
আইসেক মা মোর সরস্বতী
রথে করিয়া ভর
জৈ-জোগারে নামেক মা তুই
মোর সভার ভিতর
মোর সভা ছারিয়া যদি মা
অইন্যের সভায় যাইস
আরো কিছু কিরা না দোং মা
ধর্মের মাথা খাইস
পাইল বাইনের মস্তকে মা
থুইয়া দুই পাও।
শ্যালক মুনির কণ্ঠে আসি মা
নেওয়ালি খেলাও।
নেওয়ালি খেলাইতে যদি মা
এক পদো নড়ে
তুইও লজ্জা পাবু মা
দেবেরো সভাতে।

(ড. দ্বিজেন্দ্র ভকত-এর সংগৃহীত 'কুশান' পালা থেকে এই গানটি সংজ্ঞা করা হয়েছে।)

কুশান পালাগানের 'বন্দনা'র গুরুত্ব অত্যাধিক। রামায়ণের মাহাত্ম্য এবং ভাব-পরিবেশ তৈরী করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা রক্ষা করে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বন্দনা' অংশ পরিবেশিত হয়। সরস্বতী বন্দনার পর চারযুগের বন্দনা করা হয় —

হরি করিলেন নীলা চমৎকার
হরি তোমার নীলা বুঝা ভার
সত্যযুগে ছিলেন হরি
ত্রেতায় সে রাম ধনুর্দ্ধারী
দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ ধরি
রামনাম প্রভু নাম রাজীব লোচন,
দয়া করো রঘুনাথ প্রভু বন্দিলাম চরণ।
তব নাম স্মরণ করি বীণা লৈলাম হাতে
দয়া করো দয়াময় প্রভু অধম জনাতে।

চারযুগ বন্দনা শেষ হলে মূল গীদাল এবং দোয়ারীর কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলে। মূল গীদালের গম্ভীর কথাকে দোয়ারী হাল্কা করে দর্শকের সামনে ব্যাখ্যা করেন। রামায়ণের বিভিন্ন পালার মধ্যে কোন অংশটি গাওয়া হবে দোয়রী মূলের এবং দর্শকের অনুমতি নিয়ে তা ঘোষণা করে দেন। সংগৃহীত লক্ষ্মণে শক্তি শেল'-এর কাহিনী শুরু হয়েছে 'প্রার্থনা' অংশ দিয়ে।

প্রার্থনা শেষ হলে দোয়ারী বা বৈরাগী হাল্কা চালে গদ্য-সংলাপে মূল গীদালের সঙ্গে বাক্য বিনিময় শুরু করেন—

বৈরাগী — এইযে জুড়িল কোতোন, আর মন্দোদরীর কোতোনোতে রুষিল রাবণ।

মূল — আরে কুলোক, কোতোন কি রে ?
আরে কোতোন নোয়ায়রে ক্রন্দন
দেখ দোয়ারী, এই আসরে উঠতে উঠতে
যে কাউরহাটি — এমনটা কিন্তুক ভাল নোয়ায়

বৈরাগী — আচ্ছা ন্যাও ন্যাও, কাউরহাটি না করি, হ্যা তোমারে মুখখান বোল অশুদ্ধ,
মিছাঁও খালি ফাও ফ্যাচাল।

এইরূপ সংলাপ চলতে চলতে নর্তকীদের মধ্য থেকে একজন সীতার চরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। কিছু কথা এবং কান্না মেশানো গান দিয়ে সীতা রাম-বিচ্ছেদ-বেদনার কথা প্রকাশ করতে থাকেন। পালাগান এখান থেকেই নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করে। আসরে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করে থাকেন। মূল গীদাল এবং দোয়ারী এই ভিন্ন চরিত্রের অভিনয় সবচেয়ে বেশী করে থাকেন। ফলত কাহিনীর ঘনবদ্ধতা, অগ্রগতি এবং পরিণতি সবটাই নির্ভর করে এই দুই শিল্পীর উপর।

কুশান পালা নাটকের নাটকীয় কথা-কৌশলের মধ্যে নর্তকীদের নৃত্য পরিবেশন সমস্ত কিছুতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বন্দনা থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত নৃত্য চলতে থাকে। বিভিন্ন তালে নৃত্য শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। একতালা সুরে তাল ধীরে শুরু হবে। দোতালে আর একটু ঘনমাত্রায় নৃত্য প্রকাশিত হবে। তেতালে ক্রমশ: দ্রুততা বৃদ্ধি পেয়ে চৌতালে দ্রুত লয়ে পৌঁছে যাবে। এই দ্রুত তাল আরো তীব্র গতিতে প্রকাশ পাবে 'দশকুশি' তালের মধ্যে। ললিত কুশানী তাঁর শিল্পীদের সংখ্যা দিয়ে নাচের তালিম দিয়ে থাকতেন। তিনি বলেন ৬ মাত্রার ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ করে নৃত্য দ্রুত লয়ে চলে যাবে। নৃত্য শিল্পী প্রথমে ডান হাত উপরে তুলবেন। সেই সময় বাম হাত বুকের মাঝখানে আসবে এবং পরে উপরে উঠে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত বুকের মাঝখানে চলে আসবে। এই দুহাত ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে শরীরকেও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বাঁকিয়ে নেওয়া হয়।পা-এর ক্ষেত্রেও প্রথমে বাঁ পা এগিয়ে যাবে এবং তারপর ডান পা বিভিন্ন তালের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এগিয়ে চলবে।

এই দ্রুততালের নাচ থেমে গেলে পালাগানের মূল গীতল কবিতার আকারে দোয়ারীর প্রতি বিশেষ একটি পদ ছেড়ে দেন। দোয়ারী পদ ব্যাখ্যা করেন প্রয়োজনে পদের উপর মূলের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। এই চলমান বিষয়টির সময়েও বাজনা কখনো স্তিমিত হবে না। ধীর লয়ে চলতে থাকবে এবং নর্তকীরাও ধীরে ধীরে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে গোলাকারভাবে স্থান পরিবর্তন করতে থাকেন।

নাটকের শেষে এসে মূল সর্বশেষ হাঁক দিয়ে বলেন —

এবার রাম নাম বলো
দিন যায় বইয়া
রাম বলো হরি বলো
মুকুন্দ মুরারী
লক্ষ্মণ ঠাকুর প্রাণ পাইলো
বলো হরি হরি।

এই গানের সুরে সুরে নর্তকীরা এবং দোয়ারী নেচে নেচে কুশান পালা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটান। কুশানগানের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের পরিবেশন দেখে লক্ষ করা গেছে যে গত ২৫-৩০ বৎসর থেকে এই গান বা পালানাটকের মধ্যে যাত্রার কিছু ঢং ঢুকে গেছে। এটা হয়তো পালা বদলের হাওয়ার প্রকাশ। তথাপি কুশান পরিবেশনের যে মূল পরিকল্পনা এবং আঙ্গিক তা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এর ফলেই অন্যান্য পালা-নাটকের সঙ্গে কুশান পালা-নাটককে আলাদাভাবে চেনা যায়।

কোচবিহার, রংপুর, গোয়ালপাড়া এবং জলপাইগুড়ি জেলার নেতৃস্থানীয় পালানাটক 'কুশান'-এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বে পাশাপাশি কুশানের ভিন্ন ভিন্ন দলের অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রতিযোগিতার লড়াই

চলতো। যা থেকে আঞ্চলিক 'নড়ক' শব্দ প্রচলিত হয়েছে। কোচবিহারের দেওয়ানহাটের কাশী গীদালের সঙ্গে দিনহাটার গোসানীমারির ললিত কুশানীর প্রায়ই 'নড়ক' চলতো। কাশী গীদাল দোতরা যন্ত্র দিয়ে কুশান গান করতেন। ললিত কুশানী 'বেনা' যন্ত্র দিয়ে গান করতেন। দোতরা দিয়ে একমাত্র কাশী গীদালই গান করতেন। কুশানে সাধারণত 'বেনা' ব্যতীত দোতরার ব্যবহার দেখা যায় না। কাশী গীদালই ব্যতিক্রম ছিলেন।

দিনহাটার পেটলাতে এই দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বি মূলের 'নড়ক' চলছিলো তিনদিন তিন রাত্রি ধরে। শেষে থেমে গিয়েছিলো নেহেরুর মৃত্যু সংবাদে। এই কাহিনীটি কুশান নাট্যজগতে কিংবদন্তী হয়ে আছে। ঝাপুরা কুশানী, ললিত কুশানী, কাশীগীদাল থেকে শুরু করে বহু নামী নামী শিল্পী 'কুশান' পালাগানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ বর্তমানে এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

একটি কুশান পালার পর্যালোচনা ঃ

কুশান গানের বিষয় রামায়ণের কোন কাহিনী। রামায়ণের বাইরে এ পালায় কোনো কাহিনী গীত বা অভিনীত হয় না। রামবনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ইত্যাদি পালা কুশানের জনপ্রিয় পালা। এর আদিরূপ যখন কোচরাজ্যে প্রচলিত হয় তখন রামায়ণ কথাকে এই লোকশিল্প মাধ্যমের দ্বারা জনপ্রিয় করে তোলা এর একটি সম্ভাব্য লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। সেজন্য এই মাধ্যমে রামায়ণ কথাকেই অবিকল গ্রহণ করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে লোকনাট্যের আদিরূপও গানের মধ্যেই নিহিত ছিল। কুশান এখনো গান হিসেবে পরিচিত, দোতরা এখনো গান। এই গানের সঙ্গে নৃত্য যোগ করে তাকে কিছুটা নাটকি চেহারা দেওয়া হয়েছিল। গান মনকে ভাবের জগতে নিয়ে যায় আর কথা তাকে বাস্তব জগতের মাটিতে নিয়ে আসে। নৃত্য সুরকে রূপময় করে তোলে। দেহলীলার নানা ভঙ্গিতে সুর ও ছন্দ সেখানে মূর্তি লাভ করে। সঙ্গীত আর নৃত্যের সহযোগে রামায়ণ গান তাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গীত আর নৃত্যের এই যুগলরূপের মধ্যে নাট্যধর্ম প্রকট হয়নি। যতদিন না তা কথারসে পুষ্ট হয়ে ওঠে। রামায়ণের কাহিনীতে আছে গল্পরস। সেই গল্পরস সঙ্গীতের মাধ্যমে বলা আর নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করার ভিতরে জাগে এই লোকনাট্যের আদিমতম রূপ। ক্রমে ক্রমে আখ্যান গানের ভিতর থেকে কথকতার ভিতরে নেমে আসে। রামায়ণ কথাকে এদেশে নানা মাধ্যমের দ্বারা রূপায়িত করা হয়েছে। লোক-ফর্মের মাধ্যমে যখন রামায়ণ গানকে জনসাধারণের সামনে প্রচার করা শুরু হল তখন তারই ভিতর থেকে ক্রমে একটু একটু কথা জেগে ওঠে। সে কথা আখ্যানেরই ব্যাখ্যান। গানে যে কাহিনী বলা হল গদ্যে হল তার ব্যাখ্যা। তাকে বলা যায় কথকতা। আর যখন গানের কথাকে অভিনয়ের রূপ দেওয়া হল তখন তা হল নাট্য। একসময় লোকনাট্যের নাট্যরূপায়ণ হত গানে। উক্তি প্রত্যুক্তিও হত সংগীতের মাধ্যমে। আর চরিত্রগুলির নৃত্য ছিল তার সঙ্গে সর্বাত্মক ভাবে জড়িত। কীর্তনগানের যে রূপ বর্তমানে প্রচলিত, তাতে মৃদঙ্গ

বাদ্য ও মূল গানের গায়ক এবং দোহার সকলেই নৃত্য করেন। আবার এই কুশান গানে নৃত্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো বা গানের সঙ্গে মুখ্য রূপে মঞ্চের সম্মুখে এসে, আবার কখনো বা গানকে প্রাধান্য দিয়ে তার সহযোগীরূপে পার্শ্বে থেকে — হয়েই চলে। তার বিরাম থাকে না।

প্রথম যুগের কুশান গানের রূপ ছিল গীতিনৃত্যময়। সেই নৃত্যগীতের মধ্যে ক্রমে সাঙ্গীতিক সংলাপ কাহিনীসূত্রের যোজকরূপে সংযোজিত হয়ে তার নাট্যিকরূপের সূচনা করে। এই সাঙ্গীতিক সংলাপ থেকে ক্রমে জেগে ওঠে গদ্য সংলাপ। কিন্তু অভিনয়ের দ্বারা রূপময় হয়ে ওঠার চেয়ে কাহিনীর যোজকরূপেই তার কার্যকরিতা দেখা যায়। কুশান গানের পূর্ব রূপের আলোচনা করতে গিয়ে যারা কথা বলেছেন, তাঁদের লেখায় দেখি সেখানে গানই সংলাপের ভূমিকা পালন করত। আর দ্বিতীয়ত যা এখনো আছে — আগে তাই একমাত্র ছিল — মূল ও দোয়ারি দু'জনেই তা নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন। মূল গীদাল সবরকম ভূমিকা পালন করতে পারতেন। তিনি একই সঙ্গে গান নাচ ও অভিনয়ে দক্ষ। আর তারই মতো দক্ষ হতেন দোয়ারি। দোয়ারির কাজ ছিল গানের কর্তাকে ব্যাখ্যায় নামিয়ে এনে লোক সাধারণের পক্ষে তাকে সহজবোধ্য করে তোলা। দোয়ারি মূলগীদালের উল্টোপিঠ। সে এখানে লোক সাধারণের প্রতিনিধি। গীতির বিপরীতে তার কথা। তাই তার পোষাক পরিচ্ছদও অত্যন্ত সাধারণ। অন্যদিকে গীদাল ও দোয়ারি দুজনেই একই গানের সঙ্গে গলা মেলান একই সঙ্গে নৃত্য করেন। প্রাচীন গীতি পরিবেশনের এই রূপ। গান একলার হলেও তাতে গলা দেবেন অন্যান্যরাও — নৃত্য করবেন সকলে। এদিক থেকে দেখা যায় গানের রূপই তাতে প্রচ্ছন্ন। আর সেই গানের রূপ যখন কথার সাহায্যে কিঞ্চিৎ দ্বন্দ্বময় হয়ে প্রকটিত হয় তখন তার নাট্যরূপ ব্যক্ত হয়।

কুশানগানে রামায়ণ কথাই মূল — সেকথা আগে বলেছি। এখন কীভাবে একটি কুশানপালার রামায়ণের একটি আখ্যান পরিবেশিত হয় তার কথা বলছি। আমরা এখানে লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালাকে অনুসরণ করে এই বিবরণ দেব। লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা শুরুর আগে দেবদেবীর বন্দনা ও রাম বন্দনা একটা সাধারণ রীতি। এই বন্দনা পালার যেমন রামস্মরণের দ্বারা প্রবেশ ঘটে, তেমনি দর্শক শ্রোতার মনে একটা প্রগাঢ় রাম ভক্তির উদ্রেকের সূচনা হয়। বন্দনা গানের পর মূল গীদাল যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পতনের কথা দিয়ে পালা শুরু করেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ রাবণকে কেউ দিতে সাহস করছেন না। তাই একজন ভগ্নদূতকে প্রেরণ করা হল। ভগ্নদূতকে প্রেরণ করা হল একটি দৃশ্যে। পরের দৃশ্যে রাবণের বিলাপ ধ্বনিত হল।

নর বানরের হাতে বীরশূন্য লঙ্কাপুরী
বীরপুত্র মোর হল নিহত

তখন এলো ভগ্নদূত। ভগ্নদূত আসরে গিয়ে স্বাগত ভাষণে (রাবণ চিন্তা করতে লাগল) জানাল নিজস্ব ঢং-এ রামের প্রতাপে লংকার দুরবস্থার কথা।

বাপরে বাপ কি হলো বাপ
কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াই —
দুই বেটা জুটিল আসি
মজাইল লঙ্কা আসি
ঐ বেটা প্রাণে মরুক, আমি যেন সুখে থাকি।

এরপর রাবণ তাকে জিগ্যেস করলো — বল বল দূত রণের কিবা সংবাদ !

দূত জানালো ইন্দ্রজিৎ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে।

রাবণ পুত্র শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। যাকে বলেছি দৃশ্য সেরকম কোনো বিভাজন কিন্তু এ নাটকে নেই। কেবল বর্ণনার সুবিধের জন্যই বলেছি। রাবণের মূর্ছিত হয়ে পড়ার পর কাহিনী যোজকের ভূমিকায় এলেন গীদাল। তিনি বলে দিলেন রাবণ অনেক অনেক কষ্টে চেতনা ফিরে পেলেন। এবং তখন রাবণ নিজেই খেদ করতে লাগলেন। রাবণের এই খেদ প্রকাশ অনেকটা স্বগত সংলাপে। রাবণ চলে যাবার পর আবার গীদালের সংযোজনায় শুনি মন্দোদরী ও অন্য অন্তঃপুরিকাদের বিলাপের সংবাদ। তাকে নাট্যরূপে দেখানো হয় গীদালের সংযোজনার অব্যবহিত পরে। সেখানে মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণের কথোপকথন হয়। রাবণ জানিয়ে দেন তিনি এই ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর মূল যে কারণ সেই সীতাকে বধ করবেন। মন্দোদরী রাবণের এই ক্রোধোন্মত রূপের প্রতাপে কিছুটা বিমূঢ় হলেও পরক্ষণেই কর্তব্যস্থির করে ফেলেন।

স্বামী চলে গেল সীতারে বধিতে
না না আমি তা করতে দেব না

এরপর মূল গীদালের গানের যোজনায় পাই রাবণের সীতা বধ করবার জন্য অশোক বনে যাবার কথা, সীতার ভয়ার্ত ক্রন্দন, রামের কাছে রক্ষার আবেদন। এবং পরক্ষণেই পাগলিনী বেশে মন্দোদরী প্রবেশ করে রাবণকে নিবৃত্তকরেন। রাবণ যখন প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গ তুলে বলছেন —

তোকে আনি সর্বনাশ হল লঙ্কাপুরে।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া তোমারে।

তখনই পাগলিনীবেশে মন্দোদরীর প্রবেশ বেশ নাটকীয় হয়ে ওঠে। রাবণের সীতাবধের উদ্যম কে মন্দোদরী ঔচিত্য-শাসিত করে বলে "তোমার এ নারী বধ না হয় উচিত।" ক্রোধী রাবণের এই উদ্যম ও মন্দোদরীর চেষ্টায় সেই উদ্যমের রাশ টেনে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া মধ্যে লোক শিল্পীর নাট্যধর্ম পরিস্ফুট হয়েছে। এরপর

রাবণের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ আমরা পাই মূল গীদালের মুখে।

সিংহনাদ ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পালা যতেক কপিগন।।

আর তারই সমান্তরাল একটি দৃশ্য যেন অভিনীত হয় রাম শিবিরে :

রাম। মিত্র বিভীষণ
আজিকার রণ-কৌশল কি করিছে রাবণ ?

বিভীষণ। শুন ওহে মিত্রবর
দশানন আসিতেছে করিতে সমর।

আমাদের চোখের সামনেই এই দৃশ্যটুকু অভিনীত হয়। রাবণের যুদ্ধযাত্রার কথা শুনে রাম খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আর রামের এই উদ্বেগের মুখেই প্রবেশ করেন রাবণ। যদিও কৃত্তিবাসের অনুসরণে রাবণের সংলাপে ফুটে উঠেছে একটা আত্মসর্ম্পণ করবার মনোভাব এবং তা এই নাট্য প্রকৃতির পক্ষে একটু ক্ষতিকরও বটে — তবু রাবণ এই আত্মগত ভাবালুতাটুকু কাটিয়ে পরক্ষণেই যুদ্ধ করবার মনোভাব নিয়ে জেগে উঠেছে।

হে জটাধারী রাম মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

যুদ্ধে রাম মূর্ছিত হয়ে পড়লে নাটকীয়ভাবে এসেছে লক্ষ্মণ

ওরে দশানন
আমি তোরে পাঠাইব শমন ভবন

যুদ্ধে শেষপর্যন্ত লক্ষ্মণকে শেল বিদ্ধ করে রাবণ ফিরে গেছেন।

যদিও কাহিনীতে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই, তবু অঙ্ক বিভাজন করতে হলে বলতে হয় এই পর্যন্ত এ নাট্যরূপের প্রথম অঙ্ক। লক্ষ্মণকে শক্তি শেলে বিদ্ধ করে এ নাটকের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে। এরপর রাম শিবিরের কাহিনীই গল্পের মূল বিন্দু। লক্ষ্মণকে শক্তিশেল থেকে বাঁচিয়ে তুলতে সেখানে যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তারই নানা দৃশ্যাঙ্কিত রূপ। এই পর্যায়ের কাহিনীর মধ্যে মূল রামায়ণের অনুসরণ হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আর সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের দ্বারা দেখানো হয়েছে কীভাবে লক্ষ্মণকে শেলমুক্ত করা হল। সুষেণের কথায় রাম হনুমানকে ঔষধ আনতে পাঠালেন গন্ধমাদনে। রাবণ একথা জানতে পেরে কালনেমিকে পাঠালেন হনুমানকে নিরস্ত করতে। হনুমান আঠারো বছরের পথ একরাত্রে গিয়ে ঔষধ নিয়ে ফিরে আসবে। সে বেশ অহংকৃতভাবেই বলে গেল।

রাত্রিতে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ

মূল গীদাল এরপর সংযোজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের জানিয়ে দেন হনুমান কীভাবে মহানন্দ করে আকাশে উঠে গন্ধমাদনে যাত্রা করল। আর এই শব্দে সচকিত হয়ে রাবণ বোঝেন হনুমান বিশল্যকরণী আনতে যাচ্ছে। রাবণ বলে ওঠেন —

কোন মতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে

রাবণ কালনেমিকে স্মরণ করেন, যুক্তি বলেদেন এবং লংকার অর্দ্ধেক ভাগ দেবেন বলে কালনেমিকে প্রলুব্ধ করেন। এই সব হয়েছে পারস্পরিক কথোপকথনে। যদিও সে কথোপকথন পদ্যের ছাঁদে রচিত এবং রামায়ণেরই হুবহু অনুসরণ, তবু গীতিনাট্য হিসেবে তার মূল্য কম নয়। পদাই এখানকার সংলাপ। কিন্তু পদ্যের সমুদ্রের ভিতর থেকে ফুটে উঠছে নাট্যধর্মের স্থূল বিভাগ। এরপর মূলের যোজনায় গন্ধমাদনের চিত্র এবং কালনেমি হনুমানের কথোপকথনে তার নাট্যপরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। কালনেমির মৃত্যু হলে রাবণ সূর্যকে উদয়াচলে পাঠালেন।

রাবণ। শুনহে ভাস্কর, উদয় হওগিয়া গিরির উপর...

সূর্য। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে
এখন উদয় বল হইব কেমনে ?

রাবণ। তাতে ক্ষতি কি তোমার
ও, মনে বুঝি শক্তিহীন চিন্তহ আমায়!

সূর্য। হে লঙ্কেশ্বর তব আদেশ পালন করিতে
উদয় হইতে যাই উদয় পর্বতে।

সংলাপের পদ্যের ব্যবহার নাট্যগত ক্রিয়ার রূপায়ণে যেন প্রত্যক্ষতা হারিয়ে ফেলে। তবু লোককবি রামায়ণের পদ্যকে যেভাবে সংলাপের রূপ দিয়েছেন তার মধ্যে সংলাপের জোর অনেক সময় অনুভব করা যায়। রাবণের সংলাপের মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের পদ্য। তাকে সংলাপের মতো ব্যবহার করার মধ্যে পদ্যরূপের সাঙ্গীতিক গুণ কাটিয়ে অমিত্রাক্ষরের জোর সঞ্চার করতে হয়েছে। এই সব সংলাপের মধ্যে ও মনে বুঝি শক্তিহীন চিন্তা আমায় বেশ সংলাপের জোর পায়। এরকম মিলযুক্ত পদ্যময় সংলাপ উনিশ শতকের প্রথম দিককার বাংলানাটকেও বিরল ছিলনা। তার চেয়ে বড় কথা লোকনাট্যে একাধারে সঙ্গীতের ধর্ম বজায় রাখতে এবং নাটকের রূপ নির্মাণ করতে হয়েছে। কাজেই নাটকের সংলাপও যেমন দৃঢ় হতে পারেনি তেমনি তাকে গানের ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করাও লোকনাট্যের কাজ নয়। সেই কারণে এই লোকনাট্যের আঙ্গিকে একই সঙ্গে পাত্র পাত্রীর কথোপকথন

যেমন নাট্য ধর্মী হয়ে ওঠে তেমনি থাকে সংযোজকের ভূমিকা। মূল গীদাল উপস্থাপনা করেছিলেন ইন্দ্রজিতের মৃত্যু দিয়ে আর সেই গীদালই এই লোক গীতিনাট্যের শেষ করলেন লক্ষ্মণের জীবন দান করে। এই উপস্থাপন আর পরিণতি দুয়ের দ্বন্দ্বেরও একটা বিপরীত চরিত্র থেকে যায়। উপস্থাপনা রীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা আগে বলা হয়েছে। এখানে শুধু আঙ্গিকের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলব। আগে এই আলোচনায় সে কথা এসেছে। এই লোকনাট্যের উপস্থাপনার সেই রীতিটি হল প্রথমে কাহিনী বর্ণনা - গীদাল সেই বর্ণনা করছে গানে তারপর সেই গীতখ্যানের অভিনেয় উপস্থাপনা হচ্ছে। উপস্থাপনা রীতির দিক থেকে উনিশ শতক / বিশ শতকের কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকটায়ও যে ধরণের কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত ছিল — তার রূপ এখন প্রায় লুপ্ত। সেই কৃষ্ণযাত্রায় এই আঙ্গিকের অনুসরণ ছিল। বাল গোপাল-রূপী একটি বালক গায়ক প্রথমেই গানে যে কথা বলে যেত — পরে সেই গানের কথাই নাট্যরূপে দেখানো হত। নাট্যাংশ গীতাংশের রূপায়ণ মাত্র। রূপগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখলে বলা যায় লোক কবিদের আঙ্গিক ভাবনার একটা স্বাভাবিক স্বরূপ আছে। কুশান পালা গানে পদ্য যেমন গানের সুর দিয়ে গাওয়া হয় তেমনি তার মাঝে মাঝে কিছু গীতও গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন অশোক বনে রাবণের উদ্যত খড়্গের নীচে ভয়ার্ত সীতার আর্তি সঙ্গীতের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

কোথা প্রভু রঘুনাথ তুমিহে অনাথের নাথ
ও প্রভু রঘুনাথ হে
দেবর লক্ষ্মণ কোথা, না শুনিনু তার কথা
প্রভু প্রাণ যায় আজি রাক্ষসের হাতে
ও প্রভু রঘুনাথ হে।।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়লে লোক কবি রামের বিলাপকে সঙ্গীতের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন

ও - ও - মোর গুণের ভাইরে, ভাই লক্ষ্মণ রে

পরের কথাগুলি রামায়ণের কিন্তু গানের যে situation-এ করুণ রস মানুষের চিত্তকে আর্দ্র করে দিতে পারে সেই সুযোগকে কবিরা সঠিক ভাবেই ব্যবহার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে ভগ্নদূতের মুখের কথাগুলিকে গান করেই দেখানো হয়েছে

বাপরে বাপ, কি হলো বাপ
কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াই —

ইত্যাদি। এখানে ভগ্নদূতের মতো লোককে লঘুচিত্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। তার ভাষায়ও অনেকটাই লৌকিক।

## দোতরা

কোচবিহারে 'কুশান' পালাগানের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে 'দোতরা' পালাগানের কথা। রামায়ণকেন্দ্রিক পালাগান কুশান। লৌকিক কাহিনী, পুরনো কথা, ভগ্ন ইতিহাসের কোনো রোমান্টিক অধ্যায়ের অংশ বিশেষ নিয়ে গড়ে উঠেছে দোতরা পালার কাহিনী। হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর আকর্ষণে দর্শক-শ্রোতা আপ্লুত হয়ে থাকেন — এই দোতরা পালাগানে। দোতরা একটি বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রটির নামানুসারে দোতরা পালা লোকনাটকের পরিচয়। কুশান, বিষহরা, চোরচুন্নী, শাস্তরী, রাজধারী — কোনোটি বাদ্যযন্ত্রের নামানুসারে পরিচিত নয়। দোতরা পালা দোতরা বাদ্যযন্ত্রের নামানুসারে পরিচিত হওয়ার একটা কারণ হয়তো এই যে দোতরা যন্ত্র ছাড়া এই পালাগান কখনো হয় না। খোল, বাঁশী, জুরি, সারিন্দা, হারমোনিয়াম ইত্যাদির মধ্যে দোতরাকে অবশ্যই থাকতে হবে। লৌকিক কাহিনী, ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক উপাখ্যান এবং রূপকথাই হচ্ছে দোতরা পালার বিষয়বস্তু। দোতরা পালায় অভিনেতাদের গান ও সংলাপের মধ্যে কিছু সমাজ-অস্বীকৃত প্রেমকাহিনী থাকতো। নৃত্যের ও গীতের ভঙ্গি চটুল ছিল। তাই লোকালয় থেকে কিছু দূরে খোলা মাঠে এর আসর বসতো। এই পালানাটকের ব্যবস্থা করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা অনেক সময় অর্থ সংগ্রহের জন্য জুয়া খেলার আয়োজন করতেন। দোতরা পালার মধ্যে পরিচিত নাম — রূপধইন কইন্যা, করিম বাদশা, আলম সাধু, বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী, মরুচমতী, গুঞ্জুরা বিবি ইত্যাদি। ড. দিগ্বিজয় দে সরকার দোতরা পালা সম্পর্কে বলেছেন "দোত্‌রা ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক পালা।" তিনি অবশ্য এই পালায় সামাজিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও অলৌকিকতার স্থান দেখতে পেয়েছেন। কোনো কোনো পালা এক একটি ছোট্ট থীম নির্ভর। দুবলাবালী পালাটির মূল কথা 'কাঁচা-পাকা পিরিত' সম্বন্ধে সামাজিক মনোভাবের পরিচয়। বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী পালার বিষয় একটি রূপকথা ধর্মী কাহিনী — বিশ্বকেতু ও চন্দ্রাবলীর প্রেম। দোত্‌রা পালায় লোককাহিনী, কিংবা সওদাগর, সাধু, দেবতা-দানবের গল্প বেশ আকর্ষণীয়। রূপধন কন্যা, মরিচমতি, দুবলাবালী, বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী, মধুমালা-মদনকুমার, গুঞ্জরা বিবি, ধনপতি সওদাগর, রহিম বাদশা, করিম বাদশা প্রভৃতি খবুই জনচিত্তমোহনকারী লোকনাট্য। এসব পালার মূল কাহিনীতে থাকে একটি সরল চিত্তাকর্ষক মানবজীবনের গল্প। রূপকথার গল্প যে সহজ অথচ কল্প-জীবনের আকর্ষণ আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত রাখে এ পালাগুলিরও মধ্যে সেইরূপ আকর্ষণীয় কাহিনীর উপস্থাপনা করা হয়। এইসব কাহিনীতে থাকে একটি প্রেম ভালোবাসার কিংবা ন্যায় ধর্মের বা মানুষের জীবনের অন্য কোনো গল্প। যেমন বিশ্বকেতু চন্দ্রবলীর পালার গল্পে পাই রাজপুত্র বিশ্বকেতুর সঙ্গে দেবসভার নর্তকী চন্দ্রাবলীর প্রেম ও বিরহের কাহিনী। গুঞ্জরা বিবির পালা নেহাৎই রূপকথার গল্প। আবার চোখা ঠক' একালের সামাজিক পরিস্থিতিতে ঠক মানুষের পরিচয়।

দোতরা পালাগানের প্রাচীনতা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কোনো কথা বলা মুশকিল। অনুমান করা হয় এ গান বেশ প্রাচীন। কিন্তু এই প্রাচীনতার বিশেষ কোনো বাহ্যিক প্রমাণ নেই। অনুমান হয় মুসলমান শাসনামলে এ গানের প্রচলন শুরু হয়। দিগ্বিজয়বাবু এই নাটকে আদি লোকনাটকের রূপ লক্ষ করেছেন। এই গানের যে উপস্থাপন পদ্ধতি মঞ্চ সজ্জা, নৃত্যবাদ্য নীতের প্রয়োগ এসব বর্তমান নাট্য উপস্থাপনার থেকে আলাদা। প্রাচীন উপস্থাপন পদ্ধতি এবং লোক আঙ্গিক এ নাটকে দেখা যায়। এর প্রধান তিনটি দিক বাদ্য নৃত্য গীত এর মূল অবলম্বন। নৃত্য এর প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সহজভাবে যুক্ত। সংগীত এর মুখ্য আশ্রয়। তবে নৃত্যের যে রূপ বর্তমানে প্রচলিত তা খুব পুরানো নয়। নৃত্যে মেয়েদের অংশগ্রহণ আধুনিককালের সংযোজন। কিন্তু নৃত্যের যে চাল বা পদচারণা এবং হাত বা দেহের মুদ্রা তার মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট। নৃত্যের পদচারণার ভঙ্গিটি সরল কিন্তু সাঁওতালী নৃত্যের সরলতা তাতে নেই। তার চেয়ে কিঞ্চিৎ জটিল। কাজেই মনে হয় এতে নৃত্যরীতির যে প্রয়োগ তার দিক থেকে দেখলে এই নৃত্যগীতাত্মক নাটক কে প্রাচীন বলে ধারণা করতে হয়। কামতারাজ্যের পতন এবং কোচ-রাজ্যের উত্থান এই দুই যুগ-সন্ধিক্ষণের হোসেন শাহা কর্তৃক কামতা রাজ্যের আক্রমণের ফলে কোচবিহার অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। রাজা, আমির, ফকির, আর্গলিয়া পীর-পয়গম্বর ইত্যাদির গুণ-কীর্তন করে গ্রামীণ কবি শিল্পীরা পদ রচনা করতেন দোতরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে পালাগান পরিবেশন করতেন। এই পালাগান কালক্রমে মুক্ত আসরের মধ্যে পরিবেশিত হতে শুরু করে। এই গানের উৎপত্তিকালে একজন দোতরা বাজাতেন এবং গান করতেন, আর একজন সহযোগী শিল্পী গানের অর্থ ভেঙ্গে দিতেন এবং কাহিনীকে ধুয়ার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁরাই কালক্রমে মূল গীদাল এবং দোয়ারীরূপে পরিচিতি লাভ করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে রাজা-বাদশাদের বিগত জীবন-কাহিনী নিয়েও গায়করা গীত রচনা করে গান পরিবেশন করতেন। ফলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক সময় এই গানের চর্চা ছিল। পরবর্তীতে সম্পন্ন গৃহস্থরা এই গানের মধ্যে নৃত্য-গীতের চটুলতা লক্ষ করে একে দূরে ঠেলে দেন। কিন্তু এই পালাগানের জনপ্রিয়তা আরো বাড়তে থাকে। খোলা মাঠে স্বাধীনতাহেতু শিল্পী দর্শক উভয়েই এর বিষয় ও পরিবেশনের গুণে তৃপ্ত হতে থাকেন। পূর্বের মূল দু'জন শিল্পীর জায়গায় পরবর্তীতে চরিত্রানুযায়ী অনেক অভিনেতাদের অনুপ্রবেশ ঘটলো। কল্পনানির্ভর প্রেমনির্ভর, রাজ-কাহিনী নির্ভর কাহিনী বলে পাত্র-পাত্রীদের সাজ-সজ্জায় রাজকীয় পোশাক অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো।

বলা বাহুল্য আগে অভিনেতাগণের সবাই ছিলেন পুরুষ। মহিলা চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। এই অভিনয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে মূল গীদাল এবং দোয়ারী বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন। যে কোনো চরিত্রে যে কোনো দিকেই তাঁরা চলে যেতে পারতেন। মঞ্চপরিকল্পনায় আধুনিকতার নিদর্শন ছিলো না। আগে মাটির উপরেই আসর বসতো। বাদ্য-শিল্পী এবং অন্যান্য শিল্পীরা গোলাকার ভাবে বসতেন। তাঁদেরকে ঘিরে চারদিকে

অন্যান্য দর্শক-শ্রোতারা বসতেন। মঞ্চের চারদিকে চারটি বাঁশ বা কলাগাছের খুঁটিতে সামিয়ানা টাঙ্গানো হতো। সে সময়ে মশাল জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হতো। পরবর্তীকালে পড় বড় বড় গানের আসরে হ্যাজগ ও ডে-লাইটের ব্যবস্থা করা হলে নাটকের চাকচিক্য অনেক বেড়ে যায়।

দোতরা গানের আসর সাধারণত বড় উঠোন বা খোলা জায়গায় বসে। চারিদিক ঘিরে বসেন দর্শকেরা। দর্শকের দ্বারা ঘেরা মাঝখানের একটি প্রায়-বৃত্তাকার জায়গায় শিল্পীদের অবস্থান। শিল্পীদের মাঝে রেখেই নৃত্য করা হয়। আসরের মাথার উপর যে কোন আচ্ছাদন থাকে। আসরে বসে অভিনয়ের রেওয়াজ আগে ছিল না। কারণ আসরে নৃত্যরত ছোকরা, মূল, দোয়াড়ী ছাড়া তেমন কাউকে প্রয়োজন হত না। তেমন হলে বাজানদার কেউ উঠে সংলাপ ধরত। দর্শক অভিনেতা এখানে সমাসনে আসীন। সাজঘর (বাসাঘর) বলতে আসরের অদূরে ঘেরা-দেওয়া কোন স্থান। কিন্তু তার তেমন গুরুত্ব ছিল না। সাজ করবার পর চরিত্রগুলি সকলেই মঞ্চে উপস্থিত থাকত এবং প্রয়োজনের ভূমিকটুকু শেষ করে আসরেই বাদকারদের মধ্যে বসে পড়ত। এখন অভিনেতা সংযোজিত হওয়ায় আসরের গুরুত্ব বেড়েছে। আলোর ব্যবস্থা বলতে আগে ছিল কেরসিন তেলের বাতি। লোকে তখন পালানাটক দেখতে যাওয়ার চেয়ে গান শুনতেই যেত। ফলে স্বল্প আলোকে বা জ্যোৎস্নার আলোয় গান করবার অসুবিধে ছিল না। এখন শ্রব্যগুণের সঙ্গে দৃশ্যধর্মও যুক্ত হয়েছে। তাই আলোর ব্যবস্থার বদল হয়েছে। ডে-লাইট প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। তারপর এসেছে বিজলী আলো। এই উজ্জ্বল আলোতে দর্শকদের মঞ্চক্রিয়া দেখার সুবিধা হয়। মঞ্চমায়া সৃষ্টিতে নাটকে আলোর যে ভূমিকা এখানে তা নেই। লোকনাটক যতটা দেখার ততটাই শোনার ব্যাপার। বিশেষ কোন নাট্যক্রিয়া ছাড়া শোনার ব্যাপারটাই এখানে বেশী।

আসরের অভিনেতাগণ চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরেন। এখন চরিত্রের ভাব আনবার জন্য যতটা সম্ভব পোশাক ব্যবহার হচ্ছে। গ্রামীণ আর্থ-কাঠামো এবং পালাগানের দলের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে চরিত্রসকল পোশাক ব্যবহার করেন। তবে মূলের পরিচ্ছন্ন ধুতি-পাঞ্জাবীর ব্যবহার অপরিহার্য। দোয়ারীর বেশ কিছু মলিন হাঁটুর উপর ধুতি এবং গেঞ্জি বা সাধারণ জামা তার পোষাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ে রূপার গয়নার ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। এখন তার আর তেমন প্রচলন নেই। তার জায়গায় কাঁচের চুড়ি এবং ইমিটেশন সোনার গয়না এসেছে।

দোতরা পালাগান শুরু হওয়ার সময় অন্যান্য পালানাটকের মতো বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। এই বন্দনাগানের একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে —

— ও হো আইসো মা হে মা জননী, মোর দীনহীন কাঙ্গালের ডাকে।

আইসো মা সরস্বতী মোরে কর দয়া, চরণে স্মরণ নিলাম, দাও পদে ছায়া।

পালার রকমভেদে বন্দনার বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। এই বন্দনার সঙ্গে ছোকরারা নাচ শুরু করেন। গানের শেষ অংশ ধরে সমবেত বাজনদাররা সুর সহযোগে গান ধরেন। সেই সঙ্গীত ও নৃত্যের সহমিলনে পালাগানের উপস্থাপন হয়।

পালার বন্দনা অংশের গানে সরস্বতী, শিব-দুর্গা, নারায়ণ, ভানু-ভাস্কর, কালিকা ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন নদ-নদীর কথা, পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষলতার কথাও বন্দনা অংশে প্রকাশিত হয়।

বন্দনাশেষে শ্লোকধর্মী পদ্যাকারে সংলাপ শুরু হয়। সংলাপের মধ্য দিয়ে পালার কাহিনী এগিয়ে চলে। যখন পালা একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে যায় বা কোনো সিরিয়াস বিষয়ের দিকে এগোয় তখন দেখা যায় সংলাপ গীতিময় হয়ে ওঠে। দর্শক শ্রোতাও ঐ গীতের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেন। কোথায় গীতের ব্যবহার হবে তা সবসময়ই নির্দিষ্ট থাকে না। কেন না সংলাপ পদ্যধর্মী হওয়ায় তা সবসময়ই গীতের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। পালার গানের একটি বৈশিষ্ট্য হল তা সকলের গান। কেউ গান ধরলে পিছনে বসা বাদ্যকার মূল ও দোয়ারি সকলেই এই গানে গলা মেলান। এতে বোঝা যায় ব্যক্তিগত সাংগীতিক ধর্মের চেয়ে গোষ্ঠীগত গান এ পালার বিশেষত্ব।

গুঞ্জরা বিবির পালার একটি গান —

রন্দন রান্দে সুন্দরী কইন্যারে
রন্দন রান্দে সুন্দরী কইন্যা নাকে নড়ে বালী
রুই কাতেলার ভাজা আরো কই মাগুরের জালী
হাঁস দিয়া বাঁশ রান্দে কইতরের ছাও
শাল-শোল সাটি রান্দে বোয়ালের পাতাও রে।

গুঞ্জরা বিবির পালার এই গান মূল গীদালের মুখে গীত হয়। এখানে গুঞ্জরার রন্ধনের কথা। গানে গুঞ্জরার ভূমিকা নেই। অন্যপক্ষে 'আলাম সাধু' পালার বেগমের একটি গান এখানে দেখানো যেতে পারে — তা বেগমের নিজের গান।

ওহো প্রাণ সাধুরে সাধু
যদি সাধু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্ধি খান ওরে
দাড়ি মাঝি সাধু রাখেন সাবধনেরে
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যয়
পর নারী সাধু আপন নয়রে
পর নারী সাধু বধিবে জীবন রে

বন্দনার পর সংলাপ; সংলাপ চলতে চলতে আবার গান — এই সকল বৈশিষ্ট্য দোতরা পালাগানের একটি বিশেষত্ব। এই প্রসঙ্গে ড. সুখবিলাস বর্মার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য —

"After the Vandana comes the basic play, which in a sense is the dialogue section as the songs are in actually dialogues in a different form. What the characters sing, after having spoken in prose for a while, may either be a complement to the opinion introduced in the prose dialogue or an alternative means of presenting the same opinion."[৬]

("Bhawaiya : Ethnomusicological Study, p. 261)

পালা চলার মাঝে মাঝে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ফাস বা খোসা গানের ব্যবস্থা থাকে। সঙ্গীতের চটকা গানের তালে মূল গানের কথা কখনো ধরেই ছেড়ে দেন। অন্যান্য শিল্পীরা সেই গানের পদ ধরে গান শুরু করেন।

আরে চ্যাংরাগুলা মাইরছে দুরা
বাইগন নাই মোর গছতে
থাক্ দুরা তোক খামো ও হাটে।

ফাস গানের সঙ্গে মূল পালার সম্পর্ক নেই। এ ধরনের গান কতো পুরানো বলা যায় না। তবে লোক শিল্পীরা যে সব উপায়ে মনোরঞ্জনের চেষ্ট করেন এ তার অন্যতম। সম্ভবত লোকনাট্যের এই ধরনের প্রয়োগ দেখে যাত্রায় প্রসঙ্গ বহির্ভূত মনোরঞ্জনাত্মক কিছু 'ডুয়েট' সংযোজিত হয়েছিল।

দোতরা পালা গানে মূল গীদালের স্বাধীনতা কুশান গানের চাইতে অনেক বেশী। খোসা গান ছাড়াও কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উপদেশমূলক গান, আধ্যাত্মিক গান, মানবসম্প্রীতির গানও পরিবেশন করা হতো। এতে কাহিনীর ধারাবাহিকতায় তেমন ছেদ পড়ে না।

যেমন, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো।
পার করে আমারে

কিংবা, নানান বরণ গাভীরে ভাই
একবরণ দুধ
জগৎ ভমরিয়া দেখ সগায়
একইমায়েরপুত।

আসলে এই শ্রেণীর লোকনাট্যে কাহিনীর আঁট সাঁট উপস্থাপনা বা আঙ্গিকের বৈচিত্র্য কেউ খোঁজে না।

কিছুটা অবসর বিনোদন ও আনন্দ লাভই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সঙ্গে অধ্যাত্ম উপদেশ বাড়তি পাওনা রূপে আসে। সময় যেখানে যথেষ্ট এবং লোক মানস রস আস্বাদনে বিশেষ বৈচিত্র্য চায় না সেখানে নাট্য প্রয়োগে বা নাট্য কাহিনীতে তেমন মনোযোগ দেওয়ার দরকার হয় না। লোক কল্পনা যথেষ্ট পরিভ্রমণশীল হয়ে নানা বিষয়ের ভিতর থেকে আনন্দ সম্ভোগ করে। এই জন্য একই পালার মধ্যে নানা রসের প্রয়োগ কোনো রসাভাস সৃষ্টি করে না।

'আলম সাধু' পালায় দেখা যায় আসর বন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে। আলম সাধুর বাণিজ্যে গমনের কথা গান ও সংলাপের মধ্য দিয়ে শুরু। অনুরূপভাবে অন্যান্য চরিত্র সকল যথাক্রমে বেগম, রহিম, আয়েষা, ধাইমা, জাগীরাম বাদশা, গাটুনাপিত সকলেই গান ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ বক্তব্য আসরে নিবেদন করছেন।

সুখবিলাস বর্মা এ প্রসঙ্গে বলেন "... গান আসলে সংলাপেরই সম্প্রসারণ, সংলাপের ভাষার সঙ্গে গানের ভাষার পার্থক্য ব্যাকরণগত নয়, ধ্বননগত (Prosodic). গানের উচ্চারণে আছে সুরের সহযোগে স্বরের অতিমাত্রিক দীর্ঘীকরণ। গানের ভিতর এই ধ্বননগত পার্থক্য নাটকের শৈল্পিক তথা প্রয়োগগত প্রয়োজনেই রক্ষা করা হয়। কোনও বক্তব্যের নাটকীয় গুরুত্বকে জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই সংলাপের মধ্যে চড়া সুরের সংযোজন ঘটিয়ে সংলাপকে গানের সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়।"[৭]

পুরো পালা নাটক ঘিরেই নৃত্যানুষ্ঠান একটি অপরিহার্য অঙ্গ। খোসা গান, ধুয়া এবং পয়ার পরিবেশনকালে নর্তকীদের নৃত্য-প্রদর্শন চলতেই থাকে। সেই সঙ্গে দোয়ারীর হাস্যকৌতুক এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দর্শককে আকৃষ্ট করে। লোক আঙ্গিকের ধরানায় চটুল নৃত্যের প্রভাব বেশী। বর্তমানে পালা নাটকের মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটনার ফলে নৃত্যের কিছুটা ঢং-ও পাল্টে গেছে। যাত্রা পালা ইত্যাদির প্রভাবে দোতরাপালার চিরাচরিত নৃত্যের মুদ্রা, ছন্দ, মাত্রা ও তাল কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। মূল গীদালের হাতের দোতরার সঙ্গে খোল, করতাল, সারিন্দা ও বাঁশী অনবদ্য যন্ত্র-ধ্বনির মধ্যে অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠানে নৃত্য লীলায়িত হয়ে ওঠে। 'বন্দনা' পাঠ থেকে শুরু হয়ে ধীরে কখনো ক্ষিপ্র গতিতে আবার কখনো কাহিনীর উপযোগী বেদনাময় দৃশ্যের সঙ্গে নৃত্য-নাটকের পরিণতি পর্যন্ত চলতে থাকে। ধারাবাহিত সংলগ্নতার মধ্য দিয়ে দোতরা পালা কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে চলে আসে। এই নৃত্যের পদচারিতা ও দেহ ও হাতের মুদ্রাও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পদচারিতার চাল সোজা না হয়ে কিছুটা আঁকাবাঁকা ভাবে চলে।

পরে সহযোগী শিল্পী দোয়ারীর উপস্থিতি ঘটে। মূল গায়ক, দোয়ারী এবং পরে নর্তকীদের সহযোগে নাটকীয় রূপটির প্রকাশ ঘটে। অনেক পরে গদ্য সংলাপের ব্যবহার শুরু হয়।

**'আলমসাধু' দোতরাপালার পর্যালোচনা :**

আসরে ওঠার আগে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভক্তি-প্রণাম করেন। দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করার জন্য এবং তাদেরকে পালার শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য কখনো কখনো মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হচ্ছে।

'মুই ফল্লা (মূল গীদাল) আসরত বসিলুং
ঈশ্বর মহাদেবের পুত।
আখসুরথ বলিস্যং ফান্দ
ওক্তো উপরে পোও
মোক দেখিয়া সভার লোক
নজর কিল্লে খাড়া।
আল্লা নাগে তাল্লা।
উচুল নাগে ধান্দা
এই মন্তর দিয়া সভার লোকের
আঁখ কইলং বন্দি
এই বন্দি যদি ছোটে
আল্লা উচুলের সিংহাসন কাঁপে

সাজঘর থেকে বেরোবার আগে মন্ত্রের কাজটি শেষ হয়।

মূল গীদাল, দোয়ারী, নর্তকীর দল এবং বাজনাদাররা মিলে সবাই একসঙ্গে আসর বন্দনায় অংশগ্রহণ করেন। মূল গীদাল মূল পদ শুরু করেন। অন্যান্যরা ধুয়া ধরে গান করতে থাকেন। 'আলম সাধু' পালার বন্দনার কিছু অংশ-

আইসেক মাও মোর সরস্বতী মা
ওহে মা মোর সভার ভিতর হে
আইসেক মাও মোর সরস্বতী মা।
আইসেক মাতা সরেস্বতী রথে করিয়া ভর।
জৈ জোগারে নামেক মা তুই মোর সভার ভিতরে
মোর সবা ছাড়িয়া যদি মা অন্যের সভা যাও
আর কোনো কিড়া না দেও হে
ওহে মা ধর্মের মাথা খাও হে

প্রথমে বন্দনা করি শিবের চরণ।
শিবেরও ঘরণী বন্দং মাও ভগবতী।
তাহার দুটি কন্যা বন্দংহে ওহে মা
আইসেক লক্ষ্মী সরস্বতী হে।

'করিম বাদশা' দোতরা পালার বন্দনা শুরু হয় এইভাবে

বন্দনা –

ছাওয়াল গাজিল
তোমার পদে বন্দিকি ছালাম
আট গুরু বন্দং
পাট গুরু বন্দং
শিক্ষা গুরুর পাও
যে গুরু হস্ত ধরিয়া
শিখাইছে ডাইন বাও
ছাওয়াল গাজিল
তোমার পদে বন্দকি ছালাম।

বিভিন্ন গুরুদের বন্দনা প্রথম হয়। তারপরে মা সরস্বতীর বন্দনা। মা সরস্বতীর বন্দনা প্রত্যেকটি দোতরা পালায় আছে। বন্দনার শেষে একটি চটুল সঙ্গীতে খোসা গান হবে। এই গান কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয়। আসরকে জমজমাট করতে খোসা গানের সঙ্গে নাচও হয়।

"পার করোরে চ্যাংড়া নাইয়া
সময় বৈয়া যায়
পারের বদলে ওরে নাইয়া
যৈবন করিবো দান
পার করোরে চ্যাংড়া নাইয়া
সময় চৈলা যায়।"

খোসা গান শেষ হয়। মূল গায়ক আসরে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেন। মূল গায়ক শুরু করেন

'হায়রে — বন্দনা গানেরও কথা রইল ভালে ভালে
সোতরা পালা গানের কথা শুনি সকলে
ধর্মপুরে ছিল সাধু ধর্ম অধিকারী
সোনারূপার বানাইচে সাধু আট মহলা বাড়ি।
ধনে আসন ধনে বাসন ধনের নাইরে সীমা।
ধন দিয়া বান্ধিতে পারে আগম করিয়া।
তার পুত্র আলম সাধু নামেতে সংসারে
১৪ বছর যাবে সাধু বানিজ করিবারে।
যখন যাবে দেখ বানিজ করিবারে
তিনটি গোপন কথা বলিবে ছাইলার আগে।
একটি মাত্র পুত্র বিধি দিছে তাহার কোলে।
সেই পুত্র ডাকি কথা লাইগাছে বলিবারে।

ধর্মপুরের সাধু ধর্ম অধিকারীর পুত্র আলম সাধু। চোদ্দ বছরের জন্য বানিজ্যে যাবার আগে আলম সাধু পুত্র রহিমকে ডেকে তিনটি গোপন কথা বলেন। সেই কথা তিনটি রহিমকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

আলম সাধুর প্রথম কথা — 'এই যে গর্ভবতী ঘুড়ীটাক ছাড়িলোং ঘোড়াশালাটার মাঝে।
ঐ ঘুড়ীর উদরে যদি ঘোড়া পয়দেশ করে —
লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা করিবু বসি দ্বারে।
আর ঐ ঘুড়ীর উদরে যদি ঘুড়ী পয়দেশ করে,
সে ঘুড়ীক কাটিবু, না রাখিবু ঘরে।'

দ্বিতীয় কথা — 'গর্ভবতী হস্তিনীক ছাড়িলাং হস্তিশালের মাঝে।
ঐ হস্তিনীর উদরে যদি হস্তী পয়দেশ করে —
লক্ষ টাকা দান করিবু বসি দ্বারে
আর হস্তিনীর উদরে যদি হস্তিনী পয়দেশ করে।
সে হস্তিনীক কাটিবু না রাখিবু ঘরে।

তৃতীয় কথা — 'গর্ভবতী তোর মাক ছাড়িলাং নাট মন্দির ঘরে।
তোর মার উদরে যদি ভাই পয়দেশ করে।

লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা করিবু বসি দ্বারে।
তোর মার উদরে যদি বৈনি পয়দেশ করে —
সে বৈনিক কাটিবু না রাখিবু ঘরে।"

এই তিনটি নির্দেশ রহিমকে পালন করতে হবে। তৃতীয় কথায় রহিম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। আলম সাধু বিদায় নেন বেগমের কাছে। রহিমকে গুরুর পাঠশালায় রাখার নির্দেশ দেন। বিদায়ের সময় বেগম গান গেয়ে ওঠেন—

"ওহো প্রাণ সাধুরে সাধু
যদি সাধু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্দি খান ওরে।
দাড়ি মাঝি সাধু রাখেন সাবধানেরে।
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যায়
পরনারী সাধু আপন নয়রে
পরনারী সাধু বধিবে জীবনরে।"

এখানে ফুটে উঠেছে বেগমের আর্তি। পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে নিষেধ করেছেন, মিতব্যায়ী হয়ে চলতে বলছেন — এরকম নির্দেশ রয়েছে গানটিতে। স্বামী বিচ্ছিন্না নারীর মনের বেদনায় ভরা এই গান। বলা যেতে পারে এই জাতীয় গানগুলিই আলাদা করে ভাওয়াইয়া গানরূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। তাই অনেক বলে থাকেন দোতরা পালাগানই ভাওয়াইয়া গানের উৎস। আলম সাধু চোদ্দ বছরের ডিঙ্গা সাজিয়ে নেন। এই ডিঙ্গা সাজানোর নানা কথা গীদাল ভাবে বর্ণনা দেন। চৌদ্দ বছরের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী ডিঙ্গাতে মজুত করা হয়। ধীরে ধীরে মধুকর ডিঙ্গা বিদেশের দিকে এগিয়ে চলে।

ধনপতি সদাগর, করিম বাদশা, সাত সতীনের পালা — এই সকল দোতরা পালাতেও বাদশা ও সদাগরদের বানিজ্যে যাওয়ার দৃশ্য আছে। একই অঞ্চলে এই পালাগুলো অভিনীত হওয়ার জন্য কাহিনীর ভেতরের সাদৃশ্য থাকাটা স্বাভাবিক। অন্যদিকে বেগমের উদরের সন্তান ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। গর্ভে বড়ো হয়ে ওঠার বর্ণনা পদোর সুরে মূল গায়ক এবং দোয়ারী তুলেধরেন।

মূল গায়ক বলছে — এক মাসও হইলে গর্ভ জানি কি না জানি।
দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে — দুই মাসত হইলে গর্ভ লোকের কানাকানি।

এইভাবে বর্ণনা চলতে থাকে। বেগমের প্রসব বেদনা উঠলে 'বাইমা' কে আনা হয়। ধাইমার কথা — "বাপরে বাপ মুই যখন আসি পুচ্চুং আর ভয় কিসের"।

ধাইমার সংলাপে আছে গ্রামের ঘরের ভাষা।

সংকট সময়ে ধাইমার চতুর বুদ্ধি কাজ করে। বেগমের সুন্দর শাড়ীর প্রতি তার লোভ। সেই শাড়ী পড়ে ধাইমা শুশ্রুষা করেন —

"সেই শাড়ী পিন্দিয়া ধাইমা বেগমক ধরিল।
আন্দার ঘর আলো করি ছাওয়া জন্ম নিল।
বিধির বিড়ম্বনা দেখ কি হইতে কি হইলো
কইন্যা ছাওয়া দেখি বেগম কান্দিতে লাগিল।"

কন্যা সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ আছে রহিমের উপর। বেগম বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বিধির বিড়ম্বনা বিধির লিখন এই কথা গোটা নাটকেই আমরা মাঝে মাঝে পাই। বেগম বলেন —

ধাইমা, বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।
অকালে অভাগীর মরণ
মোর পুত্র রহিম আছে গুরুর পাঠশালে,
শুনা মাত্র ধায়া আসিয়া কইন্যারে কাটিবে।

পদ্যসংলাপের সঙ্গেই গদ্য মিশিয়ে বলেন — রহিম যে পিতৃসত্য আবদ্ধ ধাইমা। পিতৃ আদেশ রহিম পালন করবেই।

উত্তরে ধাইমার একেবারে নিজস্ব সংলাপে —

"এই বুদ্ধিটায় নাই পান। শুন মোর কথা, মুই কালি যাইম রহিমের পাঠশালা। যায়া কইম, রহিম, তোর মার ওদরে একটা ভাই জন্ম নিচে। আর ঐ ভাবা পণ্ডিত রহিমক গণনা করি কয়া দিবে, রহিম আজ থাকি ১২ বছর পর্যন্ত তুই তোর ভাই এর দেখা করিব পাচু না। দেখা করিলে তোর ঝালা নাগি তোর ভাই মরিবে, না হয় তোর ভাই এর ঝালা নাগি তুই মরিবু। এই জন্যে পাঠশালা ছাড়িয়া তুই ঘোর বনে যা।"

ধাইমার এই বুদ্ধিতে রহিম ঘোর বনে চলে যান। রহিমের বোন আয়যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেন। কিন্তু বেগম বিষণ্ণ হয়ে থাকেন আয়যা মার কাছে জানতে চান তাঁর দুঃখের কারণ।

"উপায় অন্ত না পাইয়া জননী বেগম
কহিল খুলিয়া সত্য বিবরণ।
শুন শুন শুন বাছা জবাব শুনেক মোরে।
পিতৃসত্য পালিবে রহিম কাটিয়া তোমারে।

মার কাছে দাদার কথা শুনে আয়ষা আপ্লুত হন।

"মা, না দেও যদি দাদার মনে হইতে দরশন

জানিয়া রাখ মাতা আমার মরণ।"

রহিমের বনবাস, আয়ষার অদম্য ইচ্ছা — একটা ভীতিপূর্ণ সংকটের মধ্যে বেগম। বেগম আয়ষাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন — "দেখ মা, তোক দেখা মাএ রহিম কাটি ফেলাইবে। যদি বাচির চাইস — "দাদা দাদা বলিয়া একবার কমড় জড়েয়া ধরিলে আর মারির পারে না। না হইলে তোর মরণ।"

আয়ষা ঘোর জঙ্গলে দাদা দাদা বলে চীৎকার করেন এবং বলেন "শুনেক দয়ার দাদা জবাব শুনেক মোরে মিথ্যা খবর দিছে ধাই নিকটে তোমারে। মুই তোর দয়ার বৈনি আয়ষা মোর নামটি, আলম সাধু পিতা, দাদা, জননী বেগম।" এই কথা বলেই আয়ষা দাদার কোমর জড়িয়ে ধরেন। রহিম কপালে আঘাত করে বলেন—

ভালক না কং ভাল্ মোর বিধাতা মন্দক না কং ভাল্।

মন্দ নয় কালি আর কলম, মন্দ মোর কপাল।

কাহিনীতে রয়েছে নিয়তির পরিহাস। এরকম ঘোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় রহিম। একদিকে পিতার নির্দেশ পালনের কর্তব্য, অন্যদিকে ভাই ও বোনের মধুর মিলন কোনটি ঠিক রহিম বুঝে উঠতে পারেন না। তাই সবকিছু ভাগ্যের পরহিাস বলে মনে করেন। ভাই বোন জঙ্গলে বাস করেন। বীর পালোয়ান রহিম বনে শিকারে যান। ক্রমে ক্রমে আয়ষা যুবতী হয়ে ওঠেন। দাদা ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের মুখ দেখতে পান না। নিজ-রাজ্য থেকে অনেক দূরে জাগিরাম বাদশার জঙ্গলে তাদের ঠিকানা। একদিন জাগিরাম বাদশার নাপিত গাটু আয়ষাকে দেখতে পান। এই দৃশ্যের পরেই দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য গাওয়া হয় একটি খোসা গান। দোয়ার ও নর্তকীরা নাচ ও গান করতে থাকে।

"ওরে চ্যাংরাগুলা
মাগুর মাছের ঝোল দিয়া
তুই ভাত খায়া যা।
ঝরি পড়ে ঝপঝপে
চ্যাংড়াগুলা মাছ কুড়ায় টপটপে।
কৈ দিয়া হ্যার কবিলাক
নাউ দিয়া আন্দি থুছোং
মাগুর মাছের টক।
চ্যাংরাগুলা মাগুর মাচের ঝোল দিয়া তুই ভাত খায়া যা।"

নাপিতের সঙ্গে আয়ষার একান্তে পরিচয় হয়। গাটু নাপিত জাগিরাম বাদশার কাছে আয়ষার সৌন্দর্যের বর্ণনা দেন। বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে জাগিরাম গাটুকে আয়ষার কাছে পাঠিয়ে দেন।

গাটু আয়ষকে বলেন — "কইন্যা, তোমার দুঃখের হইবে অবসান। জঙ্গলে থাকির আর লাগিবে না। জাগিরাম বাদশা নিজে মোক ঘটক করিয়া পাইছে। এ্যালাখানি তোমার মতামত বাকি। বাদশা যে তোমাক কোটে রাখিবে — কন কন তাড়াতাড়ি, কয়া ফেলান।"

কোথাও কোথাও মঞ্চে দোয়ারীই গাটুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই রীতিটিই পুরানো। বর্তমানে গাটু চরিত্রের অভিনয় করার জন্য অন্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট থাকে। মূল গীদালের গায়কীর উপর নাটকের গতি ও আকর্ষণ নির্ভর করে। আয়ষা গাটু নাপিতের প্রস্তাব উড়িয়ে দেন না। দাদা রহিম বীর পালোয়ান। তাঁর সঙ্গে জাগিরাম বাদশা লড়াই করে জিততে পারবেন না। গাটু নাপিতের এই সংবাদে জাগিরাম বাদশা সৈন্য সামন্ত নিয়ে জঙ্গল ঘিরে ফেলেন। রহিমকে নিহত্য করে আয়ষাকে নিয়ে যেতে চান।

দীর্ঘ ঘটনাকে মূল গীদাল গানের সুরে টেনে নিয়ে চলেন —

"সৈন্যের কোলাহল উঠিল গগনে
করিয়াছে আক্রমণ বুঝে এতক্ষণে।
উঠিয়া দাড়াইল রহিম নয়নে দেখিল।
শত শত সৈন্য তারে ঘিরিয়া ফেলিল।
তাই দেখিয়া রহিম কোন বা কাজ ও করে।
জিন্নাপীরের স্মরণ করি ঘোড় পৃষ্ঠে চড়ে।"

লক্ষ করবার বিষয় রহিম জিন্নাপীরের স্মরণ করেন। আলম সাধুও জিন্নাপীরের শিষ্য। জিন্না পীরের দয়ায় রহিম শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। যুদ্ধে জাগিরাম বাদশা পালিয়ে যান। জাগিরাম বাদশার সঙ্গে আয়ষার পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। দাদার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আয়ষা গাটু নাপিতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পরপুরুষের জন্য যুবতী আয়ষার ইচ্ছা —

"শুন নাপিত ভাই পাখির বসন্তকালে ডালে বান্ধে বাসা
ফুলেরও বসন্ত কালেরে ঐনা করে ভোমরার আশা।"

ভোমরার জন্য আয়ষার ব্যাকুলতাকে রহিম বুঝে উঠতে পারে না। যুদ্ধ-বিজয়ী ক্লান্ত রহিম সাগরের জলে স্নান করে আয়ষার কাছে ফেরেন। রহিম যুদ্ধে নিহত হন নি। জিন্না পীরের বরে রহিম অমর। তাঁর মৃত্যু উপায় জানার জন্য আয়ষার এখন প্রবল প্রচেষ্টা। ঘটনার মধ্যে রয়েছে চমক। এই পর্বে এসে লোকনাটক তার ঢিলেমি ভাব ছেড়ে আরো গতিশীল হয়।

আয়ষা কৌশলে দাদার কাছে তার মৃত্যুর কথা জেনে নেয়। বোনকে বিশ্বাস করে রহিম বলে —

বৈনি মরণের বিধান আজি খুলিয়া বলং তোকে।
দোহাই লাগে কাক পক্ষী কাও যেন না জানে।
শুন বৈনি, বিশ্বকর্মা দিয়া এক লোহার পিঞ্জিরা।
সপ্তকোটা সপ্ততালা নির্মাণ করিয়া,
তার মাঝে ছেদ সুয়া রাখিল বানেয়া।

এরপর গদ্য সংলাপ — নিশ্চয় জানিবে দাদার মরণ পিঞ্জিরা সেই পিঞ্জিরার ভেতর গেইলে আর ফিরিয়া আসিবার না পাইবে।

মরণ-ফাঁদের কথা আয়ষা যথারীতি গাটু নাপিতকে জানিয়ে দেন। সাগরের পাড়ে জাগিরাম বাদশা সপ্তকোটা সপ্ততালা দিয়ে পিঞ্জর বানিয়ে তার ভেতরে একটি সুয়া পাখীকে রেখে দেন। একটার পর একটা কৌশল করে আয়ষা তাঁর উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। নাটকের অভিনেত্রীর চোখে মুখে সেই ভাব ফুটে ওঠে। দাদার সঙ্গে সাবলীলভাবে কথা বলেন আয়ষা। একজন সুন্দর নর্তকীর অভিনয়ে তা প্রকাশ পায়। মূল গায়কের প্রশ্ন এবং পদের ব্যাখ্যা করেন দোয়ারী। আয়ষা রহিমকে ভুলিয়ে গোদাদেও সাগরে নিয়ে যান। এই যাত্রাপথে রহিমের মন বাঁধা পায়। মাথার উপর টিকটিকির শব্দ। গাছের শুকনো ডালে কাকের কা-কা শব্দ। এই সব অশুভ সংকেত রহিমকে বিচলিত করে। রহিম বলেই ফেলেন

— "দেখ বৈনি ঘর হাতে বেরেয়া মুই বায়রত দিনু পাও। মাথার উপরা জিটি করে টেঁও টেঁও। আজি দেওসাগরে যাওয়া বাদ দে বৈনি। দেখ বৈনি, গছের শুকান ঠালত পড়িয়া কাগা কা-কা করির ধইচেক। ... না বৈনি এত বাঁধা ফেলে যাওয়া যায় না।"

এই লোকনাটকে পাওয়া যায় লোক-বিশ্বাসের কথা। এই লোক বিশ্বাস চরিত্রের মনের অবস্থাকে চঞ্চল করে। আয়ষার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা নিপুণভাবে তৈরী। গোদাদেও সাগরের পাড়ে 'সপ্তকোটা সপ্ততালা পিঞ্জিরার' ভেতর 'সুয়া' পাখী দেখে রহিম ভেতরে ঢোকেন 'সুয়া' পাখীকে ধরতে। এখানে আয়ষা একটি দুঃখের গান গেয়ে ওঠেন। সে ঘরে একলা থাকেন। সুয়া পাখী পেলে খুশী হবেন।

"ওমোর দাদারে, ঘরে থাকং দাদা মুই একলা নারী`
পিঞ্জিরার সুয়া পাখী মোকে দেও ধরি।
সারাদিন খেলা করিম সুয়া পাখি সনে।

জননীর কথা দাদা না পড়িবে মনে।

বিগলিত রহিম সুয়া পাখী ধরতে গেলে পিঞ্জরে আটকা পড়ে। মৃত্যু অনিবার্য জেনে আয়ষার যৌবন প্রগলভ মূর্তি ভেসে ওঠে আমাদের সামনে —

"মনে বড় দুঃখরে মরা চিতে বড় দুঃখ।
তোর জন্যে দেখিবার না পাঁও পর পুরুষের মুখ।
হারাচুং বাড়ী, হারানু মাও জননী
তোর বাদে না ঝুরে মোর এক চোকেরও পানি।"

পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি আয়ষা। পিপাসায় কাতর রহিম তাঁর কাছে জল চাইলে আয়ষা বলেন — 'পানি খাবার চাইস, মনে বড় সাধ।
মল মূত্র দিব তুলি বারাইস যদি হাত।

আয়ষার নির্মম কথা। ধনপতি সদাগর, রূপধন কইন্যা, মরুচমতি, দুবলাবালি কোনো দোতরা পালায় এরকম চরিত্রের দেখা মেলে না। যৌবনের দুর্বার গতিই তাকে এরকম করে তুলেছে। নারীর এই দিকটির দিকেই লক্ষ্য করে কি আলম সাধুর তিনটি সত্যের পালন করার নির্দেশ ? এই নাটকের বিষয়বস্তুতে দেখা যায় সে রকম ভাবনাই। স্ত্রী ঘোড়া, স্ত্রী হাতী এবং কন্যাকে কেটে ফেলতে হবে — রহিমের প্রতি আলম সাধুর এরকম নির্দেশ নাটকের শুরুতেই পাই। নাটকের দৃশ্যের বদল হয় একটি খোসা গান দিয়ে। নাটকের গতি ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গ তি রেখে গান —

ওরে প্রাণ পাখীটা যে দিন তোরে যাইবে ছাড়িয়া
অবোধ মনরে, সোনার খাচার দরজা ভাঙ্গিয়া।
মন তোর মিছা বাড়ীঘর রে অবোধ মন।
প্রেমের বাজারে একদিন ভাঙ্গিবে নারায়ণ।
মিছা বাড়ীঘর রে মন রবে তো পড়িয়া।
আসিবে যমের দূত লইয়া যাইবে বান্ধিয়া।"

এই গানের পরে মূল গায়ক পদ্যের সুরে বলেন —

"যেইনা কালে রহিমের প্রাণ পাখী উড়ি গেল।
আগমে থাকিয়া জিন্নাপীর জানিতে পারিল।

গোদা দেও সাগরে আসি উপনীত হইল।
মাছি হইয়া জিন্নাপীর রহিমের দেহেরে
প্রবেশ করিল পীর রক্ষা করিবারে।

পীরের শিষ্য আলম সাধুও স্বপ্নে পুত্রের মৃত্যুর কথা জানতে পায়। চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে আলম সাধু গোদাদেও সাগরে উপস্থিত হয়। আলম সাধুর কাতর প্রার্থনায় জিন্নাপীর বলেন

ওহে সাধু জিন্নাপীরের নাম নিয়া আরো সাগরের পানী।
সেই পানী ছিটাইয়া দেও বিসমিল্লা জানি।

জিন্নাপীর ফকিরের বেশে সেই জল পিঞ্জরে ছিটিয়ে দিলে রহিম বেঁচে ওঠেন। ফকিরের নির্দেশে রহিম জাগিরাম বাদশার মহলে আয়যার উদ্দেশ্যে চলেন।

নাট মহলের কপাট ভাঙ্গে পদাঘাত করিয়া।
কোথায় আছে দুষ্টা আয়যা পালংকেতে শুইয়া।
নিমেষেতে কাটিয়া মুণ্ড নামিল হস্তে নিয়া।
ঘোড়া পৃষ্ঠে উড়িয়া রহিম উড়াইল বাতাসে।
পিতা পিতা বলিয়া রহিম কোন বা কাজও করিল।
পিতার চরণে বৈরির কাটা মুণ্ড দিল।
আজি হইতে পিতৃসত্য হইল পালন।
আলম সাধু বলে পুত্র কান্দ কি কারণ।
রহিম বলে ওগো পিতা জননীর তরে
দেখিয়া এই কাটা মুণ্ড কি বলিবে মোরে।"

পিতার নির্দেশ পালনে জিন্না পীরের ভূমিকা আছে। মায়ের জন্য ফুটে উঠেছে রহিমের দরদ। জিন্নাপীরের অলৌকিক শক্তির প্রতি আলম সাধু ও রহিম ভক্তি নিবেদন করেন। আলম সাধুর মুখ দিয়ে জিন্না পীরের কীর্তির কথা প্রচারিত হয়—

ওরে জিন্না পীর, জিন্নাপীর, করিয়া যদি করো মনস্থির।
ওরে আগমে থাকিয়া মনস্কাম পুরায় পীর।

মূল গায়ক শেষে বলে ওঠেন —

ভাইরে, এই পর্যন্ত করিলাম ক্ষান্ত

পালাগানের কথা

নাই কোন ভয় হবেরে জয় ধর্ম যথাতথা।

সত্যের জয় হবে — এই নীতি কথা দিয়ে আলম সাধু পালানাটকটি শেষ হয়।

'আলম সাধু' পালা নাটকে পীরের অলৌকিক শক্তি দেখানো হল। আর দেখানো হল সমাজে নারীর বিশ্বাসঘাতকতার ছবি। নারীর প্রতি মধ্যযুগের সমাজের মানসিকতার পরিচয়ও এতে আছে। একদিকে পীরের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন ও অন্যদিকে অবিশ্বাসিনী নারীর শাস্তির কাহিনী পালানাটকে তুলে ধরে এ পালানাটকে মধ্যযুগের লোকসমাজের মানসিক অবস্থানের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

## রাবাণ

'রাবাণ' একটি পালানাটক। 'কুশান' পালাগান যেভাবে পরিবেশিত হয় 'রাবাণ' সেভাবেই পরিবেশিত হয়। রামায়ণের যে কোনো কাহিনী আবলম্বনে 'কুশান' পালা অভিনীত হয়ে থাকে। রাবাণের বিশষত্ব এই যে কেবলমাত্র রাবণের কাহিনী নিয়ে এই পালা অভিনীত হয়। 'রাবণ' শব্দ থেকে 'রাবাণ' শব্দের উৎপত্তি। অনেকে 'রাবাণ'-ক 'আবান' রূপেও উচ্চারণ করে থাকেন।

'কুশান' গানের মূলের হাতে যেমন 'ব্যানা' থাকে 'রাবাণ' গানের মূলের হাতেও সেরকম একটি ব্যানা যন্ত্র থাকে। মূল গীদাল এখানে রাবণ'কে প্রধান চরিত্র হিসেবে পালায় উপস্থিত করেন। রাবণের বীরত্ব, শক্তি, দাম্ভিকতা এবং ভক্তি মূল গীদাল এবং পালাচরিত্রগুলির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সাধারণত ১২ থেকে ১৪ জন পালি বা সদস্য এই পালাগানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সারিন্দা, খোল, জুড়ি, হারমোনিয়াম, আড় বাঁশী এই পালাগানে ব্যবহৃত হয়।

মঞ্চ পরিকল্পনা 'কুশান' পালাগানকে অনুকরণ করে হয়। 'রাবাণ' গানের প্রচলন কুশান গানের অনেক পরে এসেছে বলে অনুমান। কুশানের প্রায় সব আঙ্গিকই 'রাবাণ' পালাগানে লক্ষ করা যায়। রাবণের মহিমাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই পালাগান। ফলে সঙ্গীতে কুশানের সুর অবলম্বন করলেও এই পালাগানের সঙ্গীতে বীর ও করুণরসের আধিক্য দেখা যায়। পালা শুরুর পূর্বে মূল গীদাল 'বন্দনা' করেন। কুশানে যেমন রামবন্দনা দিয়ে শুরু হয়, এই পালাগানও রামবন্দনা দিয়ে শুরু হয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে কুশানের অনুকরণে রাবাণের বন্দনা শুরু হয়।

বন্দনার শেষে মূল ঘোষণা করেন 'রাবাণ' পালাগান শুরু করার কথা। তাঁর কথাকে বোঝার জন্য দোয়ারী ব্যাখ্যা দেন। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলা হয় 'ভাঙ্গতি' দেওয়া। দোয়ারীর ভাঙ্গতি দেওয়াকে অনুসরণ করে দর্শক ও শ্রোতা পালাগানের ভিতরে প্রবেশ করেন।

আবার দোয়ারীর প্রশ্নকে মূল ভাঙ্গতি দেন। মূল গানের 'ধুয়া' তোলেন। ধুয়ার অংশ ধরে দোয়ারী এবং ছোকরা বা ছুকরিরা গানের সঙ্গে নাচতে থাকেন। পূর্বে এই ছোকরাদের ভূমিকায় অল্পবয়সের ছেলেরাই থাকতো। এখন মেয়েরাই সেই ভূমিকা পালনকরছেন। নর্তকীর মধ্যে 'ডাইনা' ছুকরী মূল এবং দোয়ারীর নির্দেশ এবং ইচ্ছাকে অনুসরণ করেচলেনা বলতে গেলে নৃত্য প্রদর্শনের বিষয়টি দোয়ারকে অনুসরণ করে চলে। দোয়ার বিহীন এই 'রাবাণ' পালাগান পরিবেশিত হওয়া অসম্ভব। মূলের কথার অর্থ দর্শক শ্রোতাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেওয়া, নর্তকীদের সম্পূর্ণ নির্দেশ জ্ঞাপন করা এবং নাটকের গতিকে ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দোয়ার বহন করেন। এই দোয়ারই আবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। দীর্ঘক্ষণ

পালা চলতে থাকলে মাঝে মধ্যে এক ঘেয়েমী কাটানোর জন্য খোসাগান বা ফ্যাসাগান দিয়ে রুচি পরিবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া হয়ে থাকে। এই খোসা গান বা ফ্যাসা গান কুশান ও দোতরা পালাতেও ব্যবহৃত হয়। খোসাগান বলতে চটুল প্রকৃতির ভাওয়াইয়ার সুরে গাওয়া সঙ্গীতকে বোঝায়। খোসা গান পুরোপুরি দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য কাহিনী বহির্ভূত গান। ফ্যাসাগান মূলত: হাসি-ঠাট্টার গান। একই উদ্দেশ্যে পালাগানে এই গান ব্যবহৃত হয়।

কোচবিহার জেলার 'রাবাণ' গান 'কুশান' পালার আঙ্গিকেই পরিবেশিত হয়। এই অঞ্চল ব্যতীত জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ এলাকাতেও 'রাবাণ' গানের প্রচলন আছে। আবার শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ী অঞ্চলে রাবাণ গানকে 'কেউটিয়া রাবাণ' বলে। 'কেউটিয়া রাবাণ'-এ রামায়ণ আশ্রিত কাহিনীর সঙ্গে লোকায়ত জীবন জড়িয়ে গেছে। তাই রাবণের নাম হয় 'কেউটিয়া রাবাণ'। এই কেউটিয়া রাবাণ পালায় রয়েছে খোল করতাল বাজিয়ে গান গাওয়ার রীতি। নর্তকীর কোনো ভূমিকা থাকে না।

উল্লেখিত অঞ্চলের 'রাবাণ' পালা গানের কাহিনীর অংশবিশেষ দেখানো যেতে পারে —

বন্দনা —

আমি বন্দিবোরে ওরে যত দেবগণ
বন্দিবো বন্দিবো রামের দুইখানি চরণ।
আমি বন্দিবো রে —
রামরে রামরে প্রভু রাম নারায়ণ
রাম বিনে গতি নাই এ তিন ভুবন।
আমি বন্দিবো বন্দিবো রে ...
ধন্দে ... ধাদ... ধাদ।
ছিটগান — কৌশল্যা বন্দো বিধিরে
বাপেই টেরিয়া সীতা
কপালোত তোর বিদ্যা নাই
খালি তোর ফুটানি কাথা।
পালা —
ধূর্ত বলে মহাজন শুনহ বচন।
ছাড়িয়া গেইসে ইন্দ্রজিৎ মারিসে লক্ষ্মণ

এই কোথা হইতে রাবণ অচৈতন্য হৈলা।

পালঙ্ক হইতে রাবণরাজা ঢুলিয়া পড়িলো।

ও তুই পৈতালো

ধাদ-ধাদ-ধাদ।

বাপোই মাঘ মাসিরা জারোত

সাগার আছে ভুতির গোরত

বাপই পৈতালো।

এখানে মূল গীদাল এবং বাদ্যযন্ত্রীরা গানের মধ্য দিয়ে গানের কথা ব্যাখা করেন। কাহিনীর ভেতরে খোসাগানের ন্যায় 'ছিটগান'ও পরিবেশন করা হয়।

কেউটিয়া রাবণ গানের ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে —

ও মোর কাগা গে

কেমন লাখা জুড়িলেন কৈনা

ছান ফেলাইতে হেস্ ফেসাইছে

মোর নদারীটা।

পসন-পাসান করিয়া দেখু

মোর নাদারী হৈছে গাভরী

ওরে ভাগ্যের সীমা নাই।

যার গর্ভে জন্ম নিল রামচন্দ্র গঁসাই পূর্বে রাজা বন্দি গাও

ধর্ম নিরঞ্জন

পছিমে বন্দিয়া গাও

পারুয়ার পঞ্চপীর

উত্তরে কালিকা বন্দং দক্ষিণে সাগর।

পালা — রাবণ কান্দে পুত্রশোকে

ওরে পুত্রহারা হইলাম আমি

জলমের মতে

রাবণ বলে ওরে ধুপ

ওরে বনরে রুচিত

কিভাবে মরিল আমার

পুত্র ইন্দ্রজিৎ

রাবণ কান্দেরে

ধাদ - ধাদ - ধাদ।

দেবতার মস্তক আদি দেখিতে নারে

রাবণ কান্দেরে।

ছিটগান — ও কি পৈতালো

পৈতালে কি ওরে বাপই

ক্যানে ছাড়িলো।

ধাদ - ধাদ - ধাদ।

পাঁচা — রাবণ কান্দেরে ওরে পুত্রশোকে

পুত্র হারা হৈলাম আমি

জলমের মতে

ও রাবণ কান্দেরে

ইন্দ্রজিৎ পড়িল রণে বিধিরে পর্বতের সম।

রাবণ কান্দেরে।

পাত্র মিত্র নিশাচর মন্থন করিয়া

হংনা নামে ধূর্ত একজন দিলেক পেঠেয়া

কাথা শুনিয়া ধূর্ত করিল গমন

রাবণে সাক্ষাত যায়া দিলো দরশন

ধাদ - ধাদ - ধাদ।

ও কি আহা মরি রে

মানসির নদারী কেমন বেড়ালে

দমকিয়া ফেলায় পাও

মোর নদারী ধীরে বেড়ালে

হেসপেসাছে গাও

আর চারিদিনে মোর নদারী

গে হে কাকা

হোবে গে ছাওয়ার মাও

কান্দে রাজা দশানন হে

ভাই মৈলো ভাতিজা মৈলো

পৈরে ঠাই ঠাই

রণস্থলে পৈরে মৈলো কুম্ভকর্ণ ভাই।

মূল গানের মাঝে মাঝে 'ছিটগান' চলতে থাকে। রাবণের শোক এই 'রাবাণ' গানে প্রধান। 'রাবণ কান্দেরে ওরে পুত্র শোকে' এই কথাটি গীদালের কণ্ঠে বারংবার বেজে উঠে।

# সত্যপীর

'সত্যপীর' উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সত্যপীর পূজিত হয়ে আসেন। সত্যপীরের কাহিনীকে ঘিরে তৈরী হয়েছে পালানাটক — যা সত্যপীরের গান বলে পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বাড়ীর শুভকার্যের অনুষ্ঠানে এই পালাগান অভিনীত হয়ে আসছে। উত্তরদিনাজপুর জেলার করণদীঘি, চাকুলিয়া, শকুন্তলা, রামগঞ্জ, চোপরা প্রভৃতি এলাকায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ভূটানীর ঘাট, জটেশ্বর ইত্যাদি এলাকার গ্রামাঞ্চলে সত্যপীর বা সৈতপীরের গানের প্রচলন করা যায়। শিলিগুড়ি মহকুমার রঙ্গিয়া, তারাবাড়ী, কোচবিহারের শিতলকুচি, বড়মরিচা, সিতাই, দেওয়ান হাট ও ভেটাগুড়ি অঞ্চলে সত্যপীরের গানের ধারা এখনও অব্যাহত। গৃহস্থের পুত্র সন্তান জন্ম উপলক্ষে এই গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর মিলিতভাবে এই গান পরিবেশন করেন। বিষয়বস্তুতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চমৎকার একটা মিলন দেখা যায়। সারা বাংলাদেশে সত্যপীরের গান পাঁচালী আকারে পরিচিত থাকলেও উত্তরবঙ্গে নাটকের আকারে পরিবেশন মানুষের কাছে আকর্ষক হয়ে উঠেছে।

গিরীন্দ্রনাথ দাসের 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' পুস্তক থেকে জানা যাচ্ছে প্রায় তিনশতাধিক বৎসর কাল আগে থেকে সত্যপীরের কাহিনী নিয়ে বহু কবি পাঁচালী রচনা করেছেন। হিন্দু এবং মুসলিম এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভক্তিভরে সত্যপীরের গান রচনা করেছেন। রচয়িতাদের মধ্যে কবি ফয়জুল্লাকেই অনেকে প্রাচীনতম বলে মনে করেন।

সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে বহু কাহিনী বর্ণিত আছে। মালঞ্চার পালা, শিশুপাল রাজার পালা, হীরা মুচির পালা, শশী বেশ্যার পালা, জসমন্ত সাধুর পালা এরকম বহু কাহিনী নিয়ে সত্যপীরের পাঁচালী রচিত। উত্তরবঙ্গে মালঞ্চার রাজার কাহিনীটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কাহিনীটিই নাট্যাকারে গৃহস্থের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই কাহিনীটির উৎপত্তি সম্পর্কে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ উল্লেখ করেছেন — "সত্যপীরের পিতৃমাতৃদত্ত নাম কেহই অবগত নহে, কিন্তু সত্যপীর' একটি উপাধি বলিয়াই অনুমিত হয়। মৈদলন (মহীদলনহ) নামক কোনোও রাজার কুমারী কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ভগবদিচ্ছায় সত্যপীরের জন্ম হইবার বৃত্তান্ত পুথি এবং গীতে উক্ত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গৌড়ে পাঠান রাজত্বকালে মৈদলন মালঞ্চর রাজা ছিলেন; ..... সত্যপীর হিন্দুবংশজাত ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন পূর্বক তাহার প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁহার মাতামহ এবং অন্যান্য লোক বহু বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামেই সকলই পরাজিত এবং তাঁহার মতানুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সত্যপীরের দ্বারা উত্তরবঙ্গের বহু

লোক ইসলাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের অসাধারণ প্রভাব এপর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পুথি এবং গীতে সত্যপীরের যুদ্ধবিবাদে লিপ্ত হইবার উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি লোকসেবার জন্য যে 'শিরিণির' ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ বা হিংসাবর্জ্জিত।

হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত আছে। 'সত্যনারায়ণ' বিষ্ণু অথবা নারায়ণের বহু নামের মধ্যে একটি নাম মাত্র। সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণের অভিন্নতা সম্বন্ধে সত্যপীরের পুথিতে লিখিত আছে, —

'যেই সত্যনারায়ণ সেই সত্যপীর।
দুই কুলে লৈছে সেবা করিয়া জাহির।।

সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে লিখিত আছে, —

'সত্যপীর নামে পূজা করিবে যবনে।
এরূপে করিবে সেবা যার যেই মনে।।'

সত্যপীর অথবা সত্যনারায়ণের হিংসাবর্জিত অধিকন্তু অপক্ক শিরণী অথবা প্রসাদ হিন্দু মুসলমান সকলরই পক্ষে তাঁহাকে গ্রহণের পথ প্রসারিত করিয়াছিল।''[৯]

বলা যেতে পারে সত্যপীরের পাশাপাশি অন্যান্য পীরদেবতারা যথাক্রমে মানিকপীর, ঝুঁটিয়াপীর, ল্যাংড়াপীর, জ্যাঠাপীর, মখ্দুমপীর, বালাপীর, বদরপীর প্রভৃতি পীরগণ পূজিত হয়ে থাকেন। এই সকল পীরদের মধ্যে সত্যপীরকে নিয়ে নাটকীয় আকারে পালাগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদের পুস্তক থেকে আরো জানা যায়, ''আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে পশ্চিম কামরূপে ইসলাম ধর্মের প্রচার আরব্ধ হইয়াছিল এবং পরে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বহু সাধু সন্ন্যাসী যে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। ইসলামের ভক্তিশাস্ত্রে সাধকগণের বিবিধ সম্প্রদায়ের নাম এবং বিবরণ আছে; প্রথমাবস্থায় যে সকল ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পর্য্যটক ছিলেন এবং তাঁহারা সাধারণতঃ 'পীর', 'দরবেশ' এবং 'ফকির' বলিয়া অভিহিত হইতেন।''[১০] তোরষাপীর, পাগলাপীর, গাজীপীর পাঁচপীর, খোয়াজপীর ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু 'সত্যপীর' হিন্দু এবং মুসলিমদের উভয়ের দ্বারা পূজিত এবং গৃহীত। এই সত্যপীরকে নিয়ে পালা নাটক তৈরী হয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে মনষ্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে অভিনীত হয়ে আসছে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ও বিলাসপুর অঞ্চলে অভিনীত সত্যপীরের একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে —

'পীর বলিছে আমি নাম রাখিব
দুই কুলের মধ্যে আমি সেবা পূজা নিব।

হিঁদুর দেবতারে আমি মোসলমানের পীর।
দুই কুলে নিব সেবা করিয়া জাহির।।
হিঁদুর ঘরে নিব আমি প্রসাদ আর পানি।
আর মোসলমানের ঘরে নিব তিন কড়া শিরনি।।"

(টুঙ্গীদীঘির মহম্মদ জালালউদ্দিন আহমেদের নিকট থেকে সংগৃহীত)

'সত্যপীর' পালাগানের মধ্যে মুসলমানের ধর্মের কথাও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পীর, পয়গম্বর, আউলিয়া, দরবেশ, নবাব-বাদশাদের কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। 'সত্যপীর' পালাগানের মূল গায়ক ফকির। এই ফকির মনে হয় সুফী দরবেশেরই প্রতীকস্বরূপ।

বন্দনা দিয়ে সত্যপীর পালা শুরু হয় —

'পূর্বে রাজা বন্দি গাও মুই ভানু আর ভাস্কর।
উত্তরে কালীকা বন্দং দক্ষিণে সাগর।।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাও মুই পারুয়ার পঞ্চপীর।
যাহার কলেমার গুণে মোক্ষ পায় শরীর।।
আইস মাতা সরস্বতী মাও চাপি হংসরথে,
আসিয়া বইসহ মাও অভাগার কণ্ঠেতে।
মোর কণ্ঠ ছাড়ি মাগো অন্যের কণ্ঠে যাবু।
দোহাই নাগে সত্যপীরের ধর্মের মুণ্ড খাবু।
সত্যপীরের নাম নিয়া পালা করি শুরু
তারপর বন্দি যেবা — এই গানের শুরু।
বন্দি দেবী সরস্বতী পীর পয়গম্বর।
দশজনার চরণ বন্দি সভার মাঝার।।

সত্যপীর পালাগানের অংশগ্রহণকারী সব শিল্পীরাই আসরের মধ্যে গোল হয়ে বসে বন্দনার গান শুরু করেন। আসরে গানের জন্য সহযোগী যন্ত্র হলো খোল, করতাল এবং হারমোনিয়াম। 'বন্দনা' শেষ হলে মূল বা ফকির আসরের মধ্যে উঠে দাঁড়ান। তাঁর হাতে থাকে একটি চামর বা চহর যা বাঁশ দিয়ে তৈরী লাঠিতে যুক্ত থাকে। মূল গীদাল বা ফকিরের দুদিকে নর্তকীরা থাকেন এবং তাঁদের সম্মুখে বৈরাগী বা দোয়ার থাকেন। নর্তকী এবং দোয়ারগণ অভিনয়ের শুরুতে মূল গীদাল বা ফকির কে প্রণাম করেন। মূলগীদাল চামর দিয়ে নর্তকী ও দোয়ারকে

আশীর্বাদ করেন। মূল গীদাল বন্দনা শেষ করে কথা শুরু করেন।

মালঞ্চর রাজা মহিদুর্লভ বা মইদুলব এবং সন্ধ্যাবতীর কাহিনীই উত্তরবঙ্গে প্রচলিত। কাহিনীতে বহু চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। মূলগীদাল, নর্তকী, বৈরাগী বা দোয়ার. মহিদুর্লভ রাজা, সন্ধ্যাবতী, খোদাতাল্লা, দোস্তলবী, জেব্রিল, গুলফুল চরিত্রগুলিই প্রধান।

গীদাল এবং বৈরাগীর মধ্যে দীর্ঘ কথপোকথন রয়েছে। প্রত্যেকটি কথার শেষে মূল গীদাল গনের ধুয়ার ধরেন। নর্তকী এবং বৈরাগী ধুয়া অনুসরণ করে গান ও নৃত্য করতে থাকেন। এই নৃত্যের সঙ্গে মূল গীদালও চামর দুলিয়ে দুলিয়ে যোগদান করেন।

চরিত্রগুলির পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসম্ভব চরিত্রের পরিচিতি অনুসারেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আসরের মধ্যে পোশাকের ভিন্নতা হেতু চরিত্রগুলিকে আলাদা করে নির্দিষ্ট করা যায়। সাধারণ মেক-আপের দ্বারা অভিনেতারা নিজেদের সজ্জিত করেন। দলের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে চরিত্রগুলির সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে সত্যপীরের মূল গায়ককে ফকির বলা হয়। গানে স্ত্রীবেশধারী নর্তকীদের পরিচয়ছিল ছোকরা হিসেবে। সত্যপীরের গানে ফকিরের বেশভূষা একটু আলাদা ধরণের।

"ফকিরের গায়ে থাকত পায়ের গোড়ালি থেকে সাদা ঢোলা বুক খোলা শেরওয়ানি (পাঞ্জাবীর মত)। পেছনে পিঠের ওপরে লাল পাপড়ের সুতার সেলাই দিয়ে আটকান 'তাস' এর ইসকা বন চিহ্ন। মাথায় বিড়া জাতীয় বাঁশের কঞ্চি অথবা বাখারি দিয়ে তৈরী গোলাকার চক্র এক অদ্ভুত বেশ। এটা মনে হয় মুসলিমদের পীর পয়গম্বর এবং আউলিয়া দরবেশদের প্রতীক চিহ্ন।"[১১]

মূলগায়ক বা ফকির গান শুরুতে গানের মুখাংশ গেয়ে ছেড়ে দিলে। সেই গান দোয়ারী, বাজানদাররা গাইতেন। গানের তালে তালে ছোকরারা নাচ করতেন। কাহিনী বহির্ভূত কিছু ধুয়া গানের ব্যবহার দেখা যায় সত্যপীর পালায় —

"আল্লা বল ভাইরে নবী কর সার।
নবী হইতে উন্নত সবে হৈয়া যাবে পার।।

কিংবা

"বেলা গেল, বেলা গেল পামর মন
বেলা নাইরে আর,
দুষ্কের বেলা ডুবিয়া গেলে
হবে অন্ধকার।"

কাহিনীবহির্ভূত হলেও 'ধুয়া' গানের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর দুটি ধুয়া গান সত্যপীরের মধ্যে দেখানো যেতে পারে —

"চান্দের বাজার চান্দের বাজার
দিনে দিনে, হইল আন্ধার।
ও বনের কুকিলা রে
ওরে এদমের ভরসা নাই,
হায়রে, হায়।
কুকিলার কুহু, কুহু বাছা
ময়ূরের পেখম
ওরে নিশাপ্রহর রাত্রিকালে
দেখাইলে স্বপন
বনের কুকিলারে হে।

অন্য আর একটি — "কি করিব কোথায় যাব
না দেখি উপায়
ফাপর খায়া দ্যাহার মনুরা
ছাড়িয়া যাবার চায়।"

কাহিনীর গতি এবং নাটকীয়তা বৃদ্ধিতে এই ধুয়াগানগুলির গুরুত্ব রয়েছে। সর্বোপরি বলতে হয় এই সত্যপীর পালাগানে হিন্দু-মুসলমানের প্রগাঢ় সম্প্রীতির ভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে।

## চার যুগের গান

রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং গোয়ালপাড়া, এলাকার হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় 'চার যুগের গান'-এর প্রসার দেখা যায়। দোতরা, কুশান, বিষহরি পালাগানের পাশাপাশি 'চারযুগের গান'-এর পরিচিতি পাওয়া যায়। চারযুগের গানের কাহিনী হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের তত্ত্ব কথা দিয়ে তৈরী। 'চার যুগের গান' নাটকের আকারে মঞ্চে পরিবেশিত হয়। দোতরা-কুশানে বহু চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। চারযুগের গানে দুটি চরিত্র প্রধান। তাঁরাই পরস্পর প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর দিবেন। তাঁদেরকে সহযোগিতা করবেন বাজানদারগণ।

মঞ্চ পরিকল্পনাতে কোনো নতুনত্ব নেই। অন্যান্য পালাগানে মাটিতে বৃত্তাকারে বাজানদাররা বসেন। এই

পালাগানেও বাজানদাররা বৃত্তাকারে বসেন। সাধারণত, দোতরা-কুশান পালায় যে বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় সে সকল বাদ্যযন্ত্র চার যুগের গানে ব্যবহৃত হয় না। দোতরা, ব্যানা, খোল-করতালের কোনোরকম ব্যবহার নেই। এখানে রয়েছে করকা এবং সানাইয়ের মতো একরকম বাঁশী। এই করকা এবং সানাইয়ের মতো বাঁশীটি গান-পরিবেশনের এলাকা থেকেই প্রস্তুত হয়। এই 'করকা' বাদ্যযন্ত্রটি একেবারে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র। বিয়ে বাড়ী এবং মহরমের সময় এই করকা বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষভাবে আদৃত হয়ে থাকে।

চারযুগের গানের প্রধান যে দুটি চরিত্রের কথা বলা হলো সেই দুটি চরিত্র একটি হিন্দু ধর্মের এবং আর একটি মুসলিম ধর্মের মানুষ। দুই ধর্মের কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে চরিত্র দুটি প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। কবিগানের সঙ্গে ঠিক তুলনা করা চলে না। কবিগানে আলাদা দু'দল থেকে কবিয়ালরা আসেন। কবিগানের আসরে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করেন। চারযুগের গানের দুটি প্রধান চরিত্র একটি দলের। তাঁদের বিষয়বস্তু পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে। ফলে পরস্পরের প্রতি কোনো আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। বরং উভয়ের বক্তব্য শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের গভীর কথা তাঁরা তুলে ধরেন। আরো উল্লেখযোগ্য হলো হিন্দু প্রতিনিধি মুসলিম প্রতিনিধির কাছে জানতে চাইবেন জগন্নাথ দেব সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কি না। মুসলিম প্রতিনিধি হিন্দু-প্রতিনিধির কাছে জানতে চাইবেন তিনি মক্কা-মদিনার কথা কী জানেন ? হিন্দু ধর্মের বিষয়বস্তু মুসলিমকে বলতে হবে এবং হিন্দুকে বলতে হবে মুসলমানের ধর্ম কথা। ফলে পরস্পরের ধর্মের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধার ভাব আরো বিকশিত হয়।

'চারযুগের গান' বলতে সাধারণ বোঝায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের কথা। এই চারটি যুগের কথা গানের ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে আসে। আবার কেউ কেউ মনে করেন মানবদেহের ক্রমবিকাশের চারটি স্তরের কথা — শৈশব, কৈশর, যৌবন এবং বার্ধক্য। দেহকে কেন্দ্র করে দেহাতীত জীবনের কথাও এই চার যুগের গানে ধরা পড়ে।

এই পালাগানে যে চরিত্রদুটির কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে যিনি মূল থাকেন তিনি সাধারণত মুসলিম সমাজেরই লোক হয়ে থাকেন। ফলত: এই পালাগানের মূল চর্চা মুসলিম নেতৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

অন্যান্য পালাগানের আসর বন্দনার মতো এই গানেও আসর বন্দনা করা হয়। আসর বন্দনার মূল গীদাল উঠে দাঁড়ান। তাঁর হাতে একটি চামর থাকে। এই চামরটি কাপড় দিয়ে তৈরী। দেবজ্ঞানে এই চামরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকেন। চার যুগের গানে কোনো নর্তকী থাকে না।

আল্লা বন্দনা দিয়ে বন্দনার শুরু হয়।

পহেলা বন্দিব আমি আল্লার পরবর্তী কর
ও আল্লার দস্তে বন্দি গাও মুই নবী পয়গম্বর
ঐ নারীরে জামাতা যে বন্দং যাহার মর্দ্দ আলি
ইমাম হোসেন বন্দি গাব মা ফতেমার বেটা
উম্মদ কারণে মদ্দের শির বা গেইকে কাটা
ইমাম হোসেন বন্দি গাব মুই রসুলের নাতী
বেহেস্তের দুয়ারে দুই ভাই জ্বলায় পঞ্চবাতি
ওসমা বিবির পুত্র বন্দং গাড়ী জিন্দা পীর
অল্প বয়সে মোর নৈদের চান্দ হইয়াছে ফকির
সন্ধ্যাবতীর পুত্র বন্দং নামে সদ্যপীর
মালঞ্চ নগরে করে অদ্ভুত মাহির

---

পূবে রাজা বন্দিগাব ভানু ভাষঙ্কর
ওহে উত্তরে কালিকা বন্দং দক্ষিণে সাগর।
পশ্চিমে বন্দনা হইল পারুয়ার মোকাম
আশি হাজার পীর পয়গম্বর নিত্ পড়ে কোরাণ
এতশ বন্দনা গাইতে হবে অনেকক্ষণ
একে করে প্রণাম হইল দশের চরণ
এতশ বন্দনা গাইতে কেউ নাই আর বাকি
ছালাম করিয়া বন্দনা হইলো আর জল্লার খাকি।

বন্দনা শেষ হলে মূল গীদাল প্রতিপক্ষকে 'শ্যামদেশ' বলে সম্বোধন করে বলছেন —

দেখ বাবা শ্যাম দেশ, এই আসরের মধ্যে আমি একলাখ চব্বিশ হাজার পীর পয়গম্বর বন্দনা করিলাম, ওলিওলি হাটঘাট, মক্কা মদিনা বন্দনা করিলাম ইয়ার মধ্যে কোন কোন পীর বন্দনা হইল কোন কোন পীর এবেয়া গেইল, আমাকে একটা একটা করিয়া তোলাপদ করিয়া দেন।

শ্যামদেশ মূল গীদাল অর্থাৎ ফকিরকে উত্তর দিচ্ছেন — ফকির সাহেব — সালাম সাহেম, পারুয়ার

মোকাম আশি হাজার পীর পয়গম্বর নিত্ পড়ে কোরাণ। বলেন তো ফকির সাহেম, প্রথমে কোন পীরের বন্দনা গাহিয়াছেন ?

এই ভাবে নাটকীয় আকারে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই পালায় মুসলিম প্রতিনিধি মূল গীদাল বা ফকির হিন্দুর দেবতাদের মাহাত্ম্য নিয়ে প্রশ্ন ধরেন হিন্দু প্রতিনিধি শ্যামদেশকে।

'জগন্নাথ ক্ষেত্র' নিয়ে মূল গীদাল বলছেন —

বন্দং প্রভু জগন্নাথ সকল তীর্থের বড়।
তিন কোন পৃথিবীর লোক সেইখানে হয় জরো।।
জগন্নাথ যাইতে শ্যামদেশ পন্থে দূরাদূরি।
জগন্নাথ যারা যাইবেন বাবা জোড়া বেতের বাড়ি।।
জগন্নাথ যাইতে পন্থে বিষম কাঁটা।
জগন্নাথ যাইতে খাইবেন খোলা হাড়ির ঝাঁটা।।

---

জগন্নাথ যার বা যেমন মন।
জগন্নাথ যারা পাইবেন ছেইলার দরশন।।
শূদ্রলোকে আন্দে ভাত ব্রাহ্মণ বসিয়া খায়।
মহাপ্রসাদ বলিয়া সেইভাত বন্দরে বেকায়।।
কহিলাম কহিলাম শ্যামদেশ ছাওয়ালের উত্তর
আমার সঙ্গে চল এখন শ্রী জগন্নাথ কেত্তর।

এখানে শেষ হওয়ার সাথে বাজানদারগণ একসঙ্গে গান গেয়ে ওঠেন —

"ও রসিক দাঁড়াও
আরে রসিক দাঁড়াও তিলেক
দাঁড়াও আমি দেখিয়া নেই
ও রসিক — জনমের মত রসিক দাঁড়াও
আমি দেখিয়া নেই।"

এই সঙ্গীত উপস্থাপিত হওয়ার পর শ্যামদেশ মূল গীদাল বা ফকিরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন —

''যেও কথা কইলেন গুরু মোর একটাও নাই মনে
লক্ষভাবে পোছোং কথা দেহাটার কারণে
যখন ছিল গুরু মোর নাথ নৈরাকার
ফতেমা ছিল কোথানে আল্লা কিসের পর
কোন হরপে াসমান পয়দা কোন হরপে জামিন
আসমান যখন না আছিল গুরু মোর, কোথায় ছিল চাঁন
মানব জনম না ছিল মোর কোথায় ছিল মান।
অসমান যখন না ছিল মোর কোথায় ছিল তারা
ইন্দ্ররাজা না ছিল মোর কোথায় ছিল ধারা
গছবৃক্ষ না ছিল মোর কোথায় ছিল জল।
গভী গোটা না আছিল গুরু মোর কোথায় ছিল ঘিউ।
মানব জনম না আছিল গুরু মোর কোথায় ছিল জিউ।।
আসমান জমিন পোড়া গেইচে গুরু মোর কোথায় গেইকে ছাই।
পর প্যাটোত যে কায় পোড়া গেইকে আছিলাম কারও ঠাঁই।''
যেনোপি কহিতে পাব গুরু মোর ছাওয়ালের উত্তর।
তোমার সঙ্গে চলিয়া যাবো জগন্নাথ ক্ষেত্তর।।

এইভাবে সঙ্গীত ও গদ্যসংলাপের মধ্য দিয়ে প্রশ্নোত্তর করে করে কাহিনী এগিয়ে চলে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য পালানাটকের থেকে পালাগানের উপস্থাপন কৌশল এবং বিষয়বস্তু একেবারে ভিন্ন। সামাজিক সম্প্রীতির দিক থেকে এই পালাগানের মূল্য অপরিসীম।

# চোর-চুন্নী

জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী দেওয়ানগঞ্জ হেমকুমারীর এলাকার লোকসম্পদ ঘিরে চোর-চুন্নী পালাগানের পরিধি। দিনাজপুর ও রঙপুরেও এ গানের প্রচলন আছে। চোরচুন্নী গান বৎসরের বিশেষ একটি সময়ে গাওয়া হয়। কালী পূজার দিন বা তারপর থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত এ গান গাওয়া হয়[১২] ভৌমিক : প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত আবার আর একটি লেখায় দেখা যায় কার্তিক মাসে চোরচুন্নী গান গাওয়ার কথা ''কালী পূজার পনের দিন আগে থেকে শুরু করে কালীপূজার আগের রাত্রি পর্যন্ত গানগুলি গাইবার কথা লিখেছেন সনৎকুমার মিত্র।[১৩] নির্মলেন্দুবাবু অবশ্য বিভিন্ন স্থানে চোরচুন্নী গানের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথা বলেছেন। যেমন তিস্তার পশ্চিম দিকে পাহাড়পুর ইত্যাদি অঞ্চলে দীপান্বিতা অমাবস্যার পরবর্তী অষ্টমী তিথি থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই গান চলে। আবার ধূপগুড়িতে দীপান্বিতা অমাবস্যার পরবর্তী একাদশী থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হয়। নানা সময়ের উল্লেখ থেকে নির্মলেন্দুবাবু একটি সাধারণ সূত্রে এসেছেন দীপান্বিতা অমাবস্যার প্রতিপদ থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।[১৪] আবার বিশ্বদেববাবুর প্রবন্ধে পাই কালীপূজার রাত থেকে আট দশ দিন ধরে চোরচুন্নীর দল বাড়ি বাড়ি পালা গান গেয়ে বেড়ায়। এসব লেখার সঙ্গে কিন্তু সনৎবাবুর সংযোজনে দেওয়া সময়কালের কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। গিরিজাশঙ্কর রায় চোরচুরনী গানের বিবর্তন প্রবন্ধে বলেছেন ''দীপান্বিতার সময় থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত'' এই গানের সময়।[১৫] চোরচুন্নী গান কে নির্মলেন্দু বাবু আনুষ্ঠানিক গান বলেছেন। লক্ষণীয় যে 'গান' হিসেবেই এটি পরিচিত। বর্তমানে যাঁরা এ নিয়ে লিখছেন তাঁরা একে সতর্কভাবে 'পালা' নামে অভিহিত করছেন এবং এর প্রকৃতি পরিচয় দিতে গিয়ে একে বলছেন গীতিধর্মী লোকনাট্য,[১৬] অন্যপক্ষে স্বয়ং সম্পাদক পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন 'গান বা পালা'[১৭]। এ থেকে একটি কথা বোঝা যায়। চোরচুরণী লোক সমাজে গান হিসেবেই পরিচিত হলেও এর উক্তি প্রত্যুক্তিময় প্রকৃতি দেখেই একে পালা বলা হয়ে থাকে। নির্মলেন্দুবাবু লিখেছেন এর সমস্ত গানই উক্তিপ্রত্যুক্তি মূলক। এই উক্তি প্রত্যুক্তিই নাট্য সংলাপের ভূমিকা পালন করে।

চোর-চুন্নী পালাগানের আসর সজ্জা পালাটিয়া দোতরা বা কুশান গানের অনুরূপ নয়। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় বলেন — ''চোর-চুন্নী গানের কোন বিশেষ মঞ্চ বা আসর থাকে না। গৃহস্থের উঠানে চোর চুরণীর দল গান গেয়ে থাকে। দশ-বারো বা ততোধিক কিশোর বা যুবকরাই গানে অংশগ্রহণ করে। এই দলের একজন চুররীর ভূমিকায় থাকবে। অন্যান্যরা দোহার এবং বাদ্যযন্ত্রের কাজ করবে।''[১৮] সাধারণত গৃহস্থের উঠানে বা বাইরের খোলা জায়গায় দশ-বারোজন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পালাটিয়া, দোতরা কিংবা কুশান গানের মঞ্চ গান শুরু হওয়ার আগে থেকেই প্রায় সজ্জিত হয়ে থাকে। চোর-চুন্নী পালাগানে সেরকম কোনো পূর্ব থেকে

প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে না। দশ-বারোজন শিল্পীর মধ্যে ৪ থেকে ৫ জন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেন। খোল, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশী — এই চারটিই যন্ত্রই সাধারণত বাজানদাররা ব্যবহার করে থাকেন। অন্যান্য পালাগানে মূলগীদাল যে রকম পরিচ্ছন্ন পোষাক পড়ে থাকেন এই পালাগানেও সেরকম দেখা যায় মূল গীদালের সঙ্গে ৪ থেকে ৫ জন ছেলেরা মেয়ের সাজে নর্তকী হয়ে নৃত্য প্রদর্শন করেন। মূল গীদালের সঙ্গে দোহার আকর্ষক পোষাকে আসরে অবতীর্ণ হন।

কাহিনীতে প্রবেশ করার পূর্বে মূল-গীদাল বন্দনা শুরু করেন।

ও মুই বন্দনা করেছু আজি
ও মা শ্যাম কালি
ওরে জোর হস্তে করিয়া মাগো
করেছু ভকতি
আ-হা-র তুমি কালি কমলা রানী
এমা জগত তারিনী
ওরে তোর চরণ সুহারণ করি
দে পদ ধূলি
জোড় হাতে মা করেছু ভকতি।
এ-মা যদি পুরাস আশা
হাউসে রঙ্গে করিম পূজা
ওরে মনের আশা সর্বনাশা
না করাইস আজি
আহার আমি রতি সুরোমতি
এমা অন্যায় না নিস মে
তোর চরণ সুহারণ করি
জোড় হাতে করি
চোর করিবার যাচ্ছো মুই আজি"

"এখানে 'শ্যামাকালী'-র বন্দনার একটা অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। যে সময়টায় চোর-চুরনী গানের মরশুম সেই সময়ে কালীপূজার উৎসব। অতএব পল্লী কবির রচনায় শ্যাম-কালীর প্রভাব পড়েছে।"[১৯]

চোর-চুরণী গানকে নির্মলেন্দু বাবু বলেছেন আনুষ্ঠানিক গান। অর্থাৎ এগানের মূলে ছিল কোনো আচার পালনের প্রথা। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার প্রচলিত একটি প্রথার উল্লেখ তিনি করেছেন। শ্যামা পূজার পরদিন ভোরবেলা সং সেজে একদল বালক চোরের অভিনয় করে। একজন চোর সাজে; অন্য বালকেরা থেকে চীৎকার করে গৃহস্থকে সজাগ করে। এই চোরের সং সেজে বালকেরা গৃহস্থবাড়ি থেকে টাকা পয়সা বা মিষ্টান্ন পায়। জলপাইগুড়ি জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে মহালয়ার দিন কিছু চুরি করে আনার এবং দীপান্বিতার রাত্রে সবার অজান্তে তা ফিরিয়ে দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। এর দ্বারা নাকি সারা বৎসর স্বচ্ছন্দে চুরি করে ভালো রোজগার করা যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরণের প্রথা প্রচলিত আছে। এই ধরণের প্রথার ব্যাখ্যা করে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন "কালী পূজার দিন চুরি করিতে পারিলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া নির্ভাবনায় চুরি করিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারা যায়।"[২০] কিন্তু এর বাইরে অন্য কোনো কারণ থাকা সম্ভব। যাদু বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবেও এরকম চুরির প্রথা প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে।

এই ধরনের প্রথা সারা বাংলাদেশে প্রচলিত থাকলেও কেবল জলপাইগুড়ি জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের আর কোনো কোনো জায়গায় এ নিয়ে গান রচিত হয়েছে। লোক বিশ্বাস বা লোক প্রথার প্রচলন এখন অনেক কম; চোর চুন্নীগানের প্রচলন কিন্তু এখনও আছে। তার মধ্যে ধরা পড়েছে চোর চুন্নীর অভাব, তাদের সাংসারিক পরিস্থিতি, প্রেম ও বিচ্ছেদ, শঙ্কা ও সাহসের নানা পরিচয়।

"চোর চুরণী গানের দুটি দিক। একটি চোর চুন্নীর সামাজিক আর্থিক পরিচয় — চোরের চুরি করে আনা আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়া, আর অন্যদিকে আছে চোর চুন্নীর গানে সারা বৎসরের সালতামামি।"[২১] প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত চোর চুন্নীর গান যখন পালা নাটক হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তখন তার মধ্যে উপরোক্ত দুটি বিষয় থাকতে পারে, কিংবা এর কোনো একটি বিষয় থাকতে পারে। এই সঙ্গে দেখা যায় চোর চুন্নী গানে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় প্রসঙ্গ অনেকটা জায়গা পাচ্ছে। চৌরকর্ম সিদ্ধির জন্য কালীর পূজা প্রসিদ্ধ, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ কেন এভাবে যুক্ত হল তার কারণ স্পষ্ট নয়। কাহিনীর আরম্ভে শ্যামা বন্দনা বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই গীদাল শ্যামা বন্দনা করে আসরে নামেন। কিন্তু চোর-চক্রবর্তী হিসেবে রাধা-কৃষ্ণের বন্দনার মানে নিশ্চয় ভিন্ন। কৃষ্ণকে চোরের সঙ্গে এবং রাধাকে চুন্নীর সঙ্গে তুলনা করে যে কৃষ্ণ বন্দনা তাতে কৃষ্ণকেই সব জীবের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আবার কোনো চোর-চুন্নী পালার অনুষ্ঠানে চোর-চক্রপতিকে বন্দনা করার রেওয়াজ দেখা যায়। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের 'চোর-চুন্নী'র বন্দনা অংশ প্রণিধানযোগ্য।

বন্দনা করু মুই চোর চকরপতি
সেই চোরের চুন্নী বন্ধু রাধা-বিনোদনী
সে চোর যদি মনে করে দিনতে ডাকাতি পড়ে
কারয় সাদ্দি ধরিতে পারে
সে-চোর পুরাণতে শুনি। ভয় হাতাশ কিছুই করেযে না;
যারে বাড়ীতে যায় তাঁহে কানা।
দ্যাখেয়া দিলে তাও দ্যাখে না
ও পড়শীর কানাকানি
ওই বন্ধু চোরা জগৎ মেরা চোরের শিরোমণী"।[২২]

এই বন্দনাতে — মূল গীদাল চোর চক্রপতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা বিনোদিনীকে বন্দনা করেছেন। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায়ের মত এখানেও স্মরণযোগ্য — "কবি চোরকে বন্দনা করেনি। বন্দনা করেন 'চোর চক্রপতি'-কে। দ্বিতীয় পংক্তিতে রাধা বিনোদিনীকেও বন্দনা করা হয়েছে।"[২৩]

চোর-চুন্নী পালাগান পরিবেশনে তিন রকম কাহিনীর উপস্থাপন ঘটে। প্রথমভাগে রাধাকৃষ্ণ কথা নির্ভর সঙ্গীত। দ্বিতীয়ভাগে চোর-চুন্নীর সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে কাহিনী পরিবেশিত হয়। তৃতীয় ভাগে একটি প্রচলিত কাহিনী ময়নাগুড়ির উত্তরাঞ্চলে শোনা যায় — সেই কাহিনী পরিবেশিত হয়। চক্রবর্তী নামে একজন চোর অদ্ভুত মায়া ও যাদু লাগিয়ে চুরি করতো, কোনোদিন ধরা পড়তো না। সেই চক্রবর্তী চোরের কীর্তি নিয়ে তৃতীয়ভাগের কাহিনী। প্রথম ভাগের কাহিনী চোর এবং চুন্নীর উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

মূল গীদালই গান শুরু করবেন। তিনিই চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং গান শুরু করবেন। আবার তিনি চুন্নীরূপে কখনো গান শুরু করবেন। অনুরূপভাবে দোহার চুন্নী সেজে গান করছেন বা কখনো চোররূপে উত্তর দিচ্ছেন। মূল গীদাল এবং দোহার চোর চুন্নীরূপে বা চুন্নী-চোররূপে আসরে ভূমিকা পালন করেন। আসরে সমবেত শিল্পীরা কখনো চোরের গীতে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন আবার কখনো চুন্নীর গীতে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। এই চোর-চুন্নী নাট্য পালাগানে সঙ্গীত মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মত এই স্থানে প্রণিধানযোগ্য — "চোর-চুন্নীর সমস্ত গান চোর ও চোরণীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি। হয় চোর চোরণীকে কহিতেছে, নতুবা চোরনী চোরকে কহিতেছে। এই প্রসঙ্গে, গায়নকালীন একটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ করিবার মতো। চোর যখন চোরণীকে বা চোরণী যখন চোরকে কোনো কথা বলিতেছে তখন যাহার উদ্দেশে গানটি গীত হইতেছে, সেও বক্তার সহিত গান গাহিয়া থাকে। গায়ন-কালীন এই রীতি নাটকাদিতেও পালিত হইয়া থাকে।"[২৪]

প্রথমভগের কাহিনী চুন্নীর গীত দিয়ে শুরু। মূল গীদাল শুরু করেন —

"ওরে হায়গো সখী বড়ই
নৈজ্জা দিলো শ্যাম-কালা।
ওরে কদমডালে বাজায় বাঁশী
ঠিক দুফোর বেলা
আ-হার বাঁশিটা তোর এতয় বোল ধরা
ডাকায় মোর নাম ধরিয়া
ওরে এমন মোহন বাঁশী কী সুন্দর বাজে
কী-বা আছে তোর বাঁশীটাতে
আ-হারে নন্দের বেটা চিকনরে কালা
কেনে দিলো এতয় জ্বালা
ওরে সেই জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচে না
হায়রে যাতনা কতয় শুনিম বাঁশির বাদে।

এই গানে কিন্তু রাধার আসন্তোষের কথা নেই বরং ঈপ্সার কথাই আছে। অর্থাৎ কৃষ্ণমুখী রাধার প্রেমের আকুলতাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সেই আকুলতা কৃষ্ণের বঁশির ডাকে জন্মেছে, আর তা কৃষ্ণকেই আকর্ষণ করছে। কৃষ্ণের বাঁশির ডাকে প্রেমকাতর রাধার কথা এই গানে ব্যক্ত হয়েছে। চুন্নীর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যে প্রস্তাবনা হল তার উত্তর চোরের সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। আমাদের সংগৃহীত পালায় চোরের উক্তিতে, ঠিক প্রেমাকর্ষণ নেই আছে সাংসারিক পরিস্থিতির কথা। একই পালাগানের প্রথমভাগের কাহিনী শেষ হতেই দ্বিতীয় ভাগের কাহিনী শুরু হবে। এই ভাগেই চোর চুন্নীর সামাজিক অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

নির্মলেন্দুবাবু চোর চুরনী গানের বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে চোর চুরনীর গার্হস্থ্য জীবনের কথা। পরের অংশে পাই গ্রামের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী।[২৫]

সংযোজিত গানগুলিতে দুই দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমাংশে প্রেম প্রসঙ্গই বড়। তবু তার মধ্যে চোরের কথা পাই —

ওগো কুত্তি গেলো ওগে চুন্নী
একটা কথা শুনেক মোর।
ওগে চট করিয়া খাবার দে মোক

করিবার যাম গে চোর।
ওগো যা কেনে তুই তাড়াতাড়ি
আর না করিস তুইগে দেরী
সাজা পড়া করো মুই
আ-হা-র দেখিনু মুই গণনা করি
একঠে আছে গে টাকা
এলা যদি কুনমতে পারো আনিবার
তাহলে কি অভাব গে হামার

নির্মলেন্দু বাবু যে সব গীতের সংকলন করেছেন তার একটি অংশে দেখতে পাই চোর বড় বাড়িতে চুরি করবার কথা বলে ঃ

চুন্নী নামজাদা মোর নাম
ছোট ঘরে মন না চায়
এলা বড় ঘরত করিম কাম।[২৬]

চোরের কথার উত্তরে চুন্নীর নিঃসঙ্গতার দুঃখের কথা তার গানে ব্যক্ত হয় —

ওরে পরার নারীক ভালোবাসিস
নিজের নারীকে মন্দ বাসিস
এমন কি তোর চলন গিলা
ওরে এমন করিয়া মোর বিছানাও
না থাকিস আসিয়া

চুন্নীর গানে চোরের পর-নারীর প্রতি প্রেমাসক্তি ফুটে উঠেছে। আবার কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পরকীয়া সম্পর্কের রূপ ও ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

প্রেম করিয়া হোল নিদয়া
মোক কি মারিবো কান্দেয়া
ওরে এমনভাবে মধুর সুরে
বাঁশী বাজাইসনা।

শুধু তাই নয় চুন্নী যমুনার ঘাটে ছল করে কৃষ্ণকে দেখতে যেতে চায় অথচ তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না —

মুই বোলে ছল

করিয়া যাও তোক দেখিবার

বাড়ি হাতে না দেয় বিরিবার।

এই কথা শুনে চোর যে কথা বলে তাতে প্রেমের এই আকর্ষণটাই অকস্মাৎ তত্ত্বজ্ঞানে নষ্ট হয়ে যায় —

"চুন্নী কেবা তুমি কেবা আমি

কেবা হবে কার

এ সংসারে দেকগে চন্নী কান্দাকাটায় সার।"

এসব উক্তি প্রত্যুক্তি থেকে মনে হয় চোর-চুন্নী গানের ঐ অংশে নরনারীর প্রেমই গানের উপজীব্য। যেখানে চুন্নী চোরের সঙ্গে মিলনের আকূতি জানায় সেকানে চোরের বাঁশির ডাকে সেই আকর্ষণ উদগ্র হয়ে ওঠে। অথচ চোরকে সে পায় না। চুন্নীর গানে পাই —

"আজি কথায় গেলি আমায় ছাড়ি

ওকি ও মোর প্রেম চরা

ওরে এমনভাবে বারে বারে

মোক আর কান্দাসনা।"

তখন চোর যে প্রেমচোর তা স্পষ্ট হয়ে যায়। চুন্নী আবার গায় —

"এমন বয়সে গেলো ছাড়িয়া

ও তোর কঠোর হিয়া

ওরে এমনভাবে গেল ছাড়ি

মুই নারীটা জানয় না ...

চুন্নীর প্রেমের আকুলতা যে প্রেমিকের জন্য, সে তার স্বামী। গানের একটি উক্তিতে পাই —

তুই চরা সোয়ামী হয়া

ও মোক গেলো মারিয়া

ওরে যাবার বেলা কেনে তুই মোক

না গেলো কয়া।

কাজেই গানের প্রথম দিকে কালার বাঁশির ইঙ্গিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অনুষঙ্গ বহন করে আনলেও তাতে নিঃসঙ্গ চুরণীর প্রেমকাতরতার চিত্রই মুখ্য।

চুরণীর উত্তরে চোর জানায় —

"ওরে প্রেমপিপাসা তোর গে চুন্নী
মিটান আজি ভালো করি"

এসব উক্তিতে চোর চুরণীর প্রেমের চিত্রই মুখ্য।

ঋণের দায়ে জর্জরিত চোর-চুন্নীর বাড়ীতে মহাজনের নিত্য তাগাদা এবং চোরের অনুপস্থিতিতে চুন্নীকে বিরক্ত করার কথা গানের মধ্যে প্রকাশিত।

চুন্নীর গীত ঃ ওরে বাড়ি আসিলো ভালো করিলো শুনেক চরা বিবরণ।
ওরে তোর বাদে প্রত্যেক দিন হছে মোর মরণ।
আহার এলায় আসিয়া গেলেক দেউনিয়া চরা কয়া গেলেক মোক।
ওরে আজিকার আতিক্ষা বাড়িতে চরা নবার কইসে তোক।
আজিবোলে আসিবে আইতোত।

চোরের গান ঃ আজি চট্ করিয়া উঠগে চুন্নী, জ্বলাগে বাতী
ওগে ঘরের ভিতর কেনে তুই হের কান্দোছিত বসি।
আর বাতিটা জ্বলেয়া চুন্নী ও তুই দে খুলি।
খালি খালি কান্দিস না বসি

সংসারের নানাবিধ সমস্যা চোর কিংবা চুন্নীর গীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চুরনীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, চোরের ক্ষমতা অক্ষমতা এসব গানে উঠে আসে।

'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের সংকলন অংশে দেখি চুরণী পূজার সময় চন্দ্রহার চায় —

চরারে আসিছে পূজার বাজার
নাগে মোক এইসন চন্দ্রহার
দিনে দিনে দিন যাছে মোর
করেক তুই বিচার,
নারী উজানি বাজার।[২৭]

চোর সেখানে বলছে — "চুন্নী গে
দিবার নাই পারিম চন্দ্রহার"[২৮]

কেননা পাটের বাজার মন্দা।

লোকসঙ্গীত যেহেতু কোনো নির্দিষ্টরূপে স্থির থাকে না সেজন্য এইগান সবদিন গাওয়া হয় না। তার বদলে অন্য

সমস্যা চলে আছে। আমাদের সংগৃহীত অংশে এসেছে মেয়ের বিয়ের সমস্যা চুন্নীর কথায় চোর বলে —

বিয়ার কথা কবার কছিত
শুনেক ওগো চুন্নী মাই।
এ্যালা হেসে দোসরা নিয়ম
আগিলা মতন নাই।।

তখন মেয়ের বিয়ের অনেক খরচ

মেট্রিক পড়ালার বাড়িসে সম্মান
ও তাক বেটি করিলে দান
ওগে হাজার টাকা খরচ নাগে তামাম জিনিস
আরো নাগে বেটিটা বিদ্বান।

তাছাড়া — খাট পালঙ্ক ছাইকেল ঘড়ি
রেডিওটা দেওয়া চাই।
অ্যালা হইসে দোসরা নিয়ম
আগিলা মতন নাই।

অনেক খরচ করে মেয়ের বিয়ে হলো কিন্তু জামাই পাগল। সে হিসেব নিকেশ জানেনা চুরনীর দুঃখ গানে ফুটে ওঠে।

ওরে কিসোত কি কাম কল্লো চরা
কার বুদ্ধি তুই ধরিয়া
ওরে কুঠে হাতে আনিলো জামাই সাদা পাগেলা
আ-হা-র ঘরের মধ্যে মোর এ্যাকেনা ছাওয়া
ও তার নামটা হৈল মতিবালা
ও রূপে-গুণে দেখান সুয়ান
স্বামী পাগেলা
মহা দুখোত ফেলালে ছাওয়া।

কাজেই চুরনীর আক্ষেপের শেষ নেই। চোর চুরণীর গানের এটা দ্বিতীয় অংশ। এরপর পাই দেশের পরিস্থিতির কথা অনেকটা গম্ভীরা গানের রিপোর্টিং-এর মত সালতামামী। এই অংশের সঙ্গে চৌর্যবৃত্তির কোনো যোগ নেই

কেবল চোর চুরণী এই গানের চরিত্র মাত্র। এই অংশে "একবছরের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও নৈসর্গিক ঘটনার সালতামামী"[২৯] পাওয়া যায়।

"ওরে ইন্দিরা গান্ধী হয়য়া মন্ত্রী
নয়া আইন করিলো জারি
ওরে রাস্তার বগলে কত লোকের
ভাঙ্গিয়া দিলো ঘরবাড়ী
আ-হা-রে ঘর ভাঙ্গেছে দালান ভাঙ্গেছে
ও ভাই আরো কত কি,
ওগে দোমনি হাটের জালিয়াটাবির কল দিলো কাটি
এমন আইন করিলেক জারি।"

পালা নাটকের কাহিনীর অগ্রগতির মধ্যে এ-রকম অনেক বিষয় নিয়ে গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি সামাজিক অবস্থার ছবিও উঠে আসে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ এইভাবে চোরচুন্নী গানে স্থান পায়।

চুন্নী চোরকে বলছেন —

যা ক্যানে তুই ওরে চরা সরকারী হাসপাতালে
ওরে মিছায় না কও তোকরে চরা যাছে কত লোক
"আহারে কত সুবিধা করিসে সরকার
ও দ্যায় হলে অপ্রাশন।
একশত পাঁচটাকা বোলে করেছেরে দান
তুইও যায়া হ'রে অপ্রাশন।"

এখানে চোরকে টাকা উপার্জনের জন্য অপারেশন করাবার কথা বলা হলেও তার লক্ষ্য কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ।

ওরে মানষির মুখে যাছে শুনা
যার আছে ভাই তিনটা ছাওয়া
হবার নাগে তাক অপ্রাশন।
ওরে সরকার বোলে আইন জারি করিসে এইসন।

পরিবারের অর্থ-সংগ্রহ সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয়-নীতির পরিচয় এই দুই বিষয় সম্পর্কিত সামাজিক দুই চিত্র চোর-চুন্নী এই গানটির মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই পালা গানের উপস্থাপন রীতির সঙ্গে খানিকটা

মিল রয়েছে গম্ভীরা ডুয়েট গানের। গম্ভীরাতে ডুয়েট পর্যায়ে দুটি চরিত্র দেশের সমাজের এবং নিজের পরিবারের মূল সমস্যা নিয়ে গান এবং কথোপকথন করে। চোর-চুন্নী পালা-গানে চোর-চুন্নী চরিত্র দুটি অনুরূপ ভাবে সমাজের নানা বিষয়ের সমস্যার কথা দর্শক শ্রোতাদের নিকট তুলে ধরে। 'গম্ভীরা'তে সব সমস্যার সমাধানের জন্য শিবকে জবাব দিতে হয়। চোর-চুন্নীতে সমস্যা সমাধানের কোনো কথা নেই। চোর-চুন্নী দু'জনেই সমাজের নানাবিধ সমস্যার কথা তোলে। এখানে আবার গম্ভীরার সঙ্গে একটা বিশেষ পার্থক্য।

একটি গানের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

"ওরে শুনরে ভারতবাসী
হিটা কেমন আসিলো দিন
বেংলা তাও যাছে মিটিং
আ-হা-র জলতে ভাই ভাসেছে মুরগী
ও ভাই ডাঙ্গাত ভাসে হাস
ওরে ভেরায় খাছে মাছ আর মাংস
বাঘে খাছে ঘাস,
দেখিয়া ভাই নাগেছে হাতাস
ওরে সাবধানে রাখেন দু'খান
পেটের খতিয়ান"

এর পাশাপাশি আবার মেয়েদের ফ্যাশন এই গানের বিষয় হিসেবে উঠে আসে।

কলিযুগের মেয়ের কথা কি আর বলা যায়।
আর কত ফ্যাশনের বান্ধিছে খোঁপা
আরো বান্ধেছে ফিতা
কপালেতে টিপ নাগেয়া ঠোটত দেয় আলতা
পায়ে ভাইরে পিন্দেছে জুতা।

নির্মলেন্দুবাবু রিপোর্টিং অংশটির প্রসঙ্গে বলেছেন এর সঙ্গে প্রাচীনকালের বর্ষ বিবরণীর সম্পর্ক আছে। কেন না তখন কার্তিকী অমাবস্যায় নববর্ষ হত।[৩০]

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে লোকসঙ্গীতের বর্ষবিবরণী বা রিপোর্টিং অনেকটা লোক সাংবাদিকতার কাজও করে। চোর চুরণীর এই গান সেই ভূমিকা পালন করে আসছে।

চোর-চুন্নীর ব্যক্তি জীবন রাষ্ট্র-সমাজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তি-জীবনের মূল বেদনার-কাহিনী তুলে ধরতে গিয়ে দেশের-সমাজের-চলমান পরিস্থিতির কথা বলে যাচ্ছে। আমাদের সংগৃহীত পালার এইসব রিপোর্টিং এর পর আবার চোরের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। চোর সেখানে চুরি করতে যাবার আগে চুরণীর কাছে বিদায় চাইছে।

``ওগে চুরী করিবার যামগে চুন্নী
হাসিমুখে বিদায় দে,
ওগে গলার মালা কানের সোনা
আনিম তোর বাদে।

নির্মলেন্দুবাবুর সংকলনে দেখেছি চোর বড় বাড়িতে চুরি করবার জন্য গেছে। এখানেও সেই প্রসঙ্গ দেখতে পাই—

আ-হা-র চুন্নী ধওলা বাড়ীত করিম চুরী
টাকার বাক্সো আলমারী
সন্দুকোত রাখে না মালী
আছেগে পড়ি
এ্যালা মুই যাম চোর-করি।

চোর তার স্ত্রীকে বড়লোকের বউ-এর মতো সাজ সজ্জায় সাজিয়ে তুলবে। তার এই ইচ্ছার কথা ও গানে ফুটে ওঠে।

ওগে বড়লোকের মাইয়ার মতন
শাড়ি পিন্দাম নানান মতন
ভাবিবার তোক না নাগে
ওগে গলার মালা কানের সোনা
আনিম তোর বাদে।''

কিন্তু এই চুরী করার পরিণতি যে খারাপ সে-কথাও চোর জানে। কিন্তু নিরূপায় হয়ে তাকে এই কাজ করতে হয়। চোর শেষ পর্যন্ত সে ধরাও পড়ে। ধরা পড়লে সংসার সুখের আশা শেষ হয়ে যায়।

``ওগে ধরা পরি সংসারের আশা
চুন্নী দিলো ছাড়ি,
ওকি হায় মুই কি কাম কন্নু

জান হারানু করিয়া চুরী।

পুলিশের পীড়ন সহ্য করিতে হয় — আ-হা-র দারোগা বাবু রাগ করিয়া

মোক কছে ক্যানে করলু চুরী গিয়া

মুই কছো, নাই করো মুই চুরী।

চোর মিথ্যে কথা বলে রেহাই পায় না। সেপাইরা তাকে পীড়ন করে।

ওরে এইটা কথা শুনি যেইলা

ঝাপ্পি উঠিল সিপাইগিলা

ওঠাইল পিঠের দুরদুরি

কি কাম কন্নু জান হারানু

করিয়া চুরী

আ-হা-র থানার পছিমত নিয়া যায়া

নাকে মুখে দিলেক মুতি

চিপিয়া ধরিয়া টুটি

কি কাম কন্নু জান হারানু

করিয়া চুরী।

চোরের দুর্দশা দিয়ে কাহিনী শেষ হয়। চোরের দুর্দশা দিয়ে কাহিনী এইখানে শেষ হয়। লোক কবির নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টিতে চোর চুরনীর জীবনের এই পরিণতি রচিত হয়। চোর ভেবেছিল চুরি করে সংসারের সমস্যা দূর করবে — তেমনি চুরি করে ধরা পড়ার ভয়ও তার ছিল। লোককবি এই ভাবে চোরের পরিণতি দেখিয়ে যে বার্তা দিয়ে যান তার একটা নৈতিক মূল্যও স্বীকার করতে হয়।

## পাঁচালী গান বা পালাটিয়া ঃ রং পাঁচালী, খাস পাঁচালী এবং মান পাঁচালী

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার উত্তর দিকে অবস্থিত স্থানগুলিই পাঁচালী বা পালাটিয়া গানের আকর ভূমি। এই অঞ্চলের মাটিতেই পাঁচালী গান তিন রকমভাবে মানুষের কাছে সমাদৃত — খাস পাঁচালী, রং পাঁচালী এবং মান পাঁচালী। নাট্যগুণ সম্বলিত এই পালাগানগুলিকে কখনো পালাটিয়া আবার কখনো ধামগান বলা হয়ে থাকে।

শ্রদ্ধেয় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে — ''প্রান্ত উত্তরবঙ্গে 'পাঁচালি' গান বলিতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নাট্য-কাহিনীকে বুঝায়। কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র সম্বলিত নাট্য-কাহিনীকে 'পালাগান' ও বলা হয়। 'পালা'র সহিত 'টিয়া' এই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রান্ত উত্তরবঙ্গে 'পালাটিয়া' গান-ও বলা হইয়া থাকে। 'পাঁচালি' গানেরই অপর নাম পালাটিয়া গান।''[৩১]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে পালাটিয়া তিন প্রকারের হয়। খাস পাঁচালী, রং পাঁচালী এবং মান পাঁচালী। 'খাস পাঁচালী' নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে চলমান জীবনের ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনীকে নিয়ে তৈরী কোনো পাঁচালী গান। সাম্প্রতিক ঘটনা যা কোনো অনভিপ্রেত প্রেমজনিত ঘটনাও হতে পারে, অথবা সামাজিক দিক থেকে গর্হিত কোনো ঘটনাও হতে পারে খাস পাঁচালীর কাহিনী। কিন্তু রং পাঁচালী বিষয় প্রেম। প্রেমকে কেন্দ্র করে বীরত্বপূর্ণ কাজের ফিরিস্তি, কিংবা কোনো কাহিনীকে রঙ্গীন প্রেমের প্রলেপ দিয়ে তাকে মধুময় করে তোলাই রং পাঁচালীর কাজ। নির্মলেন্দুবাবু বলেছেন রঙ পাঁচালীর প্রেম কাহিনীর সবটাই কাল্পনিক। তবে প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে হাসির উপকরণ ও তাতে মেশানো থাকে।

'মান পাঁচালী' উপরোক্ত দু'ধারা থেকে ভিন্ন। তার বিষয় পুরাণ থেকে বা কোনো শাস্ত্র থেকে নেওয়া। সমাজের মান্যতা বা সম্ভ্রম রক্ষা করে এই 'মান পাঁচালী পালাগান। বীরত্বপূর্ণ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোনো শ্রদ্ধাপূর্ণ কাহিনীকে উপজীব্য করে মান পাঁচালী গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। শ্রদ্ধেয় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে — 'মান' অর্থাৎ সম্ভ্রম করিয়া, গম্ভীর্য-পূর্ণ পরিবেশে যে নাট্য কাহিনীর অভিনয় করা হয়, তাহাকেই বলে 'মান পাঁচালী'।[৩২]

পালাটিয়া দল গড়বার জন্য অনেক শিল্পীর দরকার হয়। কোথায় কোথায় দেখা গেছে কুড়ি-পঁচিশজন কোথাও আবার তিরিশ-পঁয়ত্রিশজনকে নিয়েও দল গঠিত হয়। বর্তমানে অবশ্য কম সংখ্যক শিল্পী নিয়েও এই পাঁচালী দল গঠনের চেষ্টা চলছে। দলে যিনি পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করেন তাকে বলা হয় অধিকারী বা হাদি, যিনি গান পরিবেশন করেন তাঁকে বলা হয় গীদাল বা গীতাল, যাঁরা বাজান তাঁদের বাইন এবং নৃত্য-গীত

ও নারী চরিত্রে যে সব পুরুষ অভিনয় করেন তাঁদের ছুকরী বলা হয়। এই পালা নাটকে একজন শিল্পী একাধিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। লোকসংগীত শিল্পী শ্রী পরেশ রায় এ ব্যাপারে সমীক্ষা চালিয়ে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন — ''অনেক সময়েই এক ব্যক্তি একাধিক দায়িত্ব পালন করেন। যাঁরা পালাটিয়ার নাট্যকাহিনী রচনা করেন, তাঁদের 'অস্তাদ' বা 'রস্তাদ' বলে। যে সব দলের নিজস্ব রচয়িতা থাকে না, সে সব ক্ষেত্রে সাধারণত দলের 'হাদি' বা 'অধিকারী' কোনো অস্তাদের কাছ থেকে কিছু অর্থের বিনিময়ে নাট্যকাহিনীর মূল অংশ ও গানের লিখিত রূপের খাতা সংগ্রহ করেন। এরপর মাসাধিক কাল ধরে এই পালার মহড়া চলে। পালার প্রধান পাত্র-পাত্রীর সংলাপ লিখিত থাকলেও কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো যেমন — ফকির, কোনো পথচারী, ভাঁড় (বা খিচরিয়া প্রতিবেদক), চাকর ইত্যাদি চরিত্রগুলির সংলাপ লিখিত থাকে না। এগুলো মৌখিকভাবে তাৎক্ষণিকরূপে রচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাটিয়ায় আগে ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক মেয়েই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।[৩৬]

অভিনয়-শিল্পীদের সাজ-সজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা শুধু নৃত্যশিল্পীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলি সাধারণ মেক-আপ নিয়েই অভিনয় করে থাকেন।

পাঁচালীগানের মঞ্চসজ্জা প্রচলিত নাটকের মঞ্চসজ্জার অনুরূপ নয়। পাঁচালী পালানাটকের মঞ্চটি হবে গোলাকার, ঠিক বৃত্তের মতো। অভিনয়য়ের মধ্যস্থলে বাদ্যকর এবং অভিনয়-শিল্পীগণ বসেন। অভিনেতাদের প্রবেশ বা প্রস্থানের কোনো ব্যাপার এই গানে থাকে না। তাঁরা এই অভিনয়ের আসরেই বসে থাকেন এবং প্রয়োজন অনুসারে উঠে অভিনয় করেন আবার বসে পড়েন। চরিত্রগুলি মঞ্চের মধ্যে বসে থাকা বাদ্যকারও অন্য শিল্পীদের ঘিরে ঘিরে অভিনয় করেন। চরিত্রগুলির চলাফেরার জন্য এবং অভিনয় প্রদর্শনের জন্য আসরে প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা থাকে।

নৃত্যগীত এবং অভিনয় এই তিনের সংযোগে পালাটিয়া গান উপস্থাপিত হয়। গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিবেশন করেন। আবার অভিনয় শিল্পী সংলাপ এবং গীত দুই-ই ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণ কথপোকথন সংলাপের মধ্যে দিয়ে চলে। কোনো কোনো সময় একই কথা সংলাপের মধ্যে প্রকাশ পেলেও তা আবার গানের মধ্যে ফিরে আসে। লোকনাট্যের সংগীতের একটা জিনিস দেখা যায়। লোকনাট্যের সংগীতগুলি এলাকাগত বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত হয়ে থাকে। কোচবিহারে দোতরা পালায় দোতরা গান, জলপাইগুড়িতে চোর-চুন্নীর ক্ষেত্রে চোরচুন্নী গান, বিষহরিতে বিষহরা গান — অনুরূপভাবে পাঁচালী বা পালাটিয়ার পালাটিয়া গান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দার্জিলিং-এর নিম্নসমতলভূমি এলাকায়, তরাই অঞ্চলে লাহাংকারী গান। এই অঞ্চলের পালাটিয়া গানে ব্যবহৃত হয়। এ নাটকে লাহাংকারী গানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

লাহাংকারী গানের সুর মূলত লৌকিক এবং প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষা নিরপেক্ষ এবং সহজাত। লাহাংকারী গানে যে সুর কাঠামো ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ — সা, রা, মা, পা, ধা, না, সা, রা, সা, না, ধা, পা, মা, জ্ঞা, রা, সা, না, না, সা, জ্ঞা, রা, সা। এই সুর কাঠামো না ভীমপলশ্রী না দরকারী কানাড়া অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট রাগের সুর কাঠামো দিয়ে বাঁধা যায় না এবং এখানেই এই লাহাংকারী গানের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত হিসাগে গণ্য হওয়ার মতো মূল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।"[৩৪]

কোনো শিল্পী একটি সংলাপ হয়তো গানের আকারে বলছেন। তখন কিছু থাকে বলা হচ্ছে তিনিও সে গানে গলা মেলাবেন। বক্ত এবং শ্রোতা দুজনেই এই গান পেয়ে থাকেন। গানগুলির সঙ্গে সরলভাব দর্শক শ্রোতার মনকে সুখে দুঃখে ভরিয়ে তোলে। লাহাংকারী গানে সুরের বৈচিত্র্য আছে। ভাসানী সুর, ঢিপানী সুর, উদাসী সুর এবং পাথারী সুর — এরূপ বিভিন্ন সুরে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভাসানী সুরে ভাওয়াইয়ার দরিয়া বা দীঘলনাসার সুরের মতো দীর্ঘ শাসাঘাতের ভেতর দিয়ে এই গান পরিবেশিত হয়। ঢিপানীসুরে থাকবে চলন্তী বা চটকা গানের সুর। মনোশিক্ষা বা তুক্খ্যা গানের সুরে যেমন উদাস সুর থাকে ঠিক তেমনি লাহাংকারী গানে কখনো কখনো উদাস সুরের ব্যবহার হয়ে থাকে। বৈরাগ্য বোঝাতে বা ভাবজগতের মোহবন্ধন কাটিয়ে ওঠার যে গানগুলি রচিত হয়ে থাকে সেই গানগুলি উদাসী সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। পালাটিয়া লোকনাটকে বিশেষ করে স্ত্রী চরিত্রের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা 'পাথারী' সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

পাঁচালী গানের তিনটি ধারাতে আসর বন্দনা একইরকম ভাবে হয়। আসর বন্দনার পর কলাকুশলীরা এক এক করে আসরে এসে বসেন। এরপর যাত্রার ঢং-এ শুরু হয় কনসার্ট। কনসার্টের পর নৃত্য শিল্পীরা দুটি বা তিনটি নাচ দেখিয়ে যান। দর্শকদের অভিনয়মুখী করে তোলার জন্য এবং তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য এরকম নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। চরিত্রগুলি অভিনয়ের জন্য দৃশ্য-অনুসারে আসরে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দেয়। এই পরিচিতি পর্বের ঢং অন্য পালা নাটকগুলেতে দেখা যায় না।

রং পাঁচালী গানের বন্দনার একটি অংশ —

পয়ার হরি তোর নামের মহিমা যত
বন্দি হরি তোর শ্রীপাদ পদ্ম
হরি কোন নামে তোর করি বন্দনা
দয়াল হরিহে পুরাও হরি
মোর মনের বাসনা

চিতান এবার দাও হে হরি তোমার রাঙা চরণ
মস্তকে করিব ধারণ
আমার লাজ লৈজ্জা কর নিবারণ
খোসা হরি অধমজনায় আমি
কিছুই জানি না
কেমনে করিব হরি
তোমার সাধনা

অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক যে বন্দনা গানটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে নানা দেবের বন্দনা করা হয়েছে।

দেব সত্যযুগের নারায়ণ শিব
তৃতীয়াতে রাম
দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।[৩৭]

খাস পাঁচালি গানের চিন্তাশোরী পালার যে বন্দনা শিশির কুমার মজুমদারের বইতে পাই তা নিম্নরূপ —

ও মা দেখ কলির ব্যবহার
পাপে ডুবিল সংসার
ও মা জলপাইগুড়ি ডুবিল জলে
দেখিয়া মন কান্দে সবাকার।[৩৮]

এই পাঁচালী গান কারো বাড়িতে বা কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণমূলক ভাবে সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ভাবে কোথাও উৎসাহী ব্যবস্থাপকদের দ্বারা চাঁদা উঠিয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমানায় কিছু দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

যে স্থানে পালাটিয়া গানের অনুষ্ঠান হয় সেই স্থানটিকে লোকায়ত ভাষায় 'ধাম' বলা হয়। এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দুবাবুর অভিমত কিঞ্চিৎ ভিন্ন তিনি বলেছেন "বিশেষ বিশেষ উৎসবে অথবা কয়েকটি গ্রামের নাট্য দলের অভিনয় প্রতিভার উৎকর্ষ বিচারের উদ্দেশে এক বা একাধিক রাত্রিব্যাপী যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হইয়া থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় তাহাকে বলে ধাম।"[৩৯] ধাম এই শব্দটি তীর্থস্থানের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বহুলোক সমবেত হয় বলে সেই স্থানটি তীর্থক্ষেত্র বা ধামরূপে বিবেচিত হয়। এই ধামগানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের বিশেষ অর্থ দেওয়া হতো না। এই গানে অংশগ্রহণকারীরা বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুসারে পুরস্কৃত হন। ধামের আর একটি বৈশিষ্ট্য সেই স্থানটিতে অবশ্যই কালাঠাকুর

বা রাধাকৃষ্ণের থান বা মন্দির থাকবে।

**লোভী জোতদার লোকনাটকের পর্যালোচনা ঃ**

লোভী জোতদার 'খাস পাঁচ'লী' পর্যায়ের একটি লোকনাটক। লোভী জোতদারের পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি— এর ফলে যে একটি লজ্জাকর ঘটনা ঘটে তাই এর বিষয়। এই লোকনাটকের মঞ্চ-সজ্জার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। পাল্লার কুশী-লবগণ আসরে যাওয়ার আগে সাজঘরে কিছু নিয়ম পালন করেন। তন্ত্র-মন্ত্র জানা ব্যক্তি জলের মধ্যে মন্ত্র পড়েন। সেই জল সবার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আসরে পালানাটক সফল করার জন্য কায়-মনোবাক্যে দেব-দেবীর কাছে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা প্রার্থনা করেন। দুটি বা তার বেশী দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হলে তন্ত্র-মন্ত্রের বা 'বাণ' মারার বিষয়টি এসে যায়। এই লোক-বিশ্বাসটি মনে বহুদিন ধরেই আছে। কোনো কোনো দলে দেখা যায় জলের বদলে 'গজমারা' (তেলীর বাড়ির তেল) তেল হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়ে —

মোহিনী মোহিনী রস মোহিনী
মুখের রস গৌরী দেবী দিলে যশ
কামরূপী ডুকুরিয়া মোক ফল্লাকে করেন দয়া
তিপ'থি ঘাটার মাটি শামসুন্দর নাম
খাট পালঙ্গ বসিবারে পাং
সিংহরূপী সোন্দানুং
বাঘরূপে বিরানুং
কাঁও কোনো না বলিবে মোক।
আয় মা শুভচনি।
মোক কোলাত ধরি বৈস।
মোর ফল্লার হয়্যা দুইটা কথা কৈস।
এই মন্ত্র হেলিবু পেলেবু
কালিক' চণ্ডীর মাথাত
দুই পা বুছিবু।

এই মন্ত্র পড়া শেষ হলে বাদ্যযন্ত্রের শিল্পীরা আসরে প্রবেশ করেন। দলনেতা বা মূল গায়ক মাটিতে প্রণাম করে শিল্পীদের সঙ্গে বসেন। বাজানদাররা প্রথমে একটি কনসার্ট করেন। লোকায়ত ভাষায় 'হাড়ুড়া দেওয়া' বলে। এই বাজনার সঙ্গে নর্তকীরা চারদিক ঘুরে নৃত্য শুরু করেন। নৃত্য শেষ হলে 'বন্দনা' শুরু হয়। 'খাস পাঁচালী' 'রং

পাঁচালী' এবং 'মান পাঁচালীতে বন্দনা একই রকম। কাহিনীর উপস্থাপনাও এক। নাটকের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে এই পার্থক্য। রং পাঁচালী গানের একটি 'বন্দনা' আগেই আমরা দেখিয়েছি। মান পাঁচালী 'দস্যু কন্যা কালিন্দী' পালা নাটকের 'বন্দনা' উল্লেখ করা যেতে পারে —

'তোমায় ডাকি হে ওহে দেব নারায়ণ
এসো এসো দেব পঞ্চানন।
আমি সংকটে পড়িয়া ডাকিহে
দেব নিজ জ্ঞানে কর পার
তুমি দীনের বান্ধব হে ওহে চিনি না তোমায়
আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি নাগো দেব
এসোগো আনন্দেরও নন্দন
তুমি দীনের বান্ধব হে ওহে ভলা মহেশ্বর।'

'বন্দনা' শেষে পাঁচালী বা পালাটিয়া লোকনাটকের চরিত্ররা এক এক করে নিজের পরিচয় দেন। এই চরিত্র-পরিচয় পঠটি সোজাসুজি করে দেখানো হয় না। পরস্পর সংলাপের মধ্যে পরিচিতি পর্ব শুরু হয়। 'লোভী জোতদার' লোকনাটকটি এইভাবে শুরু।

জোতদার — নমস্কার। মোর নামড়া বাগে লোভী জোতদার। আর এই ডাবা (দুলালীক দেখায়) মোর বেটি, তোর নামটা কহ বেটি।

দুলালী — তে বাবা তুইহে কয়হা দেনা তে মোর নামডা।

জোতদার — নাহায় বেটি নাহায়, এইঠে নিজের নামডা নিজে কহবা লাগে।

দুলালী — তে বা মোর নামডা দুলালী।

এর কিছু পরে মোড়ল প্রবেশ করেন। জোতদারের সঙ্গে কিছু কথা হয়। তারপর নিজে বলেন —

— বাবুগে নমস্কার। মোর নামডা ল্যাঠালাগা....। পরিচয়ের সঙ্গে নিজের চরিত্রের প্রকাশ পায়।

প্রথম দৃশ্যে জোতদার মোড়লকে তার দুঃখের কথা বলেন। পত্নী-বিয়োগ ব্যাথায় তাঁর মনে খুব কষ্ট। সংসারে স্ত্রী লোক না থাকায় তাঁর এবং তাঁর মেয়ে দুলালীর খুব কষ্ট। মোড়লকে জানান —

— তে বুঝিলো মড়ল, তুইত ভাই তামানে জানিস, আজি তোর ভোজি মরিবার বার-তের বছর হয়া গেল্। আজি আরহ নায়া করিয়া ফম পড়েচে। ঠিকভাবে জোতদারীতে তাঁর মন নেই। দয়াল সিং প্রজার বাড়িতে যেতে মোড়লকে যেতে বলেন। খাজনা বাকী পড়ে রয়েছে। দয়াল সিং-এর স্ত্রী চালাকিশ্বরী। নামের মধ্যেই বোঝা যায়

চালাকিশ্বরী চতুর বুদ্ধিমতী মহিলা। ঘরে তাঁদের একটি ছেলে। শক্ত সিং। অলস প্রকৃতির মানুষ। অর্থ-উপার্জনে এখনো সক্ষম হয়নি। তবু সে বিয়ে করতে চায়।

মোড়ল দয়াল সিং-এর বাড়িতে পাওনা টাকা বা ধানের জন্য চাপ দিতে গেলে দয়াল সিং-এর বৌ চালাকিশ্বরী বলেন —

'তমহা গরীপের দয়া মায়া দেখন নারে, হামাযে কেনং করি দিন কাটেচি, ঐডাত তমহা কি বুঝিবন। চলদি মহ তোর সগত গিরি ঘর যাম। পঞ্চম দৃশে চালাকিশ্বরী জোতদারের বাড়িতে এসে নমস্কার করেন ''গিরিদা, আর কি কোহাম, হামার অবস্থাত দেখায় পাতিত। আজি মড়লডা যায়া বাহেচার ধানলা মুই পিসাই ঘর তকা আনিনু। ঐলা ধান জোর করি লিয়া আসিল।

চালাকিশ্বরীকে দেখে জোতদারের মতলব তৈরী হয় — তাকে কীভাবে ফুসলিয়ে ঘরে আনা যায়। চালাকিশ্বরীর বুদ্ধি দেখে প্রশংসা করে তাঁর স্বামী দয়াল সিং। জোতদার মোড়লকে দিয়ে চালাকিশ্বরীর কাছে কু-প্রস্তাব দেয়। মোড়লের কথায় চালাকিশ্বরী রেগে বলেন — তমহার করজ খাচি বাদে কি তমহা যেই কভেন হামা সেইখানি লিমরে। তুই এলহায় নিকিলা। মোর মহল একা না হলে মুই তোক ঘাড় ধাক্কা দিয়া নিকিলায় দিম এলহায়। হারামজাদা লুচ্চা কুত্তেকার।''

মোড়ল অপমানিত হয়ে ফিরলে জোতদার চালাকিশ্বরীর পরিবারকে জব্দ করার 'ফন্দী আঁটেন। টাকা-পয়সা সহ গয়নার বাক্স দারাসিংকে দিয়ে চুপিসারে দয়াল সিং-এর বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন। দয়াল সিংকে চোর-অপবাদ দিয়ে চালাকিশ্বরীকে চরম শাস্তি দেবেন।

মোড়ল থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে বলেন জোতদারের বাড়ীতে চুরি হয়ে যাওয়ার কথা। দারোগাবাবুদের সঙ্গে জোতদারের সম্পর্ক ভালো। এই সংবাদে তিনি উদ্বিগ্ন। গ্রামের জোতদারদের সঙ্গে পুলিশ-প্রসাসনের সম্পর্ক ভালো। জোতদাররা পুলিশদের সঙ্গে স্বার্থ রক্ষার জন্য সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। এই নাটকে অন্তত, তা দেখানো হয়েছে।

দারোগা — কি চুরি। জোতদার বাবুর বাড়িতে। চলো চলো কনস্টেবল, ঘর বন্ধ করে আমার সঙ্গে চলো।

দারোগাবাবু জোতদারের বাড়ীতে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন — ''আচ্ছা, আচ্ছা তাহলে তো অনেক টাকার মাল নিয়ে গেছে। আচ্ছা জোতদারবাবু, আপনার কি কারো ওপরে সন্দেহ হয় ?

জোতদার — ''তাকে সেটা হচ্ছে আমারই এক প্রজা দয়াল সিং। আপনি এখনি যান হয়তো মালপত্র তার বাড়িতেই পেতে পারেন।''

লক্ষ করা যায়, দারোগাবাবু এবং জোতদারের সংলাপে চলতি বাংলা ভাষা। এই জোতদারই তাঁর গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন সেখানকার আঞ্চলিক ভাষায়। এই লোকনাটকে গীত আছে কিন্তু নাটকটি গীতাত্মক নয়। গদ্য সংলাপই এখানে মুখ্য। বিভিন্ন দৃশের ভাগ আছে। চরিত্রগুলির প্রবেশ প্রস্থান আছে। দোতরা, কুশান বা বিষহরি পালার মতো এই নাকি গীতাত্মক নয়।

বাড়িতে চালাকিশ্বরী এবং দয়াল সিং গয়নার বাক্স দেখেন। কোনো কিছু ধারণা করার আগেই দারোগা বাড়িতে হানা দেয়। জোর করে দয়াল সিংকে থানায় নিয়ে যান। চালাকিশ্বরীর বুঝতে দেরী হয়না — এই ঘটনার পেছনে কার ফন্দী। দুঃখে গান গেয়ে ওঠেন —

"ও কি ওরে প্রাণ সওয়ামী নিদয়া হয়া তুই যাবো।
ওরে সাধের আড়ি তুই মোক করিলো।
আজি যদি নারী হোম মুই সতী
তব পদে রাখিম ভকতি।
ঐ চরণে পাবো গতি।"

চালাকিশ্বরী স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেন — 'যা ভাই যা, মুই তামান বুঝা পাইচু, এইলা তামানলায় শয়তানের চক্রান্ত। মুই যে কুনো বারকারে হোক তোক তাড়াতাড়ি ছুটাই আনিবার ব্যবস্থা করিম। 'শাস্তরী' পালার 'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোসাই লোকনাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকা আমরা দেখেছি। যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজের মত স্থাপন করেছেন জ্ঞানবালা। 'লোভী জোতদার' লোকনাটকে চালাকিশ্বরীর বুদ্ধি ও সাহস লক্ষ করার মতো। জোতদারের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দেন এই গ্রামের নারীটি — 'হায় ভগবান, এইলা কি পাকত ফেলালো। ঠিক ছে রে জোতদার, তুই মোর পাছত লাগিচিস। মহ দেখিক তুই কতদূর।"

চালাকিশ্বরী জোতদারকে তাঁর বাড়িতে আসতে বলেন। জোতদারের মন গলানোর জন্য চালাকিশ্বরী গান করেন—

"গিরিদাদারেহে, শুনেক মোর মনের কাথা
হা ওরে তোর উপর বড়য় করিচু আশা।
নাহা হাতত নাই মোর হাতের চুড়িহি।
গলার মালা কানের সোনা।
আজি তুই বিনা মোর কায় আর আছেরে আপনজনা।

চালাকিশ্বরীর কথামতো জোতদার সবরকম গয়না দিতে সম্মত হন। চালাকিশ্বরীর পরিকল্পনা নিজস্ব। শক্ত সিং তাঁর ছেলে। ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে জোতদারের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। শক্ত সিংকে এই মিথ্যা অভিনয়

করতে হবে। এতে তারই বিয়ের ইচ্ছা পূরণ হবে। চালাকিশ্বরীর পরিকল্পনা ছেলে রাজী হয়ে যায়। নতুন বৌ সেজে শক্ত সিং কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। মোড়ল সোজা তাকে নিয়ে জোতদারের বাড়ীতে পৌঁছে যান। শক্ত সিং জোতদারের মেয়ে দুলালীর হাত দিয়ে সমস্ত সোনার অলংকার পড়িয়ে নেয়। অবশেষে জোতদার বুঝতে পারেন চালাকিশ্বরীর ছলনা জোতদার চীৎকার করে বলেন — কি বাউ, তুই যদি ভাল জানিস তে এহঠে তত করা চলিয়া যা না হলে মুই তক পুলিশের হাতত দিয়া দিম।'

শক্ত সিং — ''যাম যাম, মুইত রভার বাদে আসিনু, তবে মোর গালাত যায় মালাখান দিসে তাক মোর সঙ্গে দিয় দিলই মুই চলি যাসু।''

জোতদারের মেয়ে দুলালীকেই শক্ত সিং নিয়ে যেতে চায়। চরম অবস্থার মধ্যে পড়ে জোতদার পঞ্চায়েত প্রধানকে ডেকে আনেন। খাস পাঁচালী কারো কলংকের বিষয় নিয়েই রচিত হয়ে থাকে। যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। পঞ্চায়েত প্রধান এসে শক্ত সিং-এর কাছে সব ঘটনা শোনেন। তিনি দুলালীর সঙ্গে শক্ত সিং-এর বিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। চালাকিশ্বরীর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার উপদেশ দেন। এতে জোতদারের নোংরা পরিকল্পনার কথা অনেকটা চাপা পড়ে যাবে। বে-কায়দায় পড়ে জোতদার সবই মেনে নেন। শক্ত সিং-এর সঙ্গে দুলালীর বিয়ের দিন নির্দিষ্ট হয়। চালাকিশ্বরী বলেন — 'দেখিলো বাবু মুই কোহোনু না, মোর বুদ্ধি ধরলে তোক বহু বোসর দিম।'

শক্ত — হ্যা আঈ, ছাচায়, ঐতানে তোর নাম থুইচে তোর বাপটা চালাকি। তোর লাকা বেটি ছুয়া হোলেত কুন চিন্তায় নাই। চল আঈ, মড়ল কাকাড়া থানা যাবে হামাও যাই।'

মায়ে-ছেলে বেশ মজা করে এখানে অভিনয় করেন। শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চলের লোকভাষার ব্যবহার এখানে লক্ষিত। পুরো নাটকটিতে চালাকিশ্বরীর বুদ্ধির প্রকাশ। দয়াল সিংকে মোড়ল থানা থেকে নিয়ে আসেন। দয়াল সিং এখন জোতদারের বেয়াই মশায়। জোতদারের এই কলংক মেয়ে দুলালীর মনে কষ্ট দেয়। দুলালীও ভাবে নি এরকম ভাবে শক্ত সিংকে বিয়ে করতে হবে। আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান গায় —

বাবা এতয় দুঃখ দিলেনগে অন্তরে
হিবড় কেলেংকার রাখিলেন গে সংসারে।
বাবা লাইক্ষ লাইক্ষ জুড়ি মেলে
লাইক্ষর উপর পদীপ জ্বলে
বাবা গো, সুখ শান্তি মোর হোবে কুন্ কালে।'

জোতদার মেয়েকে সান্ত্বনা দেন। এবং বুঝিয়ে বলেন — 'তুই স্বামী পালো, শ্বশুর-শাশুড়ি পালো, তোর কিসের অসুবিধা মা, তুই এলা স্বামী-সংসার লিয়া সুখে খা।'

ঘরবাড়ী-সম্পত্তি মেয়ে-মেয়ে-জামাইকে দিয়ে জোতদার তীর্থ করতে বেরিয়ে যান। তিনি কলংক নিয়ে থাকতে চান না। জোতদারের মনের ব্যাথাই নাটকের শেষে বেশী করে ফোটে। মূল গায়কের কণ্ঠস্বরে গান শোনা যায়—

'মিলন হইলোরে শুন দশজন,
ওরে লোভের কারণে শাস্তি দিলোরে নারায়ণ।'

চরিত্রই জোতদারের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার জন্য জোতদার শাস্তি পেলেন। লোকনাটকটিতে নীতি শিক্ষার দিকটিকেও দেখানো হয়েছে।

# বিষহরা বা বিষহরি

বিষহরি পালা উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য। উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) আসামের নিম্ন অঞ্চল কাছাড় ত্রিপুরা ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলা এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে বিষহরা বা বিষহরি গান প্রচলিত আছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বিষহরি মনসার পূজার প্রচলন যথেষ্ট। কোনো উৎসবের পূর্বে বিশেষ করে বিয়ের উপলক্ষে মনসা পূজা করতেই হয়। এই উপলক্ষে বিষহরির গানের অনুষ্ঠানও করা হয়। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন ধরে এই গান চলে। কোনো কোনো সময় আবার মনস্কামনা পূরণের ইচ্ছা, বা পূরণ হবার ফলে বিষহরির পূজা করা হয়ে থাকে। এভাবে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজের সঙ্গে দেবী মনসার পূজার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হতে দেখা যায়। মনসা পূজার এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বলা যেতে পারে লোকসমাজের সঙ্গে মনসা দেবীর এই যোগ বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বিষহরি পালা গানের আগে মনসার পূজা করা হয়। যে বাড়িতে পূজা হয় তার মালিককে বলা হয় মারেয়া। যে মারেয়ার বাড়িতে এই পূজা হয় তার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে পূজা কীরকম হবে — কতদিন গান হবে। সামর্থ্য থাকলে মূর্তিপূজা এবং তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত গান হতে পারে — নতুবা শুধু ঘটপূজা করে একদিনেই জাগানি ভাসানি করা হয়। জাগানি ভাসানি কথার অর্থ জাগরণ এবং ভাসান বা বিসর্জন। গানের অনুষ্ঠানের পূর্বে মারেয়া মূল গীদালের সহযোগিতায় মনসার ঘটস্থাপন করে পূজা করেন। গানের অনুষ্ঠানের সময় এই ঘট বসানো থাকে। গানের মধ্য দিয়ে কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা প্রতিষ্ঠা হয়। চাঁদের বিরোধিতা বেহুলার স্বর্গে গিয়ে লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি কাহিনীর শেষে মনসার পূজার কথা আসে। পূজার সময় কলা, হাঁসের ডিম আতপ চাল উপচার হিসেবে দেওয়া হয়। তখন আবার মনসার পূজা করা হয়। মনসা পূজার সঙ্গে স্থানীয় নদীগুলিকেও পূজা করা হয়। নদীর পূজার সঙ্গে মনসা পূজার এই সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বল যায় না। মনে হয় এখানে মনসাকে নদীর দেবী বা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে অর্চনা করা হয়। প্রাচীন কালে জলের অধিষ্ঠাতারূপে নাগ পূজা প্রচলিত ছিল। সম্ভবত জলের অধিদেবতা রূপেই মথুরা অঞ্চলের দীঘি মধ্যে এইসব নাগমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হত। বিষহরি পূজার সঙ্গে নদীর পূজার এই রকম সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

নদ-নদীর বন্দনা অংশ —

যেমন — "মহানন্দা নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া
বালাসন নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া
ব্রহ্মপুত্র নদ বাপু পূজা নেও আসিয়া
করোতোরা নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া

যত নদীর নাম জানি বা না জানি
সহস্রকোটি নদী তোমরা বস সারি সারি।
থান হতে উঠে আয় থানের থানশ্রী
রাজ্য হতে চলে আয় রাজ্যের তিস্তা বুড়ি
ময়না বিষহরি মা তুই পূজা নেও আসিয়া
মায়েয়ায় পূজে তোমার একান্ত করিয়া

এই পালানাটকে অংগ্রহণকারী শিল্পীগণের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। মূল ধুতি-চাদর-শার্টের ব্যবহার করেন। গীদালের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রী যাঁরা থাকেন তাঁরাও পরিচ্ছন্ন সাধারণ পোষাক ব্যবহার করেন। গীদালের মুখোমুখি দোয়ার বা বৈরাগীর পোষাকও অতি সাধারণ। দোয়ারির পোষাক এমন হয় যাতে সহজে লোকের চোখে পড়ে। গীদালের হাতে থাকে চামর। দোয়ারের মুখে সামান্য মেক আপ থাকে। মেক-আপ বেশী মাত্রায় থাকবে নর্তকীদের সাজ-সজ্জায়। পুরুষরাই সাধারণত মেয়ে সাজে বলে যতরকম ভাবে মেয়ে ভাব ফুটিয়ে তোলা যায় সেই চেষ্টা করা হয়। এই নর্তকীদের সবাইকে যুবতীর উগ্র সাজে সজ্জিত হতে হয়। পরচুলা, মেক-আপের সাধারণ দ্রব্য, রঙীন শাড়ি, আলতা-লিপস্টিক, কাজল তাঁদেরকে প্রসাধনের জন্য ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে কোনো কোনো দলে মেয়েদেরও নর্তকীর ভূমিকায় পাওয়া যাচ্ছে। পূজা-পার্বণে বা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিষহরি পালাগানের দলও কোথাও কোথাও দেখা যায়। বর্তমানে বিষহরা পালাগানে আধুনিক যাত্রার প্রভাব আসার জন্য চরিত্রানুযায়ী সাজ-সজ্জা আবশ্যিক হয়ে উঠছে। এই পালানাটকগুলি সরকারী বা বেসরকারী অনুষ্ঠানের ফরমায়েশ মতো পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবু বলা প্রয়োজন প্রচলিত ধারা গ্রাম-জীবনে প্রবাহমান। সাধারণ বাঁশি সব নাটক-যাত্রা-পালাতেই চলে কিন্তু, 'মুখা বাঁশি' বিষহরি পালাগানে অপরিহার্য। এই মুখাবাঁশি' এই অঞ্চলেই তৈরী হয়। খোল, করতাল, মুখা বাঁশি — এই তিনটিই এই লোকনাট্যের প্রধান বাদ্য যন্ত্র। ড. সুখবিলাস বর্মার মতে — "এই গানে সর্পদেবী মনসার পূজার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিশেষ সহায়ক যন্ত্র মুখবাঁশি ব্যবহৃত হয়। মুখাবাঁশির মুখটা গোল বড় ধরনের। বাজানোর সময়ে সারা মুখ ভরে যায়। এর বাদনভঙ্গি এমন যে বাদক বাঁশিটি মুখে রেখেই মুখের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস (দম) ঘুরিয়ে নিতে পারে — ফলে বাদনকালে বাঁশির সুরে ছেদ পড়ে না। একজোড়া মুখবাঁশি এভাবে সাপ খেলানোর সুর সৃষ্টি করে।"[৩৮]

মুখাবাঁশিতে যে সুর সৃষ্টি হয় তাকে সুখবিলাসবাবু 'সাপখেলানো সুর' বলেছেন এই সাপখেলানো সুরই বিষহরি গানের মূল সুর। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এই সুরের অনুষঙ্গী। সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের সুরে একটা বিশেষ আবহ তৈরি হয়। যাতে পালা গানের বিষয় সম্বন্ধে অবহিত না হয়েও যে 'বিষহরি পালা' অভিনীত হচ্ছে তা কেবল এই সুর

থেকেই বোঝা যায়।

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের মূল শিল্পী গীদাল। যে কোনো লোকনাট্যেই তার ভূমিকা মুখ্য। তিনিই কাহিনী উপস্থাপনা করেন। কাহিনীর সংযোজনা করেন। চরিত্রগুলি কথা তিনি জুড়ে দেন। গানের সুরে প্রধানত তাঁর উপস্থাপনা চলে। তাঁর গানের মাঝে মাঝে পাই অন্যান্যদের সংলাপ। কিন্তু তাঁর গানে গল্পের ধারাবাহিক বিন্যাস থেকেই যায়। আমরা অন্য একটি লোকনাট্যের আলোচনাসূত্রে বলেছি গীদাল পালা সংযোজনা করেন গানে গানে - আর চরিত্রগুলি তাদের কথা বলে এর ফাঁকে ফাঁকে - গদ্য বা পদ্যে বা গানে। বিষহরি বা বিষহরাকেও সেই রীতি। বিষহরা পালা গানেও মঞ্চ সজ্জার কোনো পরিপাটি বন্দোবস্ত থাকে না। অন্যান্য নাট্যে মঞ্চ ব্যবস্থার মতো এখানেও একই ভাবে লোকনাট্যের মঞ্চ সজ্জা হয়। গীদালের সঙ্গে থাকে দোহার বাদক ও অভিনেতা রূপে পাঁচ ছয়জন সহযোগী। তাছাড়া নাচের জন্য পাঁচ ছয় জনের একটি দল থাকে। তারা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বা ঘুরে ঘুরে বাজনার তালে নাচগান করে। গীদালই পালার মূল গায়ক দোহার তার সঙ্গী বা অনুসরণকারী গীদালের হাতে থাকে চামর। এই পালানাটকের মঞ্চের চারদিকে থাকে দর্শকের আসন। গীদালই গান ধরেন। দোয়ারি তার গানের ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি চলে কথোপকথন। মাঝে মাঝে নাট্য প্রসঙ্গ বহির্ভুত বিষয় এনেও হাস্যরসের যোগান দেওয়া হয়।

এরপর আসে নেতা মনসার কথা সেও গানের রূপে

মনসার কথা — তবে কি বুদ্ধি করিব দিদি পাত্র নেতাই।
(গীদালের গানে) কেমনে বানিয়ার হস্তে ফুল জল পাই।।
ধনে জনে দৌদ্দ ডিংগা ডুবাইলাম সাগরে।
তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ পূজা নাহি করে।
মস্তক মুড়াইয়া সাধুর করিল'ম যন্ত্রণা।
তত্রাচ না পূজে সাধু কি করি মন্ত্রনা।।
ছয় পুত্র মারে সাধুর মূলে করিলাম হানি।
তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ না দেয় ফুল পানি।

এইভাবে পালার সূচনা। লক্ষণীয় পালা আরম্ভ হয়েছে চাঁদের মনসার পূজা না করার কথা দিয়ে। মনসামঙ্গলের মত এখানে প্রথম থেকেই মনসা ও চাঁদের বৃত্তান্ত দেখানো হচ্ছে না। কবি বা লোকগীতের রূপকার সারাকারি চাঁদ মনসার দ্বন্দ্বের কথা তুলেছেন। পদ্মাবতী নেতোর কাছে পরামর্শ চাইছেন কীভাবে চাঁদের পূজা তিনিনি পাবেন। লক্ষণীয় পদ্মাবতীর সংলাপ হচ্ছে গদ্যে —

পদ্মা ওগো দিদি আমি এই চম্পালা পুরীর চাঁদ বানিয়ার হস্তে কি বুদ্ধে পূজা পাব দিদি ?

নেতা উত্তর দিচ্ছেন পদ্যে বা গানে। এ গান গাইছেন মূল গীদাল

নেতা বলে পদ্মাপতি আমাক কর সুত।
অষ্টনা প্রহর তোকে জোগাইয়া দেহ বুধ।।
আমার বচনে পদ্মা শীঘ্র করে যাও।
ধনমতরি রূপে যাও চাম্পালানগর।।
উনিইন্দ্র ঊষা কন্যা আন ইন্দ্রের ঠাঁই।
সনকার গর্ভে দেও দুল্যপ লখাই।।
মেনকার গর্ভে দেও বেহুলা সুন্দরী।
তবে হলে সাধিবা বাদ শুন বিষহরি।।
নেতার বচনে পদ্মা সেই কর্ম করে।
ধনমতরি রূপে গেল চম্পালানগরে।।
পদ্মা নগরে গিয়ে নাগরিকদের বর দিতে চাইলেন
বরণেও হে নগরীয়া লোক বর নেওহে শুনি।
চাঁদের গৃহিনী সোন যেত আইল শুনি।।
(অনিরুদ্ধ লোক উচ্চারণে 'উনি ইন্দ্র')

সনকা জিগ্যেস করে এই দেব সেবিলে পার কোন বর দান ? ধন্বন্তরি রূপী পদ্মা উত্তর দেয়। আন্ধেলা পাবে আঁখি দান, হাপুত্রে পাবে পুত।' সনকা বর নেয়। ধন্বন্তরি বলে দেয় —

সনা পুত্র বর নেও
মনসা সুন্দরী আগে ফুলজল দাও
না করিবে মনসার পূজা মা তোমার স্বামী
মনের অভিমানে।
কিন্তু বিবাহ রাত্রিতে পুত্রকে তোমার রাখিবে সাবধানে।।

এইবাবে লক্ষ্মীন্দরের জন্ম কথা দিয়ে এই পালার শুরু হয়। সব সময় যে এই একই রকমভাবে পালা শুরু হবে তা নয়। কোচবিহারের অন্য একটি লোকনাট্য বিষহরি পালায় নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে অনেকটা dramatic effect তৈরির কথা মনে রেখে। সেখানে চাঁদের মুখে মনসার ক্ষতিকর ভূমিকার কথা বলে পালা শুরু করা হয়েছে।

শয়তানী পদ্মাবতী কত হানি করে।

ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙা ডুবাইছে সাগরে।।...

তখন পদ্মার দৈববানী

শোন শোনেক চাঁদ এলাও কং মোর পূজা কর।

ধনে জনে ভরিয়া উঠবে তোর সব ঘর।।

এইভাবে প্রথমেই মনসা ও চাঁদের দ্বন্দকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। আমাদের সংগৃহীত পালা অনেক বেশি সঙ্গীতাত্মক, নাটকীয়তা সৃষ্টি তাতে কম। কবিরা এতদঞ্চলে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যের লৌকিক রূপের গীতাত্মক উপস্থাপনা করেছেন। আমাদের সংগৃহীত পালার সনকা মনসার কাছে বর নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ওদিকে মনসা স্বর্গে গিয়ে ঊষা অনিরুদ্ধকে অভিশপ্ত করে মর্তে আনলেন। ইন্দ্র বলে,অবগতি কেন আইলি শীঘ্রগতি হেথায় তোমার কিবা প্রয়োজন (পদ্মা বলে) মর্তদেশে এক চাঁদ সদাগর আছে। তাহার হস্তে পূজার হইল সাধ উনিইন্দ্র ঊষা যাবে। পুত্রবধূ করাবে তারে। তবে আমি সাধিতে পারি বাদ।

মনসার কথায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন — তারা নাই করে দোষ

কেমনে করিব রোষ

কেমনে পাঠাব মর্তাভুবন ?

তবু ইন্দ্রকে ছেড়ে দিতে হয়। ঊষা অনিরুদ্ধকে মনসা অভিশপ্ত করে আনেন। লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার জন্ম হয়। এই গানে মূল গীদাল প্রায় একক ভূমিকায় কাহিনীর গীতাত্মক উপস্থাপনা করে যান।

এইভাবে মনসা মঙ্গলের কাহিনীর আদলে বিষহরা পালায় একের পর এক ঘটনার উপস্থাপনা হয়। লক্ষ্মীন্দরের বয়স হল, কিন্তু বিয়ে হল না। মনসা কৌশল্যার মূর্তি ধরে লক্ষ্মীন্দরকে স্বপ্ন দেখায় - স্বপ্নে বালার সঙ্গে রতি করে মহারঙ্গে। কৌশল্যা লক্ষ্মীন্দরের মামি, মনসার ছলনায় তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের ফলে কৌশল্যা অভিশাপ দেয় —

অব মররে নিবংশের বেটা,

কন্ধ তোর যাক কাটা। দংশিবে তোক পদ্মার নাগিনী।

পদ্য গীত ময় সংলাপের মধ্য দিয়ে অভিযোগ করে কৌশল্যা

ওকি ওগে ননদদিদিবাই, কুলগেল ভাগিনার হাতে

হে মোর দিদি গেলাম আমি ভাই সরোবরে

কলস ভাঙিল বলে উদর ভাই করিল লণ্ডভণ্ড ...

সনকা চাঁদের কাছে গিয়ে সব জানায় —

স্বামীর আগে বলে বিবরণ কথা
শুনিয়া চাম্পলার পতি হেঁট করে মাথা।

এরপর কন্যা সন্ধান — লক্ষ্মীন্দরের বিবাহে যাত্রার আগে সনকার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা, সনকার খেদ "তুই মোর বিবাহে না যাইও বাচ্চারে।" লক্ষ্মীন্দর যুক্তি দেয়

আগে মরণ পিছে মরণ মরণ একবার।
জন্মিয়া যমের ধার নাগে সুজিবার।

লোক জীবনে মৃত্যুকে সহজ করে নেবার শক্তি এই উক্তিতে সঞ্চারিত হয়ে আছে।

চাঁদ এবার পাইকদের যাত্রা করতে বলে —

চাঁদ বলে পাইকগণ নেও গুয়া পান।
বরকে রাখিতে তোরা হও সাবধান।। ...
এক বস্ত্র পরিধান পর সর্বপরি।
চিনিতে না পারে যেন (জয়) বিষহরি।

পাইকগণ তখন 'ডম্ফ' করে — 'আমরা থাকিতে মশাই কী করিতে পারে' পাইকদের ভয়ে গ্রামবাসীদের ত্রাস্ত অবস্থার চিত্র দিয়ে স্থূল পরিহাস করবার চেষ্টা হয়েছে। সঙ্গে আছে নারীদের সম্বন্ধে কিছু কৌতুক —

ভাট পালায়, ভাটিয়া পালায়, চণ্ডাল পালায় হাড়ি।
ঘরের ভিতর যুক্তি করে গাড়ুর গাড়ুর আড়ি।।
এক আড়ি বলে তোমরা পালাও কিসের ডরে
বিবাহে যায় সাধু উজানি নগরে।
যেইনা পাইক নিয়ে যাবে তার সঙ্গে যা।।
আন্ধিয়া বাড়িয়া পাইকের বুকে বসে খাব।

জোলা জোলাবৌকে নিয়ে কিছু গ্রাম্য রঙ্গ করা হয়েছে। এরপর পদ্মাবতীর কথায় কালীয় নাগ লক্ষ্মীন্দরের মাথায় বিষনিঃশ্বাস ফেলে। তাতে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হয়। চাঁদের চরিত্র এখানে মঙ্গলকাব্যের ভাষায় বর্ণিত দৃঢ়তা পেয়েছে।

শিবের ভরসা করি না পূজিলাম বিষহরি সেও শিব মোর নাধরে কাণ্ডার

যে পুত্র মরিয়া গেইচে তারে কিবা দয়া।
বাহির কর মরা পুত্র নিদারুণ হয়া।।

চাঁদ চরিত্রের দৃঢ়তা লোকনাট্যের রূপেও পরিস্ফুট হয়েছে। একদিকে আছে শিবের কৃপা না পাওয়ায় চন্দ্রধরের খেদ আর অন্যদিকে বিষহরির দংশিত পুত্রকে সব দুঃখ সহ্য করেও সৎকার করার জন্য বের করে দেওয়ার কথা। মনসা মঙ্গল কাব্যগুলিতে কাহিনীর এই গঠন পাওয়া যায়। বেহুলার ভক্তিতে পদ্মা সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে দেয়। সেখানকার বর্ণনা বিষহরি পালায় সংক্ষিপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যে বিস্তৃত।

ওগো শ্বশুর অপেক্ষা কর বেলা দুই প্রহর।
কালীদহে সেবিয়ার জিয়াবো নন্দন তোমারর।

কালীহে বেহুলা মনসার পূজা করে। পূজার আচার মনসামঙ্গলের অনুরূপ

বালী দশ আঙ্গুল দিয়া সলিতা জ্বালায়।
কেশ কাটিয়া বালী চামর ঢুলায়।
বালী বুক কাটিয়া এচান্নি সাজায়।
কাঠারীখান ধরে বালী যেন খুরের ধার।
গলাতে কাঠারী দিয়া চাহে মরিবার।

পদ্মা বেহুলা বালীকে বর দিলেন, তার শরীর সুস্থ করে দিলেন। বিয়ে হল। বিবাহে স্বজনবর্গের নানা দানের কথা লোক কবির বর্ণনায় উঠে এসেছে। বালার সঙ্গে শালাবৌদের রঙ্গ তামাসার কথাও আছে। এরপর বরবধূর বিদায়, সনকার বধূবরণ। বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের বাসর যাপন। বাসর ঘিরে পাহারা। এর মাঝে সনকা লক্ষ্মীন্দরকে জিগ্যেস করে — "ওরে বাবা লক্ষ্মীন্দর শ্বশুর বাড়িতে কী কী দান পাইয়াছ ?"

লক্ষ্মীন্দর বলে — ভূমিদান পাইয়াছি মাতা গো লখিয়ার কান্দর।
তার সঙ্গে পাইয়াছি মাতা বেহুলা সুন্দর।।
আর অনেক দান পেয়েছি মাতা লেখা জখানাই।
দুধ খাইতে পেয়েছি মাতা সবন্ধের গাই।

এই অংশটি সমাজের সাধারণ কৌতুক লিপ্ত মনস্তত্বের পরিচায়ক বলে গুরুত্বপূর্ণ। যৌতুক সম্বন্ধে বাঙালী ঘরের কৌতূহল এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। যৌতুক দান সম্বন্ধে কবিও ভূমিও গোদানের উপরে উঠতে পারেননি। নিজের পারিপার্শ্ব সম্বন্ধে, তাঁর সমাজপট সম্বন্ধে কবির যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাই এখানে কাজ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে লক্ষ্মীন্দর বেহুলার প্রথম রাত্রির বিবাহিত জীবনের কিছু বর্ণনা আছে। কেতকাদাসে বরবধূতে পাশা খেলার কথা পাই। লক্ষ্মীন্দর সেখানে পরাজিত হয়। বিজয়গুপ্তে পাশাখেলার কথা নেই কিন্তু লক্ষ্মীন্দরের রতি-বাসনা আছে। বিষহরা পালা পাশার খেলার উদ্দিষ্ট রতিবাসনা। লক্ষ্মীন্দর বলেছে —

আমি হারিলে দিব তোমায় অষ্ট অলংকার।
তুমি হারিলে দিবে আমায় সুরতি শৃঙ্গার।।

এরপর লক্ষ্মীন্দর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। বিবাহ রাত্রিতে বেহুলা রন্ধন করেছে। রন্ধনের বর্ণনা প্রথানুগত এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, কিন্তু লোকজীবনের পরিচয় হিসেবে মূল্যবান।

প্রথমতে আন্ধে বালী সাক সুগবরা ভাজা।
চুচুরা মৎস আন্ধে বালী দিয়া বাঁশের গাজা।।
রহুন আন্ধে সুন্দরী রন্ধনের জানে ভাও।
ঘৃততে ভাজিয়া তুলে কৌতরের ছাও।
রহুন আন্ধে সুন্দরী তার কানের নড়ে সনা।
তৈলতে ভাজিয়া তুলে শোল মাছের পহনা।।
নদীর খাটিয়া মৎস্য বেছে হালী হালী।
ডক দিয়া আন্ধে বালী কয়া শের জালী।।
বয়ালী মৎস্য আন্ধে তার নিকীলায় কোল।
অধ্যেক করে খাটা আম্বোল অধ্যেক করে ঝোল।।
বনীয়ার বৌ বানীয়ার বৌ রন্ধন ভাল জানে।
চেং মাছ পুরিয়া থালী জামুরী দিয়া সানে।।
রহুন আন্ধে সুন্দরী তার পিষ্টে পরে ছাই।
তাক দেখে হাস্য করে দুল্লব নখাই।
এক ভাত পঞ্চাশ বেঞ্জন করিলে রন্ধন।
নিদ্রাতে পড়িল বনিকের নন্দন।

লক্ষ্মীন্দর বাসর ঘরে ঘুমিয়ে পড়লে পদ্মা সর্প-দংশন করানোর জন্য সাপদের ডাকছেন। ডারাইশ, ধামাইয়া, ঘেউটিয়া, ঢোঁড়া, নাগিনী — এই সকল সাপ কার কতটা বিষ আছে পদ্মাকে জানাচ্ছে। লৌকিক নামে এই সাপগুলির পরিচয়। নাগিনীর দংশনে লক্ষ্মীন্দর মৃত্যুকোলে ঢলে পড়তে পড়তে গীত গেয়ে বলে —

'ও সুন্দরী তোর বাপের বাড়ি গেনু, বাটিভরা মুই দান পানু, ও কি সুন্দরী তাতে আসিল ভাই আগুন চেওয়ারী।' লক্ষ্মীন্দরের ধারণা উপহার সামগ্রীর ভেতরে কোনো বিষাক্ত বিছা লুকিয়েছিল। তার কথার মধ্যে শ্বশুর বাড়ীর প্রতি একটা খোঁটা দেওয়া থাকে। বেহুলা ঘুম থেকে উঠে 'পাটের মোড়া' ঝেড়ে ফেলতেই দংশনকারী নাগিনীকে

পানের 'সপুরা'-তে আটকে ফেলে। লক্ষ্মীন্দবের বাসরঘরে হঠাৎ করে পাটের গাট এসে গেল। কৃষকের ঘরে একটা সময় মজুত থাকে এবং সেখানে সাপও লুকিয়ে থাকে। এই চিত্রটিই এখানে উদ্ভাসিত। পুত্রের মৃত্যুশোকে চাঁদ ও সনেকা অস্থির হয়ে পড়েন। বেহুলাকে ঘন ঘন দোষ দিতে থাকলে বেহুলা শুনিয়ে দেয় —

আর আজি পুত্র মরিল বাবা আমার কুলক্ষণে।
অগ্রে তোমার ছয় পুত্র মরিল কেমনে।

চাঁদের নির্দেশে ওঝা শত চেষ্টা করেও ঔষধ এনে লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচাতে পারে না। পদ্মার চক্রান্তের কাছে হেরে যায়। ক্ষোভে চাঁদ বলেন—

— আরে লেংগা শিবের ভরসা করি।
না পূজিলাম বিষহরি।
সেও শিব ভাই না ধরে কাণ্ডার।
ওরে লেংগা শুন মোরে ভাই।
নেহ মরাপুত্র চল গড়গড়িয়া যাই।
যে পুত্র মরিছে ভাই তারে কি বা দয়া।
বাহির কর মরাপুত্র নিদারুণ হয়া।
গড়গড়িয়া ঘাটে গিয়া অনলে পোড়াই।
পদ্মাবতীর মুখে দেব মাটি আর ছাই।

পদ্মার প্রতি আক্রোশ চাঁদের আরো বেড়ে যায়। সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য পদ্মার মুখে মাটি আর ছাই দিতে চায়। দুঃখে ভেঙ্গে পড়া চাঁদের ব্যক্তিত্ব আরো প্রখর হয়ে ওঠে। বেহুলা শ্বশুর বাপকে অনুরোধ করে। কলাবাগান থেকে কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে দিক সে মৃত লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে ভেসে যাবে। এই অনুরোধে চাঁদ জানান—

আমি বধূ মা তোকে কেলা দিব না।
কেলা বেচাম আনা আনা মচকা দেড় বুড়ি।
তাক খায়া বাচিম হামরা দুই বুড়াবুড়ি।
বুড়া হমো বৃদ্ধ হমো লবণ কোথায় পামো।
পুড়িয়া কেলার মুড়া তাকে খার খামো।

লোকনাটকের এই মুহূর্তে চাঁদ আর সদাগর চাঁদ নন। হয়ে ওঠেন একজন অভাবী কৃষক। চাঁদের ভূমিকায় গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষটির মনে সম্পদ-অপচয়ের আতংক প্রকাশ পেয়েছে। কলা বিক্রী করে জীবন-যাপন এবং

কলাগাছ পুড়ে লবণের বিকল্প 'ক্ষার' তৈরী করবে চাঁদ আর চাঁদের স্ত্রী। পুত্রের বিয়োগ-ব্যাথা অদৃশ্য হয়ে গেছে। লোকনাটকের অভিনেতাদের জীবন-যাপনের ধরণও ফুটে ওঠে। অথচ কাহিনীর গতির মধ্যেও কোনো অসংগতি ধরা পড়ে না। শ্রোতা ও অভিনেতাদের মধ্যে কোনো রকম বিচ্ছিন্নতা থাকে না বলে হয়তো এরকমটা সম্ভব। জ্ঞাতিরা সচেতন করলে পুনরায় চাঁদ ফিরেআসেন নিজের চরিত্রে। নদীতে ভেসে যাওয়ার জন্য বাগান থেকে কলাগাছ কেটে 'ভুরা' তৈরীর আদেশ দেয়। মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা নদীতে ভাসে। মূল গায়ক বলছেন —

রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর।
টলমল করে ভুরা জলের উপর।

দেবপুরীর যাত্রাপথে বেহুলার নানা বিপদ। পদে পদে পদ্মার নানা ছলনা। 'আলসিয়া নগরে' গোদার বাড়ি। নদীতে মাছ ধরতে ধরতে গোদা দেখে ফেলে বেহুলা সুন্দরীকে —

ও কন্যা কার বা ঘরের বিদ্যাধরী, জলে ভাস একেশ্বরী।
কন্যা প্রাণে কি তোর নাই কোন ভয়।

বেহুলার গীত —

'ও গোদা খাটে বসে মৎস মার
কেন গোদা ডাক পার হে
ও গোদা আমি নারী ভাই বড় অভাগিনী।
ও গোদা পূর্ব জনমের ফলে,
স্বামীকে খেয়াছে সাপ
মৃত লইয়া ভাই জল মধ্যে ভাসি।
ও গোদা কে আছে মোর এমন জন,
জিয়া দিবে মোর স্বামী ধন,
তারে আমি ভাই হব দাসের দাসী।

মৃতকে বাচানো জানায় না। এই সহজ-সত্যটি গোদা জানে। তাই সহজে বলে —

ও কন্যা কর পচা পরিহর
কাস্তুরী চন্দন পর। মৃত্যুকে ফেলিয়ে চল ঘর।

পতিব্রতা বেহুলা গোদার মনের ইচ্ছাকে বুঝতে পেরে দ্রুত তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা আঁটে। গোদাকে বাড়িতে যেতে বলে। তার দুই বউকে ঘর থেকে বের করে দিতে হবে। মূল গায়ক বলে ওঠেন—

তরাসে পালাইয়া যায়

কানী আর খুঁড়ী

পাছা বেড়া ভাঙ্গিয়া পালায়

গোদার মাও বুড়ি

দুই মাগ্যক বলে তোরা অন্য দেশে যাও

দুই পুত্র লয়ে তোরা ভিক্ষা করে খাও।

সুন্দরী রমণীর প্রত্যাশায় গোদা ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে দেয়। বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী দু'জনকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। নদীতে ছুটে এসে দেখে বেহুলা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সাঁতার দিয়ে ভেলা আটকিয়ে দেয়। বেহুলার কাতর প্রার্থনায় পদ্মা গোদার 'ঠ্যাং' টেনে ধরে। গোদা জলে হাবু ডাবু খেতে থাকে। গ্রামীণ কবি বা রচয়িতা অল্প কয়েকটি কথায় তা সুন্দর করে তুলেছে।

মূল গায়কের কথা —

তখন বালির মিনতি পদ্মা জানিল অন্তরে।

সেইখানে পদ্মাবতী কোন কর্ম করে।

ঠ্যাং ধরি গোদার তখন মারিলেন পাক।

উবু ডুবু করে গোদা ঢোকে পানী খায়।

হলদিয়া বেঙের মত চোখ দুইটা হয়।

গোদের চোখের দৃশ্য এবং অবস্থা দেখে বেহুলার কিছু কষ্ট হয়। বলে —

'গোদা তুমি ফিরিয়া যাও ঘর।

পাইবে অমূল্য নিধি সতী কন্যার বর।

আহত যোদ্ধার মত গোদা নদী তীরে দাঁড়িয়ে থাকে। বেহুলা ভেলা ভাসিয়ে চলে। সাধারণত, বিষহরি পালায় গোদার ভূমিকা দোয়ারী করে থাকে। দোয়ারী অভিনয় পটু। এই দৃশ্যে এসে একেবারে সাধারণ মানুষের আশাহত বেদনা নিয়ে দোয়ারী গোদার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

নদীপথে বেহুলার একের পর এক বিপদ আসে। শঙ্খ সাধু বানিজ্য করে নিজ রাজ্যে ফিরছেন। পরনারীর এই দুর্গতি দেখে তিনিও তাকে বিয়ে করতে চান। বেহুলার বুদ্ধিমত্তাতেই জানা যায় তারা পরস্পর ভাই-বোন। মৃত স্বামীকে বেহুলা বাঁচিয়ে তুলবে। তাকে এই প্রতিজ্ঞা থেকে শঙ্খ সাধু ফেরাতে পারেন না। বেহুলার প্রতি এরকম আচরণ করাতে শঙ্খ-সাধুর মনে পাপ-বোধ জেগে। এই পাপবোধ থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান।

শঙ্ক — ওরে বোন তুমি যা বললে আমি তাই করব। কিন্তু আমি যে নিজের ভাই হয়ে তোকে নিতে চাইলাম। এতে যে আমার বিরাট পাপ হইল। ইহার জন্য আমি এখন এ প্রাণ ত্যাগ করব বোন।'

শঙ্খ সাধুর চরিত্রে একজন অভিনেতা গদ্য-সংলাপে এ কথাগুলি বলেন। এর উত্তরে বেহুলা পদ্য-সংলাপে বলে—

দাদা ইহার জন্য দাদা না কর মনস্তাপ।
তুমি কি জান না দাদা যার যত পাপ।
তবে শুন দাদা, উঁচু জাগা সরবর নীচু জাগা পানী।
ব্রাহ্মণকে করিবে দান উত্তম দুধালী।
কুঘাটে ডুবিয়া দাদা সুঘাটে উঠিবে।
ভাইবোনের পাপ দাদা সেইখানে ভঞ্জিবে।

এই ঘটনার জন্য বেহুলারও অনুশোচনা হয়। তাই এটিকে ভাই-বোনের পাপ বলেছে। দাদাকে যা পরামর্শ দেয় তা প্রবাদে পরিণত — 'কু ঘাটে ডুবিয়া সুঘাটে উঠিবে।'

ত্রিপানী নদীর সম্মুখে ভেলা ভাসে। তিনদিকে সেই নদীর স্রোতের ধারা। দেবপুরীর পথ সংকুল হয়ে ওঠে বেহুলার। ছদ্মবেশী পদ্মার সাহায্যে বেহুলা বিপদমুক্ত হয়ে। নদীর তীরে নেতা ধোপানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। নেতা ধোপানীর মুখের কথায় দেবপুরের কোনো ভাষার চিহ্ন নেই। গ্রামের খেটে খাওয়া মহিলার মুখের ভাষা।

নেতা — সাত জন্মেও নাই মোর বোহিনির ছাও।
আর তুই কহেচিত মোক মাসি মাও।
তোক দেখছ মুই মানুষের বেটি
কেমনে আইলে তুমি দেবতার পুরী।

নেতাকে সাহায্য করে বেহুলা তার মন জয় করে। নৃত্য পটিয়সী বেহুলা নেতার সঙ্গে দেবপুরে যায়। শিব এবং ইন্দ্র তার নৃত্য দেখে মুগ্ধ। স্বয়ং শিব তাকে নিয়ে ময়নানগরে চলে যেতে চান। বেহুলার প্রার্থনায় ইন্দ্র শিবকে বলেন — "ওগো মহেশ্বর করি জোড় হাত। নটিনী হরিলে তোমার হবে সর্বনাশ"। বেহুলার প্রতি শিব সদয় হন। বেহুলার স্বামীর মৃত্যুর কারণ জানতে পারেন। তাই পদ্মাকে বলেন —

"বল পদ্মা তুমি বেহুলার স্বামীর প্রাণ নিয়েছ ?

পদ্মা — হ্যা পিতো, এটা আমার বিবাদিয়া মৃত্যু। তুমি সব জানো পিতো।

শিব — না পদ্মা যতই তোমার বিবাদিয়া থাক না কেন বেহুলার স্বামীকে ফিরে দিতে হবে।

পদ্মা — ওগো পিতা সত্য করুক বেহুলা দেবগণের আগে দেয়াইব ফুলজল শ্বশুরের হাতে।''

পদ্মার উক্তিতে 'বিবাদিয়া মৃত্যু'র কথা শোনা যায়। অনেক ঝামেলা-নির্ভর বিষয়কে 'বিবাদিয়া' একটি শব্দের মধ্যেই লোককবি দেখিয়েছেন। কাহিনীকে মূলগায়ক 'বলানি'র মধ্য দিয়ে আরো অনেক দূর নিয়ে যান। বেহুলা দেবতাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করে —

''যাবত পূজা না করিবে শ্বশুর সদাগর।
তাবৎ ফিরিয়া না যাইব ঘর।''

পদ্মা খুশী হয়ে ধনন্বতরী সেজে মৃত লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে তোলেন। গ্রামের ওঝাদের ঝারণ-প্রক্রিয়ার দৃশ্য এখানে ভেসে ওঠে। বেহুলা সুযোগ বুঝে পদ্মাবতীকে দিয়ে মৃত ছয় ভাশুরকে জীবিত করে নেয়। শ্বশুরের ধনজন চৌদ্দ ডিঙ্গা সব ফিরে দেবার ব্যবস্থা করেন পদ্মা।

বেহুলা — ওগো মা পদ্মাবতী আমার শ্বশুরের ধনজন চৌদ্দডিঙ্গা তুলে দাও।

পদ্মা — হ্যা মা বেহুলা, আমি তাই করব মা।

মূল গায়ক গীতে বর্ণনা দেন কীভাবে দৈত্য জলে ডুবে ডিঙ্গা তোলে। মধুকর, হাজারী, হেকা, হিরা, হুরা বিভিন্ন নামের ডিঙ্গা জলের উপরে ভেসে ওঠে। বেহুলা দেব-দেবীদের প্রণাম করে মধুকর ডিঙ্গায় ওঠে লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে চম্পকনগরের দিকে যাত্রা করে।

নদীর তীরে — তখন চাঁদের ঘরের নারীগণ ঘাটে ভরে পানি। ছয় ভাইএর নৌকা দেখি করে ঠারাঠারি
জল ভরিয়া নারীগণ করিল গমন। আপনার গৃহে যারা দিল দরশন। শুন শুন শ্বশুর বাপ বলি তোর ঠাঁই। ঘাটেতে আইসাছে তোমার দুর্লভ লখাই। তখন হস্তে লাঠি লইয়া সাধু করিল গমন। আপনার ঘাটে যাইয়া দিল দরশন।

চাঁদ উল্লাসে ভেঙ্গে বলেন — চল চল পুত্রবধূ চল যাই বাড়ি। দেখুক স্বামীর মুখ ছয় বধূ আড়ি।

বেহুলা চাঁদকে বলে ওঠে — শুন শুন শ্বশুর বাপ কথা শুন মোরে। দিতে হবে ফুল জল পদ্মার গোচরে।

চাঁদের হাট বসেছে চাঁদসদাগরের বাড়ীতে। বেহুলার সব কথায় রাজী হয়ে যান — হ্যা, মা বেহুলা, সত্য করিলাম তোমার সাক্ষাতে দেওয়াইবো ফুলজল পদ্মার গোচরে।'

কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ তাঁর জেদ রেখেই দেন —

'কিন্তু যে হস্তে পূজা করি দেব শূলপানি। সেই হস্তে না পূজিব কানি বিষহরি।

তাতে কি তুমি হবে রাজি ?''

এর উত্তর বেহুলাকে দিতে হয় না। পদ্মাদেবী নিজেই চাঁদের সম্মুখে আসেন। খুশীতে বলেন —

''হ্যা, দাদা আমি তাতে রাজি।''

লক্ষণীয়, পদ্মা এখানে চাঁদকে দাদা বলে সম্বোধন করছেন চাঁদের পৌরুষের কাছে পদ্মা অনেক ম্লান। তাতে পদ্মাবতীর কোনো দুঃখ নেই। প্রভাবশালী চাঁদের বাম হাতের পূজোতেই পদ্মাবতী খুশী। পালানাটকের কাহিনীর শেষে মূল গীদাল পদ্মার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকেন। করেন গৃহস্থের মঙ্গল কামনা। মূল গীদাল পদ্মার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে গানের মাধ্যমে বিদায় দেন। শেষে সমগ্র আসরে পদ্মার আবির্ভাবের একটি ভ'ব জেগে ওঠে। এভাবেই বিষহরি পালানাটকের অভিনয় শেষ হয়

## '' 'নটুয়া' — বিরোগের গান''

উত্তরবাংলার তরাই অঞ্চলে রাধার বিরহ নিয়ে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে সৃষ্টি 'নটুয়া'। এই অঞ্চলে 'নটুয়া' 'বিরোগের গান' রূপে প্রচলিত। রাধা-কৃষ্ণ সংক্রান্ত লোকনাটকে মঞ্চে রাধা ও কৃষ্ণের উপস্থিতি দেখা যায়। 'নটুয়া' পালা যেহেতু রাধার বিরহের গান তাই এ নাটকে কৃষ্ণের শরীরী উপস্থিতি নেই। কৃষ্ণ-বিরহের আর্তি এই লোকনাটকের মুখ্য বিষয়। এখানে অনুপস্থিত কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধার হৃদয় বেদনার প্রকাশ ঘটে।

দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে, শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চল যথাক্রমে মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ী ও খড়িবাড়ী এলাকায় নটুয়ার প্রচলন দেখা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে পুরনো বৈকুণ্ঠপুর এলাকার রাজগঞ্জ, একটিয়াশাল ও ডাবগ্রাম অঞ্চলেও 'নটুয়া' পালাগান পরিচিত। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশ রামগঞ্জ, চোপড়া ও ইসলামপুরের গ্রামাঞ্চলে এর প্রচলন আছে। বিহারের উত্তর প্রান্তে ঠাকুরগঞ্জ, কিষানগঞ্জ ও চুল্লী অঞ্চলের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় 'নটুয়া'র প্রচলন দেখা যায়। ড. শিশিরকুমার মজুমদার তাঁর উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য গ্রন্থে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ হেমতাবাদ কালিয়াগঞ্জ অঞ্চলে নটুয়ার প্রচলনের কথা বলেছেন। জলপাইগুড়িরর নটুয়ার সঙ্গে রায়গঞ্জ অঞ্চলের নটুয়ার পার্থক্যের কথা বলেছেন। স্থানের দিক থেকে বিহার সন্নিহিত উত্তরবঙ্গে নটুয়ার প্রচলনের কারণে একে কেউ কেউ বিহারের প্রভাবজাত বলে মনে করেন।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত-এর একাদশ অধ্যায়ের 'বিচিত্র' পর্বে নটুয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তিনি নটুয়াকে ব্যাতিক্রম-ধর্মী পালাগান বলেছেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে 'কালী' বন্দনার কারণ তিনি বুঝতে পারেননি। উল্লেখ্য রাধা বিরহের এই পালার বন্দনাংশে কালীর বন্দনা করা হয়। উধব ও মাধবের ভূমিকাও এখানে অন্যান্য লোকনাটকের থেকে আলাদা।

নটুয়া গানের দুটি ধারা। একটি বিরহ আর একটি কুঞ্জ। এখানে 'বিরহ' কথার প্রচলন নেই। বিরহকে 'বিরোগ' বলা হয়। 'নটুয়া' বিরহের গান। রাধিকার বিয়োগ ব্যথাই নটুয়ার মূল উপজীব্য। এই ধারাটিই প্রচলিত। 'কুঞ্জ' পর্যায়ের ধারাটি একেবার বিলুপ্ত। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লালদাস মৌজায় বিচ্ছিন্নভাবে এর সামান্য নিদর্শন পাওয়া যায়। 'কুঞ্জ' পর্যায়ের পালাগানে রাধিকার 'কুঞ্জ' নির্মাণ এবং গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করার কথা গানে ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণের উপস্থিতি এবং তার সঙ্গে রাধিকার লীলার কথা 'কুঞ্জ' পর্যায়ে পাওয়া যায়। এই ধারার পালাগানটি কেন বিলুপ্ত হলো অবশ্যই তা অনুসন্ধানযোগ্য। কিন্তু 'নটুয়া-বিরহ'-এর পালাগানটি অভিনীত হচ্ছে।

'কুঞ্জ' পর্যায়ের গানে হাস্য, মাধুর্য উচ্ছলতা সবই ছিল। নটুয়াতে রয়েছে শুধুই বিয়োগ ব্যথা। সেই বেদনা নিয়েই এ গানের শুরু, বেদনাতেই এ গানের শেষ।

'নটুয়া'-র শব্দার্থ নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর গ্রন্থে নটুয়া-র অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের ৩৫৭ সংখ্যক গানের এক জায়গায় আছে —

'চ্যাং মাছ নটুয়া ভাইরে
ভালো নাচন জানে
সব মাছে যুক্তি করি
চ্যাংয়ের নাচন দ্যাখে।'[৩৯]

এই অংশের মধ্যে 'নটুয়া' শব্দটি নাচের অর্থকে ব্যঞ্জিত করছে। নৃত্য বা অভিনয় বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির অর্থ নটুয়া শব্দে প্রকাশ পায়। নটুয়ার প্রচলিত অর্থ নট কিংবা নর্তক। সেদিক থেকেও 'নটুয়া' নামের তাৎপর্যে থাকতে পারে নৃত্যগীতময় কোন উপস্থাপনা। নির্মলেন্দুবাবু নটুয়া গানকে বিহারের লোকসঙ্গীত বলতে চান। এমনটা অসম্ভব নাও হতে পারে। 'নট্ট' শব্দটি বিহারী হিন্দি উচ্চারণে এমনটা হতে পারে। তা থেকে বাংলায় 'নটুয়া' এসে থাকতে পারে। ডঃ গিরিজাশংকর রায় মনে করেন 'নটবর' শব্দ থেকেও নটুয়া আসতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম নটবর। কিন্তু এই 'নটবর' শব্দটি নটুয়া পালাগানে কোথাও চোখে পড়ে না। তাছাড়া নটবর শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তনে নটুয়া হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব রাঙ্গাপানির বনিজোত গ্রামের বসিন্দা বালিমোহন সিংহ 'নটুয়া' গান করেন। তিনি পাশাপাশি বিষহরা বা মনসা পূজারও গানও করেন। বিষহরা গান তাঁর কণ্ঠস্থ। এই শিল্পী বলেন শ্রী রাধিকা নাচে, কান্দে, নট করে সেইজন্যে আমরা একে নটুয়া বলি। নট করা শব্দের অর্থ নাটকীয় আচরণ করা।

তিনি বিষহরা গান থেকে একটি পদ উল্লেখ করেন —

নট করে নটুয়া গাইন করে গীত
মেন্ড ঘরে বালা-বালী হইলো উপনীত।

এই অঞ্চলের বিষহরা গানের পদের মধ্যে এইভাবে নটুয়া কথাটির প্রয়োগ পাওয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে বাক্যহীনা হয়ে নৃত্যের দ্বারা নিজের বেদনাকে প্রকাশ করেন। এজন্য এই পালা 'নটুয়া' রূপে পরিচিত। কিন্তু এতেও নটুয়া কথার অর্থ এতেও স্পষ্ট হল না। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলে যে লেটোর গান প্রচলিত আছে তার মূলে নাটুয়া কথাটি ছিল। নাটুয়া নেটো লেটো — এইভাবে তার ধ্বনিগত রূপান্তর হয়েছে। সুকুমার সেন তাঁর 'নট নাট্য নাটক' বইতে প্রাচীনতর নাটুয়া নৃত্যের কথা বলেছেন[৪০]। নাটুয়া নৃত্য বলতে তিনি গীতিনাট্য

কথাটি বুঝেছেন। আর নাটুয়া কৃত্য কথা থেকে নেটো লেটো নামক এক শ্রেণীর লোকনাট্যের কথা বলেছেন। "নাটুয়া কাচ হল নেটো — এই তাঁর অভিমত[৪১]। বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক গ্রন্থে ব্রজগোপাল বৈষ্ণব একটি প্রবন্ধে লিখেছেন উত্তর দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রঙ্গরসাত্মক ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়ার আকারে ধাঁধা ও গানের সমন্বয়কে বলে 'লটুয়া'। তিনি লটুয়াকে বলেছেন খন-এর রূপভেদ। বলা বাহুল্য গ্রামীণ উচ্চারণে যা 'লটুয়া' তা কোথাও কোথাও নটুয়া রূপে উচ্চারিত হয়। লটুয়া গানের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই প্রবন্ধে যার উল্লেখ করা হয়েছে তা এই ধাঁধা ও গানের জোরে তৈরী। আমাদের সংগৃহীত নটুয়া — বিরোগের গানও এই রকম ধাঁধা ও গানের মিশ্র রূপ।

মনে হয় প্রশ্নোত্তরের ছাঁচে এক সময় গ্রামীণ জীবনে নানা জ্ঞানের চর্চা চালু ছিল। লোক সমাজে প্রচলিত ধাঁধা সাহিত্যের প্রাচুর্য দেখে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে লোক জীবনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেমন বলা হত তেমনি তাকে কিছুটা গূঢ়ভাবে প্রকাশ করার মধ্যে বুদ্ধি চর্চার ভূমিকাও ছিল। বুদ্ধি সহকারে এই গূঢ়োক্তির রহস্য ভেদ করতে পারলে তবে যে আনন্দ পাওয়া যায় এর রস সেই শ্রেণীর আনন্দ। এ ভাবরসের আনন্দ নয় বুদ্ধিগম্য এর ভাব। এই ভাবে জীবনের নানা রহস্য বা বাস্তব শিক্ষা অধ্যাত্ম শিক্ষা এই ধাঁধার মাধ্যমে দেওয়া হত। এই পদ্ধতি খুবই প্রাচীন লোকশিক্ষার পদ্ধতি। করে এর সূত্রপাত বলা যায় না। তবে দেশে বিদেশে তার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে লোক জীবনের এই ধাঁধা বলার রীতিটি বহু প্রাচীন। কিন্তু তার মধ্যে একঘেঁয়েমি থেকে যায়। তাই তার সঙ্গে গানের যোগ হয় — এই ধাঁধার একঘেয়েমির মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য আনবার জন্যে। উত্তর দিনাজপুরে থাকে বলে খন - লটুয়া - সম্ভবত এ থেকেই তার উৎপত্তি। শিশিরকুমার মজুমদার যে নটুয়ার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন তাতে এই 'ফাকড়ি' বলার সঙ্গে সঙ্গে আছে রাধার নৌকা পারাবারের গান। সেটা বিরহের নয়। রাধা সেখানে বলছে "পার কর নিলাজ কানাই রে বেড়ি বাক চাই। নষ্ট হবে দহি দুধ বিক্রি বহে যায়।"[৪২] "রাধা ও কৃষ্ণের এই গানের ভূমিকার পর আসছে ফাকড়ি অর্থাৎ ধাঁধা বলা। কাজেই এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ধাঁধা বা ফাকড়ি বলার মধ্যেই সঙ্গীত যোগে ও নৃত্য যোগ এ ধরনের নটুয়া পালার উৎপত্তি।

সাধারণত দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর পর থেকে কালীপূজা পর্যন্ত নটুয়া পালাগান বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজার পরও প্রয়োজন অনুসারে বা বিশেষ আমন্ত্রণে নটুয়া অনুষ্ঠান হয়। বর্তমানে যে সম্পূর্ণ পালাটি সংযোজিত হয়েছে সেই পালাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পূর্ব রাঙাপানির বনিজোত গ্রামের শ্রী বালিমোহন সিং-এর নিকট থেকে সংগৃহীত। প্রায় ১২ জনকে নিয়ে এই গঠিত দলটি শ্রীবালিমোহন-এর নেতৃত্বে লোকনাট্য উপস্থাপনা করে। এই দলের মূল গীদাল শ্রীবাজারু সিংহ নৃত্যগীতও অভিনয়ের কৌশলটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই নাটকের মূল দুটি চরিত্র উধব ও মাধবের অভিনয় করেন যথাক্রমে শ্রী বালিমোহন সিংহ এবং শ্রী হরিকান্ত সিংহ।

রাধিকার বেশে নৃত্য করেন শ্রী বীরেন সিংহ। দলটিতে বাজনাদারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ ও জুড়ি (করতাল) সহযোগে গোটা পালাটির অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমথু সিংহ মৃদঙ্গ বাজানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত পটু। জুড়ি বা করতাল ঠিক তাল মিলিয়ে বাজান শ্রী সুমেল সিংহ। আরো দু-তিনজন শিল্পী থাকেন তাঁদেরকে বলা হয় 'গান-ধরা' লোক। মূল গীদাল বা গায়ক গান শুরু করলে গানের ধুয়া ধরে অন্যরা গান শুরু করেন। এই গানের ধুয়া যাতে কখনো তাল ভঙ্গ না হয় তার জন্য মঞ্চে স্থায়ী দুই থেকে তিন জন গান টানার লোক থাকেন। এই লোক শিল্পীদের বসবাস এলাকা রাঙাপানিকে ঘিরেই। এরা প্রত্যেকেই কম-বেশী কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত। তবে গ্রামীণ পরিকাঠামোয় ক্ষুদ্র শিল্পের যেখানে বিকাশ ঘটেছে সেখানেও অনেকে শ্রমিক বা গ্রামীণ শিল্পী হিসেবে যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। রাঙ্গাপানি রেল স্টেশনেও অনেকে মজুরের কাজ করেন। রেল-সভ্যতার দ্রুত গতিতেও তাঁদের কণ্ঠে নটুয়া এখনো অব্যাহত।

নটুয়া লোকনাটকের মঞ্চ বা আসরের জন্য কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান নির্বাচন করতে হয় না। গৃহস্থের বাড়ীর বাইরের উঠান বা খোলানবাড়ীতে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। এখন সরকারী বদান্যতায় লোক-উৎসব অনুষ্ঠান পরিশীলিত মঞ্চেও অভিনীত হয়। তবে সেই সব মঞ্চে এই গ্রামীণ লোক-শিল্পীরা অভিনয় করতে অনেক ক্ষেত্রে একটা চাপা অনুভব করেন। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশ বয়স্ক পুরুষ-মহিলারাই থাকেন।

বাড়ির বাইরে খোলা স্থানে একটি বৃত্তাকার স্থান নির্বাচন করা হয়। তার তিন দিক ঘিরে শ্রোতারা বসবেন। বৃত্তাকার আসরে প্রথম সারিতে বাজনদাররা বসবেন। তাঁদের পাশেই বসে থাকবেন শ্রী রাধিকা। কিশোর বয়সের হালকা চেহারার মেয়েলী মুখাবয়বের ছেলেরাই রাধিকা সাজেন। সেই শিল্পীকে নৃত্যে অসম্ভব পটু হতে হবে। প্রয়োজন মতো বাজনদারদের জায়গা থেকে উঠে এসে রাধিকা আসরের সম্মুখে নৃত্য করবে। মূল গীদাল সম্পূর্ণ পালাগানটিকে গান ও কথার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সবচাইতে আকর্ষক দুটি চরিত্র — উধব এবং মাধব — বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হবেন। তাঁদের উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে একটা হাস্যরস সৃষ্টি করবে। তাঁরা দুজনেই মূল গীদালের সঙ্গে বিভিন্ন ধাঁধা-র মধ্য দিয়ে তর্ক-বিতর্ক ক'রে ক'রে নাটকটিকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন। চরিত্রগুলির সাজ-সজ্জাও অতি সাধারণ। মুখে মেক-আপ করবার জন্য সাধারণ ভ্যানিশিং ক্রিম, পাউডার, লাল রং, রাংতা ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। রাধিকার পরনে ঘাগরা থাকে। মূল গীদাল ধূতি, পাঞ্জাবী বা ফুল সার্ট এবং গলায় একখণ্ড লম্বা সাদা কাপড় পরেন। উধব-মাধব মাথায় জোকারদের মতো লম্বা টুপি পরেন। মুখে সাদা রং-এর উৎকট ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পুরোনো চাপা পা-জামা বা খাটো করে ধুতি পরেন। চরিত্রের ঢং অনুযায়ী পোশাক-পরিধান লক্ষ করা যায়।

নটুয়া পালা বা লোকনাটকটির কাহিনী অত্যন্ত ছোটো। ফুলবাগানে ফুল তুলতে গিয়ে শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেলেন। ফুল বাগানে তন্ন তন্ন করে খুঁজে রাধিকা আর কৃষ্ণকে খুঁজে পান না। কৃষ্ণ বিহনে

রাধিকা বিরহে কাতর হয়ে ওঠে। এই কাতরতাকে ঘিরে মূল গীদাল গান শুরু করেন। উধব ও মাধব কৃষ্ণের দুই ভাগ্নে সর্বদাই রাধিকা অর্থাৎ মামিকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে মামা অর্থাৎ কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। দুঃখের কোনো কারণ নেই। কিন্তু রাধিকা সেটা মানতে চান না। মূল গীদাল উধব-মাধবকে গান ও কথার মাধ্যমে বোঝাতে থাকেন তাদের মামি রাধিকার দোষেই কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন। মূল গীদালই আবার রাধাভাবে ভাবিত হয়ে গান করে রাধিকার বেদনার কথা ব্যক্ত করেন। সেই গানের সঙ্গে প্রয়োজন মতো বাক্যহীনা রাধা মঞ্চে নৃত্য করে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে 'বতেয়া' একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই বতেয়ার জন্য আলাদা ব্যক্তি থাকেন না। উধব-মাধবই বতেয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন।

নটুয়া লোক নাটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো এই এলাকার লোকভাষায় ফাকড়ি বা শ্লোক। গীদাল শ্লোকের উত্তর দেবেন। উধব-মাধব শ্লোক বলবে এমনভাবে যা নাটকীয় ঘটনার কোনো ছন্দ-পতন ঘটাবে না। এই ভাবে গান, কথোপকথন ও শ্লোকের মধ্যে দিয়ে ঘটনা এগিয়ে চলবে। রাধার কষ্ট এবং যাতনা মূল গীদাল গানের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেন। এই কষ্ট এবং যন্ত্রণাকে হাল্কা করার জন্য উধব নিজে আবার কখনো বতেয়ারূপে মাধবের সঙ্গে শ্লোক বা ধাঁধার মধ্য দিয়ে গায়ককে প্রশ্ন করে। এই শ্লোকগুলো পরিবেশনের ধরণ এমন সুন্দরভাবে করা হয় তাতে নাটকীয় অভাব ঘটে না। মূল গায়ক উধব এবং মাধবকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে কৃষ্ণ তাদের মামিকে ছেড়ে চলে গেছে। এটা উধব-মাধবের নিকট অবমাননার সমতুল। তারা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এড়িয়ে শ্লোকের মধ্য দিয়ে মূল ঘটনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু মূল গায়ক শ্লোকের যথাযথ উত্তর দিয়ে কথা কিংবা গানের মধ্যে দিয়ে পুনরায় রাধিকার বিরহ বিয়োগের কথা ব্যক্ত করেন। নাটকের গানে চলে বিরহ আর পদ্যে সেই বিরহ বেদনাকে লঘু করে দেবার চেষ্টা। এই ফাকড়ি বা শ্লোকগুলোর কাব্যমূল্য অবশ্যই বিচার্য। নীতি শিক্ষা, তাৎক্ষণিক বিচার বুদ্ধি এই শ্লোকগুলোতে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ পেয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পালা গান আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি পালাতে রাধার অভিনয় সংলাপ ও গীতের মধ্য দিয়ে পালাগান উপস্থাপিত হয়। ব্যতিক্রম নটুয়া নাটকে। এখানে রাধিকা নিজে কোনো কথা প্রকাশ করবে না। নৃত্যের মধ্য দিয়েই, বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমেই রাধিকা তার বেদনাকে শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরবে।

বন্দনা দিয়ে পালাগান শুরু হয়। বন্দনার সময় আসরে উপস্থিত সব শিল্পীই বন্দনার গানে অংশ গ্রহণ করেন। বন্দনার সঙ্গে নৃত্যও চলে। বন্দনাংশে কালীমায়ের স্মরণ নেওয়ার ব্যাপারটা নিতান্ত লৌকিক বিশ্বাসের ফল। নির্মলেন্দুবাবু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে 'কালী'র উল্লেখ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বিস্মিত হবার কারণ নিশ্চয় আছে। কিন্তু লোক-কবির নিজস্ব বিশ্বাস বা আঞ্চলিক কারণে কালীর প্রতি নির্ভরতা এর কারণ বলে মনে করি।

বন্দনা অংশে কবি কিংবা গায়েন তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী দেবদেবীর বন্দনা করেন। কাজেই এখানে কালীমায়ের উপর নির্ভরতার মূলে সেই লোক বিশ্বাস আছে। কবির নিজের ধর্মবিশ্বাস এবং নাটকের পাত্রপাত্রীর অবস্থানগত সামঞ্জস্য এতে হয়তো রক্ষিত হয়নি, কিন্তু এখানে এই দুটিকে আলাদা করে দেখতে হবে। শিশির মজুমদার উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য গ্রন্থে যে নটুয়া পালা সন্নিবেশিত করেছেন তাতে রাধা কৃষ্ণ দুয়েরই উক্তি আছে। কিন্তু কেউ রাধা বা কৃষ্ণ সাজে না। মূল গীদাল এবং একজন সহকারীরাধার কৃষ্ণের গান করেন।[৪৩] ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু না বলেও লিখেছে "শ্রীরাধা বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়া লোক কবির চোখে সাধারণ নারী হইয়া উঠিয়াছেন।"[৪৪] এখানে রাধার সাধারণ নারীরূপ গ্রহণের কথাআছে।

বন্দনাংশের নৃত্য থেমে গেলে মূল গীদাল শুরু করেন —

হাতে লিনু বাটারে মুই
মিঠাপান
কাহাসে আইলো রাধাগে
দশমুনিক করিস পরনাম।

গান শেষ না হতেই বতেয়া বা দোহার গানের ধুয়া ধরে গান চালিয়ে যেতে থাকবে। যখন মূল গীদাল উধব-মাধবকে উদ্দেশ্য করে কথা শুরু করবেন তখন গান বন্ধ হয়ে যাবে। মূল গীদাল বলবেন —

উধব, তোর মামীটা কান্দিসে,
তোর মামাতো না আসে।

এই কথার সূত্র ধরে পয়ারের আকারে মূল গীদাল বলবেন —

খাটোখুটো বিন্দাবনে
ফুল তুলিনু হামা তিনজনে,
ফুল তুলিতে হারানুং স্বামীরে
সোয়ামী গেইসে মোর বিন্দাবনে।

রাধার কথা গীদালই বলে যান "এঠে হারালো মোর সোয়ামী" — স্বামী হারার দুঃখের সরল প্রকাশ ঘটে এই উক্তিতে। কিন্তু এই দুঃখের অনুভূতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে উধব মাধব তাকে লঘু করে দিতে চায়, শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে তারা একেরে পর একে 'ফাকরি' অর্থাৎ ধাঁধা বলে, কৃষ্ণের হারিয়ে যাওয়ার নানা কারণ দেখাতে চায়—

মামা, ভাত শাকোত নুন নি পায়

তাতে রাগ করি পালাইচে।

হামাক মামাক অনষেবার যাবা হবে।

মূল গীদাল রাধার ভাবে আবার গান শুরু করেন —

এখেতো আন্ধার রাতি

একালরে রহালনি যায়

ওহো পরভুজি

হায়, দেখি মোর কপালের নেখা রে

জার গেলো মোর কাপড়া বিনে

বয়স গেলো সোয়ামী বিনে

একালরে রহালনি যায়

গোকুলা নগরে ওহে পরভুজি।

এই বেদনাকে হাল্কা করবার জন্য কিংবা রাধিকার বিরহকে ভুলে থাকার জন্য উধব দর্শক-শ্রোতাদের সম্মুখে মূল গায়ককে শ্লোকের মাধ্যমে প্রশ্ন করে বসেন —

ক্ষুদ্র বর্ণ বিত্তা নাল বর্ণ দেহ

ছালেবা ছালেবা সর্ব অঙ্গ ধরে

অধিক করি খাইলে

তোর মুখখ্যান গন্ধ করে।

শ্লোক শুনে মূল গীদাল হেসে বা নাটকীয় ভঙ্গীতে উত্তর —

'হে উধব, তুই যে পিয়াজটার কথা কলু।'

নটুয়া পালায় রাধার কৃষ্ণ বিরহের বেদনা যে গভীরতা পায় না, তার একটা কারণ রাধার বিষণ্ণতাকে আমল না দিয়ে সহকারী উধো মাধো নানা রকম বাধা বলতে থাকে। এই ধাঁধাগুলি শ্রোতাদের মনকে রসসিক্ত করবার চেয়ে তাকে বুদ্ধিজাগর করে তোলে। বস্তুত রাধা বিরহের পদগুলির বেদনার যে নিবিড়তা তাকে এই লোক কবিরা ধরতে পারেননি। নটুয়া "বিরোগের" গান ঠিকই কিন্তু তাতে বিরহের বেদনার প্রকাশ অত্যন্ত সরল। এখানে সংযোজিত নটুয়া পালায় রাধার দুঃখের কথা বলা হচ্ছে — তার পাশাপাশি বলা হচ্ছে নিতান্ত লৌকিক ধাঁধা — অনেক সময় তা লোকরুচির স্থূলতার পরিচয়বাহী হয়ে ওঠে। নটুয়াপালার যে গানগুলি গাওয়া হয় তাতে একবার রাধার দুঃখ গীদালের কণ্ঠে আর তারপরেই ধাঁধার ফুলঝুরি। এই ধাঁধা বলাটাই মনে

হয় নটুয়া পালার একটা আকর্ষণ। গ্রামীণ জনসমাজে এই ধাঁধার মূল্য ছিল। শুধু লোকসাহিত্যের বিষয় হিসেবে নয়, ধাঁধার মধ্যে লোকমনের বুদ্ধিটার রূপ পাই। ধাঁধার আকর্ষণই এখানে লোকদের টেনে আনে। 'নটুয়া' পালার যে কাহিনীটি এখানে সংযোজিত হয়েছে তাতে রাধা-কৃষ্ণ-হারা। কৃষ্ণ তার স্বামী। স্বামীহারা রাধার বেদনা যদি এর প্রধান উপজীব্য হয় তাহলে তার সেই বেদনাকেই তীব্রতর করে তোলো লোককবির পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তার পরিবর্তে দেখি একের পর এক ধাঁধা বলে, উধব মাধবের রহস্য পরিহাসের মধ্য দিয়েও, এই বেদনাকে লঘুতর করে তোলা হয়েছে। নটুয়া গানের যে পালাটি শিশির মজুমদার সংকলিত করেছেন তাতে এই বিরহের কথা তেমন নেই।সেখানে রাধা কৃষ্ণ উভয়েরই কথা আছে — রাধা কৃষ্ণের ভাঙা নৌকোয় পার হচ্ছেন — এতে বোঝা যায় সেই পালাটি নৌকালীলার অনুসরণ। কিন্তু সেখানেও আছে এই ধাঁধার ব্যবহার। এখানে উদারভাবে একটা অনুমান করা যায়। মনে হয় নটুয়া পালার এই ধাঁধাগুলি এই লোকনাট্যের প্রাচীন অংশ। ধাঁধা বলা এবং তার উত্তর দেবার মধ্যে একটা উত্তেজনা জনিত আনন্দ কাজ করে। এই ধাঁধাগুলি প্রায়শই সন্ধ্যাবেলাকার অবসরে বলা হয়। নটুয়া পালাগানে এই ধাঁধারই বাহুল্য দেখে মনে হয় ধাঁধা, হয় ধাঁধা বলাটাই এই নটুয়া লোকনাট্যের প্রাচীনরূপ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের গান। এই গান যুক্ত হয়েছে অনেক পরবর্তীকালে। গীদাল গানের মধ্য দিয়ে রাধিকার বেদনা এবং তারই কর্মের জন্য কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গেছে, এই ধরনের ঘটনাগুলোকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করতে থাকেন। উধব-মাধব বরাবরই শ্লোকের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর পেতে থাকে। নটুয়া-বিরোগের গান রাধার বিরহ ব্যথার গান। এই বিরোগের গানের কোনো কোনো অংশ কাব্যময়। আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা হলো নটুয়া গানের সম্পূর্ণ অংশ — তা থেকেই বোঝা যাবে এর কাব্যমূল্যের গুরুত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাধার বিরহের কোনো কোনো পদের সঙ্গে এর দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গির মিল দেখা যায়, যেমন—

হাতের শাংখা করিমু দূর
গায়ের বস্ত্র করিমু দূর
দূর করিম নয়নের কাজল
সীথার সেন্দুর।

আরেকটি পদ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে —

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।

এই পদটি 'নটুয়া'-গানের একটি পদের কথা মনে করিয়ে দেয় —

"মনের আগুন তলে জ্বলেরে
নেকটের আগুন ধায়
জ্বলেছে মনের আগুন
সখিরে কি খাইলে জুড়ায়।"

এখানে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বিরহ কাব্যের বর্ণনার সঙ্গে যে সাদৃশ্য, তার কারণ লোককবির কল্পনার সাধর্ম্য। লোককবির কল্পানায় স্বামীহীনার খেদ সমস্ত বিলাস দ্রব্য ছেড়ে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ত্যাগের ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছে। নারীমনের কামনা প্রকাশের ক্ষেত্রে আগুনের উপমা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। এগুলি উপমান ব্যবহারের গতানুগতিক রীতির অনুসরণ। লোককবির পক্ষে এই উপমান ব্যবহারের সারল্য এবং তার মাধ্যমে মানব-মনের বিরহানুভূতির প্রকাশ ভালো হয়েছে। তবে সামগ্রিক বিচারে এর কবিত্ব কিছুই নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার যে মানসিক অবস্থান্তর ঘটেছে, তার ফলে শেষ পর্যন্ত তার বিরহানুভূতি এক তীব্র আর্তিতে প্রকাশিত হতে পেরেছে। অন্য পক্ষে এসব লোকনাটকে সেই পরিসর কিংবা সেই সামর্থ্য দেখা যায় না। আমার মনে হয় নটুয়া পালায় রাধার বেদনা প্রকাশটাই লক্ষ্য নয়। বরং তার বিরহকে কিছুটা সহনীয় করে বাস্তব সমাজে সংসারের উপযোগী করে তোলাও এর লক্ষ্য। দুঃখ বেদনা বিরহ বিচ্ছেদ সবই সামাজিক মানুষকে আক্রান্ত করে, আচ্ছন্ন করে। তাকে কাটিয়ে উঠে সহজ জীবনকে গ্রহণ করতে হবে। লোক কবির কল্পনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ সাধারণ সংসারের নরনারীতে পরিণত হয়েছে। সেখানে বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব প্রত্যাশা করা যায় না।

ফলে দেখা যায় গানের শেষে রাধা বিরহ বেদনা ভুলে যাচ্ছে। "পাসরিমু মুই সায়ার শোক।" পরন্তু রাধা উধবের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এদিক থেকে পালাটি বিচারযোগ্য। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের বই থেকে দেখতে পাই কুঞ্জ সাজানোর আগে রাধা উঠোন ঝাট দিচ্ছেন। এ নিশ্চয় রাধার কোনো উচ্চতর অবস্থান নয়। লোক-কবির কল্পনায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গভীরতা নিয়েও কিছু কৌতুকের কথা শোনা যায়। হুঁকো হাতে আগুন প্রত্যাশী কৃষ্ণের রাধার গৃহে গমনের কথাটি লঘু পরিহাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে রাধা কৃষ্ণের রূপটি নিতান্তই লৌকিক। প্রতিদিনের সংসারে যে কোনো আত্যন্তিক অনুভূতির প্রথম প্রবলতা কেটে গেলে তার আত্যন্তিকতা নিয়ে কৌতুক করার ব্যাপার ও দেখা যায়।

আমাদের ধারণা নটুয়া গানে একদিকে রাধার এই খেদ আর তার বিপরীত দিকে এই ধাঁধা হেঁয়ালি নিয়ে লঘুতরল পরিহাস প্রবণতা লোকজীবনের একটা বৈপরীত্য তুলে ধরে। রাধার কৃষ্ণ বিরহে ততটা মন না দিয়ে বরং কিছুটা হাল্কাভাবে সেই বেদনা উপস্থাপিত করা ও একটা শিল্প কৌশল। নটুয়া পালায় রাধাকৃষ্ণের লীলার নানা পর্যায়কে অবলম্বন করে তার মধ্যে এই লঘুচপল হাস্য পরিহাস প্রয়োগের এটা একটা কারণ হতে পারে। আমাদের সংগৃহীত পালায় পরিণতিতে দেখা যায় রাধা "পাশুরিমু মুই স্বামীর শোক" বলে রাধা তার দুঃখকে

সহ্য করে নিয়েছে। এই দুঃখ নিয়ে চিরকাল থাকা যায় না — দুঃখকে স্বীকার করেও জীবন এগিয়ে চলে — রাধার উক্তির মধ্যে সেই দিকটিই ফুটে উঠেছে। রাধা কদমতলে গিয়ে সায়ার শোক ভুলতে চায়। সেখানেইএর শেষ হতে পারে।এখানে কিন্তু শেষে উধব কৃষ্ণের ভাব নিয়ে রাধিকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। লোককবি এখানে কোন জীবনবোধকে প্রকাশ করেন তা স্পষ্ট নয়।

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক জীবন-যাপনের খন্ড চিত্রও এই নাটকের গানগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে উধব-মাধবের শ্লোকগুলোর মধ্যে চলমান জীবনের নানান কথা পাওয়া যায়। শ্লোকগুলোর মধ্যে দিয়ে জ্ঞানেরও উন্মেষ ঘটে। পুরুষানুক্রমে শ্রোতারা এগুলো গ্রহণ করে নিজেদের জীবনের কাজে লাগান।

'নটুয়া-বিরোগের গান' - লোকনাটক কোনো একজনের বিশেষ সৃষ্টি নয়। বহু লোক শিল্পীর সঙ্গীত-শৈলী দিয়ে তৈরী এই গানের পদগুলি। এগুলি শ্রুতি ও অভিনয়ের ভেতর দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতকে 'ভাওয়াইয়া' বলা হয়। এই ভাওয়াইয়ার বহু ধারা-উপধারা রয়েছে। দরিয়া, চটকা, ক্ষিরোল, দীঘল নাসা, মৈষালী, লাহাংকারী আরো নানা প্রকার রয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সংঙ্গীতের বিভিন্ন রকমের উপস্থাপন ঘটে। ভাওয়াইয়াতে দরিয়া বিভাগে নারীর বেদনা ও বিরহের কথা মুখ্যত প্রকাশ পায়। উত্তরের তরাই অঞ্চলে দরিয়া শব্দটির তেমন পরিচিতি পূর্বে ছিলো না। এখানে নারীর ব্যথা-বিরহ প্রকাশ হতো যে সুরে তা হলো লাহাংকারী। রাধিকার ব্যথা-বেদনা লাহাংকারী সুরের মধ্য দিয়ে পালানাটকে ব্যক্ত হয়।

## 'শাস্তরী' — পালাগান

## জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই

'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' একটি 'শাস্তরী' লোকনাটক। এই লোকনাটকটিকে শাস্তরী বলার কারণ হচ্ছে, এই পালায় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর শাস্ত্রসম্মত তত্ত্ব কথার বিবরণ থাকে। অভিনয়ে মুখ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধ বেধে যায়। শাস্ত্রসম্মত তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিণতি ঘটে। রামায়ণ, মহাভারত, শিবপুরাণ, ভাগবত ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক কাহিনীর থেকে উদাহরণ সহযোগে পাত্র-পাত্রী যুক্তিস্থাপন করে একটি নির্দিষ্ট নীতিকে স্থাপন করেন এই নাটকে। জীবনবোধ, পার্থিব জগৎ, আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং অলৌকিক প্রেমের কথাও এই শাস্তরী পালাগানে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সারকথা প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' - নামের পালাগানে।

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে পাঁচালী গানের ব্যাপক প্রসার দেখা যায়। এই পাঁচালী গানের প্রকারভেদ তিন রকমের। খাস পাঁচালী, রং পাঁচালী এবং মান পাঁচালী। মান পাঁচালী পালাগানে কাহিনীর বিশেষ মান লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে মান পাঁচালী তৈরী। এই পালাগানে অনেকে শাস্ত্রীয় বিষয় লক্ষ করেন বলে মান পাঁচালীকে অনেকে শাস্তরী বলে থাকেন। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং নাট্যাভিনয়ের বিভিন্ন প্রদর্শন দেখার ফলে এটা পরিষ্কার যে 'শাস্তরী' গান মান পাঁচালী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

শাস্তরী গানে তত্ত্বকথাই মূল। তত্ত্বকথা শাস্ত্রীয় যুক্তির মধ্য দিয়ে স্থাপন করতে গিয়ে পাত্র-পাত্রীদের ঘিরে একটি ঘটনা বিবৃত হয়।

শাস্তরী পালা শিলিগুড়ি মহকুমার একটিয়াশাল গ্রাম এলাকায় প্রচলিত। পূর্বে এই এলাকাটি গ্রাম ছিল। ডাবগ্রাম, সাহুডাঙ্গী, একটিয়াশাল, শালুগাড়া ইত্যাদি জায়গাগুলো পুরোনো বৈকুণ্ঠপুরের অন্তর্ভুক্ত। শহরের অগ্রগতির ফলে শিলিগুড়ির ইস্টার্ণ বাইপাস অঞ্চল নগরায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তবু পুরোনো অধিবাসী রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ অন্যান্য লোক-উৎসবের সঙ্গে এই 'শাস্তরী' পালাগানকে জীবিত করে রেখেছেন।

জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের সর্বত্রই এই গানের প্রচলন আছে। এই পালাগানের মূল গায়ক শ্রদ্ধেয় পরমলাল রায়ের কাছ থেকে এই গানের বিষয়বস্তু পার্শ্ববর্তী এলাকা — যথাক্রমে জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ী, মানিকগঞ্জ, ফাঁসীদেওয়া, নক্সালবাড়ী ও মাটিগাড়া এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি কিছুদিন আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এই মানুষটি পুরোনো শিলিগুড়ি এলাকার ঘুঘুমালীর রথখোলাতে বসবাস করতেন। এখনো তাঁর বংশধররা বিদ্যমান। পরমলালের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য তৈরী হন। তাঁরাই বিভিন্ন জায়গায় এই পালাটির

অনুষ্ঠান করেন। হলদিবাড়ী ব্লকের বর্ধিষ্ণু গ্রাম মানিকগঞ্জ লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান। মানিকগঞ্জ পঞ্চায়েত এলাকার ডাকের কামাত গ্রামের বিষ'রু গোঁসাই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারী এবং বেসরকারী অনুষ্ঠানে এই পালা নাটকটি মঞ্চস্থ করে থাকেন।

বর্তমান আলোচনায় 'শাস্তরী' পালাগানটির মূলভূমি শিলিগুড়ি মহকুমার তরাই অঞ্চল। রাজগঞ্জ ব্লকের শিলিগুড়ি সংলগ্ন একটিয়াশালের অধিবাসী শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় দলপরিচালনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পালাগানটি ধরে রেখেছেন। তাঁর কাছে শোনা যায় সাহুডাঙ্গির কাছাকাছি আমবাড়ীতে বহুপূর্বে নরসিংহ রায় নামে এক ওস্তাদ ছিলেন। নরসিংহ ওস্তাদের কাছে শ্রদ্ধেয় পরমলাল রায় এই 'শাস্তরী' পালাগানটি শিক্ষা করেন। পরে ধীরে ধীরে উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের সর্বত্রই এই গানের সমধিক পরিচিতি ঘটতে থাকে।

তরাই অঞ্চলের একটিয়াশাল গ্রামের শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় বর্তমানে জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালা নাটকটি পরিচালনা করে আসছেন। পরমলালবাবুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর কাছে চলে আসে। জীবিত অবস্থায় পটপুটিয়া গোঁসাই-এর চরিত্রে পরমলালবাবু অভিনয় করতেন। জ্ঞানবালার ভূমিকায় দীর্ঘদিন নগেনবাবু স্ত্রীর বেশে অভিনয় করতেন। বর্তমানে নারীরাই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নগেনবাবু জ্ঞানবালা চরিত্রের বদলে মূল গীদাল ও পটপুটিয়া গোঁসাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। জ্ঞানবালার চরিত্রে কখনো মমতা রায় আবার কখনো পাতা রায় অভিনয় করে থাকেন। বাণেশ্বর রায় একজন দক্ষ শিল্পী। তিনি সাজেন বগুলা গোঁসাই। এই সকল লোকশিল্পীদের বাড়ি সাহুডাঙ্গী, একটিয়াশাল, রথখোলা হরিচরণপাড়া ও ফাড়াবাড়ী এলাকায়। এই পালাটিতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে যুক্ত থাকেন যথাক্রমে মন্মথ রায়, কলিন রায়, দেবেন রায়, সুভাষ রায় এবং কেপেরু রায়।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ মঞ্চে অভিনয়কালে চরিত্রানুযায়ী সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদই ব্যবহার করেন। সাজ-সজ্জায় বাহুল্য লক্ষ করা যায় না। জ্ঞানবালার পোষাকের মধ্যে চাকচিক্য আছে। বিধবা মানেই যে তাঁকে সাদা কাপড় পরতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। মেক-আপ অতি সাধারণ। উগ্রতার কোনো প্রকাশ নেই। নর্তকী দু'জনার মধ্যে বেশ রং-এর ব্যবহার আছে। আলতা, সিঁদুর, পাউডার ও বর্তমান মেক-আপ-এর দ্রব্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।

শুধুমাত্র বর্ষার কয়েকটি মাস ব্যতীত বছরের সারাটা সময় এই পালাটি গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থের ঘরে-বাইরে কিংবা কোনো 'ধাম' -এ (নির্দিষ্ট স্থানে) অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়া দশমীর পর থেকেই তরাই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকাকে অতিক্রম করে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরের নানান স্থানে এই লোকনাটক মানুষের

আনন্দ শিক্ষা ও জীবনবোধ বিকাশে ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হয়ে চলে।

'শাস্তরী — জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা অন্যান্য লোকনাটকের থেকে কিছুটা আলাদা। আসরে শ্রোতাদের মাঝখানে দৈর্ঘ্যে দশ হাত প্রস্থে দশ হাত করে সীমানা নির্দেশ করা হয়। এই সীমানার মধ্যে ডিম্বাকৃতির মতো নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে বাজনাদার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা থাকেন। এই নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যস্থলে বাজনাদাররা বসেন। খোলবাদক, দোতরাওয়ালা, বংশীবাদক, হারমোনিয়াময়ালা ও করতালবাদক ডিমের ভিতরের কুসুমের মতো নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করেন। এঁদেরকে ঘিরেই উপ-বৃত্তাকারে নাটকের চরিত্ররা অবস্থান করেন। চরিত্রগুলোর মধ্যে জ্ঞানবালা, পটপুটিয়া গোঁসাই, বগুলা গোঁসাই ও দু'জন নর্তকী থাকেন। আসরের ভেতর প্রায় বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে গীত, নৃত্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে এই 'শাস্তরী' গান চলতে থাকে। পটপুটিয়া গোঁসাই এর চরিত্রে অভিনয় করেন মূল গীদাল। পালার শুরুতে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম মূল গীদাল উপস্থিত করেন। শাস্ত্র-সম্মত ও অধ্যাত্ম বিষয় আলোচিত হয় বলে কিছু আচার-অনুষ্ঠান থাকে। বন্দনা শুরু হওয়ার আগে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কিছুক্ষণের জন্য পূজা-অনুষ্ঠান করা হয়।

পটপুটিয়া গোঁসাই নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজেন। তিনি বগুলা গোঁসাই-এর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবীয় জীবন-আচরণের প্রতি অনুরক্ত হন। গৃহস্থ জীবনের ভোগ-বাসনাকে সর্বদাই নিবৃত্ত করে ঈশ্বরের সাধন-পথে নিজেকে সমর্পিত করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। এমনি একদিন শিষ্য বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি হয়ে গেলে অপরিচিত একটি বাড়িতে হাজির হন। সেই বাড়িতে সদ্য বিধবা জ্ঞানবালা বাস করেন। অল্প বয়সের 'চিটুল বিধবা' জ্ঞানবালা নবীন। বয়সের সন্ন্যাসী পটপুটিয়াকে দেখে তাঁর হৃদয় বিচলিত হয়। অতিথিকে আপ্যায়ন করার জন্য জ্ঞানবালা সমস্তরকম ব্যবস্থা করেন। পটপুটিয়া গোঁসাই জ্ঞানবালাকে জানিয়ে দেন তিনি বৈষ্ণব। বিধবা নারীর আপ্যায়ন তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। গীত-সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রথমেই উভয়ের পরিচয় বিবৃত হয়। পটপুটিয়া গোঁসাই কী কারণে নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হন তাঁর পরিচয় দেন। জ্ঞানবালা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁর সাংসারিক জীবনের বাসনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই কথাগুলো গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। জ্ঞানবালা শাস্ত্রসম্মত যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন বিধবার দ্বারা সকল ক্রিয়াকর্মের শুদ্ধতা বজায় থাকে। পটপুটিয়া নানা যুক্তির অবতারণা করেও শেষে জ্ঞানবালার কাছে নতি স্বীকার করেন। এই ভাবে একটি ছোটো ঘটনাকে ঘিরে নানা শাস্ত্রকথা উভয়ের তর্কযুদ্ধের ভেতর দিয়ে উন্মোচিত হয়।

পূজা অনুষ্ঠানের পর মূল গীদাল বন্দনা শুরু করেন। বন্দনা অনুষ্ঠানটি অন্যান্য লোকনাটকের বন্দনা থেকে সামান্য আলাদা। কুষাণ, দোতরা, নটুয়া ও রাজধারী পালা নাটকে আসর বন্দনার সময় বিভিন্ন দেব-

দেবী, গিরি-পর্বতমালা, সাগর ও পীর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই পালাগানে কেবলমাত্র সতী নারীদেরই বন্দনা করা হয়। তাঁদের বন্দনার সময় পরিচিতিও সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, সীতা, রাধা, দ্রৌপদী, অহল্যা, রঞ্জনা, পদ্মাবতী ও বেহুলা - এই সকল সতী নারীদের বন্দনা করে নেওয়া হয়। বন্দনা গানের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

"লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দু মাগো
গঙ্গা ভাগীরথী
পাপের হবে মুক্তি।
সতীর মধ্যে সতীরে ভাই
নামটি তাহার সীতা
সেও সতীটাক হরণ করিছে
লঙ্কার রাবণ রাজা।
আরেক সতীক বন্দি নেবো
নামে রাধা সতী
সেও সতীটা হইছে ভাইরে
ভাগিনা ভাতারী"

উপরে যতো সতী নারীর কথা বলা হয়েছে এই ভাবে তাঁদের সকলের গানের মধ্য দিয়ে বন্দনা করা হয়। বন্দনার মধ্যে সকল নারীর পরিচিতি দেওয়া হয়। যেহেতু এই পালাটিতে বিধবা জ্ঞানবালার সতীত্ব ও নারী মর্যাদার প্রতিষ্ঠাই বড়ো হয়ে উঠেছে, তাই বন্দনা অংশে শুধুমাত্র সতী নারীদের কথাই বলা হয়। বন্দনা শেষ হলে মূল গীদাল পটপুটিয়া চরিত্রের ও নামের ব্যাখ্যা দেন। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে মূল গীদাল স্বয়ং আসরের মধ্যেই পটপুটিয়ারূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং পটপুটিয়ার চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। এই পালা নাটকে মূল গীদালের চরিত্রের বিশেষ কিছু ভূমিকা থাকে না। পটপুটিয়ার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলি নাটকীয় আকারে কথোপকথন ও গান-সংলাপের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত প্রতিভাসিত হতে থাকে।

বিধবা জ্ঞানবালা চরিত্রের সঙ্গে পটপুটিয়া গোঁসাই-এর শাস্ত্র সম্মত তর্ক যুদ্ধ গান ও কথার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। জ্ঞানবালার হাতের রন্ধনে কোনো প্রকার দোষ নাই — এই বিষয়বস্তুটি যুক্তি সহকারে জ্ঞানবালা তুলে ধরতে চান।

লক্ষ্য করা যেতে পারে —

জ্ঞানবালা ঃ (পটপুটিয়াকে উদ্দেশ্য করে) গলাত তোর তুলসি মালা
অহে আড়ি মাইয়া
রাধা হছে দুই ভাতারী
বোষ্টমের গোড়া।
ওই শোনেক ঠাকুর মন দিয়ে
আড়ি মাইয়া মহাশুদ্ধি
দেখো বর্তমানে।
তুলসী হছে আড়ি মাইয়া
সকল কাজে লাগে।
বিবাহিতা নারী একজন
নাম তার সীতা,
কোনো কাজে নাহি লাগে
কায় করে পূজা।
এক ভাতারী একেশ্বরী
নাই ভাতারী সাই,
পাঁচ ভাতারী হছে
ভগবানের পিসাই।

পটপুটিয়া ঃ পাঁচ ভাতারী কায়গে মাই
বাতায়ে দিবা হোরে,
নিশুনিম তোর মুখের কথা
কোন শাস্ত্রত আছে

জ্ঞানবালা ঃ পাঁচ ভাতারী কুন্তী দেবী
শ্রী কৃষ্ণের পিসাই,
এই কথাটা মিথ্যা না হয়
মহাভারতে পাই।

জ্ঞানবালা বিধবা হওয়া সত্ত্বেও যে তিনি বৈষ্ণবীয় কাজের সমান অধিকারী এই বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। শুধু যুক্তি নয়, কখনো কখনো এমন সকল মানবিক বিষয়কে উপস্থাপন করেন তখন সমগ্র নারী জাতির ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

বৈষ্ণবীয় আচরণের কঠোর-সাধন পটপুটিয়া গোঁসাই-এর মধ্যে শেষ-পর্যন্ত জ্ঞানবালার সংস্পর্শে নির্মল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যুগল প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথের কথা এই পালা নাটকের একটি বিশেষ দিক।

বিধবা নারীর প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, সাধনপথের সহায়িকারূপে নারীর ভূমিকা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত।

বৈষ্ণবতত্ত্বের ব্যাখ্যা উভয়েরই গীতময় কথোপকথনে পরিস্ফুট। এখানেও উল্লেখ করা যেতে পারে -

জ্ঞানবালা ঃ বোষ্টম হয়য়া যেবা নিন্দা করিছে আড়ি।
না জানে বোষ্টম তত্ত্ব পেটের বৈরাগী
আড়ি নিন্দা করেচিস এইটা তোর ভুল
আড়ি মেয়েটা হছে ভব নদীর কূল।
আড়ি নিন্দা করেছিত বোষ্টম গোঁসাই
আড়ি মাইয়ার জল না হলে ভাইন্ডের শুদ্ধি নাই।
জীবতো চলিয়া গেইছে ভাইন্ড আছে পড়ি
তুলসি জল দিলে ভাইন্ডের হবে শুদ্ধি
হুজুগেতে মাতিয়া সাজিছেন বৈরাগী
অল্প বয়সে ডোর কাটিয়া হইছেন বৈরাগী
হাঁড়ি ভাঙিলে খোলা শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ চাষে
নারী শুদ্ধ হামার চান্দে মাসে
পুরুষ শুদ্ধ কিসে?

পটপুটিয়া ঃ হাঁড়ি ভাঙিলে খোলা শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ চাষে
নারী শুদ্ধ চান্দে মাসে
পুরুষ শুদ্ধ গুরুর মহামন্ত্রে।
(আড়ি - অর্থ বিধবা)

নারীতত্ত্ব ঠিকমতো সাধন করতে না পারলে বৈষ্ণবতত্ত্ব উপলব্ধি করা সহজ নয়। জ্ঞানবালা এই মতকে যুক্তি সহকারে স্থাপন করেন।

জ্ঞানবালা ঃ নারী নিন্দা ওরে ঠাকুর
করেছিত কিতায়
নারী ছাড়া দেখগে ঠাকুর
আছে আরো কায়।

পটপুটিয়া ঃ মাইয়া হন ওগে মাই মাকড়ার জাল
নারী লোকগুলা হছেন তোমহা পুরুষের মহাকাল।

জ্ঞানবালা ঃ নারী নিন্দা কহছিস বোষ্টম গোঁসাই
নারী হইতে সৃষ্টি হইছে দুনিয়ায়

কথা ঃ ঠাকুর আগে সাধন করো নারী
নারী সাধন না করিলে না হও বোষ্টম বৈরাগী
না জানিলে নারীতত্ত্ব নারীতে যদি হস মত্ত
পুরুষের যে পরমাত্মা, সবে নিবে কাড়ি
তার আগে না হও বোষ্টম বৈরাগী।
ইর' পিঙ্গলা সুষম্না নারী থাকে যেন আজ্ঞাকারী
আগে সাধন করো নারী, তার আগে
না হও বৈষ্টম বৈরাগী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নারী শুধু লৌকিক জীবনের সাংসারিক বিষয়-আশয়ের বস্তু নয়। নারী সাধনার মধ্য দিয়ে অলৌকিক দিব্যলীলায় পৌছানো যেতে পারে। রাধাস্বরূপ নারী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি দিয়ে তৈরী। সেই নারীকে সাধন করা একান্ত দরকার। জ্ঞানবালার শাস্ত্রসম্মত কথায় পটপুটিয়া গোঁসাই-এর মন মুগ্ধ হতে থাকে। তিনি তাকে দীক্ষা দিয়ে পরম শিষ্যা তৈরী করতে চান।

পটপুটিয়া বলেন ঃ চন্দ্র গেলো সূর্যের কাছে
মিতিংগা গেলো জলে ভাসি
তোমাকে মন্ত্র দেবো
হৃদয়ে বসি।

জ্ঞানবালার কথা ঃ ঠাকুর মন্ত্র দিবেন, মন্ত্রটা কোন স্বরূপ?

পটপুটিয়া ঃ মন্ত্রটা শ্রীমতী রাধাস্বরূপ।

জ্ঞানবালা ঃ শ্রীমতী রাধা বেটি ছাওয়া না ব্যাটা ছাওয়া?

জ্ঞানবালার এই তাত্ত্বিক প্রশ্ন পটপুটিয়াকে গভীর বিস্ময়ে ফেলে দেয়। জ্ঞানবালার বৈধব্য এবং তিনি যে ঈশ্বর সাধনায় কোনোরকম অন্তরায় নন বরং যুগল সাধনের ক্ষেত্রে একান্ত সহযোগী হয়ে উঠতে পারেন - এই বোধে পটপুটিয়ার জীবনের উত্তরণ ঘটতে থাকে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকার কান্তাপ্রেমে সর্বস্ব নিবেদন করে পটপুটিয়া গোঁসাই ঈশ্বরের অলৌকিক প্রেমে প্রবেশ করতে চান। নানা প্রশ্নোত্তরে পটপুটিয়া গোঁসাইর নিজেকে সমর্পণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর নেই।

এই নাটকের শেষে গিয়ে মিলনের গান দেখা যায় ---

'যুগল সাধনের মতো
আর তো সাধন নাই
শাস্তর খুলিয়া দেখো
ওরে বোষ্টম গোঁসাই।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের নির্গলিত রসই ভক্তিরস। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা স্বরূপতঃ সত্য। তাঁদের যুগল মিলন পূর্ণ ঈশ্বরের প্রতীক। সুতরাং এই পালানাটকটি লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এইক্ষেত্রে লোকশিক্ষার ভূমিকায় যথেষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

প্রত্যেকটি লোকনাটকের মধ্যে সমকালীন জীবনের ছাপ পাওয়া যায়। জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালাটিকে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই একটি তৎকালীন সমাজ চিত্র।

পালার শুরুতে পটপুটিয়া-গোঁসাই-এর নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজার কারণ বর্ণিত হয়েছে। গৃহস্থ জীবনের মধ্যেও অনেকে গার্হস্থ্য জীবন সম্পূর্ণ শুরু না করে গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে ঈশ্বরের পথে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর কাছে সদ্য বিধবা জ্ঞানবালার পরিচয়ের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।

অল্পবয়সে বিয়ে এবং বিধবা হয়ে যাওয়া সে সময়ে সচরাচর দেখা যেতো। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বিধবাদের চাইতে বৃহৎ উত্তরবাংলার উত্তরাঞ্চলের বিধবা নারীদের স্বাধীনতা অনেক বেশী প্রতীয়মান। সামাজিক আচার-আচরণের নিয়ম-নিষ্ঠার ঘেরাটোপের মধ্য দিয়ে এই নারীরা কখনোই বিকশিত হননি। অন্যান্য পুরুষদের

সামাজিক ক্রিয়াকর্মের প্রায় সমান অংশীদার হতেন। পাশাপাশি বিধবা বিবাহ কোনোদিনই এই অঞ্চলের জনসমাজে নিষিদ্ধ ছিলো না। বিধবা নারীদের পুরুষদের বিভিন্ন উপায়ে বরণ করে নেওয়ার প্রথা পরিলক্ষিত হয়। লোকনাটক, ভাওয়াইয়া এবং লাহাংকারী গানের মধ্যে এর বিবরণ পাওয়া যায়। ভাওয়াইয়ার দরিয়া বিভাগে এবং লাহাংকারী গানে এই সকল নারীদের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোক সমাজে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। নারীপ্রধান সভ্যতার উপরে ক্রমে পুরুষ প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা হলেও নারীর মূল্য, সমাজ মোটের উপর স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কালক্রমে বাইরে থেকে অন্যকোনো পুরুষ প্রধান সমাজের প্রথা এই সমাজের উপর এসে পড়ে। যে তিনটি শাস্তরী লোকনাট্য আমরা দেখেছি ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সংকলিত মুকচাটু গঁসাইয়ের পালা ড. শিশির মজুমদার সংকলিত নয়ানশোরী এবং এখানে আলোচিত জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই — তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় — বৈষ্ণব শ্রেণীর কোনোব্যক্তির সঙ্গে তর্কালোচনায় নারীর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। বৈষ্ণব সমাজের কোনো গোস্বামীর সঙ্গে এইলোক সমাজের কোনো বিধবা নারীর তর্কের মাধ্যমে এই সমাজে নারীর এবং বিধবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখানোর অন্য তাৎপর্য পাওয়া যায়। এর সঙ্গে তর্ক যুদ্ধের প্রাচীন প্রথাটিও লক্ষণীয়। তিনটি ক্ষেত্রেই গোস্বামীর পরাজয় এবং জয়ী নারীকে তার ইচ্ছানুসারে বিবাহের কথা বলা হয়েছে। নারী লোকসমাজের প্রতিনিধি। 'গোস্বামী' উচ্চতর সমাজের। উচ্চতর তথাকথিত ভদ্রশ্রেণী সংস্কৃতি যখন লোকসমাজের উপরে আরোপিত হয়, তখন তার যে প্রকৃতি পরিবর্তন ঘটে তার কথা পাই গোস্বামীদের আচরণে। অন্যপক্ষে লোকসমাজের জীবন চিন্তাই শেষ পর্যন্তএ নাটকগুলিতে জয়যুক্ত হয়। জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালাগানে জ্ঞানবালার ভূমিকা এই দিক থেকে সৃষ্ট। বাইরের থেকে আরোপিত কোনো বস্তুর উপর নির্ভর করে রচিত ও প্রদর্শিত নয় এই পালাগান। বাংলা লোকনাটকের ইতিহাসে এরূপ নারীচরিত্রের প্রকাশ বিরল। পালানাটকটি গীত, নৃত্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে চলে এই কথা আগেই বলা হয়েছে।

পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের বক্তব্য অধিকাংশ সময়েই গীতের মধ্য দিয়ে ঘটে। বিষয়টিকে দর্শক শ্রোতাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে এই ব্যবস্থা। দর্শকের মনে রসের সঞ্চারের জন্য যেমন গীতের ব্যবহার ঠিক তেমনি কথারও ব্যবহার, রয়েছে। আর এই গীত বা সংলাপের ভাষা অধিকাংশ সময়েই আঞ্চলিক। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

বগুলা গোঁসাই ঃ বাউ তুই কায় ?

পটপুটিয়া ঃ মুই ক্যাছেরার ব্যাটা/ছেরাদ্দের সময় গেসিলেন।

বগুলা ঃ যাবেন তোমরা কুন্তি ?

পটপুটিয়া ঃ বড়ই দুঃখে গোঁসাই
আসিলাম তোমার বাড়ী।

বগুলা ঃ কি তায় আসিলেন বা?

পটপুটিয়া ঃ বড়ই দুঃখে আসিচু গোঁসাই।

গান ঃ দিনু গুরু দায়

ধন সম্পত্তি ফুরায়ে যায়া,

মুই মানষের ভিতর নাই।

দেও মোক ঝোলা মালা,

দেও গোপাল ডাং,

দ্যাশ বিদেশে মুই ভিক্ষা করিয়া খাম।

সংলাপ কিছু সময় ধরে চলতে থাকলে গান শুরু হয়ে যায়। লোকনাটকের গান শুধু মাত্র গানের জন্য নয়। গানের ভিতর দিয়ে রসসঞ্চার যেমন হয়, তেমনি সংলাপের কাজটিও সেরে নেওয়া হয়। এই গানে উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়ার দরিয়া ও লাহাংকারী গানের সুরের প্রভাব বিদ্যমান। এই এলাকায় মনোশিক্ষা বা দেহতত্ত্বের গানের পরিচিতি ব্যাপক। এই মনোশিক্ষা বা দেহতত্ত্ব গানে অধ্যাত্মকথা, পৃথিবীর নশ্বরতা, পরলোকের বিষয় মুখ্য হয়ে ওঠে। এই সকল শাস্ত্রসম্মত গানগুলোর বিশেষ অংশ এই লোকনাটকে গীত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ করা যায় — ওই মন মাতঙ্গ বান্ধব

সদায় মন মোর আনন্দ

গুরু বলিয়া ডাকরে মন

এ দেহটা নিশির স্বপন।

'শাস্তরী' গান বলে শুধু শাস্ত্রসম্মত কথাই থাকে না। নাটক যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই এখানে তৎকালীন বিধবা নারীর স্বামীবিহীন যন্ত্রণাও ক্রন্দনে ফুটে উঠেছে।

জ্ঞানবালার গীত ঃ ছোটয় ছিনু ভালো ছিনু

বাপ মায়ের কোলে।

বেহা হয়য়া হনু আড়ি

নিজ কর্মের দোষে।

বেশী বয়সের পুরুষের সঙ্গে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিয়ের প্রচলন ছিলো। বাল্যকালে বাবা-মায়ের কাছে আদর যত্নের কোনো অভাব ছিলো না। কিন্তু স্বামীহীনা হওয়ার পর তাঁর দুঃখের আর শেষ থাকে না। গোটা লোকনাটকটি ঘিরে রয়েছে সমকালীন সমাজ জীবনের চিত্র। এই আলোচনার সঙ্গে সংযোজিত লোকনাটকটি অনুধাবন করলে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হবে।

# রাজধারী

রাজধারী তরাই অঞ্চলের একটি অনাবিষ্কৃত লোকনাটক। এ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি নিয়ে লেখা গ্রন্থে রাজধারীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচন করেছেন। রাজধারী তাঁর এলাকার মধ্যে পড়ে নি। পরবর্তীকালে লোকনাট্যের যেসব সংকলন গ্রন্থ বা আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির কোনোটিতে রাজধারী সম্বন্ধে কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। কাজেই বলা যেতে পারে রাজধারী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। এই রাজধারী অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি নাট্যরূপ। নাট্যবৈচিত্রের কারণে এবং লোকনাট্যের রূপায়ণের বিশেষত্বের দিক থেকে রাজধারীর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। উত্তরবাংলার দীর্ঘকালের সংহত সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এই এলাকার লোকনাটকগুলি। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নেমে এসে সমতলে মিশেগেছে তরাই অঞ্চল। বনানী, চা বাগিচার ঘন রাশি, নানান ছোটো ছোটো পাহাড়ী নদী, উঁচু-নীচু চাষের জমি দিয়ে ঘেরা তরাই। এর জনপদগুলো কালোক্রমে নাগরিক জীবনের প্রভাবে আধুনিক হয়ে উঠছে। এই জনপদগুলোর মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বৈষ্ণবতার ভাবে ভাবিত তাঁদের জীবন। বৈষ্ণবীয় জীবন চর্যা তাদের প্রতিদিনের নিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনকে করে তুলেছে সংযমী এবং ভক্তি ভাবময়। ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর নিয়ম এখানে তেমন একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ সহজ জীবন চেতনার সঙ্গে বৈষ্ণবতাকে মিলিয়ে জীবনে একটা নৈতিকতা এবং সহজধর্ম বজায় রাখতে পেরেছেন। সেই জন্য এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতিতে বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

রাজধারী এখানকার প্রাচীন লোকনাটক। মনে করা যায় গানের মধ্যে অভিনয় যুক্ত হয়ে অন্যান্য লোকনাট্যের মতো এরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এর বিষয় রামায়ণ থেকে নেওয়া। রামের সঙ্গে রাবণের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত রামের কাছে রাবণের আত্মসমর্পণের কাহিনী এই নাটকের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। রাজধারী দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের নাটক শিলিগুড়ির গ্রামাঞ্চলে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে এবং উত্তর দিনাজপুরের কোন কোন অঞ্চলে এর প্রচলন আছে। এই অঞ্চল সন্নিহিত বিহারের কিষাণগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ এবং নেপালের তরাই অঞ্চলের ঝাপা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাজধারী লোকনাটকের প্রসার দেখা যায়। এই নাটকের পরিবেশন, উপস্থাপন পদ্ধতি, ভাষা, পোশাক ও মুখোশের ব্যবহার, ইন্দ্রজাল সৃষ্টি, শ্রোতাদের সঙ্গে নিবিড় মিলন, মঞ্চ ও রাবণের সিংহাসন পরিকল্পনা প্রায় সমস্ত কিছুতে একটা নতুনত্বের দাবী রাখে।

'রাজধারী' নাটকের আর একটি নাম লংকার গান। রামচন্দ্রের সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বন গমন থেকে লংকায় সীতা উদ্ধার পর্যন্ত 'রাজধারী' গানের বিষয়। লংকাকাণ্ডের বিষয় এর আখ্যানের প্রায় মূল ঘটনা। তাই

একে লংকাগান বলা হয়ে থাকে। এই নাটকের চরিত্রগুলির পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবহার রাজকীয়। লঙ্কার রাজা রাবণকে নিয়ে এই গান পরিবেশিত হয়। রাবণের রাজকীয় আড়ম্বর এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। তাই এই নাটককে 'রাজধারী' বলা হয়ে থাকে। 'রাজধারী' নামটি সম্বন্ধে আর একটি অনুমান করা যায়। এই নাটকের বিষয় রাবণের রাজ-মহিমা, রাজশক্তির অহংকার এবং দম্ভের প্রকাশ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রাজমহিমা বনবাসী রামের চরণে বিসর্জিত হয়। রাবণের শক্তির দম্ভ ভেঙে যায়। রামের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। তখন মনে হয় রামই প্রকৃত 'রাজা' আর রাজা পদবীধারী রাবণ কেবল 'রাজবেশধারী। তার অহংকৃত রূপ ভেঙে পড়ে। তাই রাবণ রাজবেশধারী বা 'রাজধারী' মাত্র। রাবণের কাহিনী এবং রামের কাছে তার আত্মসমর্পণ ও রামের আশ্রয়লাভ এই নাটকের মূল বিষয় বলে এর নাম 'রাজধারী' — এমনটা হতে পারে।

**'রাজধারী' নাটকের উপস্থাপনা ঃ**

এই নাটক কারো বাড়ীতে হয় না। কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় অথবা প্রয়োজন মতো স্থান নির্বাচন করে এই নাটক প্রদর্শিত হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির বাইরে অথচ এমন স্থান যেখানে বাড়ীর মহিলারাও অনায়াসে আসতে পারেন। অবশ্য মহিলারা বর্তমানে যে কোনো মুক্ত মঞ্চের অনুষ্ঠানই দেখতে আসছেন। শ্রোতাদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা পুরুষদের প্রায় কাছাকাছি। এই নাটকের স্থাননির্বাচনের সঙ্গে মঞ্চ পরিকল্পনা যুক্ত থাকে। প্রায় ২০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া বর্গাকার ক্ষেত্র আসর হিসাবে ব্যবহার করা হয় একটি জায়গা নির্বাচন করার পর সেই স্থানে রাবণের সিংহাসন তৈরী করা হয়। বাঁশ দিয়ে তৈরী এই সিংহাসনে পৌঁছতে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। রাবণের পদাধিকারগত উচ্চতাকে প্রকাশ করার জন্য এই ব্যবস্থা। এই মঞ্চসজ্জাকে লোকভাষায় বলা হয়ে থাকে 'লংকা বান্ধা'। এটি লংকার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রাচীন লোকনাট্যের ইতিহাসে খোলা মঞ্চের ব্যবহার ধারাবাহিক ভাবে দেখা যায়। এই মঞ্চের উত্তর-পূর্ব কোণায় বাঁশ দিয়ে একটি ঘরের মতো আচ্ছাদন তৈরী করা থাকে। এটিকে অশোকবন রূপে চিহ্নিত করা হয়। এখানে রাম-লক্ষ্মণ আশ্রয় নেয়। মঞ্চের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে শ্রোতাদের বসার জায়গা। দক্ষিণদিকে শিল্পীদের জন্য খোলা প্রাঙ্গণ।

মঞ্চে শিল্পীদের ব্যবহৃত মূল বাদ্যযন্ত্রগুলি হলো খোল, ঢুলকি, ডুগি-তবলা, কাড়ানাকাড়া, বাঁশি ও করতাল। এই যন্ত্রগুলোর অধিকাংশই শিল্পীদের নিজেদের তৈরী। বাজনাদাররা শুধু বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করেন না, তাঁরা অভিনয়ের বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে কখনো লিপ্ত হয়ে যান। তবে তাঁদের যন্ত্রসঙ্গীতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বাদ্যযন্ত্রীরা এই নাটকে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য নাটকের মতো আসরের মাঝখানে বসেন না। মঞ্চের একদিকে বসেন। রঙ্গমঞ্চে যাওয়ার জন্য একটি সরু পথ থাকে। অন্য দিকে থাকে লংকার সিংহাসন। এইরূপ মঞ্চ পরিকল্পনা বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের লোকনাটকের মঞ্চ থেকে আলাদা।

অভিনয়ে শিল্পীদের বিশালাকার মুখোশের ব্যবহার লক্ষণীয়। মুখোশের ব্যবহার বাংলার লোকনাটকে নতুন নয়। দিনাজপুরের ব-খেলা কিংবা পুরুলিয়ার ছৌ-এ মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু রাজধারী লোকনাটকে লংকায় বসবাসকারী চরিত্রগুলোর মধ্যে বড় বড় মুখোশের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রে মুখোশের কোনো ব্যবহার নেই। তারা ধুতি-পাঞ্জাবী পরেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিপরীতদিকে লংকাবাসীদের চরিত্রের কর্কশভাব ও ভয়ংকরতা ফুটিয়ে তোলার জন্য এই সকল মুখোশের ব্যবহার করা হয়। রাম লক্ষ্মণের মধ্যে বীরভাব অপেক্ষা বৈষ্ণব ভাবই প্রধান। রাবণের মুখোশ বিশাল আকৃতির। দেড় ফুট চওড়া এবং আড়াই ফুট লম্বা। ওজনের দিক থেকে কম পক্ষে ৭-৮ কিলোগ্রাম। গামারি, শিশু বা সেগুন কাঠের তৈরী এই মুখোশ। একবার এই মুখোশ তৈরী হলে তা দীর্ঘদিন সযত্নে রাখা হয়। রাবণের মুখোশের দুপাশে দেড়ফুট লম্বাকারে আরো দুটো মুখোশ থাকে। মুখোশের উপরিভাগ বরাবর ছোটো ছোটো কাঠের তৈরী দশমুন্ড। সব মিলিয়ে ১৮ থেকে ২০ কিলোগ্রাম ওজন এই মুখোশটির। এই মুখোশ পরে রাবণকে মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে অভিনয়ের জন্য চলাফেরা করতে হয়। কুম্ভকর্ণের মুখোশও বিশালাকৃতির। দেড়ফুট চওড়া, দু' ফুট লম্বা, ওজন ৮ থেকে ১০ কিলোগ্রাম। কুম্ভকর্ণের মুখোশের মধ্যে ভয়ংকরতার চেয়ে নিদ্রালুতার ভাব বেশী। উর্মিলার মুখোশ ১ ফুট চওড়া ২ ফুট লম্বা। মহীরাবণের মুখোশও বেশ বড়ো আকৃতির। এক ফুট চওড়া আড়াইফুট লম্বা। মুখোশের দুদিকে দুটি ছোটো মাথা লাগানো অতিরিক্ত মুখোশ আছে। মুখোশ দুটির একসঙ্গে ওজন প্রায় ১০ কিলোগ্রাম। মুখোশগুলির বেশীর ভাগই উজ্জ্বল বেগুণী রঙের। মহীরাবণের মুখোশের মধ্যে একটা চাতুর্যের ভাব আছে। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের মুখোশ এক ফুট চওড়া, দু' ফুট লম্বা। এই মুখোশটিরও ওজন প্রায় ১০ কিলোগ্রাম। ইন্দ্রজিতের মুখোশের মধ্যে ভয়ংকরতার চেয়ে শৌর্যের ভাব বেশি। সেখানে একটা রাজকীয়তার ভাব পরিস্ফুট হয়। রাবণভগ্নী সূর্পনখার মুখোশ দুটি। একটি খয়েরি রঙের আর একটি সাদা। মুখোশ দুটি এক ফুট চওড়া দু' ফুট লম্বা। সিপাইরা যে মুখোশের ব্যবহার করে সেগুলো দেড় ফুট চওড়া, দুই ফুট লম্বা; এগুলোর রং খয়েরি। হনুমানের মুখোশ এক ফুট চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা। এই মুখোশের রং লাল। জাম্বুবানের ক্ষেত্রেও এক ফুট চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা কিন্তু এক্ষেত্রে মুখোশের রং কালো। আরো কয়েক প্রকার মুখোশ থাকে - লাল, নীল, এবং সাদা রঙের। এগুলো বানরের মুখোশ। একটি বৃহৎ আকারে বাঘের মুখোশ থাকবে। একটি গড়ুর পাখীর বৃহৎ আকারের ঠোঁট দেখা যায়। সেটি লম্বায় ৩ ফুট হবে। দেবী দুর্গার একটি ভূমিকা এই নাটকে আছে। দেবী দুর্গার দশ হাতের পরিবর্তে এখানে আটটি হাত দেখানো হয়। হাতগুলিতে ত্রিশূল, গদা, ও ধনুক দেখা যায়। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মুখোশের ব্যবহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং লোকনাট্যের পালায় দেখা যায়।

নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থে কোনো কোনো লোকনাট্যের অনুষ্ঠানে মুখোশের ব্যবহারের কথা বলেছেন। গম্ভীরা লোকনাট্যে মুখোশের ব্যবহার আছে। নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন— পৌরাণিক যুগের কোনো মানুষ বা প্রাণীর মুখোশ ধারণ করিলে সেই যুগেরও সময়ের ভাব দর্শক ও ধারয়িতার মনে সঞ্চরিত হয়।"[৪৫] সম্ভবত এই প্রাচীন যুগের ভাবমণ্ডল সৃষ্টির কারণে রাজধারী লোকনাট্যে এরকম মুখোশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিল্পীরা চরিত্রানুযায়ী পোশাক ব্যবহার করেন। পোশাক বেশ উজ্জ্বল এবং রাজকীয় আড়ম্বর প্রকাশের উপযোগী। মেকআপ-এর জন্য জল, আলতা, সিঁদুর, আবীর, অভ্র ব্যবহৃত হয়। পরচুলার ব্যবহার প্রয়োজন মত হয়ে থাকে। এখানে যে মুখোশের ব্যবহারের কথা বলা হলো সেই মুখোশগুলো পুরুলিয়ার ছৌ-এর মুখোশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রাজধারী নাটকে রাম-লক্ষ্মণের কোনো প্রকার মুখোশের ব্যবহার নেই। পুরুলিয়ার ছৌ-এ প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখোশ ব্যবহার আবশ্যক।

'রাজধারী' নাটকটি মঞ্চস্থ করবার জন্য বাদ্যযন্ত্রী সহ ৬৫ থেকে ৭০ জন শিল্পীর দরকার হয়। এত বেশী সংখ্যক মানুষকে বর্তমানে একই সময়ে পাওয়া সম্ভব হয় না। সেই কারণে প্রায় ৩০ জন শিল্পী এই নাটকে অভিনয় করেন। বর্তমান যে নাট্যদলটি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ী এলাকায় এ নাটকের উপস্থাপনা করে সেখানে ১৮ জন শিল্পী ৫৮টি চরিত্র রূপায়িত করেন। কখনো এক একটি চরিত্র ৬ থেকে ৮ টি চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় চরিত্র বদলের সময় পূর্ব চরিত্রের ছাপ সেই চরিত্রে প্রতিফলিত হয় না। বিশাল বিশাল মুখোশ অতি দ্রুত বদল করে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে এঁরা অভিনয় করেন। স্বর বদলের ক্ষেত্রেও কোনো অসংগতি পরিলক্ষিত হয় না।

ইন্দ্ররাজা, খর, বিরাট, সিপাই, ব্রহ্মা, ইন্দ্রজিৎ, কালনেমি এবং বালি চরিত্রে অভিনয় করেন ডমন লাল সিংহ। আটটি চরিত্রে বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তি যথাযথ ভাবে সংলাপ বলে যেতে পারেন। শিব, হনুমান ও সূর্পনখা চরিত্রে অভিনয় করছেন শচীন রায় সিংহ। পুরুষ চরিত্র ও স্ত্রী চরিত্র একই ব্যক্তি করছেন। স্বরবদলের ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা হয় না। দূষণ, তরণীসেন, ইন্দ্রজিৎ, সূর্যদেব, মহীরাবণ এবং যোগীরাবণ চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন ভবানন্দ সিংহ। ছয়টি চরিত্রে ভবানন্দ সিংহের অভিনয় করতে কোনো অসুবিধে হয়না। গহন সিংহকে সৈন্য ও বানরের ভূমিকায় দেখা যায়। চারটি চরিত্র যথাক্রমে মুনি, তিরসিরা, অঙ্গদ ও চেরী একজন অভিনেতা সেরকেত সিংহের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়। সুপেন সিংহ মুনি, বিষ্ণু ও মারীচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সরস্বতী, বানর, অঙ্গদ ও মহীরাবণের ছেলের অভিনয় করেন রঞ্জিত মালাকার। দুর্গা, বিদ্যুতজিহ্বা, মন্দোদরী, গন্ধকালী ও পাতাল কালী এই পাঁচটি চরিত্রে বলেন সিংহ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। দেবেন মালাকার শুধু অভিনয়ই করেন না, নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তিনি

একাই তারাদেবী, সরমা, সূর্পনখা, সৈন্য, ত্রিজটা মুনি ও কৌশল্যা প্রভৃতি সাতটি ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। রাজু মালাকার ছেলেটি ছোটোখাটো এবং হাল্কা শরীরের, দেখতে সুন্দর। গলার স্বরটিও মিষ্টি। রাজু অভিনয় করেন লক্ষ্মী ও সীতার ভূমিকায়। অসুর ও বিভীষণের ভূমিকায় ধীরেন মালাকার, গণেশ ও রামচন্দ্রের ভূমিকায় শতো মালাকার অভিনয় করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মুনিদের ভূমিকায় কোনো মুখোশের ব্যবহার নেই। সেক্ষেত্রে এই অভিনয় যারা করেন তাদের শরীরের গঠন ও রঙের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। শত মালাকার দেখতে সুন্দর। তিনি রামচন্দ্রের অভিনয় করেন। হুদুম বর্মন কার্ত্তিক ও লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করেন। অনিল মালাকার সুন্দরী যুবতী ও গৌতম মালাকার হরিণ রূপে মঞ্চে আসেন। কিরণ সিংহ, ব্রহ্মা, সুগ্রীব ও রাবণের ভূমিকায় দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে যারা যুক্ত থাকেন তাদের মধ্যে শশীলাল সিংহ, সমু সিংহ, নিখিল পাল, বীরেন সিংহ, চিত্র বর্মন এবং উমাকান্ত সিংহ যথাক্রমে বাঁশি, হারমোনিয়াম, খোল, করতাল, ফ্লুট বাজান। গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে কালিয়া বর্মন, গহন সিংহ, রমণীকান্ত সিংহ, সমু সিংহ, পরবাসু বর্মন। সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বসনলাল সিংহ। বসনলাল পুরুষানুক্রমে এই পালাটির অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বহু সংখ্যক মানুষকে একটা দলের মধ্য টেনে এনে দলকে ধরে রাখা বেশ কঠিন। তাকে যথেষ্ট সতর্কতায় কাজ করতে হয়। রমেশ মালাকার সহপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

এই নাটকে রাবণের উচ্চ সিংহাসন তৈরীর একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। সহপরিচালককেই 'লঙ্কা বান্ধা' অর্থাৎ সিংহাসন তৈরীর ব্যাপারটি ঠিক করে নিতে হয়। এই নাট্য দলটির সাজ সজ্জার দায়িত্বে থাকেন বিদেশী বর্মন। নাট্যদলের লোকের কাছে তিনি সাজার লোক হিসাবে পরিচিত। এই শিল্পীরা গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। তাদের অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। কৃষক, সম্পন্ন গৃহস্থ, ক্ষেত মজুর, গ্রামীণ শিল্পী, চাকুরে, প্রাথমিক শিক্ষক ইত্যাদি পেশায় তারা যুক্ত। কেউ কেউ শহরে বা পার্শ্ববর্তী নেপালে গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা দলনেতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। যে কোনো সময়ে তাদের ডাক আসতে পারে। এই সকল গুণী মানুষরা প্রায় সবাই রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অঞ্চলের রাজবংশীগণের ধর্মীয় ভাবনা এই লোকনাটকের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নাটকের পর্যালোচনা ঃ

এবার আমরা রাজধারী গানের বিষয়বস্তুর ভেতরে প্রবেশ করবো। অনুষ্ঠান শুরুতে মঞ্চে মূল গায়ক সহ সাতজন বাদ্যযন্ত্রী প্রবেশ করেন। তাঁরা মঞ্চের একদিকে বসেন। অন্যান্য পালাগানের মতো মঞ্চের মাঝখানে আসন গ্রহণ করেন না। লংকার সিংহাসন যে দিকে থাকে তার কাছাকাছি শিল্পীরা বসেন।

মূল গায়ক রামলক্ষ্মণ বন্দনা দিয়ে গান শুরু করেন —

একবার দয়া করে আয় হে
একবার কৌশল্যার নন্দন হে প্রভু
রাম আয় হে
একবার সুমিত্রার নন্দন লক্ষ্মণ বীর
আয় হে
একবার কৈকেয়ীর নন্দন হে
ভরত-শত্রুঘ্ন আয় হে
একবার ব্রহ্মার নন্দন হে
জাম্বুবান আয় হে
একবার পবনের নন্দন হে
হনুমান আয় হে
একবার কিসকিন্ধ্যা নগরের হে
বালি-সুগ্রীব আয় হে
একবার বালীর নন্দন হে
অঙ্গদ বীর আয় হে

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বন্দনাও করা হয়।

একবার সোনার বরণ গৌর চান
কোথায় গেলে পাবো রে
ওই আমি আর না হেরিবোরে
হরি নাম সংকীর্তন প্রচার করিলোরে
গৌর ঐ আমি আর না হেরিবোরে

এরপর আবার রামচন্দ্রকে বন্দনা করে অন্যান্যদের বন্দনা —

ওহে রাম বন্দুবন্দু রামের যুগলচরণ
হে রাম বন্দু
ওই যে ভকতি করে বন্দি মাতা
কৌশল্যার চরণ হে রাম

এইভাবে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নসহ রামচন্দ্রের সপক্ষে যারা রয়েছে তাদের সকলকে বন্দনা করে নাটকের

মূলে প্রবেশ করেন গায়ক।

এই নাটকে বন্দনা অংশ শেষ হওয়ার পরই 'ডাক' বলে একটি বিশেষ পর্ব রয়েছে। এই 'ডাক' পর্বটি তুলসীদাসের রামায়ণে 'দোহা-' রূপে দেখা যায়। 'ডাক' এর উদাহরণ —

(ক) অযুতা কান্ডতে হইলো শ্রীরামের বন।
অরণ্য কান্ডতে সীতাকে হরিছে রাবণ।।

(খ) কিসকিন্দা কান্ডতে হইলো সুগ্রীব মিলন।
সুন্দরা কান্ডতে রাম বান্ধিলো সাগর।।

(গ) সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য কলে পার।
দিনে দিনে রাবণ রাজার টুটে অহংকার।

(ঘ) সর্বনাখার ময়া নিলা কে চিনিতে পারে।
রাইক্কস মূর্ত্তি ছাড়িয়া যেন সুন্দর মূর্ত্তি ধরে।।

বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গায়করা অথবা অভিনয়কালীন কোনো চরিত্র চিৎকার করে ঐ 'ডাক'গুলি দিয়ে থাকেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই নাটকীয় ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে। 'ডাক'গুলি শুধু আহ্বানই নয় এর মধ্যে কাব্যগুণও রয়েছে।

যেমন — বিরাট বীর মারা পইরে অরণ শব্দ হইলো।
গৃহ হইতে উর্মিলা বীর সাজনি করিলো।

উল্লেখিত 'ডাক'-এ পাই বিরাট বীর মারা গিয়েছে, অরণ্যে শব্দ হচ্ছে। বাড়ী থেকে উর্মিলা বীর যুদ্ধের জন্য সাজতে লাগলো। ঘটনার ক্রমবিকাশ এবং পরস্পরিক সংলগ্নতা 'ডাক'-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

রাজধারী লোকনাট্যের বিষয় রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে বহু গান পালা লোকনাট্যের রূপায়ণ হয়েছে। এই রাজধারী লোকনাট্যে লোককবি প্রায় পুরো কাহিনীকেই অল্প সময়ে উপস্থাপিত করেছেন। কাহিনী লঙ্কার রাবণের দিক থেকে দেখানো। বন্দনা গানের পরে দুই মুনির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্য পালার সূচনা। পালার সূচনায় চরিত্রের পরিচয় দেবার প্রয়োজন। লোকপালায় কথা থেকে আর সাজপোষাক থেকে দর্শকরা এই চরিত্রগুলিকে বুঝে নিতে পারেন। এই পালায় দুই মুনি মঞ্চে এসে পরস্পরকে পরিচয় জিজ্ঞেস করেন।

প্রথম মুনি ঃ ওরে মুনি হে, তুমি কুন মুনি হে

দ্বিতীয় মুনি : আমি অগস্ত্য মুনি হে, আরে তুমি কুন মুনি হে

প্রথম : আমি বিবর্ণ মুনি হে

এই ভাবে দুই মুনির পরিচয় দেওয়া হলে। তাদের কথার মধ্যে এলেন ইন্দ্ররাজ। তিনি এই মুনিদের প্রণাম করলেন। বিবর্ণ মুনি বললেন —

ওরে বাপু ইন্দ্ররাজ শুনহ বচন,

এখানে আসিলে বাপু কিসের কারণ ?

এইভাবে মুনির কথায় ইন্দ্রের পরিচয় পাওয়া গেলো। ইন্দ্র জানিয়ে গেলেন রাম আসবেন। তাঁর জন্য তিনি ধনুর্বাণ এনেছেন। সেগুলি যেন রাম লক্ষ্মণকে দেওয়া হয়। ইন্দ্র চলে যাবার পর এলেন রাম লক্ষ্মণ সীতা। এই তিনজনকে দেখে দর্শক এদের পরিচয় বুঝতে পারেন। উপরন্তু সংলাপে আসে পরিচয় দেবার কথা। রামের গানে তার প্রকাশ —

ওরে ভাইরে লক্ষ্মণ

রাইজ্য নাশি বনরে বাসীহে সঙ্গে সীতা ভাইরে

এইভাবে রামের পরিচয় পাওয়া গেল। এরপর মুনির পরিচয় জিজ্ঞাসা —

ওরে বাপু ছাইলারে তিনজন,

কথাকার বসন্তি কাহার নন্দন।

কিসের জন্য ফির বাপু পঞ্চবটী বনরে ?

রামের পরিচয় দান —

ওকি ও মুনি ঠাকুর, শুন মুনি ঠাকুর

ওহে অযুতার বসন্তি হামেরা দশরথ নন্দন

পিতার সত্যপালিতে দুই ভাই ফিরি বনে বন।

মুনিরা রাম লক্ষ্মণকে রাক্ষসের মায়া সম্বন্ধে সতর্ক করে নিজেদের তপস্যা যে সার্থক হল তা জানিয়ে চলে যান। গায়কেরা হরিধ্বনি দেয় — সর্বলোকে হরি বল রে। এই পর্যন্ত হল নাটকের উপস্থাপনা। পরবর্তী অংশে আসে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে আরণ্য রাক্ষসদের যুদ্ধ। প্রথমে বিরাট ও পরে উর্মিলা রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের বর্ণনা একই রকম।

বিরাটের প্রবেশ ও সীতা হরণ (রামায়ণে এর নাম বিরাধ)

রাম — ওকি ও ভাইরে লক্ষ্মণ, হের আসে দেখ আমার সীতার দুর্গতি রে ভাই।

লক্ষ্মণ — ওরে বেটা রাইক্কস দুরাচার,

শিরাম মানুষ না হয় ত্রিজগতের নাথ।

রাইক্কস বধিবা হেতু হয়েছে প্রকাশ।।

যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি ধর।

আজিকার রণে বেটা তোক পাঠাব যমের ঘর।।

যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিরাটের মুণ্ড কেটে ফেলল। এরপর এল ঊর্মিলা বীর। একই ভাবে সেও যুদ্ধে মারা যায়। যুদ্ধের বর্ণনা গায়েনের গানে —

ও বীর যুদ্ধ করে রে।

প্রথমে যে হইলো বীরের মোর মুখতে গালাগালি,

ও বীর যুদ্ধ করে রে।

দুইজনকার ভরে যেন মোর কাঁপেছে মেদিনী, ও বীর যুদ্ধ করে রে।

যুদ্ধে ঊর্মিলার মুণ্ড কেটে ফেলল লক্ষ্মণ। এরপর ডাকের গানে কাহিনীর যোজনা।

ডাক — ঊর্মিলাক মারিয়া প্রভু আনন্দ হইলো।

ঘোটনা বান্ধিতে প্রভু নিজে আইগা দিলো।।

ডাকের কথাতেই আমরা জানতে পারলাম —

ঘোটনা বান্ধিয়া প্রভু ঘোটে প্রবেশিলো।

মানব মানব বসন তবে সৌরভ ছুটিলো।।

ওরে মানব সৌরভ পায়া - রাইকসিনী আইলো ধায়ারে —

সূর্পনখা সুন্দরী রূপ ধারণ করে রামের কাছে যায়, রাম তাকে লক্ষ্মণের কাছে পাঠান। লক্ষ্মণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ডাকের গানে তখন জানতে পারি — সূর্পনখা রাক্ষসমূর্তি ধরে সীতাকে ভয় দেখায়।

লক্ষ্মণ — গে রাইক্কসনী গে রাইক্কসনী

কুন মুখে খাবো সীতাক দেখ্ তোর জিহ্বার পুতনী, গে রাইক্কসনী

লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাক কান কেটে নেন। সূর্পনখার ডাকে যুদ্ধ করতে এসে খর দূষণ মারা পড়ে। ভগ্নদূত গিয়ে রাবণকে সব জানায়। কাহিনীর জোড় লাগে ডাকের বচনে।

খর ঢুসন মারা পইরে অরণ শব্দ হইলো।

ভগ্নদূত রাবণ রাজাকে বারতা জানাইলো।।

ভগ্নদূতের কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়। সারথিকে বলে —

কান্দে কান্দে ভগ্নী মোর পরে গেল পায়।
সরবাঙ্গ জ্বলে গেল মোর অগ্নি দিল গায়।।
কান্দে কান্দে ভগ্নী মোর কান্দে মনো দুখে।
সরবাঙ্গ জ্বলে গেল মোর কাটা নাকটা দেখে।।

রাবণের যা কিছু প্রতিক্রিয়া — ভগ্নীর জন্য মনো দুঃখে তার উৎস। কাজেই রাবণ রামকে শাস্তি দিতেই সীতা হরণ করে আনে। এবং এরই ফল স্বরূপ রামের হাতে রাক্ষস বংশ ধ্বংস হয়। কাহিনীর মধ্যে এরপর রামায়ণের প্রায় সব ঘটনাই সংক্ষেপে নাট্য রূপায়িত হয়। মারীচের প্রসঙ্গ, বনবাসে রামসীতার দাম্পত্য জীবন, বালি সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান কথা, রাবণ পুত্রদের যুদ্ধযাত্রার কাহিনী, রাবণরাজার সিপাহীদের কথোপকথন — শেষ পর্যন্ত রাবণের মুখে রামের গুণকীর্তন — যুদ্ধ এবং সীতা উদ্ধার — সংক্ষেপে সবই এই নাটকে দেখানো হয়।

'রাজধারী' লোকনাটকে রাম-সীতার প্রসঙ্গ গৌণ। লঙ্কা রাজ্যের রাক্ষস বংশের বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপন এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। সীতাকে রাবণ হরণ করেছে। এই অন্যায় নিয়ে রাবণের কোনো খেদ নেই। তার দুঃখ একজন সামান্য নর তার বোন সূর্পনখার নাক কান কেটে দিয়েছে। নর কর্তৃক রাক্ষস জাতির অপমান — এটা রাবণের কাছে সহনীয় নয়। প্রবল জাত্যভিমান এবং বংশমর্যাদায় রাবণ সচেতন। রামায়ণ নিয়ে ভারতবর্ষের নানা কাহিনীতে রামচন্দ্রের স্থান মুখ্য। এখানে তা হচ্ছে না। এই গানের নাম হচ্ছে 'লংকা গান'। লংকার দিকের কথাই এখানে বেশী তাই রাবণ এই নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। রাবণের স্বদেশবোধ, জাত্যভিমান, বংশমর্যাদা, অপত্যস্নেহ, নারীদের প্রতি সম্মান, ভগ্নীপ্রেম সবকিছু মিলে রাবণ রাক্ষস মূর্তি ছেড়ে মানবীয় হয়ে উঠেছে। এই মানবীয় রাবণরূপই রাজধারী নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। এই চরিত্রটিই সকল চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে।

রাবণ — ইহি সাহারথি, আমার স্বর্ণ লংকাপুরী কেন শব্দ করেরে?

সারথি — আইগ্‌গা মহারাজ। আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হবে না? আপনার ভগ্নি সর্বনখার নাসা কর্ণ কর্তন হইয়াছে। আর খর-দুষণ ভাই মারা পড়িয়াছে। সেইজন্য আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ করে মহারাজ।

রাবণ — ইহি সাহারথি, সে আমার ভগ্নি সর্বনাখাকে নিয়া আইসো আমার গোচরেরে।

(সূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করে।)

শূর্পনখা — গে রাবণ দাদা হা, মোর নাকটা কাটিয়া লিছেগে

হে রাবণ দাদা হা
ফুল তুলিতে গিসনু দাদা পঞ্চবটীর বনে
ধরিয়া নাক কান কাটি দিসে

শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ হে দাদা হা।

রাবণ ভগ্নীকে আশ্বাস দিয়ে বলে তার কোনো চিন্তা নাই —

ইহি ভগ্নি সর্বনাখা কাটিচে কাটিচে
তোর চামর নাক কান
কালি বেহানে দিমু তোক সনার
নাক-কান গে ভগ্নি সর্বনাখা।

রাক্ষস রাজা রাবণ নিজে বেদনাহত। ভগ্নীর এই দুর্দশার কথা রাবণ সারথির কাছে বলছে —

রাবণ — ইহি সাহারথি, কান্দে কান্দে
ভগ্নি মোর পড়ে গেলো পায়।
সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো মোর
অগ্নি দিলে গায়।
কান্দে কান্দে ভগ্নি মোর কান্দে মন দুঃখে
সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো মোর কাটা নাকটা দেখে।

রাবণ এই দুঃখেই সূর্পনখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়। সীতার প্রতি তার কোনো বিরূপ মনোভাব নেই বরং তার প্রতি রাবণের ব্যবহার অত্যন্ত বিনম্র। ভগ্নী, পুত্র, মাতুল প্রত্যেকের প্রতি রাবণের স্নেহ। তারাও রাবণের প্রতি শ্রদ্ধাবান। এমনকি সীতাহরণ পর্বে সীতার প্রতি রাবণের মনোরম ব্যবহার কখনই রাবণকে কপটতার পর্যায়ে নিয়ে যায় না।

লংকাপুরীতে রাবণ বিনয়ের সঙ্গে সীতার নিকট প্রেম নিবেদন করছে —

সুন্দরী নানা রত্নে পূর্ণ আমার আগার,
যত দেখিতেছো সুন্দরী সকলই তোমার।
তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী,
অনুমতি দাও সুন্দরী চল আমার অন্তঃপুরী।

সীতা — আমার সেবক কহিলেন আপুনি
সেবক হইয়া কেন লংঘ ঠাকুরানী।
সেবক হইলে সেতো হন গুরুজন
সেবক হইয়া কেনো বলো কুবচন।
রামে প্রাণনাথ মোর রামে দেবতা

রাম ছাড়া অন্যজনকে নাহি চায় সীতা।

রাবণ — রামতো সামান্য নর অল্প তার ভক্ষণ
যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন।

সীতার প্রতি রাবণের এই ব্যবহার অপূর্ব শালীনতা পূর্ণ। এই শিষ্টতাই এ নাটকে রাবণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রাণী মন্দোদরীর প্রতি রাবণের সম্মান প্রদর্শন লক্ষণীয়। সীতার জীবনহরণে রাবণকে নিষেধ করছে মন্দোদরী।

মন্দোদরী — শুন শুন মহারাজ শুন মোর বাণী,
নারী হত্যা মহাপাপ সর্ব শাস্ত্রে শুনি।
শত মুনি বধিলে যত পাপ হয়,
এক নারী হত্যায় তত পাপ জানহ নিশ্চয়।

মন্দোদরীর কথা রাবণ মেনে নিয়েছেন। এতে শ্রোতাদের মন মুগ্ধ হয়। যুদ্ধ-সংকটে জয়ী হবার বাসনায় এক এক করে পুত্রদের সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠানোর সময় তাদের প্রতি পিতার মমতাময় আচরণে ও মন ভরে ওঠে। সারথি নির্দেশ মতো ইন্দ্রজিতকে রাবণের সম্মুখে হাজির করে —

ইন্দ্রজিৎ — ওগো পিতা লংকেশ্বর গে
আপুনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র আইলাম গে পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ — ওরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ, আইসো আইসো
পুত্র, তুই মোর বৈসো রত্ন সিংহাসনে
ত্রিফুল তামাকু মোর করহো ভক্ষণরে।

রাবণ পুত্রকে সস্নেহে কাছে ডেকে বর্তমান লংকার দুর্দশা বোঝাচ্ছেন এবং তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এইভাবে তাঁর অন্যান্য পুত্রদেরও কাছে ডেকেছেন এবং কর্তব্য সচেতন করেছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে সমস্ত লংকাপুরী শোকে হাহাকার করে উঠছে। সারথীর নিকট এই সংবাদ রাবণ জ্ঞাত হওয়ার পর ভ্রাতুষ্পুত্র তরণীসেনকেও ঠিক একইভাবে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। ভাই বিভীষণের শত্রুতাকে রাবণ ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট তুলে ধরেছেন অদ্ভুত বেদনার মধ্য দিয়ে —

রাবণ — ইহি পুত্র মোর তরণী,
শুনহ পুত্র তুই মোর দুঃখের কাহিনী।
বিভীষণ ধর্মে তৎপর,
হিত উপদেশ কত বুঝাইলো বিস্তর।
অহংকারে আমি ছিন্ন কইনু মতি,

বিনা অপরাধে ভাইয়ের বুকে মারিনু লাথি।
আমারে ছাড়িয়া ভাই বিভীষণ,
অনুরাগে লিয়াছে রামের শরণ।
ইহি পুত্র মোর তরণী —
রাক্ষসকুলের তুই হয়েছিস সুসন্তান
নর বানর মারিয়া রাখ আমার সম্মান।

তরণীসেনের প্রতি যেরূপ মমত্ববোধ তা তিনি মহীরাবণের ক্ষেত্রেও প্রকাশ করেছেন। পিতার আহ্বানে মহীরাবণ এসে বলে —

ওগো পিতা লঙ্কেশ্বর, সে তোমার মহীপুত্র আইলামগো পিতা লঙ্কেশ্বর

এর উত্তরে রাবণ বলে — আইসো পুত্র যে তুই মোর বস রত্নসিংহাসনে,
ত্রিফল তামাকু মোর করহ ভক্ষণ রে।

মহীরাবণ — ওগো পিতা লঙ্কেশ্বর, বসিলাম বসিলাম পিতা
তোমার রত্ন সিংহাসনে
ত্রিফুল তামাকু তোর করিলাম ভক্ষণ গে পিতা।
সে আমাকে কেন ডাকলেন গে পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ — ইহি পুত্র মোরে মহী
শুনহ পুত্র তুই মোর দুঃখের কাহিনী
সর্বনাখা তব পিসি আমার ভগিনী
হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক কান
কেমনে সহিবো বল এত অপমান রে।

এই নাটকে রাবণকে কখনও উগ্র বা উদ্ধত দেখানো হয়নি। তার ভগিনী সূর্পনাখার অপমান, রাক্ষস জাতির অপমান — এটা রাবণের পক্ষে অসহনীয়। তাই সে সীতা হরণ করেছে। রাক্ষস জাতির অপমান সহ্য করতে না পারা রাবণ চরিত্রের নৈতিক ভিত্তির মূল। রাবণ ঠিক ভোগের জন্য সীতা হরণ করে নি, করেছে রাম লক্ষ্মণকে সমুচিত দুঃখ দিয়ে ভগ্নী সূর্পনখা ও রাক্ষস জাতির অপমানের প্রতিশোধ নিতে। রাবণের কথা শুনে মহীরাবণ রাম লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে গিয়ে বধ করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। রাবণ আশ্বস্ত হয়। পুত্রদের প্রতি তার স্নেহও খুব প্রবল। বরং ভাই বিভীষণ তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে — এটা যেন তারই দোষ।

রাবণকে বলতে শোনা যায় তরণীসেনকে উদ্দেশ্য করে —

'অহংকারে আমি ছিন্ন কইনু মতি
বিনা অপরাধে ভাইয়ের বুকে মারিনু লাথি
আমারে ছাড়িয়া ভাই বিভীষণ
অনুরাগে লিয়াছে রামের শরণ'।

রামচন্দ্রের কাছে নাটকের শেষে গিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের পূর্বে নিজের বেদনাকে প্রকাশ করছে রাবণ —

এ প্রভু, ঘরে ঘরে মোর কান্দে রানীগণ
শুন প্রভু রঘুনাথ রে
এ প্রভু, সর্বনাখড়ার কথা ধরনু
লংকাপুরী শূন্য করনুরে হে
বাতি দিবার মোর কেহ না রহিলো রে হে

সম্মুখ যুদ্ধের ঠিক পূর্বেই রাবণের মনের গভীর বেদনা ক্রন্দন হয়ে প্রকাশিত হয়। সেই সময় দর্শকগণও বেদনায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। রাবণের এরূপ পরিবর্তন দর্শক মনকে কারুণ্যে মথিত করে। রাজধারী নাটকে রামায়ণের বহু চরিত্রের ব্যবহার করা হয়। বহু চরিত্রের পারস্পরিক কথপোকথন, সংলাপের বৈচিত্র্য দ্বন্দ্ব সবমিলিয়ে নাটকটি হয়ে উঠেছে এক কথায় অভিনব। শুধুমাত্র রাবণ চরিত্রের কাহিনীই এখানে মুখ্য হয় নি। রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রকে এখানে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজধারী গান রামায়ণ কাহিনীর লৌকিক নাট্যরূপ। কাজেই এর মধ্যে সমকালীন জীবনের কথা না থাকারই কথা। আমাদের বিশ্লেষিত কুশান পালা অংশে দেখিয়েছি সেখানে রামায়ণের অনুসরণ যথেষ্ট মূলানুশ্রিত। কিন্তু রাজধারী পালাগানের মধ্যে রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে লোকজীবনের কিছু কথাও মিশে গেছে। এ কারণে রামায়ণ কথার আশ্রয় করলেও পালাটি রাজবংশী জীবনের কথার একটি ছবি রূপে ফুটে উঠেছে। এতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের লোকজীবনের চিত্র বৈষ্ণবতা, রামভক্তি এসবই প্রতিফলিত হয়েছে।

কাহিনীর শুরুতেই যে গৌরবন্দনা পাওয়া যায় তাই যেন পালার মূল ভাবটিকে স্থির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

একবার দয়া করে আয় হে গরা, কৃপা করে আয়

এই সমবেত প্রার্থনা — সমষ্টি জীবনের মূল ভাবটিকে তুলে ধরে লোকজীবনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিস্ফুট করে তোলে। উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে বৈষ্ণবতার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের ভাবটি এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও প্রতিফলিত হয়। রাজধারীগানের এই গৌরবন্দনায় সেই ভক্তিভাবেরই প্রকাশ ঘটে। মঞ্চে মুনিদের কথোপকথনের ভঙ্গিটিও লৌকিক জীবনেরই অনুসরণ। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে মুনিদের পরিচয়

পর্ব, রামের মুনিচরণ বন্দনা মুনিদের রামকে সতর্ক করে দেওয়া সবই সেই লোকজীবনের অনুরূপ। যখন সূর্পনখা মঞ্চে এলো তখনকার যে সংলাপ তা নিতান্ত লৌকিক। তার মধ্যে নারী সম্পর্কিত লোক মনস্তত্বও স্পষ্ট।

সূর্পনখা — এ বাই, বাইগে হে, লোকলা এখে সঙ্গে আসল, ভাউজিটা মোর কুন লাংগের মুখ দেখবা গেল সনা।

মঞ্চের ব্যক্তিগণ — ভাউজি তুই লাংগের মুখ দেখফা গিসলো...

সূর্পনখা — এ ভাউজি দেখদি, বাঁশের আগালিটাত ঘুঘুর ডিমাডা

এখানকার উক্তিতে নারীর সামাজিক অবস্থার কথা একটি সম্পর্কের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। সামাজিক জীবনের সত্য তা হোক আর নাই হোক, তাতে সামাজিক মনস্তত্ব পরিষ্কার বোঝা যায়।

সূর্পনখার নাক কান কাটা গেলে মঞ্চে 'পেটবীর' ওঝার প্রবেশ ঘটে। 'পেটবীর' ওঝা কথাটি যথেষ্ট ইঙ্গিতাত্মক সামাজিক মানুষের এই নামকরণে যেমন সত্যের আভাস ফুটে ওঠে তেমনি পাই তার পরিহাস প্রিয়তার পরিচয়। 'পেটবীর' ওঝা যেভাবে সূর্পনখার কাটা নাক কানের চিকিৎসা করে তাতে এই ওঝার চিকিৎসা শক্তির পরিচয় পাই। আর পাই লোক কবির পরিহাসপ্রিয়তা। নাটকে এইভাবে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন লোককবি। আসলে এগুলি সমাজে প্রচলিত কৌতুক — সেগুলিই নাটকে উঠে এসেছে।

ওঝা — এ সর্বনাখা তোর যে নাকটা কাটা গেল এনোং করি, রোভো না আউসত লাগাবো ?

সূর্পনখা — আউসত ছে নাকি তে রে, ছে তে দে।

ওঝা — ছে। একখান কাটা ঘাউয়ার ঔষদ জামরির রস, বাঘ মরিচ ও নুন, এখেটে বেনালছে যেদি এইখান লাগাদেবি আলায় খরখরা হয় যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

সূর্পনখা — দে দে লাগায় আউসতখান

বলাবাহুল্য এই রসিকতা অত্যন্ত মোটা দাগের। কিন্তু যে শ্রেণীর শ্রোতা এই নাচ্যরস পিপাসু তারা এই রসিকতা থেকেই আনন্দ আহরণ করে

রণস্থলে দূষণের মৃত্যু হয়েছে খর প্রবেশ করে জানতে চায় — ওরে সৈন্যগণ আমার ভ্রাতা কোথায় ?

সৈন্যগণ উত্তর দেয় — ''মহারাজ রণস্থলের পশ্চিম পাকায় গাড়ী উলটায় দিছে''

'গাড়ী উলটায় দিছে' — নিতান্ত আঞ্চলিক ইডিয়ম। এর দ্বারা মৃত্যুর কথাটি বোঝানো হল।

বনবাসে রাম সীতার সুখী দাম্পত্য চিত্র নাটকের মধ্যে দেখাতে হলে অন্তত পুরো একটি দৃশ্য ব্যবহার করে সেই চিত্র রূপায়িত করতে হত। রাবণ যখন মারীচকে নিয়ে সীতা হরণের জন্য পঞ্চবটী বনে এসেছে — তারই ঠিক আগে রাম সীতার এই দাম্পত্য সম্পর্ক দেখানো খুব প্রয়োজনীয় ছিল। মাত্র ছোট্ট একটি দৃশ্যে সেই সম্পর্ক

দেখানো হল। রাম সীতার প্রসার খেলা।

গান — রাম সীতা প্রসার খেলিতে লাগিলো

সীতার গান — হারিলো হারিলো হারিলো রে - স্বামী তুই হারিলো, ওরে এতয় রমণীর মাঝে প্রসারে রে স্বামী তুই হারিলো।

ডাক — প্রসার খেলিয়া প্রভু আনন্দ হইলো। হেন সময় ময়ামৃগি যেন পন্থে দেখা দিল।।

লোককবির এই নাট্যবোধের প্রশংসা করতে হয়। যেভাবে তিনি রামসীতার এই সুখী দাম্পত্য জীবন চিত্র রচনা করে তারই পটভূমিতে সীতাহরণ বর্ণনা করলেন তা যথেষ্ট নাট্যগুণের দাবী করে। অন্যপক্ষে তার যে লৌকিক রূপ সেটিও স্মরণযোগ্য। বনবাসে রামসীতার প্রসার খেলা যে কতটা অসম্ভব তার কথা মনে না রেখে সীতার গানে বলা হয়েছে "এতয় রমণীর মাঝে প্রসারে রে স্বামী তুই হারিলো।" প্রসার খেলা উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের সঙ্গে জড়িত। এই দৃশ্যটি তাই একই সঙ্গে রামসীতার দাম্পত্য জীবন ও লোকজীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাচক।

রাবণের সৈন্যদের কথোপকথন অংশটি ও লোকজীবনের চিত্ররূপ।

সিপাহি — আরে চুপ চুপ। আপ কৌন হ্যায় জী

সারথি — আরে হাম গাঁওকা মণ্ডল হ্যায় জী। আপ কৌন হ্যায় জী ?

সিপাহি — ও গাঁওকা মণ্ডল হামকো নেহি পয়হচানতে ?

হাম রাজা লঙ্কেশ্বর কা সিপাহি হ্যায় জী।

সিপাহি লঙ্কেশ্বরের জন্য রাজবাড়ী নির্মাণ করবে। তাই লোক চাই। কালুয়াকে ডেকে আনা হয়।

সারথি — একালুয়া দেখেক রাজা লঙ্কেশ্বরের সিপাহি

কালুয়া — উ হু মুই বুঝবা নি পানু

সারথি — আরে সিপাহি কাথা যখন বুঝবা নিপালো বরকন্দাজত বুঝিস। এহে রাজা লংকেশ্বরের বরকন্দাজ।...

সিপাহি — কালুয়া দেখো হিয়া রাজা লঙ্কেশ্বর আয়গা রাজপুরি নির্মাণ করনে হোগা...

কালুয়া — মোর দ্বারা হোবেনি বারে, মোর পিছলাহে অমহার দ্বারা হোবে।

সিপাহি — ওহি বোলোরে কালুয়া। তুম জাতমে ছোটাহ্যা লোকিন বাতমে তো বরে বরে রস হ্যারে। জলদি পুকারো উলোককো।

সিপাহির কথায় কালুয়া বলে — তমহায় ডাকায়

সিপাহি জিগ্যেস করে — কিয়া নাম হ্যায় উসিকা

কালুয়া বলে — ও মোর মাও।

সিপাহির সন্দেহ হয়। সে সারথিকে জিজ্ঞেস করে। সারথি বলে মেয়েদের এভাবে ডাকা হয়। সিপাহি ডাকে। তাতে আসে কালুয়ার দুই বৌ। দুই বৌএর সঙ্গে কালুয়ার কথোপকথনে রাজবংশী সংসারের ছবি ফুটে ওঠে।

বড়বৌ — এ মাই, তোক কুন কহে গিছে

ছোটবৌ — মোক কুননি কহেগে ভাই

বড়বৌ — চলধি এইডা বাড়িত পুছারি করমো কভা কভাবারচেন নি কাহ ...

কালুয়া — খরাক আইনচেন দেখাও

ছোটবৌ — এ মোর বাপ আগুত বিরিডা খায়েলে শালাই মুই আনুনি কেনং করে খাবো

বড় বৌ — খা বিরিডা লক্ষ্মীছাড়া বৈরাগী

কালুয়া— দে খরাকলা। ধর বিরিডা ফুকে ফুকে রাখিম তাহে মুই খরাকলা খাম।

ছোটবৌ — বিরিডা খাবোনি তাহলে। মুই সিপাইডার তানে চলে গেনু।

রাজধারী নাটকের পৌরাণিক রাম রাবণের গল্পোর আবহে এইভাবে ঢুকে পড়ে লোকজীবনের এক চিলতে দৈনন্দিনতার ছবি।

সাধারণ চরিত্রগুলি যথাক্রমে সারথি, সিপাই, সুন্দরী যুবতী ইত্যাদির কথোপকথনে এলাকার বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক সময় পৌরাণিকের ভিতর লৌকিক বিষয়ও ঢুকে পড়েছে।

উদাহরণে দেখা যায় —

তিরসিরা বীর সাজিলো রে
সাজিলো তিরসিরা বীর টেপাগুলির নাতী
ধুতির গুনজাত বান্ধিয়া লিছে গান্ডা চারি হাতি।
এমন বীর সাজিলো ভাইরে
আগো পাছো না ভাবিয়া
বীরের মধ্যে বীর সাজিলো কাংক্ষে বন্দুক লয়া।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা, দৈনন্দিন চাল-চলন, খাদ্যাভ্যাস, গ্রামীণ কুটীর শিল্প, সামাজিক ন্যায়বোধ, এইগুলি রাজধারী নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। এলাকার কৃষি-ফলনের বিভিন্ন দিকগুলিও উল্লেখিত হয়েছে। সামাজিক আপ্যায়নে তামাকের ব্যবহারও লক্ষণীয়। তামাক সেবনের মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। রাবণ তাঁর ভ্রাতা বিভীষণ, পুত্র ইন্দ্রজিত, তরণীসেন যাদেরকেই আহ্বান করে নিয়ে এসেছেন সকলকেই তামাক সেবনের জন্য বলছেন —

'ওরে ভাইরে বিভীষণ।
আইসো আইসো ভাই মোরে
বস রত্ন সিংহাসনে
ত্রিফুল তামাকু মোরে
করেঁহ ভক্ষণরে ভাই বিভীষণ।'

তৎকালীন গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ ওঝা বা কবিরাজরা গ্রামীণ পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করতেন। সে রকম চিত্রও পাওয়া যায়। শূর্পনখার নাক-কান কাটা গেলে শূর্পনখা ওঝার কাছে ছুটে যায়।

ওঝা বলে — 'ছে একখান কাটা ঘাউয়ের ঔসদ
জামরির রস, বাঘ মরিচ আর নুন এখেটে
বানায় লাগাদিলে আলায় খর খর
হয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে।'

এটা ঠিক কাটা ঘায়ের চিকিৎসা নয় — রসিকতার জন্য এটি বলা হয়েছে। গ্রামীণ যাদু বা ইন্দ্রজালও কখনো কখনো নাটকে সৃষ্টি করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যের জন্য তেল জাতীয় কোনো দ্রব্য মুখ থেকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আগুন ধরানো হয়। তাতে মুহূর্তে আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে যায়। সম্পূর্ণ নাটকটি হয়ে উঠেছে ঐ অঞ্চলের সমকালীন দর্পণ।

রাজধারী লোকনাট্যে সংলাপের ব্যবহারে নানারকম বৈচিত্র্য রয়েছে। সংলাপ নাটকের মুখ্য বিষয়। সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের ক্রমবিকাশ ঘটে। লোকনাট্যে গদ্য সংলাপের চেয়ে পদ্য-আকারে সংলাপের আধিক্য বেশী। এই লোকনাট্যে গদ্য আকারে, পদ্যের আকারে এবং সর্বোপরি গানের মধ্য দিয়ে নাটকের বিষয় বস্তু পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। এছাড়াও মূল গায়ক এবং বাদ্যকারেরা ঘটনার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করার জন্য উচ্চস্বরে ছন্দবদ্ধ ডাক ও গানের ধুয়ার সাহায্যে কাহিনীর ঐক্য বজায় রাখেন। সাধারণ চরিত্রগুলি যখন কথাবার্তা বলেন তখনই গদ্যের ব্যবহার বেশীমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

বড় বৌ — এ মাই তোক কুনে কহে গিছে
ছোটো বৌ —মোক কুনেনি কহেগে বাই
বড় বৌ — দাদাগে দাদা হামার বাপটা তমহার
এইতি আইচি না কিগে, তমহা কাহো
কভা পারবেন?
সারথি — কায়, উলাতো মাই তমহার বাপটা

খোব বেহানে হামার এই পাকে গিছে।

কখনো কখনো প্রধান চরিত্রগুলি সাধারণ গদ্যে কথপোকথনের মধ্য দিয়ে পদ্য সংলাপে প্রবেশ করেন।

শূর্পণখা (গদ্যরূপে) — গে রাবণ দাদা হা, মোর নাকটা কাটিয়া লিছে গে, হে রাবণ দাদা হা।

রাবণ (গদ্যরূপে) — ইহি ভগ্নি সর্বনাখা, এ দুখদসা তোর কে করেছে। সে তুমি প্রকাশ করে বলো রে।

শূর্পণখা (পদ্যরূপে) — ফুল তুলিতে গিসনু দাদা পঞ্চবটির বনে।
ধরিয়া নাক কান কাটিছে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে।

রাবণ (পদ্যরূপে) — ইহি ভগ্নি সর্বনাখা কথাকার বসন্তি তারা কাহারে নন্দন।
কি জন্যে ফিরে তারা পঞ্চবটির বন।

শূর্পণখা (পদ্যরূপে) — অযুতা নগরে ঘর দশরথ নাম।
চারিপুত্র জন্মিলো জেষ্ঠ পুত্র রাম।
ভরতকে রাইজ্য দিলো না দিলো রামকে।
সত্য করে কৈকয়ী মাতা পাঠাইলো বনে।।
ঝটা বাকুল পইরিধন তপসিয়ার ভেশ।
পিতার সত পালিতে দুই ভাই ফেরে দেশ দেশ।।
পিতার সত পালিতে দুই ভাই হয়েছে বনচারী।
তাহা সঙ্গে ফিরে একটা সুন্দর নারী।
খাইবার ছলে দাদা গিয়াছিনু বনে —
ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে।

রাবণ (পদ্যরূপে) — কাটিচে কাটিচে ভগ্নি তোর চামর নাক কান।
কালি বেহানে দিমু তোক সনার নাক-কান।

এর পরেই ফিরে আসে গদ্য সংলাপ —

শূর্পণখা (সারথিকে উদ্দেশ্য করে) — এ সারথি শুনলো নাতে দাদা ডাকি কোহোল।

সারথি — শুননু নাতে। চামড়ার নাকত তোর সলার নাক দিবে।

শূর্পণখা — এ সারথি, সলার না হয়রে, সনার দিবা চাহালো।

এইভাবে সংলাপের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক গদ্যের ব্যবহার করা হয়। গদ্য সংলাপ শেষ না হতে হতে পদ্যের সংলাপ শুরু হয়। আবার প্রয়োজন মতো গানের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ধ্বনির ক্ষুদ্র পার্থক্যে রসিকতা

সৃষ্টি করা হয়। লক্ষ্মণ একটি গানের মধ্য দিয়ে সীতাকে বোঝাচ্ছে —

ওকি ও জানকি, শুনো জানকি ময়া না রাইক্কস
ময়া না রাও ছাড়ে।
বলো কার বাপের শকতি আছে হে দাদাক
মারিবারে বোলো হায় হায়।
আমাক ছাড়িয়া গুণের ভাই মোর গেলো
কুন বা দেশেরে হায়রে হায়।

মায়ামৃগের পশ্চাতে রামচন্দ্র ধাবিত হলে দুঃখে লক্ষ্মণ সীতাকে তার বেদনা জ্ঞাপন করছে। মূল গায়ক 'ডাক' এর মাধ্যমে ঘটনাকে সংযুক্ত করেন।

ডাক — 'অযুতা কান্ডতে হইলো শ্রী রামের বন
অরণ কান্ডতে সীতাকে হরিছে রাবণ'

এইরকম বিভিন্ন প্রকার ডাকের মধ্য দিয়ে কাহিনীর জোড় দেওয়া হয়ে থাকে।

রাজধারী গানে সঙ্গীতের সংখ্যা কম নয়। অনেকগুলি সঙ্গীত এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। বন্দনা গানের পর আসে কথোপকথন তারপর রামের গান। বিরাট ও উর্মিলা রাক্ষসের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধের কথা গায়কদের গানে প্রকাশিত হয়। এই গানগুলির গায়নরীতিতে এবং সঙ্গীতের প্রয়োগে যুদ্ধের ভাব ব্যক্ত হয়। গানের মধ্য দিয়েই বিচ্ছেদ, মৃত্যু ও দুঃখজনক পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলা হয়। বীররসপূর্ণ সঙ্গীতও এতে দেখা যায়। রামের সঙ্গে তিরসিরার যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

"ওই আরে দিম দিম তিরসিরা বীর যুদ্ধ করেরে
প্রথমতে হইল্ বীরের মুখোতে গালাগালি
ও বীর যুদ্ধ করে রে।
ওরে দুইঝনকার ভরে যেন মোর কাপেচে মেদিনী
দুইজনে যুদ্ধ করে দোহে রে মহাবলী।
ও বীর যুদ্ধ করেরে
ধনুকে ছুড়িলো প্রভু ব্রহ্ম-অস্ত্র বান
ও বীর যুদ্ধ করেরে।

তিরসিরার মুণ্ড কাটে কইলে খান খান
ও বীর যুদ্ধ করে রে।''

বলা প্রয়োজন প্রত্যেকটি যুদ্ধের বর্ণনায় এই গান গায়কের মুখে বসানো হয়েছে। কেবল যোদ্ধাদের নাম বদলে গেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে একটি গানই তৈরি করা হয়েছে। সেই গান যে কোন যুদ্ধের সময়ই গাওয়া হচ্ছে। এই গানগুলির মধ্যে বীররস অপেক্ষা যুদ্ধের বর্ণনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অন্যান্য রসের গানের ক্ষেত্রেও বর্ণনাই মুখ্য। সীতা বিহনে রামের বেদনা নিচের গানটিতে প্রকাশিত হয়েছে —

'ও ভাইরে লক্ষ্মণ তুমি ভাই মোর ছাড়রে
আমি যাছি গৃহমাঝেরে ভাই
হায় হায়রে দারুন বিধি আর কি না হইলো
ফুলের কমল সীতা কুন বা দেশে গেলো।'

সূর্পনখা সুন্দর রূপ ধারণ করে যে গান গেয়েছে সেটিতে প্রেমিকা নারীর মনোভাব ফুটে উঠেছে —

ওই মন মানে নাগো সই দিন মানে না
আমি করি কি উপাইগে সোয়েই মন মানে না —

এরপর রামের কাছে গিয়ে সূর্পনখা নিজের কথা বলে —

ওকি ও তপসিয়ার গসাই শুন তপসিয়ার গসাই...
আমি তোমার পুতলী হোবো আমার বিয়ে করহে
তপসিয়ার গসাই।

গান, পদ্য সংলাপ আর গদ্য সংলাপে কাহিনীর নাট্য উপস্থাপনা হয়। গানগুলির অধিকাংশই বর্ণনামূলক, তাতে কাহিনীর বর্ণনা আছে। গানগুলিতে ভাবের কথা কম, প্রায় নেই। গান যেখানে ভাবের প্রকাশ সেখানে তার রস সৃষ্টির শক্তি বেশি হয়। এসব নাট্য সঙ্গীতে তার অবকাশ কম। রাবণের একটি গানে রামের আশ্রয় গ্রহণের কথা আছে। ভক্তের আকূতি তাতে কিছুটা ফুটেছে। সাধারণ শ্রোতাদের চিত্তে রাবণের এই ভক্তি নিবেদন কারুণ্য ও ভক্তিবিনম্রতা সৃষ্টি করে। রাবণের গান —

এ প্রভু তুইহে মাতা মোর
তুইহে পিতা, তুই হলো মোর জনম দাতারে
এ প্রভু অভাগিয়া যার আর কেহো

নাই, শুনো প্রভু রঘুনাথ রে
এ প্রভু ছিলো পুত্র মোর মেঘনাদ
আহা মরিরে তাহায় গেলো মোর।
এ প্রভু ঘরে ঘরে মোর কন্দে
রানীগণ শুনো প্রভু রঘুনাথ রে।
এ প্রভু সর্বনাখার কথা ধরনু
লংকাপুরী শূন্য করনুরে
বাতি দিবার মোর কাহ নাই রহিল্
আররে হে।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন লোক নাটকে বিভিন্ন রকমের লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় দোতারা, কুষাণ, চোর-চুন্নী ইত্যাদি লোকনাটকে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। সেটা কখনো চটকারূপে আবার কখনো দরিয়া রূপে। তরাই অঞ্চলের লোকনাটকে এখানকার লুপ্ত প্রায় লোকসঙ্গীত 'লাহাংকারী'-রই প্রভাব সবচাইতে বেশী। দীর্ঘ-বিলম্বিত লয়ে লাহাংকারী গান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে বিরহই মুখ্যত ফুটে উঠে। কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গভীর বেদনাই এর মধ্যে ব্যক্ত হয়। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নারী মনের বেদনা, মৃত্যু চেতনার ভাবনা ছাড়াও জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে। এই 'রাজধারী' লোকনাটকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই লোকসঙ্গীত 'লাহাংকারী' গানের প্রয়োগ আছে।

লোকনাট্য লোকজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার গায়ক সাধারণ লোক, তার শ্রোতাও সাধারণ গ্রামীণ কৃষক মজুর বা সাধারণ কোনো জীবিকার মানুষ। লোকনাট্যের বিষয় সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নেওয়া। পৌরাণিক কাহিনী হলে তাকে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় নাট্যরূপ দেওয়া হয়। তার ভাষায় থাকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত বাক্‌ভঙ্গি এবং শব্দ ব্যবহার। গূঢ়োক্তি কিংবা অলংকৃত বাক ব্যবহার তার মধ্যে দেখা যায় না। ভাওয়াইয়া গানে তবু কিছু কিছু স্বভাবোক্তি বা উপমা রূপক দেখা যায়। কিন্তু লোকনাট্যের ভাষায় এরকম অলংকৃত সংলাপ ব্যবহার করা হয় না। নাট্য সংলাপকে হতে হয় প্রত্যক্ষ এবং তীক্ষ্ণ যাতে তা বক্তার কথা শ্রোতার কানে পৌঁছোতে পারে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নাগরিক নাট্য সংলাপের ভাষা কিছুটা অলংকৃত হয়েছে। লোকনাট্যে তা আশা করা যায় না। তবু পদ্য সংলাপে রামায়ণের উপমা হুবহু উঠে এসেছে। যেমন মারীচ রাবণ রাজাকে তার কর্ম দোষ স্মরণ করিয়ে বলছে —

যেমন ছুটিলে হস্তি না রহে অংকুশে
লংকাপুরী তেমন মজিবে তব দোষে

ভিক্ষুকবেশী রাবণ সীতাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

ও মা সীতা, সুরধনি চন্দ্রবদনী
তার মধ্যে সৌন্দর্যের উপমা প্রচলিত বা গতানুগতিক।

দূষণের উক্তিতে অলংকার প্রয়োগ ভেক হয়ে করিস কি ভৃংগের মস্তকে পদালত বামন হয়ে কর কি চান্দের অপ বিলাস ইত্যাদি।

ছন্দের দিক থেকে বলতে গেলে 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দেরই আধিক্য বেশী। রাজধারী লোকনাটকের ভাষা উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের মুখের ভাষা, এই এলাকার বসবাসকারী মুখ্য জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায় মানুষের ব্যবহৃত ভাষা। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ বাংলার ব্যবহার প্রচুর রয়েছে। বিশেষ কয়েকটি সংলাপ এখানে উল্লেখ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে এই অঞ্চলের মৌখিক ভাষাটিকে বুঝে উঠতে সহজ হবে।

রাবণ — ইহি মারিচ মোর মামু চৈদিগে নাগর
চৈদিগে সাগর তার মধ্যত তোর ঘর
রথে চইড়ি আইলাম বাফু তোর গোচরে

মারিচ — ইহি ভাগিনারে দশানন
আইসো আইসো ভাগিনা বইসো
রত্ন সিংহাসনে
তিরিফুল তামাকু মোর করহো ভক্ষণ রে

রাবণ — ইতি মারিচ মোরে মামু। না বসিবো
না বসিবো তোর রত্ন সিংহাসনে
তিরিফুল তামাকু তোর না করিবো ভক্ষণ
আগে যদি আমার সঙ্গে কর সতবন্দি
তবে না বসিবো তোর রত্ন সিংহাসনে।

মারিচ — আজ কেন এতো ক্রুধ্য কেন বাফুরে

আমি রাইক্কস জাতির সঙ্গে সত্য করবো না
বাফুরে।

রাবণ — ইহি মারিচ মোরে মামু,
লক্ষ্মী, সরস্বতী, নান্ধন নান্ধে
পবন দিয়া ধারা।
সত্যের ক্ষণেক হইলে তোর
লাথিয়ায় ভাংগিম দন্তেরর বারারে।

রাবণ ও মারিচের কথোপকথনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কোথাও উপভাষার শব্দ ব্যবহার আবার কোথাও শব্দগুলি শুদ্ধ বাংলার শব্দরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। বস্তুত অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকদিগের দিকে তাকিয়ে অভিনেতারা ভাষাকে লোকের বোঝার মতো করে ব্যবহার করেন।

আঞ্চলিক ভাষারূপের সঙ্গে চলিত ভাষার চিত্রকে এ লোকনাট্যের ভাষা একটা কাব্যিক ভাষার রূপ পেয়েছে—

ওরে বাপু ছাইলার তিনজন
কথাকার বান্তি কাহার নন্দন
কিসের জন্য ফির বাপু পঞ্চবটী বন রে —

# 'খন'

উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় এক ধরণের গ্রামীণ লোকনাট্যের প্রচলন দেখা যায়। এগুলিকে এখানে 'খন গান' নামে অভিহিত করা হয়। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে ইসলামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডী, কুমারগঞ্জ গঙ্গারামপুর তপন সর্বত্রই খনগানের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলি অঞ্চল বিশেষ এক একটি চরিত্র-ধর্ম লাভ করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনজপুরে এই লোকনাট্য 'খন' নামে বিশেষ পরিচিত। মালদহে গম্ভীরা, কোচবিহারে কুশান ও দোতরা পালা বিখ্যাত।

'খন' কেন এই লোকনাট্যের নাম হল সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলা যায় না। পুষ্পজিৎ রায় একটি প্রবন্ধে 'খন' অর্থে উৎসবকাল বা অবসরকাল ধরে একে উৎসবকালের বা অবসরকালের গান বলেছেন। "উৎসবের কালে চিরামের অবকাশে সৃষ্ট ও অনুষ্ঠিত পালাগানকে খন গান বলা যেতে পারে।" তিনি আবার একে আনন্দ উপভোগের জন্য গাওয়া গান বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই অর্থে দেখলে যে কোনো গ্রামীণ লোকনাট্যই উৎসবে বিরামে বা আনন্দের জন্য গীত হয়। পুষ্পজিৎবাবু নিজেই আবার অন্য একটি অর্থ সন্ধান করেছেন। খন গানের বিষয়বস্তুতে থাকে অপ্রকাশ্যে সংঘটিত অনৈতিক প্রণয় ঘটনা। খন গানে এই ঘটনাকে সাধারণের সম্মুখে পরিবেশন করা হয়। এই কাহিনী খনন করাকে তিনি খন বলেছেন। ক্ষত থেকে খন হতে পারে বলেও কারো কারো ধারণা।

চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি 'খন'। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য যে নাটকগুলিকে প্রকৃত লোকনাট্যের মর্যাদা দিয়েছেন খন তাদের অন্যতম। খন গানে লোকনাট্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয় তার মধ্যে মুখ্য হল এগুলি গ্রামীণ জীবনের বাস্তব ঘটনা নির্ভর কাহিনীর নাট্য উপস্থাপনা। মুখে মুখেই এর সংলাপ রচিত হয়। গ্রামে সংঘটিত কোনো নাট্য সম্ভাবনা পূর্ণ ঘটনা নিয়েই এই নাটক উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত অবৈধ প্রণয়ই এর বিষয়। একে নৃত্যে সঙ্গীতে সংলাপে রূপায়িত করাই এই লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য।

'খন'-এর উপস্থাপন মঞ্চ অনেকটা বৃত্তাকার ক্ষেত্র। বৃত্তের ঠিক ভেতরের অংশে দোহার-পার্টি এবং বাজানদাররা বসেন। তাঁদেরকে ঘিরে আভিনয় স্থল, এবং অভিনয় স্থলকে ঘিরে দর্শক শ্রোতাগণ বসেন। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। দর্শকের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিনেতার ইচ্ছা যুক্ত থাকে নিবিড়ভাবে এই 'খন' গানে।

অনুষ্ঠান আসর বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। আসর বন্দনায় নারী-পুরুষ মিলে প্রদীপ ও ধূপবাতি হাতে নিয়ে

প্রথমে পূর্ব-উত্তর, পশ্চিম-দক্ষিণ দিক ঘুরে ঘুরে দিক্ বন্দনা এবং আসর বন্দনা করেন। এই বন্দনার সময় বিভিন্ন দেবতার বন্দনা যেমন করা হয়, তেমনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে দশ ঠাকুরের চরণ বন্দনা অবশ্যই করা হয়। মূল অভিনয় শুরুর আগে সকল দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধকর বন্দনার ভিতর দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। দর্শকদিগদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ থাকে। তাই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দেবতার বন্দনা পুরানো কাল থেকে চলে আসছে।

লক্ষ করা যেতে পারে —

বন্দি মাতা বীনাপাণি জগৎ মাতা জননী
তোমারি চরণ প্রণাম করি।
পূরবে বন্দনা করি ভানু দিগম্বর,
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,
সেই পর্বতে বসত করে যত মুনিগণ,
তাহাদের চরণে আমরা করিগো প্রণাম।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা মদিনা
দক্ষিণে বন্দনা করি সপ্তসাগর লংকা
লংকা দ্বীপে বসত করে
দশমুণ্ড রাবণ,
তাহারি চরণ আমরা করিগো প্রণাম।
গ্রামের মধ্যে বন্দনা করি যতয় দেবগণ,
তাহাদের চরণ আমরা করিগো প্রণাম
আসরে বন্দনা করি দশ ঠাকুরের চরণ
শুন শুন তোমরা দশজন এই আসরে
গাওনা হবে আধিয়ার বিদ্রোহ
(তে-ভাগা আন্দোলন)
হরিহরের বিচার
সর্বশিক্ষয় আন্দোলন

বিভিন্ন 'খন' পালার বন্দনা বিভিন্ন প্রকারের হয়। খন পালা বেশ পুরানো। তবে যেহেতু এ পালা প্রতি বৎসরই সাময়িক ঘটনা নিয়ে উপস্থাপিত হয় তাই এর মধ্যে প্রাচীনত্বের বিশেষ কোনো লক্ষণ নেই। এর ভাষা

এবং বিষয়বস্তু নিত্য পরিবর্তিত। 'খন' লোকনাটকের বিদগ্ধ পরিচালক শ্রী খুশীমোহন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে বাংলাদেশে রামায়ণ গানের প্রচলনের সময় থেকেই এই 'খন' গান চলে আসছে। লোককবি বা লোকনাট্যকারের সৃজনী শক্তির দ্বারা খন গান রচিত হয়ে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে রাজবংশী ও অন্যান্য লোকসম্প্রদায়ের অমূল্য সৃষ্টি এই খন। 'খন' যেহেতু গ্রামীণ জীবনে সংঘটিত কোনো ঘটনার রূপায়ণ বিশেষত অবৈধ প্রণয়জনিত কাহিনী — কাজেই এর বিষয়বস্তু কখনো এক থাকে না। প্রতি বছরই কিছু না কিছু নূতন বিষয় নিয়ে এই পালা নাটক রচিত হয়। পুষ্পজিৎবাবু এরকম কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যেমন নয়নশরী জামালউদ্দীন খাঁর ফাঁসি, কারেনশরী, যম বাউদিয়া, বৌদির চক্রান্ত, দুরাচার জমিদার, অসভ্য চেয়ারম্যান, পয়মালশারী, বিনোদ-বাসন্তী, সাইকেশরী, তেভাগা ইত্যাদি। সংখ্যাটা অনেক। এইসব বিষয় গ্রামীণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জীবন্ত বিষয়। বর্তমানে খন গানকে লোকশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সর্বশিক্ষা আন্দোলন, সাক্ষরতা ইত্যাদির কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগে যা ছিল প্রণয়মূলক কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ এখন তা নিয়ন্ত্রিত আকারে লোকশিক্ষার কাজে প্রযুক্ত হচ্ছে। গ্রামীণ লোকনাট্যের একটা বৈশিষ্ট্যই হল এই যে তাতে লোকশিক্ষা ও লোক মনোরঞ্জন দুইই করা হয়। সেদিক থেকে লোক শিক্ষার উপরে বর্তমান জোর পড়েছে। পুরুষ-নারীর আপত্তিকর প্রেম-ভালোবাসা নিয়েই 'খন' লেখা হয়। গানের ভিতর দিয়ে পুরুষ-নারীর আপত্তিকর বা অসামাজিক কর্মকে সাবধান বা সতর্ক করে দেওয়া হয়। বর্তমানে 'খন' পুরুষ-নারীর ভালোবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের যত ধরনের ক্রিয়া কলাপ রয়েছে সবকিছুকে নিয়ে গান রচিত হয়। কথায় কথায় গান তৈরী হয়। সুরপ্রধান এই গানগুলি অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা পরিবেশিত হয়। বর্তমানে সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জমি অধিগ্রহণ, ভাগচাষ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলত: 'খন' গানের রচয়িতারা এই জাতীয় গান রচনা করে উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন।

হরিহরের বিচার, তে-ভাগা আন্দোলন, ইত্যাদি বিষয়গুলো যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ যতই এই গানের বিষয়বস্তু হোক না, কেন অবৈধ প্রণয়-কাহিনীই এর মূল উৎস।

পূর্বেই বলা হয়েছে 'খন' গান পরিবেশনকালে সাধারণ দর্শকের প্রায় সঙ্গেই অভিনেতারা মঞ্চে অভিনয় করে থাকেন। সাধারণ আলোয়, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদে এবং অল্প মেক-আপে চরিত্রগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। হালুয়া-হালুয়ালী এই জাতীয় পালার প্রয়োজনে জীবজন্তুর আদল বোঝাতে মুখোশের ব্যবহার হয়।

সাধারণভাবে এই গান শীতকালেই বেশী পরিবেশিত হয়। তবে বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপানায় যে কোনো সময় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গ্রাম-গঞ্জে গৃহস্থের আঙ্গিনায় দীর্ঘক্ষণ ধরে 'খন' গান নবান্নের সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লক্ষ্মপূর্ণিমাতে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে 'খজাগর' নামে এক গান-উৎসব অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। বহুকাল আগে 'খন' গানও ঐ সময়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে করা হয়ে থাকতো। এছাড়া মানুষের চাহিদার উপর 'খন' গান রচিত হয়ে থাকে।

নির্বাচিত সংকলনের 'খন' লোকনাটকটির নাম 'হরিহরের বিচার'। রচনা করেছেন খুশী সরকার। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তৈরী হয়েছে এই খন। কৃষক পরিবারের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে গেলে অনেক সমস্যা। সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা-চেতনার অভাব। এই 'খন'-এর বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয়েছে আটটি দৃশ্যে। নাটকে পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা ছয়টি এবং নারী চরিত্র একটি। প্রথম দৃশ্যে সবুজ, বেঙ্গু, অভয় ও জগাই প্রবেশ করে। সবুজ একজন যুবক। গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য। সবুজ প্রবেশ করেই বলে — শিক্ষা মানুষের অধিকার। সেই অধিকার অর্জন করিবা হইলে হামাক ইসকুলত যাবা হবে, ছায়ালাক ইস্কুল পাঠাবা হবে।''

সবুজের কথায় বেঙ্গু ও অভয়ের গভীর আস্থা। অভয় গ্রামের সঙ্গীত শিল্পী। তাই গান গেয়ে ওঠে —

শুনেন শুনেন দাদাগণ
শুনেন শুনেন বৌদিগণ
লেখা-পড়া করিতে ইসকুলে
পাঠান সবে বাচ্চাগণ।
ও দাদাগো ও বৌদিগো
তোমার ৫ থেকে ৯ বছরের ছেলে মেয়ে
পাঠাও সবে ইসকুলে।
এবার VEC ডাক দিয়েছে।

সাক্ষরতা অভিযানকে সফল করার জন্য এই গানের প্রচার। গ্রামে গ্রামে এখন Village Education Committee (VEC)। তাই এটি 'খন' গানেও প্রতিফলিত। গ্রামের বিদ্যালয়ের ঘর-দরজা, আসবাবপত্র নতুন করে করা হচ্ছে। সেই কাজগুলোতেও জগাই মহাজনের খারাপ নজর। তাকে সাবধান করে দেয় গাঁ-এর কৃষক বেঙ্গু। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় হরিহর, দুর্গা ও সবুজকে। কৃষক হরিহর লাঙ্গল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে মাঠে যায়। যাওয়ার সময় গানের ভেতর দিয়ে স্ত্রী দুর্গাকে বলে—

ওনা সকালে উঠিয়া মুই
যাছু হালখান ধরি
তাড়াতাড়ি ওরে চেতনার মা
তুই যাইস খরাক দিবা।
ওনা সঙ্গে দুটা পিয়াজ নিগাবু
আর নিগাবু আলুর ভাজা
এক দুফুর বেলা হইলে —
ওরে চেতনার মা
ও মোক ভোগ নাগে চন চন করিয়া।

হরিহরের স্ত্রী দুর্গা চেতনার মা। সে নামে না ধরে চেতনার মা বলে সম্বোধন করছে। দুপুর হলেই তাকে ক্ষুধা লাগে। দুর্গাকে মাঠের মধ্যে খাবার নিয়ে যেতে হবে। কৃষক-বাড়ীর এই দৃশ্যটি নাটকে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

হরিহরের অনুপস্থিতে শিক্ষা কমিটির সদস্য যুবক সবুজ দুর্গাকে শিক্ষার উপযোগিতা বোঝায়। এখানে দেখা যাচ্ছে দুর্গা সবুজকে ভাশুর বলে সম্বোধন করে। সবুজ দুর্গাকে ভাউসান বলে। 'খন' লোকনাটকে প্রায় প্রত্যেকটিতেই 'ভাশুর ভাউসান' সম্পর্কের কথা দেখতে পাওয়া যায়।

সবুজ দুর্গার মেয়ে চেতনাকে স্কুলে পাঠানোর কথা বলে। দুর্গা সবুজকে নানান সমস্যার কথা বলার সময় চতুর জগাই প্রবেশ করে। সবুজ-দুর্গার কথপোকথনের উপর জগাই একটা আপত্তিজনক সন্দেহ তৈরী করে নেয়। সবুজের উপর দৃষ্টি রেখে আপনমনে বলে — "ওহো প্রেম জামিয়া ভালয়। প্রেম করা তোর ভাকরোছ, সবুজ মেম্বার। ওদিন তোর জন্য অপমান হনু। অপমানের শোধতো মোক নিবার হবে।" দুর্গা হরিহরের দুপুরের খাবার নিয়ে তৃতীয় দৃশ্যে মাঠে আসে। হরিহর দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং রেগে বলে — 'এত বেলায়। তমার একটা জ্ঞান আছে অত করি কহি আসিনু। দিম নাকি হাল বহা পানঠিখান দি ঝরঝরাই।'

দুর্গা — 'মারনিতে। মাইর ছাড়াত কিছু বুঝেন নি। সকালে বাসি কাম কি কম থাকে। ছাগললা বান্ধিনু। গাইটাক ঘাস খাবা দিনু। ভাত আন্দিনু। আলু ভাজিনু। তারপরত আসিনু। ধরধর এক্ষুনে হোচট খাই পরি গেনুহুই।'

একজন কৃষকের বৌ-এর নানা কাজ এখানে বর্ণিত। দুর্গার যুক্তিতে শান্ত হয়ে খেতে বসে হরিহর ছেলে ও মেয়েদুটোর খবর শুনে চট করে রেগে ওঠে।

হরিহর — হা, কার হুকুমে ইসকুলত পাঠালু। এত কাম ইলা কে করিবে।

দুর্গা — মুই নিজে পাঠানু। কিতে গাও শিক্ষা কমিটির মেম্বার ভাশুরটা কহিবা আসিয়াল সব ছুয়াক ইসকুলত পাঠান হবে।

হরিহর — মোর বেটাবেটি ইসকুলত যাবে, না নি যাবে মুই বুঝিম। সনাতনক পাঠালে হল হয়। বেটিটা পাঠালে কেনে ?

হরিহর ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে রাজী। কিন্তু মেয়েকে পাঠানোর কোনো যুক্তি দেখে না। কিন্তু দুর্গাও নাছোরবান্দা।

দুর্গা — মুই কহচু যাবে বেটি মোর ইসকুলত যাবে।

হরিহর — এই চুপ। মোর উপরে কাথা।

দুর্গা — চুপ করিম কেনে মোর বেটাবেটি ইসকুলত যাবে।

হরিহর ভীষণ রেগে উঠে দুর্গাকে বেশ জোরেই মারে। দুর্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

এখানে দুর্গার গানই সংলাপ হয়ে উঠেছে।

— ছুয়ার নেখাপড়ার দোষে
ও স্বামীধন মোকে মারিলেন
শিক্ষার কি মূল্য স্বামীধন
কেমনে জানিবেন।
ওনা - কুমার শালে মাটি শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ হয় চাষ দিলে
বিদ্যালাভে মানুষ শুদ্ধ হয় সুয়ামী
শাস্ত্রে নেখা আছে।

দুর্গা ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাবেই। সবুজ মেম্বারের চেতনার দ্বারা সে প্রভাবিত। পরের দৃশ্যে দেখা যায় জগাই হরিহরকে ঠাট্টা করে। হরিহরের মনে নানা সংকট। জোর করে মেয়েকে স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। মেয়ে চেতনা জগাইয়ের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করবে বলে হরিহর আগেই টাকা নিয়েছে। সে কোনো কিছু সামলে উঠতে পারে না। তার মধ্যে পিওন একটা চিঠি নিয়ে আসে। সেই চিঠি নিয়ে জগাই মহাজনের কাছে গিয়ে জানতে চায় চিঠিতে কী লেখা আছে। গ্রামের মহাজন জগাই হরিহর কৃষকের বাড়ীর ভেতরের যাবতীয় ঘটনাকেই প্রভাবিত করে। গ্রামের এই লোকগুলোকে দুঃস্থ কৃষকদের এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না। চিঠি পেয়ে হরিহরের

সন্দেহ হয়। দুর্গা কারো প্রেমে পড়েছে কি না। জগাই-এর কাছে মেলে ধরে চিঠি। সবুজ মেম্বার হরিহরকে চিঠি দিয়েছে। বিনা কারণে কেন সে তার স্ত্রীকে মারধোর করেছে। কেন ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না — এই বিষয় নিয়ে গ্রাম শিক্ষা কমিটিতে হরিহরের বিচার বুধবার বেলা দুটায় হবে। সবুজ মেম্বারের চিঠি পেয়ে হরিহরের আরো দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। এই অপমান থেকে একমাত্র দুর্গাই তাকে রক্ষা করতে পারে।

সবুজ মেম্বারের এই সকল কাজকর্ম মহাজন জগাই-এর একদম পছন্দ নয়। জগাই মহাজনের সঙ্গে যুক্ত হয় আর একজন মহাজন। তার নাম ভুচিয়াল। উভয়ের কথপোকথন শোনা যেতে পারে —

ভুচিয়াল — মানুষের মুখে কানা-ঘুষা মহ শুনুহ। কাথাটা তাহলে সত্যি দাদা, গাও শিক্ষা কমিটি হরিহরের বিচার ডাকিয়া বিচার হইবে।

জগাই — সত্যি মানে? ইতিমতন নটিশ করিয়া। কি দোষ, না ছুয়া ইস্কুলত পাঠায়নি। তার বহুক ধরি মারিয়া। বহু কাথা যদি না শুনে। এরকম হামার ঘরত কত হয়।

ভুচিয়াল — যতসব ভুঁই-ফুটা দেউনিয়া। মোর বাড়িত দিন-আইত অত্যাচার নাগায়। কি তাংনি জানিস, মোর বাড়িত এতনা নেংগেরা বেটি ছে — তাক ইস্কুলত পাঠাবায় হবে — তার নাকি পড়াশুনা করা বেশী দরকার। ইলা ফের কাথা কহয়।"

শেষপর্যন্ত জগাই ও ভুচিয়ালের কোনো মতামতই ঠেকে না। সাক্ষরতা আন্দোলনে সকলকেই স্কুলে যেতে হয়। নাটকের শেষে এসে দেখা যায় সবুজ, বেঙ্গু হরিহর, দুর্গা চেতনা এবং আরো অনেকে মিটিং-এ বসেছে। সেখানে হরিহরের বিচার শুরু হয়।

হরিহর বলে — মোর কোন দোষ নাই দশঠাকুরলা। ওই মোর কাথা শুনেনি। মুই কহচং, উয়াই কহচে, আর একটা উত্তরা-উত্তরি। তাতে মোর মাথা গরম হইল। আর একটা কাম করিয়া, মোক না কহি বেটিটাক ইসকুলত পাঠায় আ। ওই তাংনে আর কোনদিন এনং হবা নাহা। দশ ঠাকুরলা মোক ক্ষমা কর। কড়জোরে তোমার ঠিনা ক্ষমা চাহাচং।

দুর্গা — দশঠাকুরের ঠিনা মোর অনুরোধ, চেতনার বাপক উচিত শিক্ষা দে। বিনা কারণে মাঝে মধ্যে এইভাবে মোক মারধোর করে। কোনদিন তাস-জুয়া খেলাই, মদ খাই আসি মাতলামি করে আর মোক ধরি মারে। বেটা-বেটিলাক ইসকুলত পাঠাবা চাহোনি। বিনা কারণে মোর দোষ বাহির করে।

গ্রামের দশজনকে নিয়ে বিচার ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই প্রচলিত। গ্রাম শিক্ষা কমিটি বিষয়টি মিটিয়ে দিয়ে

হরিহরকে শিক্ষানুরাগী করে তোলে। বর্তমান শিক্ষা-প্রসারের আন্দোলনটি এখানে স্থান পেয়েছে। নাটকটি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়। সেই উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপিত করে দেখানো হয়। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সবাই শেষে একসঙ্গে গান গেয়ে ওঠে।

আধারে জ্বালিয়ে আলো।
গাওবাসী শিক্ষার দিকে এগিয়ে চলো।
মানব মন্দিরে জ্বালো শিক্ষার আলো।

নাটকে চরিত্রানুযায়ী মেক আপ, পোশাক পরিচ্ছদ, সংলাপ ব্যবহার সবকিছু মধ্যে একটা শক্ত বাঁধন আছে। নাটকটি শুরু হয়ে দ্রুত গতিতে শেষ হয়। উচ্চারণ আঞ্চলিক হলেও স্পষ্ট করে বলার অভ্যাস দেখা যায়। বিষয় বহির্ভূত গান বা সংলাপ নেই। এই 'খন' পালা নাটকটির উপর মনে হয় আধুনিক নাটকের প্রভাব আছে। 'খন' গনা রচনা কখনো থেমে থাকে না। রচয়িতারা সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে খন রচনা করেন। বহুদিন আগের কিছু 'খন' গানের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অতিথিদের সেবা-যত্ন করা গ্রামে প্রচলিত নিয়ম। বাড়ীতে অতিথি এলে হাত-পা ধোয়ার জল দেওয়া হয়। অতিথিকে সম্মানে খাওয়ানো হয়। এরকম একটি বিষয় নিয়ে 'খন' গান আছে। 'তিতোসরী' খন গান। 'তিতোসরী' খন গানে মা তার মেয়ে তিতোসরীকে অতিথি সেবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। —

'কি করহেছিস তিতো বেটি
ঘরতে বসিয়া
বহুদিনের পরে তোর ভাশুর
আসলে বেড়াবা।
পান দে বেটি বিড়ি দে
আর দে বেটি বসিবা
তাড়াতাড়ি ওলো বেটি
চরণ সেবা করা।'

কাহিনীতে জানা যায় তিতোসরী বিধবা। বৈধব্য নিয়ে কাটায় বলে মনে কেটা দুঃখ রয়েছে। ভাশুরের সেবা-যত্নের জন্য জল নিয়ে আসে। নিজের দুঃখের কথা গানের ভেতর দিয়ে বলছে —

''নেহ ভাশুর
চরণ সেবার জল
বহু দিনে সোয়ামী মরা

মন বড় চঞ্চল।

কপালে ছিল ভাশুর

এ দুঃখ লেখা

কাচা-চুলে সোয়ামী মরা

মন হচ্ছে উতলা।''

আর একটি পুরনো 'খন' গানের নাম 'চৌদ্দ পাঠুয়ার খন' পরস্পর আত্মীদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা চলছে। দুই বেয়াই মশায়ের সম্পত্তির গর্ব। ফলে একটু কিছু হতেই আদালতে গিয়ে একজন আর একজনের বিপক্ষে মামলা করে দেয়। একে অপরকে জব্দ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। গ্রামের লোক এই নিয়ে বেশ মজা করে। এই মামলায় দুটি পরিবারই আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তুলনামূলক গরীব বেয়াই মশায় মামলা তুলে নিতে চায়। এতে অবস্থাসম্পন্ন বেয়াই সুযোগ পেয়ে যায়। চৌদ্দ পাঠুয়ার 'খনে' দুই বেয়াইয়ের গানে ফুটেছে সেই চিত্র। গরীব বেয়াই বলছে — মামলা উঠান বেহাই

হবে সম্মানের হানি

ধনী বেয়াইয়ের উত্তর — জীবন থাকতে ওহে বেহাই

মামলা উঠামনি।

উল্লেখিত 'খন' গান দক্ষিণ দিনাজপুরে কুশমণ্ডীর 'খন' রচয়িতা শ্রী খুশীমোহন সরকারের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ঘটে যাওয়া ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে 'খন' গান প্রচুর লেখা হয়েছে। ডক্টর শিশির মজুমদারের উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য গ্রন্থে বেশ কয়েকটি খন গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকোশোরী, সুমিতা যোগীর গান, মায়্যা বন্ধকী, নয়ানশোরী, বর্মোশোরী[১৬] — এই 'খন' গানগুলিতে আছে সমকালের চিত্র। 'আমিনা-ঝালুয়া' বলে অতি পরিচিত পুরনো একটি খন গান পাওয়া যায়। বয়স্ক ব্যক্তিদের মুখে মুখে এই পালার নাম শোনা যায়। ঝালুয়া প্রেমিকের নাম। আমিনা প্রেমিকা।

ঝালুয়া প্রেমিকা বলছে —

দেখেক আমি না

দুনিয়ার কল

তোর রূপে দেখিয়া

মুই হইনু পাগল

তিন চাকায় চলে

আমিনা রিক্সার গাড়ী

মটর করেছে আমিনা

দৌড়াদৌড়ি

খুটার উপর লহার বাতি

চল।

এই খন গানটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চান্দইল গ্রামের শ্রীমন্ত সরকারের রচনা। অবৈধপ্রেম নিয়ে খনের রচনা বহু। ছোট ভাই-এর বৌ-এর কাছে বড় ভাই-এর প্রেম নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা 'খন' গানে দেখা যায়। 'শিতলসরি' খনে তা দেখানো যেতে পারে

ভাশুর বলছে — ভাউসান তমারি আশা

যদি করান ভালবাসা

কতই নিবেন শাড়ি বাটি

কতই নিবেন গাহানা

তমাকে না দেখিলে ভাউসান

থাকিবার পারুনা।

এবার ভাউসান গদ্য সংলাপে বলে —

— ঐলা শরমের কাথা বড় হয়া কেনং করি হামাক কহাচন। ঐলা কাথা হামাক কহান না। মানষি জানিলে কলংক উঠিবে। তাইলে হামার একটা কাথা শুন —

তমরায় হবেন বড় ভাশুর

হামরায় ছোট ভাউসানী

প্রেম পিরীতির কাথা কহিতে

ভাশুর শরমে করাননি।

ভাশুর — প্রেম পিরীতির কথা কহিতে ভাউসানি কিসের শরম। তমাক না চাহাচে হামার মন। হামার একটা কাথা শুন।

ভাউসান — কানে দিম তোর কান মাকিরি।

অলংকারের কথা শুনে ভাউসান বলে — ঠিক কহাচন ও ভাশুর, না হামাক খালি নষ্ট করিবা চাহাচেন। হামরা যা যা চাহিম সব পাম। হায়রে মোর কপাল।

ভাশুর — হে ভাউসান সব পাবেন।

(শ্রী নির্মল সরকারের রচিত এই খন গান। এই গানগুলি শ্রী খুশী মোহন সরকার সংগ্রহ করেছেন।

পৌষ ১৪১০, ডিসেম্বরের ২০০৩ সালের 'লোকশ্রুতি' পত্রিকাতেও খুশীমোহন সরকার এই খন গানগুলির কিছু কিছু উল্লেখকরেছেন।

সামাজিক আন্দোলনের বিষয় নিয়ে বর্তমানে বেশী করে 'খন' গান রচিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 'খন' উদ্যোগেও তৈরী হচ্ছে। পরাধীন ভারতবর্ষের তেভাগা আন্দোলন নিয়ে একটি 'খন' রচিত হয়েছে। এই কনের রচয়িতা খুশীমোন সরক'র। এই খনের বিষয়বস্তুতে আছে কৃষকের উৎপন্ন ফসলের তি নভাগ আদায়ের লড়াইয়ের কথা। জমিদার তহশিলদার, মহাজনদের অত্যাচারকে সহ্য করে কৃষক তার আন্দোলনে সফল হয়েছে নিয়ে খন। গ্রামে ঘটে যাওয়া কলংকের কাহিনীই একদিন খন গানের বিষয়বস্তু ছিল। বিশেষ করে অবৈধ প্রেম। সেই অবৈধ প্রেমের চিত্র বা চিত্রাভাস প্রত্যেকটি 'খন' গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'তে-ভাগা' আন্দোলনের কাহিনীতেও দেখতে পাওয়া যায় মহাজন গৃহস্থের বৌ-এর সঙ্গে সুযোগ বুঝে প্রেম করার চেষ্টা ঋণে জর্জরিত গৃহস্থের বৌ মহাজনকে ভাশুর সম্বোধন করছে —

ফুলন — ওই ভাশুর তমরা আসিয়ান। আইস আইস বাড়ীর ভিতর আইস। হায়রে কপাল। ভাশুর তোমার খাটো পা খান আইজ নাম্বা হইল। হামার কি কপাল।

হান্ডিয়া মহাজন — ভাউসান, তোমাক একটা কাথা কহিবা আসিন। যদি শুনেন তে কহি।

ফুলন — কহিয়া আসিয়ান। কহ। শুনি কি কাথা। হান্ডিয়া মহাজন (গানের মধ্য দিয়ে বলে) —

ও না শয়নে স্বপনে ভাউসান
দেখু তমার ছবি
তমাক ছাড়া ও ভাউসানী
মোক ভায় নাগেনি
তমরায় সাজ ফুল ভাউসান
হামরা সাজি ভাউসান ভমরা
মনের সুখে মধু খাম ভাউসানী
তমার ঐ ফুলে বসিয়া

তে-ভাগার রয়েছে অবৈধ প্রেমের কথা। আধুনিককালে যে 'খন'ই রচিত হোক না কেন প্রচ্ছন্নভাবে তার ভেতরে এই 'প্রেম' বস্তুটি থেকে যায়।

# রাম-বনবাস

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি প্রাচীন লোকনাটক রাম-বনবাস। কুশমণ্ডী, বংশীহারী, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ এলাকায় রাজবংশী পালিয়া গোষ্ঠীভুক্ত সমাজের মধ্যে এই নাটকের প্রচলন। এই অঞ্চলে কীর্তন, রামমঙ্গল গান, বিষহরা বা পদ্মার গীতেরও প্রচলন রয়েছে। তার পাশাপাশি ভক্তিমূলক লোকনাটক রাম বনবাস প্রচলিত।

রাম বনবাসের বিষয়বস্তু রামায়ণের কাহিনী আশ্রিত। অযোধ্যা কাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত এর বিষয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। অযোধ্যা থেকে লঙ্কা কাণ্ডের প্রত্যেকটি অংশের কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করে নাটকের রূপে রাম বনবাস পরিবেশিত হয়।

এই লোকনাটকে অরণ্য কাণ্ডের চাইতে লঙ্কা কাণ্ডের কাহিনীই বেশী পরিলক্ষিত। রামের বনবাস থেকে রাবণবধ পর্যন্ত এর মধ্যে কাহিনী। এই কারণে লোকনাটকটির নাম 'রাম বনবাস'। মূল গায়কদের কাছে প্রশ্নটি উত্থাপন করে এরকম উত্তরই পাওয়া যায়। 'রাম বনবাস' — এই নামকরণ পূর্ব থেকেই প্রচলিত। হালে এই নামেরও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

এই লোকনাটকটির মঞ্চ সজ্জা অতি সাধারণ। খোলামাঠে মঞ্চের মধ্যে বাদ্যকারদের বসার ব্যবস্থা থাকে। তাদের ঘিরে অন্যান্য অভিনেতারা বসেন। মঞ্চের চারদিকে দর্শকরা থাকেন। খোলামঞ্চের চারিদকে বাঁশের খুঁটি এবং উপরে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়। মঞ্চের একদিকে রামচন্দ্রের একটি সিংহাসন থাকে। এই সিংহাসনটিকে পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করা হয়।

অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছদ চরিত্রানুযায়ী মূল গীদাল সাদা ফতুয়া এবং ধূতি পরেন। হাতে একটি চামর থাকে। অভিনয়ে রাবণের দশমাথার মুখোশটি সবচাইতে বড়ো। সূর্পনখা, খর, দূষণ, মহিরাবণ, হনুমান, জটায়ু, নল, নীল, অঙ্গদ — এই চরিত্রগুলির প্রকৃতি অনুযায়ী মুখোশ তৈরী হয়। গ্রামীণ কাঠ-শিল্পীরাই মুখোশ তৈরী করেন। নর-বানর-রাক্ষস এই তিন শ্রেণীর গোষ্ঠীর পার্থক্য বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পোশাক ও মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়। লোকনাটকটিতে রয়েছে বহু চরিত্রের উপস্থিতি।

দুর্গা পূজা, কালী পূজা, হরি পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই লোকনাটক। বর্তমানে সরকারী অনুষ্ঠানে এবং বেসরকারী সংগঠনের অনুষ্ঠানেও 'রাম বনবাস' মঞ্চস্থ হয় তবে খোলা মাঠে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা এই সকল অনুষ্ঠানে থাকে না। গ্রামীণ পরিকাঠামোর মধ্যে পুরনো আঙ্গিককেই ধরে রেখেছে রাম-বনবাস। গম্ভীরা, খন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। তাই পরিবর্তন চোখে পড়ে। কিন্তু রাম বনবাস প্রচলিত আঙ্গিকের

মধ্যেই থেকে গেছে।

মূল গীদাল আসরে দাঁড়িয়ে দর্শক-শ্রোতাদের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে অনুমতি প্রার্থনা করে জানতে চান রাম বনবাস পালার কোন অংশটুকু তাঁরা আসরে মঞ্চস্থ করবেন। সময়ের বাধা না থাকলে রামের বনবাস থেকে শুরু করে সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত অভিনয় চলে।

রাম বনবাস পালা নাটকে প্রথম দৃশ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের কথোপকথন। লক্ষ্মণকে রাম রাজ্য ছেড়ে যেতে নিষেধ করছে। ঠিক সেইভাবে সীতাকেও রাজ্য ছেড়ে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে।

রামের কথা — শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে যাব আমি বন।
পিতা-মাতা ভাই সহ থাক একস্থানে।
চৌদ্দ বৎসরের জন্য যাব আমি ঐ অরণ্য কাননে।

সীতাকে রামের যুক্তি —

'সীতা, সীতা। চৌদ্দ বৎসর বনবাস দারুন যন্ত্রণা, নারিবি সহিতে প্রাণে। তার চেয়ে থাক তুমি, হেথায় গৃহ মাঝে, মাতৃসেবা কর তুমি আনন্দিত মনে।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বিদায়ের পরেই কিষ্কিন্ধ্যানগরের দৃশ্য ভেসে ওঠে। বালি, সুগ্রীব ও তারা প্রবেশ করে। দানবকে বধ করার জন্য বালি পাতালে যায়। রাজ্যের প্রজাগণ রাজার অভাবে বড়ই কষ্টে পড়ে। বড় প্রজা, ছোট প্রজা, কানা, কেরাণী এই রকম বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক আলোচনায় লোকায়ত জীবনের কথা ফুঠে ওঠে। কিষ্কিন্ধ্যানগরের এক কেরাণী বলছে — আরে বাবা তোমাদের হল কি! এই অফিসে এসে চিৎকার করছ কেন ?

প্রজা — 'চিৎকার করছি কেন? দেশে খুব দুর্ভিক্ষ পড়েছে। তাই এসেছি কিছু সাহায্যের জন্য। আমাদের কিছু সাহায্য দিন।'
রাজার অনুপস্থিতে রাজ-প্রশাসনে ঘটেছে বিশৃংখলা। প্রজারা তাই সবাই মিলে সুগ্রীবকে রাজা বানিয়ে দেয়। কেটা নির্বাচনের কথা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রজা — 'শুনেন কেরাণী সাহেব। পাতালে গেলে মানুষ আর ফিরে আসতে পারে না। একন এক কাজ করি, আমরা সকল প্রজা মিলে তাহাকে রাজা সাজিয়ে দিই।'

কেরাণী — 'ছোট রাজকুমার আপনার দাদা পাতাল থেকে আর ফিরে আসবে না। তাই আমরা সকলে প্রজা

মিলে আপনাকে রাজা সাজিয়ে দিই। আর আমাদের কিছু সাহায্য দিয়ে দিন।'

লোকজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অভাব পূরণের কথাগুলো নাটকের মধ্যে দেখা যায়।

অন্যদিকে বনের মধ্যে সূর্পনাখার বিবাহের ইচ্ছাকে রাম-লক্ষ্মণ প্রত্যাখ্যান করে। তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সূর্পনখারই নাক-কান কাটা পড়ে। লঙ্কাপুরীতে এ খবর পৌঁছে গেলে রাবণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। মারীচকে রাবণ অনুরোধ করে মায়ারূপ ধারণ করে রামকে ছলনা করতে যাতে সে সীতা হরণ করতে পারে। রাবণ এখানে গীতের মধ্যে মারীচকে বলছেন —

হস্তে ধরি পায়ে পড়িরে মামা, করি নিবেদন। ওহে মায়ামৃগ বেশে যাহ কুটীরের পাশে। সোনার বরণ দেহখানিরে মামা, রূপার মস্তকখানিরে। নাচিতে নাচিতে যাহ কুটীরের পাশে ওহে। তুমি যাহ আগে আগেরে মামা, আমি যাব তোমার পিছেরে মামা হরিব জানাকীরে।

এই অংশে নাটকে মামা-ভাগ্নের সম্পর্ককে খুব নিকট করে দেখতে পাওয়া যায়। রাবণ ছদ্মবেশে সীতার কাছে ভিক্ষা চাইতে গেলে সীতা বলে —

শুনহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আমি বলি তোরে।
কি দিয়ে বুঝাব তোমায় অন্ন নাহি ঘরে।

তখন রাবণের গীতের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে এলাকার মানুষের বারমাসের জীবনযাত্রার চিত্র।

রাবণ —

ওরে আমার কপালে ভিক্ষা হল নারে।
বৈশাখ মাস ধর্মমাস ভগদই ছিটাছিটি।
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম, খাইতে বড় স্বাদ।
আষাঢ় মাসে অনাবৃষ্টি, বিনা মেঘে কাছ।
শ্রাবণ মাসে ঘন মেঘ চুয়ায় পড়ে ব্যাঙ।
ভাদ্রামাসে মনসা পূজা, জলে ভুরা ভাসে।
আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, ঘরে ঘরে জুলে।
কার্তিক মাসে কালি পূজা পাঠা বলিদান।
অগ্রাহণ মাসে নতুন ধান ঘরে ঘরে নবান।
পৌষমাসে পৌষ আলো চিড়ায় লেপন।
মাঘ মাঘে মাখি জার ঝাপ টানানি।
ফাল্গুন মাসে দোলের চাঁদ রং ছড়াছড়ি।

চৈত্রমাসে চৈতা কালী ঠাকুর মেলা লাগে।

বারো মাসে তের চাঁদ সর্বলোকে জানে।

বারো মাসে তের চাঁদ গেলরে চলিয়া।

বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রকৃতির বর্ণনা লোকনাটক রচয়তিার ভাবনায় ফুটে উঠেছে। বৈশাখে 'ভগদই ছিটাছিটি' বলতে ধর্মমাসে পূজার প্রসাদের কথা বোঝাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠের পাকা আম, আষাঢ়ের অনাবৃষ্টি, শ্রাবণের মেঘ, ভাদ্র মাসের মনসা পূজা, আশ্বিনের দুর্গা, কার্তিকের কালী অঘ্রায়ণ মাসের নবান্ন, পৌষের আতপ-চিড়ে, মাঘের ঠাণ্ডা, ফাল্গুনের দোল, চৈত্রের লৌকিক চৈতা কালীর পূজা — এই সব কিছুর বর্ণনা রাবণের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোথাও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ বেশী ভিক্ষুক রাবণ এখানে সাধারণ অভাবগ্রস্ত মানুষ হিসেবে চিত্রিত।

সীতাকে হরণ করে রাবণ অশোকবনে রেখে দেয়। হনুমানের সীতা সন্ধান দৃশ্যে লৌকিক ও সামাজিক জীবনের কথা পাই।

সীতা — বাবা হনুমান আমি তোমায় কি খেতে দিব, একটি ফল খাও বাবা।

হনু — মা সীতা, একটা ফলে আমার উদর পূরণ হবে না। এই ফলের বাগান কোথায় আছে মা।

সীতা — ওইযে বাবা ফলের বাগান, তুমি গিয়ে ফল খাও। রাবণ শুক-সারণকে দায়িত্ব দেয় বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য। শুকের কথা — মহারাজ, বাগানতো পাহারা দিতে যাবো তাহলে আমাকে কিছু চিড়া মুড়কি খেতে দিন।

নাটকের গতির সাথে চরিত্রগুলি কখনো কখনো খুবই সাধারণ হয়ে ওঠে। দর্শকদের আর্থ-সামাজিক জীবনের সঙ্গে অভিনেতাদের জীবন জড়িত। ফলে বিষয়বস্তু রামায়ণের হলেও লোকসমাজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। ফলে নাটকের গতি কখনো ঢিলে হয়। তবু শ্রোতাদের আকর্ষণ কমে না। রাম রাবণের যুদ্ধে রাবণের প্রধান প্রধান সৈন্য নিহিত হলে তরণী সেনকে রাবণ আহ্বান করছে। আহ্বানে রাজী হলে সরমার পুত্রকে যেতে দিতে চায় না। সরমা গীতে পুত্রহারা মায়ের বেদনা —

যেও না যেও না বাপরে ও বাপ

নর বানরের রণে

নর বানরের রণে গেলে বাচিব না প্রাণে।

পুত্র তরণী গীতের মধ্য দিয়ে বিচায় চায় —

বিদায় দাও বিদায় দাও গে মাতা
বিদায় দাও হে মোরে
রণ করিতে যাব ওগো মাতা শ্রীহরির সনে।

যুদ্ধে লঙ্কার বীরদের নিধন সংবাদ রাবণের কাছে শুক পৌঁছে দেয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দূত মুখে রাবণ সংবাদ পান। এই লোকনাটকে শুক দূতের ভূমিকা পালন করে। এই নিধন সংবাদ পরিবেশনে শুক কখনো সিরিয়াস হচ্ছে আবার কখনো হাল্কাভাবে কথা বলছে।

শুক — মহারাজ, আপনার তরণী সেন বীর রণে পতন।

রাবণ — একি শুনালে শুক মোরে। তরণী সেন বীর মোর গেল যম ঘর। যাও পুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে এস আমার সম্মুখে।

যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পতন হলে শুক এসে রাবণকে সংবাদ দেয়।

শুক — মহারাজ মহারাজ, আপনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র একেবারে মর গিয়া।

নাটকে রাবণের কাছে দুঃখের খবর শুক দূতরূপে এরকম ভাবে পৌঁছে দেয়।

রাবণ দুঃখে গীত গায় —

কি হল, কি হল বিধিরে এ বিধি আমার কপালে
দেবীর পূজিতে মহি গেল যম ঘরে
মরেরে সোয়া লক্ষ নাতী
এক জন না রইল, বংশে দিতে বাতি।

এই গীতে রয়েছে রাবণের বেদনা। রাবণের 'মৃত্যুবাণ'-কে উদ্ধার করার জন্য মন্দোদরীর সঙ্গে হনুমানের কথোপকথন অতি সাধারণ। গ্রামের পুরুষ ও মহিলার বাক্য বিনিময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

জ্যোতিষী — হনুমানকে মন্দোদরী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ বাবা, আচ্ছা বলতো বাবা ফুল দুটি কি ?
কোন ফুলটি জয় আর কোন ফুলটি পরাজয় ?

হনুমান — বগাটা কালো। বগিটা ধলা। আর এই বাড়ীর উপর দিয়া মহি চক্র চলে গেল। আনতো মা চাল ডাল কুমড় বড়ি। ঐ পুকুরের জালে মাছ ধরি। মা, আমার গণনা হয়েছে। আপনার দক্ষিণ হস্তে জবাফুল আর বাম হস্তে গোলাপ ফুল। বামহস্তের জয় আর দক্ষিণ হস্তের ফুলটির পরাজয় মা।

লৌকিক ভাষায় জ্যোতিষের মন্ত্র। ঝার-ফুক, মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাসী লোকের কাছে জ্যোতিষ হনুমানের মন্ত্র এখানে

হয়েছে সজীব। গণনা করতে করতে জ্যোতিষ হনুমান গ্রামীণ ছড়া কাটে।

রাজার বাড়ী চুরি ডাকাতি
পুকুরের পাড়ে সিং
গাছের আগায় বিছানা বালিস
পাণিত পাড়ে নিন

মন্দোদরী হনুমানকে রসগোল্লা, পানিতাওয়া, চমচম খেতে বলে। উত্তরে হনুমান জানায় —

"না মা আমি এসব চিরাইতে পারব না। কারণ বুড়ো হয়ে গেছিতো দাঁতগুলো সব নড়ে গেছে।
তাই আমি বলছিলাম কি, আমার জন্য চাল ভাজা, কলাই ভাজা, পাঁপড় ভাজা এইসব খাইতে মজা।"

এ ধরনের কথাবার্তায় চরিত্রগুলি দর্শকের কাছে আপন হয়ে উঠে।

এই লোকনাটকে রামের কাছে রাবণের পরাজয়ের সময় রাবণের কাছে রামচন্দ্রের গুণকীর্তনের কথা নেই। রাজধারী লোকনাটকে রাবণের পরাজয়ের মধ্যে রাবণের আত্ম-নিবেদন আছে। রাম-বনবাস পালা নাটকে এরকম কোনো বিনয় রাবণের নেই। এই পালায় রামচন্দ্রের 'সীতা উদ্ধারই' কাহিনীর মূল বিষয়। তাই নাটকও শেষ হয় রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে।

# গম্ভীরা

উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকনাটক গম্ভীরা। সারা বাংলায় লোকনাট্যের যত রকম ফর্ম দেখা যায় উত্তরবঙ্গে তার অনেকটাই পাওয়া যায়। কোচবিহার থেকে মালদহ পর্যন্ত ভূ-খণ্ডে এই লোকনাট্যগুলির অনেক রূপেরই প্রচলন আছে। তাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে গম্ভীরায় স্থান প্রথমদিকে। গম্ভীরা মালদহের লোকনাট্য। মালদহের পার্শ্ববর্তী দুই জেলা মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুরেও তার প্রচলন দেখা যায়। মালদহই এর কেন্দ্র স্থল। মালদহের সর্বত্র যেভাবে গম্ভীরার অনুষ্ঠান কিছুদিন আগেও দেখা যেত এখন ততটা নেই। নগর সভ্যতার বিস্তারের ফলে লোকসংস্কৃতির এই রূপগুলি কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং নবরূপে নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। লোকসংস্কৃতির শক্তি এখানেই যে তা নূতন পরিস্থিতিতে কিছু স্তিমিত হয়ে পড়লেও পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে। গম্ভীরা এখন উত্তরবঙ্গের ভদ্র সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গনে ও অভিনীত হচ্ছে। তাছাড়া কিছুটা সরকারী উদ্যোগের দ্বারাও তার পুষ্টিবর্ধন হচ্ছে। ফলে লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে মালদহে গম্ভীরা-গান গ্রামীণ সংস্কৃতিতে কিছুটা ক্ষীণ হয়ে পড়েও হৃতবল হয়নি। ড. প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ লিখেছেন বছর ত্রিশ চল্লিশ আগেও বাঙলার জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবের'' মত ধূমধামের সঙ্গে গম্ভীরার অনুষ্ঠান হত।[৪৭] এখন তার আয়তন কিছু সংকুচিত হয়েছে। বর্তমানে মালদহের ৮/১০ টি থানায় গম্ভীরার অনুষ্ঠান হয়। দুপাশের দুই জেলা ধরে মাঝে মালদহকে রেখে মোটের উপর গম্ভীরার প্রচলন কম নয়।

গম্ভীরা শব্দের অর্থ নিয়ে গবেষকেরা খুব স্পষ্ট কিছু নির্দেশ করতে পারেন নি। গম্ভীরা কথাটির অভিধানিক অর্থ বাড়ির ভিতরের কোনো স্থান অন্তঃপ্রকোষ্ঠ। গম্ভীরা শব্দটির ব্যবহার এই অর্থে চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায় 'গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসানিও প্রভুকে শোয়াইল'। গম্ভীরা এখানে বাড়ির ভিতরের কোনো ঘর। কিন্তু এই অর্থে গম্ভীরা কথাটি এখন চলেনা। শিবের মন্দির সংলগ্ন অংশকে গম্ভীরা বলে অভিহিত করা হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা শব্দের উৎস মূল আদি জনজাতির জীবনের মধ্যে খুঁজেছেন। শিবপূজার মণ্ডপকেও গম্ভীরা বলা হয়ে থাকে। সেই সূত্রে গ্রামীণ দেবতার পূজাস্থান অর্থেও গম্ভীরা শব্দের প্রয়োগ দেখেছেন পুষ্পজিৎ বাবু।[৪৮] এ থেকে বলা যেতে পারে শিবের পূজা উপলক্ষে গীত যে লোকনাট্য বা লোকগীত তাই গম্ভীরা। এখনকার গম্ভীরা গানের সঙ্গে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এরকম একটা সহজ অনুমানের কথা মনেই আসতে পারে। পুষ্পজিৎবাবু শিবপূজার একটি স্বতন্ত্র ধারার নাম গম্ভীরা পূজা বলে মনে করেন। শিবকে গম্ভীরও বলা হয়। পুষ্পজিৎবাবু গানে

এই গম্ভীরাপূজার মূলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রভাব সন্ধান করেছেন। প্রদ্যোৎবাবুর অনুমান তার পিছনে জাদুবিদ্যা ও তন্ত্র সাধানার প্রভাব আছে। তবু মোটের উপর একথা সকলেই স্বীকার করেন যে গম্ভীরা মূলে আছেন শিব

দেবতা। শিবপূজাই গম্ভীরা পূজার নাম নিয়েছে। এই শিবের পূজার পিছনে হয়ত প্রাচীন কোনো জনগোষ্ঠীর পূজা ও তন্ত্রাচারের প্রভাব আছে। প্রদ্যোৎবাবুর লেখা থেকে দেখতে পাই গম্ভীরা অনুষ্ঠানে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য করবার প্রথা বামনগোলা থানার কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে।[৪৯] আর গম্ভীরা পূজা বা গম্ভীরা বর্তমানের লোক সংগীত নাট্যের সঙ্গে যাদের যোগ তারা বর্ণ হিন্দু নন। এই পূজার সঙ্গে প্রধানত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও রাজবংশী সমাজের যোগ। ''মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর থানা এলাকা 'বরিন্দ' বা 'বরিণ' এলাকা নামে পরিচিত। এই এলাকায় রাজবংশী, দেশি, পলি, বাবুপলি, সাধুপলি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস। ...এই কোচ-ক্ষত্রিয় রাজবংশী-দেশি-পলি গোষ্ঠীর সম্মিলিত উৎসব হচ্ছে গম্ভীরা উৎসব।''[৫০] পরবর্তীকালে এই বরিন্দ এলাকায় বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জাতিধর্মের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। ''সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে, একসঙ্গে বসবাসের ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক মিলন মিশ্রণ ঘটেছে। দেশ বিভাগের পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এসে এ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। সংস্কৃতির আদান-প্রদান গ্রহণ-বর্জন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ব্রহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-কুণ্ড-তিলি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ও গম্ভীরাগানের অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সুফি মাস্টার (মহম্মদ সুফি), মেরাজ্জদ্দীন, শমীর খলিফা, আবছন মজিদ, সোলেমান ডাক্তার প্রমুখ গম্ভীরা শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।''[৫১]

গম্ভীরা উৎসব চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার দিকে অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক পূজা বর্তমানে শিবের সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে গম্ভীরা পূজা শিবের পূজা আর গম্ভীরা গান চড়ক উপলক্ষে শিবের পূজাকালীন সঙ্গীত। আনুষ্ঠানিকভাবে গম্ভীরা উপস্থাপনের একটা বিশেষ প্রচলন কাল রয়েছে। চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে যায় পর্ব অনুসারে উৎসব। 'গম্ভীরা' প্রাঙ্গণে পূজা, গান এবং নৃত্য — এই তিনটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চৈত্রের শেষ সপ্তাহের তৃতীয় দিন থেকে শুরু হয় 'ঘটভরা' উৎসব তারপরের দিন হবে ছোট তামাসা। এই ছোট তামাসার দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান ও নৃত্য বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে করবে। পঞ্চম দিনের দিন বড়রা নাচ-গান করেন। এই দিন নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার হয়। মুখোশ পরিধান করে মহিষাসুর নৃত্য, শিব-পার্বতী নৃত্য ইত্যাদি নৃত্যের পরিবেশন হয়। ষষ্ঠ দিনে কুশীলবগণ গ্রামের বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান করে করে গ্রাম পরিক্রমা করেন। এই পরিক্রমাতে সবাইকে আহ্বান করেন। তাই এই পর্যায়টির নাম 'বোলোবাই'। 'বোলোবাই' বা 'বোলোয়াই' শব্দের আঞ্চলিক অর্থ হচ্ছে কাউকে ডেকে আনা। অন্যদেরকে ডেকে ডেকে ঘটনার বিবরণী শোনানো। ঠিক এখানেই গম্ভীরা লোকনাটকের উৎস।

সপ্তমদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজাপাঠন এবং তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত

হয়ে থাকে। নতুন বৎসর থেকে শুরু হয় নতুন গান তৈরীর পালা। সমাজের গতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গম্ভীরা নাটক বিশেষ রীতির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সারাবৎসরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই লোকনাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।

বর্তমানে গম্ভীরা শব্দটি গম্ভীরা পূজা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে কেবল গম্ভীরা গান অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসলে শিবের গম্ভীর আখ্যাটি অপ্রচলিত হয়ে শিবকে স্থান ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু গম্ভীরা যে অর্থে লোকউৎসব বা লোকসঙ্গীত সেখানে শব্দটি প্রয়োগ অপ্রচলিত হয়নি। কাজেই গম্ভীরা এখন শিবপূজার সঙ্গে যুক্ত আবার তা থেকে বিশ্লিষ্ট একটি স্বাধীন লোক সঙ্গীত। "এ গীত এখন স্থানকাল মানে না, তাই আগের গম্ভীরা গীতের চেয়ে আজকের গম্ভীরার পূজা বিহীন গীতে সর্বজনীনতার ছাপ বেশি।"[৫২]

পুষ্পজিৎ রায় তাঁর 'গম্ভীরা' পুস্তকে গানের সঙ্গে বোলবাহি বা বোলবাই পালাধর্মী গানের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। 'বোলবাহি' খোট্টা ভাষার শব্দ, তার অর্থ আহ্বান করা। কোনো ব্যক্তিকে ডেকে আনা বা সম্ভাষণ জানানো। বামনগোলা হবিবপুরের কোনো কোনো গ্রামে একে কুৎসা বা কেচ্ছা অর্থে ব্যবহার করা হয়। বোলবাহি কেচ্ছা জাতীয় গান।[৫৩] গম্ভীরা গানে সেই বোলবাহি গানের প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। তিনি তাঁর 'গম্ভীরা'-তে যেভাবে গম্ভীরা পালাগানের পুনর্গঠন করেছেন তা বেশ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের ধর্ম হিসেবে কাহিনী নির্মাণ শক্তি ও কাহিনীর ক্রমবিকাশ ধর্মের কথা বলেছিলেন। কাহিনীর উপরে যুগপ্রভাবের কথা ও ছিল। চরিত্র ও বক্তব্যে যুগধর্ম ফুটিয়ে তোলার শক্তি লোকনাট্যের প্রধান শক্তি। তিনি 'খন' 'পালাটিয়া' ও 'রঙ পাঁচালি' কে প্রকৃত গ্রামীণ লোকনাট্য বলেছিলেন। বোলবাহিগান সম্ভবত তিনি দেখেননি। পুষ্পজিৎ বাবুর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় বোলবাহি গানে একদা খনেরই মতো লৌকিক বিষয় নিয়ে "গুপ্ত বা প্রকাশ্য ভাবে" যে সব "ন্যায় বিগর্হিত" কাজ হত সেই বিষয় নিয়েই গান করা হত।[৫৪] কাজেই বলা যায় লোকনাট্যের মূলধর্ম তা সেই গানে ছিল। কিন্তু ক্রমে সেই গানের রূপান্তর ঘটে। অবৈধ প্রণয় কাহিনী সম্ভবত সর্বসাধারণের নীতি ও রুচিবোধের উন্নতির ফলে এবং পুষ্পজিৎবাবুর মতানুযায়ী" জাতীয় চেতনার বিকাশের ফলে পরিত্যক্ত হয় এবং সেই পালাগানের সমাজ সমালোচনার অংশে সেই অনৈতিক ক্রিয়ার পরিচয় কিছুটা সংবৃত হয়ে পড়ে।[৫৫] গম্ভীরা গানে যে সমাজ সমালোচনা, ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে সমকালীন জীবনের বিচ্যুতি সম্বন্ধে সংগীত পরিবেশন করা হয় — তার মধ্যে পুরানো অনৈতিক ক্রিয়ার উপর বিদ্রূপ বর্ষণ ও সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ভূমিকাটি রয়ে গেছে। মানব সমাজের বহু পুরাতন রীতি ও আচার সভ্যতা বিস্তারের কারণে পরিবর্তিত হয়ে চলে — কোথাও তার সেই সূত্র পাওয়া যায় কোথাও পাওয়া যায় না। — নৈতিক মূল্যচেতনা এবং বিশেষত রুচিবোধের উন্নতির ফলে এই শ্রেণীর অবৈধ প্রণয়মূলক সংগীত কিছুটা পাল্টে যায়। সামাজিক কোন জাগরণ বা কোনো অন্যতম প্রভাব হয়তো এর পরিবর্তনে কাজ করে থাকে।

গম্ভীরার উৎস যাইহোক তার বর্তমান রূপে সেটিকে আর কেবল আনুষ্ঠানিক সংগীত বলা যায় না। অনুষ্ঠান নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে যে সর্বজনীন ধর্ম পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক আচারের সঙ্গে গানের যোগ প্রায় নেই। এ বিষয়ে প্রদ্যোৎ ঘোষ লিখেছেন "একদা গম্ভীরা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে সেই সম্পর্ক হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।"[৫৬]

গম্ভীরার আসর উত্তরবঙ্গের অন্যান্য লোকনাট্যের আসরের মতো দর্শকদের মাঝখানে বসে। চারিদিকে ঘিরে থাকে দর্শক — তার মাঝখানে প্রায় গোলাকার একটি প্রশস্ত জায়গায় আসর বসে। আসরের মাঝামাঝি প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে বসেন বাদ্যযন্ত্রীগণ। কুশীলবরাও তাদের সঙ্গেই বসেন। প্রয়োজন মত তাঁরা সেখান থেকে উঠে গানে বা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এরকমটা অন্যান্য লোকনাট্যেও দেখা যায়। আগে গম্ভীরা মণ্ডপ ফুল দিয়ে সাজানোর কথা অনেকে লিখেছেন। সদ্যফোটা পদ্ম ফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হত। তবে এখন আর তা দেখা যায় না। এখন সাধারণ সামিয়ানা দিয়ে তৈরি মঞ্চেই এ পালাগানের অভিনয় হয়।

গম্ভীরা পালাগানের বিষয়বস্তু প্রত্যহিক জীবনের নানা দিক নিয়ে গড়ে ওঠে। আশুতোষ ভট্টাচার্য একে বর্ষবিবরণীর গান বলেছেন। সমাজ জীবনের নানা ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কারো কোনো কাজের সমালোচনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক মতামত, কালের ধর্মানুযায়ী যুবক যুবতীদের আচার আচরণ, ফ্যাশন — অর্থাৎ যা কিছু একজন বীক্ষণশীল মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে তার সবই এর বিষয়বস্তুর মধ্যে গৃহীত হয়। ব্যক্তিগত ত্রুটির সমালোচনাও এর বাইরে নয়। রাজনৈতিক দলের মতামতগুলি ও এঁদের সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই সমালোচনার ক্ষেত্র থেকে কারো প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখানো হয় না। মানুষের কোনো আচরণ, পোষাক পরিচ্ছদ, বাবুয়ানা, মেয়েদের চালচলন, কারো কোনো আচরণের নিন্দা, স্ত্রী পুরুষের সাংসারিকতা, নারী শিক্ষা, সমাজে গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের উৎপাত, প্রমোটারের বাড়াবাড়ি এই সব বিষয়েই শ্রোতাদের মন বেশি আকৃষ্ট হয়। কাজেই এগুলিকেই গম্ভীরা গানে বিষয় হিসেবে পরিবেশন করা হয়। এ বিষয়গুলি গায়কেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বা কোনো সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করে গানের মধ্যে প্রয়োগ করেন।

গম্ভীরা পালা গানের একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পালার চারটি পর্যায়। প্রস্তাবনা, বন্দনা, চারইয়ারি ডুয়েট এবং রিপোর্টিং। পর্বগুলির নাম অবশ্য কেউ কেউ অন্য নামে দিয়েছেন। প্রদ্যোৎবাবু পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলেছেন —

(১) মুখপাদ (২) বন্দনা (৩) ডুয়েট বা চার ইয়ারি (৪) পালাবন্দীগান (৫) রিপোর্টিং

তিনি ডুয়েট বা চারইয়ারিকে একই সঙ্গে দেখিয়েছেন আর মুখপাদ ও বন্দনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সূচনা বা মুখপাদকে আমরা বন্দনা গানের প্রস্তাবনা অংশে রেখেছি। ডুয়েট ও চারইয়ারিকে দুটি আলাদা পর্যায় হিসেবে ভাগ করে দেখিয়েছি। এছাড়া প্রদ্যোৎবাবু যাকে পালাগান বলেছেন তাও গম্ভীরার একটি পর্যায়। তবে পালা গান এর অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ নয়। কাজেই পালাগান এর মধ্যে জোড়া যেতে পারে, আবার তা না জুড়লেও চলে।

প্রস্তাবনা অংশে দেখা যায় চারজন শিল্পী আসরে প্রবেশ করে নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। কথা বলতে গিয়ে তাঁরা তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। কিংবা বিভিন্ন লোকে তাঁদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে থাকেন এবং প্রতিকারের পথ খোঁজেন। যেমন আমাদের সংগৃহীত পালাগানে দেখা যায় —

প্রথম ব্যক্তি — হায় কি হলোরে ও কি করিরে, কি করি উপায়
বুড়াতি কালে প্যাটে পাথর,
অপারেশনের টাকা নাই

দ্বিতীয় ব্যক্তি — গণেশ বাবাজীর পায়ের তলায়
ঠুকছি মাথা সকাল সন্ধ্যায়
মাতালের বংশ ঘরে ঘরে যেন বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় ব্যক্তি — কারখানা বন্ধ কপাল মন্দ

চতুর্থ ব্যক্তি — পৌরভোট বছরে চারবার চাই
মরবেনা কেহ বিনা চিকিৎসায়
রাখবে রাজার হাল ব্যারাম হলে
হবু কমিশনার ভাই।

প্রদ্যোৎ ঘোষ যে 'মুখপাদ' অংশের কথা বলেছেন তাতে চরিত্রগুলি গান করতে এসে নিজের পরিচয় দেয়।[৫৭] এখানে চরিত্রগুলি নিজেদের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পুষ্পজিৎ বাবু লিখেছেন "সমস্যাগুলির সমাধান প্রসঙ্গে তুমুল তর্কবিতর্ক করতে থাকেন সমস্যা সমাধান করবার জন্য শেষ পর্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেব শিবকে আহ্বান জানান"।[৫৮] প্রস্তাবনা অংশের পর শিব চরিত্র মঞ্চে আসে।

বন্দনা অংশে শিবের বন্দনা এবং শিবের কাছে সমস্যার উপস্থাপনা হয়। বন্দনার রূপ নানারকম। পুষ্পজিৎবাবু সংগৃহীত একটি বন্দনা :

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়া শিবের গম্ভীরা বন্দ

আর বন্দ সরস্বতীর গান

বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ

কিন্তু এরকম আনুষ্ঠানিক বন্দনার সঙ্গে সঙ্গেই আসে শিবের কাছে সমস্যার উপস্থাপনা

কী করলি হে দশা দৈন্য

আজ দেশের লোকে পায়না অন্ন

ওরে হায় কি পস্তানার কথা

শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।

তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী

টাকায় আটমনের দর হইল হে

কুন্ঠে গেল সে মুখের দিন

হনুদিনে দিনে দীনের অধীন শিবহে।

এখন আট সেরের দর ছুটে না

প্যাটে দুবেলা ভাত জুটেনা

তোর নন্দী ভিরিঙ্গি বুড়া দামড়া

কি দিয়ে পূজব কহেক হামরা শিবহে।

আমাদের সংগৃহীত লোকনাট্যের এই বন্দনায় একেবারে একালের ছবি ধরা পড়েছে।

শিবহে

চারিদিকে শুধুই অন্ধকার

বছর বছর বন্যা খরা ভূমিকম্পে দিশাহারা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছারখার

প্রথম — তালিবাজ সরকার বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করছে বামিয়ার

শয়তানেরা করছে ভন্ডামি ধর্মের নামে

দেশের সম্মান বিসর্জিত, করছে ধর্মকে কলঙ্কিত

ভারতে হিন্দু তালিবান, দিয়েছে বর্বরতার প্রমাণ

দ্বিতীয় — ৫৩ বছর অতিক্রান্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন,
দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, মানুষ কর্মহীন।
কাটছে দিন অনাহারে, অপুষ্টিতে শিশু মরে
বহু গ্রামে পানীয় জল নাই, মরছে বিনা চিকিৎসায়
সাইবেরিয়ান বার্ডের মতন ভোট সিজিনে নেতার আগমন
ভাষণে কত প্রতিশ্রুতির জোয়ার।

তৃতীয় — ত্রাণের টাকা লোন স্যাংশন চলছে স্বজনপোষণ
চাকুরি কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে নেতাদের আপনজন
গ্রাম উন্নয়নের টাকায়, পঞ্চায়েত প্রধান কমিশন খায়...

মানুষের অভিযোগ নানারকম সময়ের ইতিহাসও এই গানের মধ্যে উঠে আসে।

যেমন — তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে যতো ইউরোপ মহাদেশে।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে এক হয়েছে জার্মানি আর রুশে।।

দেশের দুর্দিন সম্বন্ধে চিন্তা উঠে এসেছে একটি গানে

শিব হে —
হায়রে দেশ পাপে ভইর‍্যা, গেল সব মইর‍্যা
সাচ্চা নেতার পাল
ভোলানাথ কেমনে কাটি কাল।
স্বাধীনতার যত ফল খাই মিলে বেইমানের দল
দুর্নীতিতে কইর‍্যাছে বেহাল।

কিন্তু যার কাছে অভিযোগ সেই শিবের অবস্থাই তো ভালো নয়

শুন বুড়া সাচ্চা কথা বলব কি বলব নাহে
বলব না
তোমার ভাব দেখে মনে হতেছে ভাবনা হে
বাড়ীঘর দিয়া ছাইড়া, শ্মশানেতে রহ পইড়্যা
তুমি সাজিছ বৈরাগী, সঙ্গে লিয়া মাগী হে,
শিঙ্গ ডুমুর হাতে, বেড়াও বুড়া ভূতের সাথে
খাহো গাঁজা আর ভাঙ মুখে বাবাম বাবাম হে।[৫৯]

সমবেত আহ্বানে শিব এসে উপস্থিত হন

এইসব অভিযোগ শুনে শিব বলেন

শিব — ঠিক আছে, তোমাদের যা দুঃখ আছে সব খুলে বল, আমি নোট করে নিয়ে যাব। তোমাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব।

শিবের এই উক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। শিব চরিত্র সম্বন্ধে এখানে একটি দুটি কথা বলা দরকার। শিব সেজে এখন যিনি স্টেজে উপস্থিত হন, তাঁর মেকআপ শিবের মত। পরনে বাঘছাল হাতে ত্রিশূল। শিব চরিত্রকে সামনে রেখেই প্রজাদের এই সব অভিযোগ এবং শিবের কাছে সমাধানের জন্য আবেদন। কিন্তু গম্ভীরাগানে শিবের উপস্থিতি খুব বেশি দিনের নয়। বড় জোর ৬০/৭০ বৎসর। এ বিষয়ে প্রদ্যোৎ ঘোষ যা বলেছেন তার মর্মার্থ দাঁড়ায় :

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাঙলার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একবার মালদহ আসবার কথা ছিল। স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহম্মদ সুফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের সম্মুখে গম্ভীরা গাইবেন ঠিক করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত স্যার আশুতোষ মালদহে আসতে পারেননি। মোহম্মদ সুফী তবু শিবকে উপস্থিত করে গান গেয়েছিলেন —

হে দ্যাখ, হো দ্যাখ কারে ডাকতে

কেডা আইল ভাইরে,

ইনি কি স্যার আশুতোষ ? হাইকোর্টের জজ

গায়ে জামা কেন ছাইরে।

এই উপস্থাপনা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়। ফলে পরবর্তীকালে গম্ভীরায় শিবকে উপস্থিত করবার রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যায়। প্রদ্যোৎবাবুর এই খবর থেকে জানা যায় শিব চরিত্র উপস্থাপনা ৬০/৭০ বছরের বেশি নয়। কিন্তু এরই মধ্যে সমাজব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার পরিচয় শিব চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন প্রথম যুগে শিব ছিলেন ভূস্বামী শ্রেণীর প্রতিনিধি। আর এখন তিনি মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতা। সমাজের যেসব দিকে সমস্যা যেগুলি শিবের নজরে আনা হয়। প্রজারা দুঃখের কথা বলে।

জনগণ — ত্রিশ ভাগ লোক শিক্ষিত আর সত্তর ভাগ অশিক্ষিত। তাও ত্রিশভাগ লোকের মধ্যে সহি করতে কলম ভাঙ্গা দিবে। এই যে শিক্ষায় অবনতি এদিকে নজর দাও।

শিব — কেন, হামিত শিক্ষার জন্য নন-ফর্মাল, নাইট-স্কুল

এ গিলা সব চালু কর‍্যাছি, শিক্ষার উন্নতির জন্যে।[৬০]

এরই মধ্যে আসে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, ঘূর্ণিঝড়, কখনো বা ভোটে রিগিং-এর অভিযোগ, কংগ্রেস তৃণমূল মহাজোট গঠন প্রসঙ্গ এবং আরো নানা বিষয়। শিব তো প্রজাদের অভিযোগ নোট করে নিয়ে যান, সমাধানের চেষ্টা করবার আশ্বাস দেন। এবং পাকা রাজনৈতিক নেতার মতো বলেন —

" তোমরা আমার পাশে থাক, আমি সব সমস্যার সমাধান করে দিব।
এবার যদি ক্ষমতা ফিরে পাই, তাহলে সব সমস্যার সমাধান করে দিব।"[৬১]

শিবের এই উক্তিতে একালের রাজনীতিক নেতার উচ্চারণ শোনা যায়। ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যই শিবকে মাঝে মাঝে 'জনগণের' কাছাকাছি আসতে হয়। একথা জনগণও জানেন। তাঁরা গান গেয়েছেন —

"সাইবেরিয়ার বার্ডের মতন,
ভোট সিজিনে নেতার আগমন
ভাষণে কত প্রতিশ্রুতির জোয়ার।"

কাজেই জনগণও জানেন শিবের ক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রয়োগের সীমানা কতোটা। উভয় পক্ষই এখন উভয়কে চেনেন। গম্ভীরায় সেই গল্পটাই যেন উঠে আসে। আসলে প্রতিদিনের বাস্তব জগৎকে এই শিল্পীরা যেভাবে চেনেন — তাকেই কিছুটা বিদ্রূপাত্মক ভাবে প্রকাশ করেন।

চারইয়ারি —

চারইয়ারি অংশে চারজন বক্তার কথোপকথনের মাধ্যমে সাময়িক প্রসঙ্গের সমালোচনা করা হয়। এখানে কোনো সম্পূর্ণ কাহিনী থাকে না, থাকে এক একটি সমকালীন বিষয়। কখনো রিগিং, সন্ত্রাস, কখনো মহাজোট প্রসঙ্গ, কখনো আবার কীভাবে লোককে ঠকিয়ে অর্থবান হওয়া যায় তার কথা, প্রোমোটারি, কন্ট্রাকটরি, পণপ্রথা, কৌলিন্য, নূতন শিক্ষিত শ্রেণীর নীতিহীনতা, সাম্প্রদায়িক সংহতি নানা বিষয় এর মধ্যে থাকে।

চারইয়ারিতে চারজনের মধ্যে তিনজনের নিজের নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের পর সেই বক্তব্যগুলিকে উচিতার্থে চতুর্থ ব্যক্তি বিশ্লেষণ করে বক্তব্য পেশ করবেন। সেইজন্য এই ব্যক্তিকে বলা হয় উচিত বক্তা। চারইয়ারীর একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে —

প্রথম বক্তা — বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মহাজোট চেয়েছিলাম, ঝঞ্ঝাট চাইনি জোটের নামে।

দ্বিতীয় বক্তা — রিগিং সন্ত্রাস করেছে সিপিএম তৃণমূল সমানে।

তৃতীয় বক্তা — রিংগিং সন্ত্রাস করে বামফ্রন্ট এল সরকারে।

চতুর্থ বক্তা — নাচতে না জানলে পরে বাঁকা হয় উঠান, বারে বারে তুলিস হেরে রিগিং-এর স্লোগান। নির্বাচনে — টি.ভি., পেপারে, বামফ্রন্ট প্রতিবারই হারে। পত্রিকা টি.ভি. বানায় হিরো, ফলাফলে দেখি জিরো। তহেলকা সম্বন্ধে তোদের মুখে কোন কথা নাই, ডুবালি জলে পা দিয়ে দু'নৌকায়।

... ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার, রাইটার্স দখল করতে সংগঠন দরকার।

ডুয়েট — চারইয়ারী উপস্থাপনের পরের পর্যায় হলো ডুয়েট। ডুয়েট শব্দটিতেই বোঝো যাচ্ছে দু'জন অভিনেতার কথা। দু'টি চরিত্রের মধ্যে একজন সাধারণত: স্ত্রী চরিত্র। তবে কখনো কখনো দুজন পুরুষের মধ্যেও ডুয়েট হতে পারে। এখনও পুরুষ স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। তবে সংগতকারদের মধ্যে এখন স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিবেশনেরও রেওয়াজ চালু হয়েছে। ডুয়েটে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর প্রতিদিনের সমস্যার কথাই প্রকাশ পায়। স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনের ডুয়েট অংশে নানা ঘরোয়া প্রসঙ্গ উঠে আসে। কথোপকথনের ভঙ্গিতে তা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

স্ত্রী : আমি তোমাকে বিয়ে করে মরলাম জ্বলে পুড়ে / না জেনে শুনে বিবাহ বন্ধনে হলাম আবদ্ধ/কত ভাল পাত্র দিলাম ছেড়ে।

পুরুষ : তোমার বাবা এসেছিল বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, দিনে শতবার বাবার পায়ে যেত তেল মাখিয়ে, বাড়ীর মাটি দিয়েছিল বসিয়ে, বাবাকে সোজা পেয়ে তোমার বাপে মায়ে দিল গছিয়ে, এমন রণচণ্ডি আমার ঘাড়ে।

স্ত্রী : রিহার্সালে কর তোমার ষাঁড়ের মতো চিৎকার, শিল্পীবন্ধুদের জন্য চা করে দাও তিনবার, যেন কেনা দাসী। তোমার পানের পিকে পোড়া বিড়িতে ঘর করে একাকার, চলবে না সব ঐ ঘরে, সব ফেলব ছুড়ে।

পুরুষ : তোমার ভাই, বোন, দাদা পরিজন আত্মীয় যত, আমার বাড়ীকে করেছে হোটেলে পরিণত, এখানেই আব্দার যত। সম্মানের খাতিরে, বিছানা ছেড়ে, ঘুমাই মেঝেতে। আমিও দেব এবার বের করে।

স্ত্রী : পরনিন্দা, পরচর্চা এইতো গম্ভীরা

ছেড়া কাপড়ে রাস্তার ধারে
গায় ছোট-লোকেরা
শোনেন ভদ্র যারা
অসভ্যের মতন, তোমাদের নাচন, কি বিচ্ছিরী ভাষা
নাই মান সম্মান এই কালচারে গম্ভীরা দাও ছেড়ে।

পুরুষ : এই পোষাক, ভাষা, নৃত্য আর গম্ভীরা গানে। আঘাত হেনেছিল ভারতে বৃটিশ শাসনে, গম্ভীরা শিল্পীগণে। সুভাষচন্দ্র, কবি রবীন্দ্র মণীষীগণের গম্ভীরা কেটেছিল দাগ অন্তরে।

স্বামী স্ত্রীর ডুয়েট অনেক সময় অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। সংসারে অভাব স্ত্রী চাকরি করতে চায়, স্বামী স্ত্রীকে চাকরি করতে দিতে চায় না। তার একটি চিত্র পুষ্পজিৎ রায় তাঁর 'গম্ভীরা' বইয়ের ১০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন।

স্ত্রী — দেখ সংসারে তো বড্ড অভাব।

পুরুষ — এই কথায় কি চাহিস জবাব।

স্ত্রী — হুকুম দাও তো চাকরি করি।

পুরুষ — তোর চাকরির ঠোকনা মারি।

স্ত্রী — তুমি আমার কথা লাও না ধরে

পুরুষ — দূর কাহা যাবি ঘরের কাজ ছেড়ে

স্ত্রী — যদি কেলেক্টারির হই কেরানি

পুরুষ — তখন হবি মানির বেটি মানি

ভাত তরকারি বাঁধবো ধনী

তুমি করবা মালিকানা

স্ত্রী — স্পেশাল কেডারের যদি চাকরি পাই।

পুরুষ — চেংরা পেংরার ঘি থাকবে না মাথায়,

শুধু দেখবে তোকে পড়বে কি ছাই

ফেল ছাড়া পাশ করবে না।

স্ত্রী — ডিউটি দিব রাইফেল ধইরে

পুরুষ — তবে চোর দেখে খুব যাবে বাইরে,

রাইফেল কুনাও নিবে কাইড়ে

তোকেও খুঁজে পাবো না।

স্ত্রী — খেলব টেনিস ফুটবল হকি

পুরুষ — তোর মাথাতে ঢুইকেছে কি,

খেলওয়াড়রা করবে ধাক্কাধাক্কি

ফাউল ছাড়া গোল করবে না।[৬২]

এসব প্রসঙ্গ সমাজ মানসিকতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। একদিকে আর্থিক চাপ অন্যদিকে পুরুষের স্ত্রীকে ঘরে রাখার ইচ্ছা — এবং মেয়েরা বাইরে চাকরি করতে গেলে তার সম্ভাব্য পরিণাম এসব বিষয়ের উদ্বেগ বাড়ে। লোককবির রসিকতার মধ্যে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

'ডুয়েট' প্রদর্শন শেষ হলে কোনো কোনো গম্ভীরা নাচদল 'টনটিং' বলে আরেকটি পর্যায় উপস্থাপিত করেন।

'টনটিং' আর কিছুই নয় — এ শুধু কারো কার্যকলাপকে বিদ্রূপ করা। সামাজিক রাজনৈতিক বা পারিবারিক কোনো কার্যকলাপ নিয়ে দুটি চরিত্র বিদ্রূপ করে, গান এবং কথা দিয়ে দর্শক শ্রোতাকে বোঝাতে থাকবেন। এই চরিত্রগুলিকে আবার বলা হয়ে থাকে উচিত বক্তা। সমাজের কর্তাদের কিংবা দেশের নেতাদের যে কোনো কর্মকে কেউ ভালোভাবে না নিলে তাকে বিদ্রূপের আকারে এখানে পরিবেশন করা হয়।

প্রথম বক্তা : বেকারত্ব ঘুচবে ভারতে মন্দির নির্মাণ হলে,
কাজকর্ম আর উন্নতির পথ ভারতে যাবে খুলে,
চুরি ছিনতাই করবো, টাকা লুটবো
মন্দিরে গেলে ক্ষয় সর্বপাপ

প্রথম চরিত্রের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চরিত্র গান ও কথার মধ্য দিয়ে বিদ্রূপ করবেন।

দ্বিতীয় বক্তা : অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলি নির্বাচনে
তোদের স্পর্শে সাধু হল লম্পট গুন্ডাগণে
টাকা কামালো গুরুয়া গরলা ভন্ডামী করাই তোদের স্বভাব।
দাপরযুগে আবির্ভূত কৃষ্ণ অবতার, ইকাল করব পূজা হব রাজা থাকবে না ঘরে অভাব।

তৃতীয় বক্তা : ভারতবুকে আদিবাসী আর হরিজনে,
উচ্চবর্ণের লোকেরা মারছে পুড়িয়ে জ্বলন্ত আগুনে
কেন প্রতিবাদ নাই, হরিজন হওয়ায়,
নাইকো তোদের অনুতাপ।

এইভাবে প্রথমবক্তার বক্তব্যকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তা তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করে উপস্থাপন করে থাকেন।

টনটিং এর একটি পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'অর্থমন্ত্রীজি আপকো শ' সেলাম
জনতা কো দিয়া আজব ইনাম
আপকা বাজেট বহুত খাসা
পুরাহোগা মনকা আশা
অমর রহেগা আপকা নাম।'

— লক্ষণীয় এই গানের ভাষা হিন্দি, কারণ অর্থমন্ত্রী হিন্দিভাষী। বাজেট প্রসঙ্গে

প্রথম বক্তার কথা — বাড়ী ঘর বেচা কিনব মারুতি গাড়ী
ঋত্বিক হবো, ঘুরবে কত, পাশেতে সুন্দরী
ঘুর ঘুর করবে কত ছুঁড়ি
নাচন কুদন করব কত,
হিন্দি সিনেমার মত
মুখে গাইব কহনা পিয়ার হ্যায়ের গান।

দ্বিতীয় বক্তা — ভর্তুকী বন্ধ, কৃষিতে আমদানি শুল্ক হ্রাস,
ডিজেল সারের বাড়ছে দাম কৃষকদের বাঁশ
ভারতে কৃষির সর্বনাশ
শুদ্র পাঞ্জাব হরিয়ানায়
আত্মহত্যায় জীবন যায়
তোদের কাছে নাই চাষী জানের দাম।

তৃতীয় বক্তা — সোনাহীরা ফ্রিজ সস্তাতে পাব এবার
গলাতে পরাব বৌকে হীরার হার
সর্বাঙ্গে সোনার অলংকার
ফ্রিজেতে রাখব তুল্যা ফলের জুস আর পেপসি কোলা
ভারতবাসী অতি ভাগ্যবান।

গম্ভীরা গানের শেষ পর্বটির নাম রিপোর্ট। 'রিপোর্ট' আর কিছুই নয় দর্শকদের কাছে সারা বৎসরের ঘটনার বিবরণ দেওয়া। এই অর্থে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা গানকে বর্ষবিবরণী বলেছিলেন। এই পর্যায়ে শিব দেবতাকে ডেকে এনে দেশের সারা বৎসরের কথা রিপোর্ট করা বা বিবরণ দেওয়া হয়। নানান সমস্যার কথা শিবকে শুধু বলাই নয় শিবকে কৈলাশে প্রস্থান করার আগে সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিতে হয়।

'রিপোর্ট' শুরু হতেই শিল্পীরা গেয়ে ওঠে একটি গান। এই গানের মধ্য দিয়ে তাদের দল এবং সাহসের কথা প্রতিফলিত হয়।

নানা হে,

আমরা সদর্পে গম্ভীরা গাই

করব না মাথা নত, কাপুরুষের মত

গোবিন্দ গোপীনাথ বলেছে তাই।

গানের শেষে দুটি চরিত্র মূলত: মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিবকে 'নানা' সম্বোধন করে প্রতিবেদন পেশ করেন।

১। শিব কহে দে উপায়

হামরা বাঁচি কী প্রকারে

মোদের ইস্তক বিস্তি কাবার হইল

ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে

আর ধীরেনবাবু ফেনসি ড্রেসে

টাউনে নাম জারি

আর মজা মারে প্রথম ডাক্তার

কামিয়া গোঁফ দাড়ি।[৬৫]

২। বলবো কী গান ওহে শিব বাগানে নাই আম

গাছে গাছে বেড়িয়া দেখছি নূতন পাতা সব সমান।

মনে মনে ভাবছি বন্যা কাজের কোনো পায়না দিশা

তেল ধান চাটলের দর খুব কলা ভূয়ার বেশী দাম।[৬৬]

৩। আপ্পায়ারা পিল্ল রিপোর্টার

তেপান্ন বছর বয়স তার

হোটেলে বিদেশিনী বুড়ার জাগালো শিহরণ

রসে পরিপূর্ণ বুড়ার যৌবন, সুন্দরীর জন্য আত্মহারা

হোটেল কর্তৃপক্ষ বুঝল না দুঃখ

বুড়াকে দিল বিদায়। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

৪। নাতীর চাকরী করার সখ

দিদিমা টাকা দিতে নারাজ

দিদিমার সোনার দাঁতের প্রতি,

নাতির লোভ হলো অতি,

এক বক্সিং মারল কস্যা
সোনার দাঁত গেল খস্যা
দিদিমা গেল স্বর্গধামে
নাতি গেল জেলখানায়। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

৫। রাজনৈতিক দল, দেশে প্রবল
মালিকশ্রেণী পুঁজিপতির দল
সুখী নয় কেউ, তাই অন্তর্দ্বন্দ্ব
দেখে অবস্থা কয় গোবিন্দ
না হলে বন্ধ অন্তর্দ্বন্দ্ব
স্বাধীনতায় কোনো সুখ নাই। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

৬। মন্ত্রী, এম.এল.এ., এম.পি.গণ
ভোট দেয় মুখের মতন
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
ভুল ভোট দেয় ৬৭জন
স্বনামধন্য মন্ত্রী এম.এল.এ.
ভারতের সুনাম বাজায়। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

রিপোর্ট পর্বে সম্বৎসরের নানা বিষয় নিয়ে গান করা হয়। শিব সে সব গান শোনেন। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রাস্তার অবস্থা, মেয়েদের ফ্যাশন, লোডশেডিং, শিক্ষা, চাকরি কোনো কিছুই এর বাইরে নয়। এই সব বিবরণ দেখে একে বর্ষবিবরণী নাম দেওয়া সার্থক বলেই মনে হয়। গম্ভীরা গানের মধ্যে লোক সাংবাদিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গম্ভীরা গানে রিপোর্টিং হয় রঙ্গ ব্যঙ্গের ঢং-এ। এই হাস্য পরিহাসের মধ্যে দেশের অবস্থার পরিচয় তুলে ধরা হয়। লঘু কৌতুক বা বিদ্রূপের ঢং ব্যবহার করবার ফলে শ্রোতাদের কাছে তার আবেদন বেশ সরস হয়ে পৌঁছায়। উপরন্তু তাতে সমালোচকের সচেতন মন ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে রঙ্গ রসিকতা ও নীতি মূল্য দুইই তাতে পাওয়া যায়। ঠিক একইরকম না হলেও চড়ক উপলক্ষে অনেক জায়গায় হ'ত। এই সঙগুলিও হ'ত কোনো অনৈতিক প্রণয় বা কোনো লোকসমাজের প্রসঙ্গ নিয়ে। তারও লক্ষ্য ছিল সমাজ সমালোচনা ও মনোরঞ্জন।

এই সকল রিপোর্ট করার পর পূর্বের ডুয়েটের মতো দু'টি চরিত্র এখানেও ডুয়েট প্রদর্শন করে থাকেন। এই

ডুয়েটে স্বামী-স্ত্রীর ঘরোয়া সমস্যাই হালকা-লঘুচালে গানের আকারে প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টিং পরিবেশনের মধ্যে প্রদর্শন বৈচিত্র্য আনার জন্য কুশী-লবরা এটা করে থাকেন। পুনরায় রিপোর্টিং শুরু হয়।

১। গর্ভে আসে যদি সন্তান,
করো অন্য গর্ভে চালান,
যখন ভূমিষ্ঠ হবে,
কাকে মা বলে ডাকবে,
গর্ভ যন্ত্রণা সইতে হবে না,
বিনা কষ্টে মা হওয়া যায়।

২। আশ্চর্য খবর শুনলাম ভাই,
পুরুষ মাইয়া হইয়া যায়।
শুন্যা লাগছে ভীষণ ভয়,
কপালে যদি এমন হয়,
তখন বলবে না বউ প্রাণনাথ,
দুজনারই স্বামী নাই।

৩। সাঁইবাবার কন্যা হলে,
সোনাদানা চাকরী মেলে,
ইঞ্জিনীয়ারকে দিল উপহার
হাত ঘুরিয়া সোনার হাত
মন্ত্রী সন্ত্রী ছিল যত, অলৌকিক ঘটনায় অভিভূত
বাবাজীর ধান্দাবাজী, আর কার সাথী
ধরা পড়ল টি.ভি. ক্যামেরায়।

রিপোর্টিং-এর প্রায় শেষে অভিনেতাগণ শিবকে খোঁচা দিয়ে আবার 'বন্দনা'র মধ্যে সজাগ করে দেন। (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

১। বল না কি দোষ কর‍্যাছি ভোলা
চোখ নাই কেনে হামাদের বেলা
বুনছিস মরণ জাল, খ্যায়া কলাচাল

গাঁচাতে দিচ্ছিস ঠ্যালা।

ষাঁড়ে চড়্যা বেরাস ঘুর‍্যা, পর‍্যা বাঘ-ছাল হে,

সিদ্ধি গাঁজা খ্যায়া দু'চোখ কর‍্যাছিল লাল হে,

ত্রিশূল হাতে শ্মশানেতে, ছাই ম্যাখা গোটাগায়েতে

নন্দী-ভিরিঙ্গি সঙ্গে — মেতেছিস তুই রঙ্গে

কত রসরঙ্গে নানীর সঙ্গে খেলেছিস তুই প্রেমের খেলা (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

২। শিব হে :

শুন বলি ওহে ভোলা চলছে হত্যালীলা,

বিশ ধুকছে দেখ্যা কাণ্ড-কারখানা

স্বভাব যায় না মোলে, ইজ্জত যায় না ধুলে

গুজরাট দাঙ্গা তারই নমুনা (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

৩। স্বাধীনতার স্বাদ বড়ুই তিতা দিন কাটছে অনাহারে —

শিবহে, কোটি কোটি টন খাদ্য শষ্য পচছে গুদাম ঘরে

বাজেট পাশ একবার বছরে মূল্য বৃদ্ধি বারে বারে (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

শিবকে সামনে রেখে দেশের সমাজের নানাবিধ বিবরণ পেশ করেন অভিনেতাগণ। 'গম্ভীরা' অনুষ্ঠান অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। এখন তার মধ্যে ফুটছে আধুনিক সমাজের কথা। এখন গম্ভীরার কুশীলবরাও আর বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মানুষ নন। এক সময় মালদহ জেলার দেশী-পলি-রাজবংশী-কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্য থেকে এই লোকনাটকের সৃষ্টি হয়েছিলো। এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে এই সকল শিল্পীর দৃষ্টিতে সমাজ ও দেশের সমস্যাবহুল যেসব ছবি ধরা পড়ে তারই রূপায়ণ ঘটে গম্ভীরায়। শিল্পীদের শতছিন্ন মলিত বেশ প্রতীকীচিত্রকেই উপস্থিত করে। তাঁরা বঞ্চিত পীড়িত হত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি দেবতার দরবারে তাঁদের নালিশ জানাতে আসেন। যার কাছে তাঁদের নালিশ তিনি তাঁদেরই মতো দরিদ্র নিঃস্ব। কিন্তু সেই দেবতারও কিছু পরিবর্তন গানের গহনে ঘটে গেছে।

এখন নানা শ্রেণীর মানুষ এই গানে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের প্রধান অংশই কৃষি নির্ভর। দেশের জনগণের মানুষের হয়ে নিজেও ছিলেন পোষাকে চরিত্রে। গম্ভীরা এভাবেই মানুষের কথা বলে, মানুষের পরিবর্তনের কথা বলে — সময় ও সমাজের নষ্ট চরিত্রকে উন্মোচিত করে তাকে...

## তথ্যসূত্র


১। বাংলার লোকসংস্কৃতি, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১৩৬।

২। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, পৃ: ১৩৬।

৩। কুশান গান, দ্বিজেন্দ্র ভকত, পৃ: ২৫।

৪। নট নাট্য নাটক, সুকুমার সেন, পৃ: ২৫।

৫। কুশান গান, দ্বিজেন্দ্র ভকত, পৃ: ১।

৬। Indian Folk Music, Bhawaiya, Ethnomusicological Study, Dr. Sukhbilash Barma, p.261.

৭। ভাওয়াইয়া, সুখবিলাস বর্মা, পৃ: ২৩৫।

৮। বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, গিরীন্দ্রনাথ দাস, পৃ: ৩৬৬।

৯। কোচবিহারের ইতিহাস, খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ: ৬৯।

১০। তদেব, পৃ: ৬৬।

১১। ভাওয়াইয়া স্মরণিকা-২০০৭, শ্যামাপদবর্মণ, পৃ: ৫৩।

১২। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১০৭।

১৩। গ্রামীণ বাংলা লোকনাটক (সম্পাদিত), সনৎ কুমার মিত্র, পৃ: ১৫৮।

১৪। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১০৮।

১৫। স্মরণিকা, লোকসংস্কৃতি উৎসব, ১৯৮৩, পৃ: ৩১।

১৬। গ্রামীণ বাংলা নাটক (সম্পাদিত : সনৎ কুমার মিত্র), বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৫২।

১৭। তদেব, পৃ: ১৫৮।

১৮। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা, বীরেন্দ্রনাথ রায়, পৃ: ৯০।

১৯। তদেব, পৃ: ৯১।

২০। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১০৮।

২১। তদেব, পৃ: ১১০।

২২। তদেব, পৃ: ৬৭।

২৩। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা, বীরেন্দ্রনাথ রায়, পৃ: ৯১।

২৪। তদেব, পৃ: ১০৮।

২৫। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১১০।

২৬। তদেব, পৃ: ৬৯।

২৭। তদেব, পৃ: ৭০।

২৮। তদেব, পৃ: ৭১।

২৯। তদেব, পৃ: ১১০।

৩০। তদেব, পৃ: ১১১।

৩১। তদেব, পৃ: ২৭৮।

৩২। তদেব, পৃ: ২৭৯।

৩৩। বৈতানিক, তরাইয়ের প্রাণ লাহাংকারী গান, পরেশচন্দ্র রায়, পৃ: ১১।

৩৪। তদেব, পৃ: ১৫।

৩৫। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৭০।

৩৬। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, শিশির মজুমদার, পৃ: ২৫৭।

৩৭। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ২৭৯।

৩৮। ভাওয়াইয়া, সুখবিলাস বর্মা, পৃ: ২৪৫।

৩৯। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৪৬৬।

৪০। নট নাট্য নাটক, সুকুমার সেন, পৃ: ৯৬।

৪১। তদেব, পৃ: ৯৬।

৪২। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, শিশির মজুমদার, পৃ: ৪০।

৪৩। তদেব, পৃ: ৩৯।

৪৪। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৩৭৯।

৪৫। তদেব, পৃ: ২৭৩।

৪৬। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, শিশির মজুমদার, পৃ: ৫৭, ১০৮, ১৪৪, ১৯৫, ২৩৮।

৪৭। গ্রামীণ বাংলা নাটক (সম্পাদিত : সনৎ কুমার মিত্র), গম্ভীরা, পৃ: ৬০।

৪৮। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ১৩।

৪৯। গ্রামীণ বাংলা নাটক, সনৎ মিত্র সম্পাদিত, পৃ: ৫৯।

৫০। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ১৭।

৫১। তদেব, পৃ: ২০।

৫২। তদেব, পৃ: ৬০।

৫৩। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ২৬।

৫৪। তদেব, পৃ: ২৬।

৫৫। তদেব, পৃ: ২৮।

৫৬। তদেব, পৃ: ৬৩।

৫৭। তদেব, পৃ: ৬৪।

৫৮। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ৩১।

৫৯। তদেব, পৃ: ৯৬।

৬০। তদেব, পৃ: ৯৯।

৬১। তদেব, পৃ: ১০২।

৬২। তদেব, পৃ: ১০৬, ১০৭।

৬৩। তদেব, পৃ: ১২৩।

৬৪। তদেব, পৃ: ১২৫।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ ও বৈচিত্র্য

লোকনাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার নিয়ে আলোচনাকে বলা যায় অতি কথন। কেননা যাকে লোকনাটক বলা যায় তার উৎপত্তিই হয়েছে সঙ্গীতের সমুদ্র থেকে। সঙ্গীতই তার প্রাণ, তার সংলাপ, তার রসানুভূতির মূল আশ্রয়। লোকনাটকের উদ্ভবের সম্বন্ধে যাঁরাই আলোচনা করেছেন, কিংবা যাঁরা লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলেছেন তাঁরা সকলেই মনে করেন লোকনাটকের প্রধান লক্ষণ হল এগুলি গীতিপ্রধান রচনা। লোকনাট্য বিষয়ে বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ, কিংবাতুষার চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রত্যেকেই এই সাংগীতিক ধর্মের কথা বলেছেন। বাংলার লোকনাট্য সম্বন্ধে প্রথম আলোচনাই শুরু হয়েছিল এই গানের সূত্রে। অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' বইতে দেখিয়েছেন, 'লোকনাট্য বিষয়ক চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল গুরুসদয় দত্তের বালান সম্পর্কিত আলোচনায় আর যে লেখায় (The Folk Dances of Bengal) এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তাতে বোলানকে বলা হয়েছিল Ballad dance এই Balad Dance-এর মুখ্য বিষয়হল 'dance and song'।[১] আর হারাধন দত্ত "তাঁর প্রবন্ধে বোলানকে নদীয়ার পল্লীগীতি বলেই নির্দেশ করেছিলেন।"[২] কাজেই সঙ্গীতকে লোকনাট্য থেকে পৃথক করা যায় না। লোকনাট্যের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, "এগুলি আদিম যুগের ritual dance, পরে সেগুলিতে সঙ্গীত যুক্ত হয়েছিল। ক্রমে সেগুলি থেকে সংগীতাংশ কমে গিয়ে সংলাপ অংশের বিস্তার ঘটেছে। সুতরাং নৃত্য ও সংগীত লোকনাট্যের প্রথম দিকে এই দুটি উপাদানই ছিল মুখ্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য এগুলিকে গীতি প্রধান বলেছেন। অজিত ঘোষ বলেছেন এগুলিতে সঙ্গীতের প্রাধান্যের কথা।"[৩]

লোকনাট্যের এই সাঙ্গীতিক চরিত্র কিন্তু সবক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকেনি। লোকসাহিত্যের যে বিশিষ্ট ধর্ম — তার নিত্য পরিবর্তনশীলতা — তার ফলে সঙ্গীতাংশ ক্রমে সংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক Gillber Murry গ্রীক নাটকের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন। "সে দেশেও আনুষ্ঠানিক নৃত্যগীত থেকেই নাটকের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। এবং এই নৃত্যগীতময় অভিনয়ে Song Poetry-র সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয় Speech Poetry। তখনই গ্রীকনাটকের আদিপর্বের রূপান্তর শুরু হয়। Song Poetry এবং Speech Poetry কথা দুটি এক্ষেত্রে বেশ উপযোগী বলে মনে করি। গ্রীক নৃত্য-সংগীতের Song Poetry-র সঙ্গে ক্রমে জুড়েছিল Speech Poetry।"[৪] আমাদের দেশেও মনে করি রূপান্তর প্রক্রিয়া একই বিবর্তনের নিয়মে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়ে লোকনাট্যের উদ্ভব বিষয়ক আলোচনায় অনেক কথা

বলা হয়েছে। কাজেই লোকনাটকের সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করার অর্থ হল সামগ্রিক ভাবে লোকনাট্যের করণ কৌশলেরই আলোচনা। তার সংলাপ, তার ভাবধর্ম - দুইই সংগীতের বেগবান প্রবাহে দর্শকের মনে গিয়ে রসাবেদন সৃষ্টি করে। আর যেহেতু সুর এবং মিলমুক্ত এই সংলাপ, কাজেই লোকনাটকের সংগীতগুলির মতো সংলাপগুলিও শ্রোতাদের সঙ্গে গভীর অনুভূতি জাগাতে সমর্থ হয়। এবং এই সঙ্গীতও মিলনান্ত সংলাপগুলি দর্শক শ্রোতাদের গলায় গান হয়ে ফেরে। যেহেতু এইসব সঙ্গীতের সুর অত্যন্ত সরল এবং সহজ কাজেই বিশেষ কোনো শিক্ষা ব্যতিরেকেই গ্রামের সাধারণ মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে তা সচ্ছন্দভাবে গীত হয়। তাছাড়া এইসব সঙ্গীত যারা গায় তাদের মধ্যে সুকণ্ঠব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু যারা সূক্ষ্ম সুরবোধ সম্পন্ন নয় তাদেরও গলায় এইসব গান শুনতে পাওয়া যায়। এই ভাবে শ্রোতা সাধারণের দ্বারা গৃহীত হয়ে লোকনাটকের সংলাপ ও সঙ্গীত একটা জীবন্ত প্রবহমান চরিত্র লাভ করে।

একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে প্রাচীন সাহিত্য গানের ভিতর থেকেই জেগে উঠেছিল। গানের একটা সুবিধে তা মনে রাখা যায়। যেখানে তার সঙ্গে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক (ritualistic) সেখানে সেগুলিকে বিশুদ্ধ সুরে তালে লয়ে গেয়ে মনে রাখতে হত। আমাদের বেদের সূক্তগুলি এইরকম নানা ritual-এর সঙ্গে যুক্ত। এগুলিকে অবিকৃতভাবে গাইতে হত। গবেষকগণ মনে করেন এগুলির পিছনে আছে sympathetic magic-এর ''বৈদিক যুক্তগুলির মধ্যে এই আনুষ্ঠানিক আচারের মূল্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লোকজীবনের নানা ক্ষেত্রেও এই আচার অনুষ্ঠানের ভূমিকা তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সেখানেও আচারমূলক সঙ্গীতকে রথাসম্ভব একইভাবে গাইতে হত। আর যে সব সঙ্গীতের মধ্যে এই আনুষ্ঠানিকতার মূল্য মন, সেগুলি লোকমুখে পরিবর্তন লাভ করে নিত্য সচল থাকতো। এইভাবে লোকনাট্যগুলি লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা জীবন্ত সত্ত রক্ষা করে চলত।''[৫] এই কারণে আনুষ্ঠানিকতাও স্মৃতি ধার্যতার প্রয়োজনে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো লোকনাট্যগুলিও সঙ্গীতমূল্য এবং সঙ্গীত প্রাণ হয়ে পড়ে। লোকনাট্যের মধ্যে যে সঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায় সেগুলিকে দুদিক থেকে বিন্যাস করা সম্ভব। এক শ্রেণীর গান নাটকের বিষয়বস্তু অনুসারে রচিত, সেগুলি কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচনা করা হয়। আর একরকম গান পাওয়া যায় - সেগুলিকে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না করেই - গান হিসাবে আলাদাভাবে গাওয়া হয়। এ গানগুলি কাহিনীর প্রয়োজনে আসেনা- এগুলি শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য গানের ফাঁকে ফাঁকে গাওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যে এগুলিকে বলা হয় 'খোসাগান'। খোসাগান কথাটির অর্থ দ্বিগ্বিজয়বাবু করেছেন। ''খোসা চাল নয় ভূষি অর্থাৎ বাহুল্য।''[৬] এগুলির ভিন্ন নাম 'ফাস গান' বা ভর্তুকীগান। দ্বিগ্বিজয়বাবু খোসা অর্থে ভূষি ধরেছেন। কিন্তু ভূষিকে বাহুল্য বলা যায় না তা আনার অংশমাত্র। অন্য পক্ষে খোসা কথাটি ফার্সী খুশ অর্থাৎ প্রীতিকর আমোদজনক অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই বেশি সম্ভব বলে মনে হয়। এই গানগুলি

নাটকের মূল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য আমোদ বিধানের জন্য গাওয়া হয়। দিগ্বিজয়বাবু একে সেজন্যই Dramatic relief হিসাবে দেখিয়েছেন। একে যে ভর্তুকীগান বলা হয় তার মানে বোধ করি মূল গানের সঙ্গে বাড়তি কিছু দেওয়া। 'ভরতুকি' শব্দের সমার্থক শব্দ অধিবৃত্তি, অনুদান ইংরেজি বোনাস, কাজেই মূল গানের সঙ্গে যা অনুদান হিসেবে বোনাস হিসেবে বাড়তি দেওয়া হয় তাকেই বলা যায় ভরতুকী গান। কাজেই খোসা গান বা ভরতুকী গান লোকনাট্যের একটি বিশেষ উপাদানরূপে মূল কাহিনীর অংশ না হয়েও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে যুক্ত থাকে। ফাসগান কথাটিও এই অর্থে প্রচলিত।

গানগুলিকে আর একদিক থেকে বিন্যস্ত করা সম্ভব। সে হল গানের প্রকৃতিগত বিন্যাস। আগেই বলেছি লোকনাট্যগুলি সঙ্গীতের ভিতর থেকেই জেগে উঠেছে। এই লোকনাট্যের সংলাপগুলিও -পদ্য সংলাপ হলে - সুরে গাওয়া হয়। এগুলিও সঙ্গীতাত্মক। আবার এই সঙ্গীতময় সংলাপের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে এক একটি গান জেগে ওঠে। এগুলি সংলাপাত্মক সঙ্গীতনয়। বিশেষ বিশেষ সময়ে নায়ক নায়িকার মানসধর্ম বোঝানোর জন্য তাদের মনের বিশেষ ধরনের emotion বোঝানোর জন্য এগুলি গাওয়া হয়। এগুলির মধ্যেও ক্ষীণভাবে সংলাপের কিছু ধর্ম কাজ করে বটে কিন্তু সংলাপ-সঙ্গীত থেকে এগুলি পৃথক। কাজেই লোকনাটকের গানগুলিকে নাট্যগঠনের দিক থেকে দু'ভাগে বিন্যস্ত করা সম্ভব। লোকনাট্যের সঙ্গীত আবার বর্ণনাপ্রধান এবং ভাব ব্যঞ্জনামুখ্য এই দুরকম হতে পারে। যখন মূল বা গীদাল আসরে কোন দেবদেবীর বন্দনা গান করেন তখন সেটির সঙ্গীতধর্মই মুখ্য। কিন্তু এই সঙ্গীতের শেষে যখন গান গেয়ে কাহিনী বর্ণনা করবার কাজ করেন তখন সেখানে সঙ্গীত গল্প বলার মাধ্যম - সঙ্গীত সেখানে কাহিনী বর্ণনার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূল বা গীদাল যে সুরে এই কাহিনী বর্ণনা করেন, কাহিনীর অন্তর্বর্তী গানের সুর তার থেকে আলাদা। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় - পদ্য বর্ণনাংশের সুর গানের সুরের থেকে আলাদা। এ থেকে অনুমান করা যায় পদ্য বর্ণনাংশ তাৎক্ষণিক রচনা কিন্তু এর ভিতরকার গানগুলি (এক সময় তাৎক্ষণিক ভাবে সৃষ্ট হলেও) সম্ভবত পূর্বেকার রচনা। এগুলি গানের কাহিনীসূত্রে রচিত হয়ে বহুবার গীত হতে হতে কাহিনীর অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে।

আধুনিক বাংলা নাটকের আদিপর্বে সঙ্গীতের ব্যবহার খুব কম ছিল। এগুলি মুখ্যত ইংরেজি নাট্যরীতির প্রভাবে গড়ে উঠেছে। এগুলির সঙ্গে আমাদের লোক ঐতিহ্যের যোগ নেই। কিন্তু বাংলার লোকনাট্যের সাঙ্গীতিক ধারা অচিরেই এই নাটকগুলির উপরে অনুভব করা যায়। সে সব জায়গায় গানের পরিমান অনেক বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে মনোমোহন বসু কিংবা গিরিশচন্দ্র ক্ষীরোদ প্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের একটি প্রধান ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আধুনিক রীতির সিনেমাতেও গান অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি দিক। এইসব নাটকে গানের প্রথম ভূমিকা মনোরঞ্জন। দ্বিতীয় স্থানে রাখা যায় পাত্রপাত্রীর মনোভাব বা বিশেষ

ধরনের emotion প্রকাশের প্রসঙ্গ। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে দেশ প্রেম কিংবা নরনারীর লৌকিক প্রেম কিংবা ভক্তির আবেগ প্রকাশের পক্ষে গানকেই উপযুক্ত মাধ্যম মনে করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে লোকনাটকের ঐতিহ্য থেকে নাটকের রীতিগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর নাটকে গানের ভূমিকা যথেষ্ট। তাঁর সমকালে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও গল্পের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যা অব্যক্ত বা অনতিব্যক্ত, কিংবা যা মনের আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম কিংবা সুতীব্র বাসনা তা প্রকাশের পক্ষে গানই উপযুক্ত।

লোকনাটকের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে মানুষের সরল সহজ ভাবগুলি নিয়েই লোক কবিরা কারবার করেন। সেখানকার প্রেম বিচ্ছেদ বেদনা কিংবা দুঃখ, আনন্দ যে কোনো অনুভূতিই হোক না কেন তা বেশ সজীব ও সরলভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু তার মধ্যে জীবনের জটিল অনুভূতির জটিলতররূপের পরিচয় থাকে না। মানুষের মৌল অনুভূতির সরলরূপই সেখানে অভিব্যক্ত হয়। প্রেম বা বিচ্ছেদজনিত আনন্দ বা বেদনা এই সঙ্গীতগুলির প্রধান উপজীব্য। সহজ সরল রূপক, সাদামাটা স্বভাবোক্তি বা দু'একটি উপমা প্রয়োগে এইসব সঙ্গীত কাব্যগুণান্বিত হয়ে ওঠে। গায়ক বা শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই এগুলির রস উদ্দীপন বা রস আস্বাদনের মধ্যে একটি সহজ জীবন যোগসূত্র থাকেই। সরলসহজ এবং আন্তরিক সুরের মূর্ছনায় এই সঙ্গীতগুলি গ্রামীণ লোক সঙ্গীতের শ্রোতাদের মনপ্রাণ আকর্ষণ করে।

## কুশান

বহুল প্রচারিত লোকনাটক 'কুশান' গানে সঙ্গীত নানা কৌশলে এবং বিবিধ ব্যঞ্জনায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। রামায়ণ মহাকাব্য থেকে কুশান গানের পালা নির্বাচন করা হয়। সেই পালাতে সঙ্গীত পরিবেশনে মহাকব্য-ধর্মী ভাব ও গম্ভীরতা বজায় রাখা হয়। দোতরাগানের খোসা গান ব্যতীত কুশান গানে চটুলতার ভাব পরিলক্ষিত হয় না।

"কুশান গানের মধ্যে মহাকব্যে বিধৃত ধর্ম-ভাবনার সাথে সাথে দোয়ারীর বাক্‌চাতুর্যের মাধ্যমে নির্মল হাস্যরস পরিবেশন এবং ছুকরির নানা তালের পদবিপক্ষের মধ্যে পরিবেশন করা নৃত্য সহযোগে গীত এতদঞ্চলের সঙ্গীতপ্রেমী মানুষকে এক অনাবিল আনন্দে আপ্লুত রাখে। কুশান গান মূল গীদালের তত্ত্বধানে শিষ্য তালিম নিয়ে পরবর্তী জীবনে কুশানী হিসাবে পরিচিত হন। এই গান গুরুর মুখে শুনে শিখতে হয়। এই গানের তাল, সুর, নৃত্য ভঙ্গীমা গুরুর কাছে থেকেই শিখতে হয়। বাইন অর্থাৎ খোলবাদক তার গুরু বাইনের কাছে শিখে থাকে, দোয়ারী তার বাক্‌চাতুর্য্য ও অঙ্গভঙ্গীমা তার গুরু দোয়ারীর কাছে শিখে নেয়। ছুকরীও তার নৃত্য ভঙ্গীমা, মুদ্রা, তাল আদি তার গুরুর কাছে শিখে নেয়। এককথায় গুরুভক্তি বা গুরুর শরণ নিয়েই কুশান

গান শেখার রীতি।"[১]

কুশান গানের মূল যন্ত্র হচ্ছে ব্যানা। ছোট আকারের এই ব্যানা বাদ্য-যন্ত্রটি মূল গীদালের হাতে থাকে। তাঁর সুনিপুণ হস্ত-চালনে অপূর্ব সঙ্গীত সুর বেরিয়ে আসে। কুশান গানের প্রথম যে গান তা অন্যান্য লোকনাটকের মতো বন্দনা দিয়েই শুরু। এই বন্দনার পূর্বেই ব্যানা যন্ত্রের মধ্য দিয়ে 'আওচার আলাপ' (স্বরের নিক্ষেপ) সৃষ্টি করা হয়। এই আওচার আলাপের ভেতর দিয়ে সমবেত শিল্পীরাগান করার প্রস্তুতির ভাব তৈরী করে নেন।

কুশান গানের বন্দনায় অন্যান্য পালাগানের বন্দনার চাইতে বেশীমাত্রায় গাম্ভীর্য রক্ষা করা হয়। রামায়ণ-মাহাত্ম্যের ভাবনাই এর কারণ। কোথাও এই বন্দনাকে 'প্রার্থনা' বলা হয়।

প্রথমে গীদাল মঙ্গলাচরণ শ্লোকে রামবন্দনা করেন। এই রামবন্দনা অংশে সাধারণত রামায়ণের পরিচিত রামবন্দনা ব্যবহার করা হয়। এই রামবন্দনাটি দিয়ে আরম্ভ করবার ফল সভার মধ্যে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ললিত কুশানী এই সংস্কৃত রামবন্দনাকে মঙ্গলাচরণ হিসেবে ব্যবহার করে একটি পরিবেশ তৈরী করে নিতেন। তারপর আসে প্রার্থনা। এই প্রার্থনাসংগীত সম্বন্ধে আমরা ভূমিকায় কিছু আলোচনা করেছি। কোনো কোনো কোনো সময় পালাগানের মধ্যে সরস্বতী বন্দনাও করা হয়। এই সরস্বতী বন্দনা মোটের উপর একইরকম। যে কোনো পালায় প্রয়োজনমত তা প্রয়োগ করা হয়। আমাদের সংগৃহীত পালায় কোনো সরস্বতী বন্দনা নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই পালায় কোনো সময় সরস্বতী বন্দনা করা হবে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে সংগৃহীত নাটকে তা নেই। কিন্তু আসরে তা হওয়া সম্ভব।

ও এস হে প্রভু দয়াল মোরে রঘুনাথ
এস আমার আসরে — এ হে হে
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে
দীন দেখি নৌকা প্রভু
লইয়া গেলে দূরে
দয়া কর রামচন্দ্র দয়াল ভগবান
তোমার চরণে প্রভু লইনু স্মরণ।

গানের মধ্যে ভাওয়াইয়ার আধ্যাত্ম ও দেহতত্ব জাতীয় গানের সুর ব্যবহার করা হয়। পালাগানের মুল বিষয়ের গাম্ভীর্য-অনুযায়ী এর প্রকাশ হয়ে থাকে। আমাদের সংগৃহীত লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালাটিতে মূল গায়েন সংলাপ সঙ্গীতের ভঙ্গিতে গেয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলে। চরিত্রগুলি তাদের ভূমিকায় অভিনয় করে।

রাজা হরিশচন্দ্র, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, মহীরাবণ বধ ইত্যাদি পালাগুলো কুশান গানের পালা। পালাগানের গীদাল সূত্রধরের মতো সংলাপের মাঝে মাঝে পদ্য সংলাপকে একটানা সুরে গেয়ে চলে।

পালাগানে মূলগীদাল দীর্ঘস্বরে হাঁক দেবেন এবং তখন বাদ্যযন্ত্র হাঁকের সুরে বেজে উঠবে। সেখানেও এক সঙ্গীত মূর্ছনা লক্ষ করা যায়।

''সোমদত্ত রাজকন্যা তার নাম শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশচন্দ্র অতিভব্যা।
সুন্দরী পাইয়া রাজার অন্তরে উল্লাস
তাহার হইলো পুত্র নাম রুহিদাস।''

আবার এই কাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে রুহিদাসের মৃত্যুকালে শৈব্যা যে ক্রন্দন করে উঠেন তা ভাওয়াইয়ার ব্যথিত কথার সুর ছাড়া আর কিছুই নয়।

''ছোট হাতে পুষিলুং বাছা মোর, দুধ-ভাত দিয়া,
যাবার কালে গেলুরে বাছা বুকে শেল দিয়া,
ও বাছা কোর তোতা ময়নারে ...।

কাহিনীর অগ্রগতিতে গীদাল উচ্চরব করেণ, সেও সঙ্গীত হয়ে ওঠে।

তখন চন্দন কাষ্ঠে সাজাইয়া চিতা
মধ্যতে রাখিল পুত্র পাশে মাতা-পিতা
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবাক চিতাতে
হেনকালে ধর্মরাজ কহেন সাক্ষাতে
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যাজিবে জীবন
আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন।

প্রতিটি গানের ছত্রকে বিভিন্ন ঢং - এ, নানান বিচিত্র তালে, বিচিত্র লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে।

## দোতরা

দোতরা পালা গান কোচবিহার জেলার একটি প্রাচীন লোকনাটক। এই পালাগানে মূলতঃ সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান। কল্পলোকের কাহিনী, রূপকথার ঘটনার ঘনঘটা বা মঙ্গল কাব্যের কাহিনীর কোন বিশেষ অংশ নিয়ে দোতরা পালার বিষয় রচিত। রচয়িতার জন্ম-তারিখ-সাল খোঁজা বৃথা প্রচেষ্টা মাত্র। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কাহিনীগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এই দোতরা পালায় সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ-ণীয়।

দোতরা পালা গান শুরু হওয়ার আগে একটি সমবেত বাদ্য-সঙ্গীত হয়। সাধারণতঃ চটুল সঙ্গীতের সুর দিয়ে শুরু হয়। সেই সুরের মধ্যে একটা বিশেষ 'বোল' বা বুলি আছে। কুশান গানে গানের 'স্থায়ী' থেকে সুরের অংশ সরে এসে 'স্থায়ী'তে গিয়ে যোগ হয় — দোতরায় তা কখনো হয় না। দোতরা গানে 'স্থায়ী' থেকে শুরু হলে সেখানে আর ফিরে আসে না।

দোতরা গানের 'বন্দনা'-র প্রথম অংশ —

আইসেক মাও মোর সরস্বতি মা
ওহে মা মোর সভার ভিতর হে
আইসেক মাও মোর সরস্বতি মা
প্রথমে বন্দনা করি দেব নারায়ণ
শিবেরও ঘরণী বন্ধং মাও ভগবতী
তাহার দুটি কন্যা বন্ধং হে ওহে মা
লক্ষ্মী সরস্বতী হে।। আইসেক .....

'বন্দনা' অংশের পরেই মূল গীদাল কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করার পথে আবার একটি গানের 'ধুয়া' ব্যবহার করতে পারেন। 'আলম সাধু' দোতরা পালায় একটি ধুয়া —

আমি হইলাম তব ঐ চরণ ভিখারী হে হরি
আমিতো হইলাম।
আমার মরণ কালে চরণ দিও হরি হে
আমার মরণ
ও চাঁদ হরি হে দয়াল আমিতো .....

'বন্দনা' অংশের রেশ ধরেই একই সুরে এই 'ধুয়া' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'দোতরা' গান প্রেমমূলক, কল্পনানির্ভর বা পৌরাণিক অংশের কোনো বিস্মৃত অধ্যায় থেকে তৈরী, এখানে সঙ্গীতের সুরের মধ্যে গাম্ভীর্যের চেয়ে দ্রুত চালের ক্ষিপ্রতাই বেশি থাকে।

সংলাপের মধ্যে গদ্য-সংলাপের অবকাশ অত্যন্ত কম। পালায় গানের পাশাপাশি পয়ারের চালে কাহিনী এগিয়ে চলে। গানের মাধ্যমেই বক্তাদের উক্তি প্রত্যুক্তি চলতে থাকে। এর কিছুটা গীদালের মুখে এবং খানিকটা দোহারের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ কাহিনীর বিশেষ বিশেষ অংশ দ্রুত শেষ হয়।

মূল গীদাল বলছেন —

হায়রে, বিদায় লইয়া আলম সাধু বেগমের কাছে যায়।

বেগম বেগম বলিয়া সাধু ডাকিতে লাগিলো
বারো বছর যাবো আমি বানিজ করিবারে।
রাজ্যবাড়ী দেখ তুমি অতি সাবধানে
রহিম থাকিবে গুরুর পাঠশালে.
করিও স্মরণ তারে বিপদে পড়িলে।

সঙ্গীত গদ্য উক্তি এবং পদ্য পয়ারের মাধ্যমেই কাহিনীর গতি বাড়ে এবং তা পরিণতির দিকে চলে। আলমসাধুর এই বিদায় ভাষণের ফলে বেগমের কণ্ঠেও বিদায়কালীন বেদনা ফুটে পরিষ্কার একটি 'ভওয়াইয়া' সঙ্গীতের মধ্যে।

ও হো প্রাণ সাধুরে সাধু
যদি সাধু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্ধি খান ওরে
দারি মাঝি সাধু রাখেন সাবধানে রে
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যয়
পর নারী সাধু আপন নয়রে
পর নারী সাধু বধি ; জীবন রে

এই দোতরা পালাগানের মধ্যেই লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়ার আঁতুড় ঘর। বর্তমান যে ভাওয়াইয়া গানগুলো ধারাবাহিক ভাবে পরিবেশিত হয়ে চলেছে সে গুলোর সৃষ্টি এই পালাগানগুলোর মধ্যেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

দোতরাপালা গানে মূল চরিত্র মুখ্য কথা নয় — দোয়ারীর ভূমিকা ব্যতীত দোতরা পালাগান মৃত। সঙ্গীত বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে দোয়ারের পয়ারকেন্দ্রিক সংলাপ সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

দোয়ারের সঙ্গীতময় সংলাপ —

একমাসও হইলে গর্ভ জানি কিনা জানি
তিন মাসত হইলে গর্ভ রক্তে পুছে গোলা
চার মাসও হইলে গর্ভ হাড়ে মাংসে জোড়া
পাঁচ মাসও হইলে গর্ভ পঞ্চ পুষ্ট ফোটে।

ছয়ত না মাসের বেলা এ গৈর ও গৈর করে

সাত মাসও হইলে গর্ভ স্বাদ খাইতে চায়

আট না মাসের বেলা অষ্টমী মেলায়।

নয় মাস দশ দিন পূর্ণ হইলে ভূমিতে বসতি।

সঙ্গীতের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কাহিনী দ্রুত তালে এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে এক ঘেয়েমী কাটিয়ে উঠতে 'খোসা' গান গাওয়া হয়। পালা গানের মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয় যে গান সেই গানই হচ্ছে 'খোসা' গান। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য কিংবা relief দেওয়ার জন্য খোসা গান গাওয়া হয়। যে কোনো লোকনাটকে একই 'খোসা' গান ব্যবহৃত হতে পারে। আলম সাধু পালায় —

কালা আর না বাজান বাঁশরী

সাধের ঘরে কালা রইতে না পারি।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'দোতরা' বাদ্যযন্ত্র মুখ্য। সেই সঙ্গে থাকছে খোল, ঢোলক, হারমোনিয়াম, বাঁশী ইত্যাদি। মূল গীদালের হাতের যন্ত্র দোতরা। এই বাদ্যযন্ত্রের নামেই পালার নাম হয়ে উঠেছে দোতরা পালা।

## চোর-চুন্নি

চোর-চুন্নি পালা নাটক মুখ্যতঃ সঙ্গীত-নির্ভর। চোর-চুন্নি পালাগানে গীতের সঙ্গে বাদ্য এবং সেই নৃত্য সহযোগে কাহিনী ক্রমশঃ এগিয়ে চলে। সঙ্গীত পরিবেশনের বিশেষ কায়দা রপ্ত করতে না পারলে অভিনয়-শিল্পীরা কেউই অভিনয় করতে পারবেন না। উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলা এবং তার সংলগ্ন এলাকায় এই পালানাটক দুর্গাপূজার পর থেকে পরিবেশিত হয়ে আসে। চোর-চুন্নি পালানাটকে চুন্নি (চোরের স্ত্রী) নিজের অভাব অভিযোগের কথা গানের আকারে প্রকাশ করেন। তারপর চোর উত্তর দিয়ে থাকেন গানের মাধ্যমে। চরিত্রগুলির গানকে সহায়তা করার জন্য যে-সকল সংগতকারী বসে থাকেন তাঁরা বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে চরিত্রের গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রয়োজন মতো গানের সুর ধরেন। গানের কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে —

ওরে হায়গো সখী

বড়ই নৈজ্জা দিলো শ্যামকালা

ওরে কদম ডালে বাজায় বাঁশী

ঠিক দুফোর বেলা

আহা-র বাঁশীটা তোর এতয় বোল ধরা

ডাকায় মোর নাম ধরিয়া।

ওরে এমন মোহন বাঁশী কি সুন্দর বাজে

কীবা আছে তোর বাঁশীটাতে

আহা-র নন্দনের বেটা চিকনরে কালা

কেনে দিলো এতয় জ্বালা।

ওরে সেই জ্বালায় আর প্রান বাঁচেনা

হায়রে যাতনা কতয় শুনিম বাঁশীর বাদে

সাধারণত সঙ্গীতে চারটি ভাগ থাকে — স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। স্থায়ীকে এই পালানাটকের সঙ্গীতে গোড় বা গড়ান বলা হয়। এই সঙ্গীতের -

ওরে হায়গো সখী

বড়ই নৈজ্জা দিলো শ্যাম কালা

ওরে কদমডালে বাজায় বাঁশী

ঠিক দোফরবেলা

এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে গোড় বা গড়ান। এই সংগীত একটা শেষ না হতে আরেকটা শুরু হয়ে যায়। প্রশ্ন-উত্তর-প্রত্যুত্তর দীর্ঘ গানের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এক একেটা গানে একেকরকম সুর চলবে। গড়ান অর্থাৎ স্থায়ী বারবার প্রত্যেক স্তবকের শেষে ফিরে আসবে।

পরবর্তী স্তবক —

আ-হা-র বাঁশীটা তোর এতয় বোল ধরা

ডাকায় মোর নাম ধরিয়া

ওরে এমন মোহন বাঁশী কি সুন্দর বাজে

কীবা আছে তোর বাঁশীটাতে।

এই স্তবকটিকে এই পালাগানে বলা হয়ে থাকে চিতান। সাধারণ সঙ্গীতে যাকে 'অন্তরা' বলে চিনি। 'এই গান অস্থায়ীতে উচ্চগ্রাম হতে আরম্ভ হয়ে ক্রমেই নিম্নগ্রামের দিকে নেমে আসে। 'চিতান' শব্দটি সম্ভবতঃ 'চিৎ' কথা থেকে এসেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে উচ্চকণ্ঠে গান ধরলে যে ভাবের সৃষ্টি সেই ধরনের কিছু অনুভূতি এই গানে অনুমান করা হয়। উদাহরণ সহযোগে গানটির তৃতীয় অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে।

ওরে হাতে নিয়া মোহন বাঁশী

আলোক চিতে মুখের হাসি

হিলা ওতোর কেমন চলন

ওরে নদীর পারত বাজাইস বাঁশী

পাগেলার মতোন।

সঙ্গীতের শেষ স্তবকের ঠিক পূর্বের অংশটিকে যেমন আমরা সঞ্চারী বলে থাকি এই পালানাটকের সঙ্গীতের এই অংশটিকে বলা হয় 'পড়ান'।

চোরচুন্নি পালানাটকের এই সঙ্গীতের শেষ অংশটিকে বলা হয় 'ঘষা'।

পালানাটকে সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পীর সমকাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যেহেতু শিল্পীর স্বাধীনতা এখানে খুব বেশি, সেজন্য গানও অনেকটা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয়। ফলত, আঞ্চলিক ভাষার রূপ নিয়ে গানগুলি পরিবেশিত হয়ে মানুষের মনে তৃপ্তির সাধন করে। এই সঙ্গীত প্রয়োগের মধ্যেই পালানাটকটি সমৃদ্ধ হয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। পালাগানের মূল কাঠামোয় গানের ভাষাএবং প্রকাশের ভঙ্গি বদলে যেতে পারে। কাজেই লোকনাটকের কোনোএকটি পালার সংগৃহীত রূপগুলির মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। পালাগানেরমধ্যে নানাবিষয় ঢুকে পড়ে। তার সম্বন্ধে ঠিক আগে থেকে কোনো কিছু নির্বাচন করা থাকে এমনও নয়। গানের পরিবেশ এবং গায়েনের মানসিকতার উপর নির্ভর করে গান বৈচিত্র্য পায়।

## পাঁচালী বা পালাটিয়া

তরাই অঞ্চলের পালানাটক যথাক্রমে মান পাঁচালী, রং পাঁচালী এবং খাস পাঁচালী। এই পালা নাটকগুলিকে এ অঞ্চলের ভাষায় পালাটিয়া বলা হয়। এই পালানাটকগুলোতে সঙ্গীতের ব্যবহার অপরিহার্য। পাঁচালী বা পালাটিয়া 'বন্দনা' দিয়ে শুরু হয়।

বন্দনা অংশে চিরাচরিত দেব-দেবীদের পাশাপাশি লৌকিক দেববৌদের কথাও বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই গানগুলি পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে। ঢোল, আখরাই বা আকরাই, হারমোনিয়াম, করতাল, কর্নেট, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। পালাটিয়া গানের সঙ্গীত পরিবেশনে স্থানীয় লাহাংকারী গানের সুর, পদ, তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাঁচালী পালানাটকের একটি গানের অংশ —

আশার দোহরে হে

ভাসিবে কি আশার সাগরে

ঐ ফোটা ফুল রবে কি চিরতরে

আজি নারীর জীবন ফলের সমান

দুই দিন পরে ঝরিয়া যাবে

কালারে হে, প্রাণ কালা রে।

আবার দেখা যায় খাস-পাঁচালী ''কাক-ভাঙ্গা-ঢেঙপারীর পালা''-র গান —

''ও মোর বাপোইরে

নাজের কাথা কভা না মনায়''।

পালাটিয়া গানের মধ্যে তরাই অঞ্চলের বিশেষ সঙ্গীত লাহাংকারী নিজেই অত্মপ্রকাশ করেছে। এই গানগুলোর সুরের বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। ''ভাসানী সুর — ভাওয়াইয়া দরিয়া বা দীঘলনাসা সুরের মতো ভাসানী সুরে দীর্ঘশ্বাসাঘাত প্রয়োজন হয়। অকূল দরিয়ার বা নদীর স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার সঙ্গে নারীর বেদনার দীর্ঘসূত্রতার সুর এখানে পরিব্যপ্ত।''[৮] টিপানি সুর যা কিনা ভাওয়াইয়া চলন্তী বা চটকা গানের সুরের মতো। চরিত্রের সংলাপ অনুযায়ী প্রয়োজন হেতু সঙ্গীতের মধ্যে এই সুর ব্যবহৃত হয়।

দুঃখের জ্বালা নায়িকার মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠলে পালায় গানের ক্ষেত্রে পাথারি সুর ভেসে ওঠে। পালাগান বা পালাটিয়ায় কাহিনীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে বা বিষয়ের একাগ্রতার ক্ষেত্রে সঙ্গীত মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পালাটিয়া গানের মধ্যে সব সংলাপই যেন গান হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে স্মর্তব্য —'' পালাটিয়া গানে গানই অনেক সময় সংলাপের ভূমিকা নিয়ে থাকে। যখন গানের মধ্য দিয়া নায়ক বা নায়িকা পরস্পরকে কিছু বলিতেছে তখন কখনই সেই গান সে একা গাহিবে না। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে। অর্থাৎ একজনে গানের মধ্য দিয়া একটি কথা বলিল, অপর জন গানে তাহা উত্তর দিল, — এই রূপ নহে। বক্তা ও শ্রোতা একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তরাংশ গাহিয়া থাকে।''[৯] অন্যান্য পালানাটকের থেকে পালাটিয়া বা পাঁচালীগানের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

## বিষহরি

বিষহরি পালা নাটক উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম পালা নাটক। বিষহরি পালা গান কোথাও বিষহরা কোথাও পদ্মপুরাণ বা ভাষাণ গান হিসাবে পরিচিত। এই পালা নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারই মুখ্য। অন্যান্য পালানাটক থেকে স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে এই পালানাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। মোটামুটি বারো থেকে চোদ্দজন মানুষের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পাঁচ থেকে ছয় জন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতায় থাকেন। মূল গীদালের সঙ্গে দোয়ার এবং অবশিষ্ট কজন অভিনেতা ও নর্তকী হিসাবে নাটকে থাকেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। সাধারণ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে 'মুখাবাঁশি' সর্বাধিক মাত্রা নিয়ে আসে।

"মুখাবাঁশির মুখটা গোল বড় ধরণের। বাজানোর সময় সারামুখ ভরে যায়। এর বাদনভঙ্গি এমন যে বাদক বাঁশিটি মুখে রেখেই মুখের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস (দম) ঘুরিয়ে নিতে পারে — ফলে বাদনকালে বাঁশির সুরে ছেদ পড়ে না। একজোড়া মুখাবাঁশির এভাবে সাপখেলানোর সুর সৃষ্টি করে। বিষহরার নাচের ভঙ্গিমাতেও সাপ খেলানোর দোলন, ছোকরাদের সাপের ফণার মত হস্তমুদ্রা ইত্যাদি লক্ষনীয়। মনসা মঙ্গলের করুণ কাহিনী বেহুলা লখীন্দরের দুঃখ বর্ণনাকে ভিত্তি করে গাওয়া এই নাটকের চলন ধীর গতি সম্পন্ন। সুর টান ও ধীর লয়ের তাই অপেক্ষাকৃত কঠিন। একতাল ও তেওরা তালের ব্যবহার বেশী।"[১৩]

পদ্মার গীত —

"আরে ও কত মায়া,
কতমায়া ধরে বিষহরি
রে কতমায়া ধরে।
তবে তরাও গো তারণীমাতা এবার
তুমি না তরালে ভবে কে আছে আমার।"

অন্য এক জায়গায় সনকার ধুয়া —

"ও মোর বাচ্ছা নাইরে ওমো কমা বলিবে কে
ও মো যাদু নাইরে মস্তকের উপরে
সনার বেলারে সকাল,
এখনো না আসে বাচ্ছা মোর দুধের দুলাল।
সকালে গিয়াছে বাচ্ছা কোর ক্ষির ননি খায়া।
আর কতক্ষণ থাকবো আমি পন্থের দিকে চায়া
অন্ন হইল ঝর ঝর, বেঞ্জন হইল বাসি
খন আউকটা দুধের বাচ্ছার পড়ি গেল মাছি।

দেবপুরে বেহুলার গীত —

"ও বিধিরে কত দিনে যাব দেবপুর রে হায়
বিধিরে হে ত্রিপানির তিন ধার
কোন ঘাটতে হব পার হায়রে
আজি বুঝি মোর না বাঁচিবে প্রাণ।"

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই পালানাটকের গানগুলো একটি বিশেষ স্টাইলের মধ্যে চলে আসছে। এই পালানাটকের সঙ্গীতের সুরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মত আমরা পাই "— প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রায়োজন যে সাধারণ ভাবে এবং একক ভাবে গীত ভাওয়াই-চটকা গান মুদারা সপ্তকের কোমল নিখাদের উপরে ওঠে না কিন্তু ভাওয়াইয়া-চটকা ভিত্তিক লোকনাটক বা পালাগানের 'খোসা' ও 'পায়ার' গান হিসাবে ক্বচিৎ কখনো এই সুরকে তারা সপ্তকের শুদ্ধ ঋষভ পর্যন্ত পৌঁছাতে দেখা যায় — বিশেষ করে পদ্মপুরাণ বা বিষহরাতে। তবে সেই ধরনের গানের সংখ্যা খুবই কম। দেহতত্ব বা মনশিক্ষা আঙ্গিকের কিছু গানেও কোমল নিখাদের উপরে সুরকে যেতে দেখা যায়।"[১১]

যেহেতু এই সঙ্গীতের স্টাইল পারিপার্শ্বিক জীবন-বোধের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে সেই জন্য এর স্বরভঙ্গি এবং কৌশলও আঞ্চলিকতাকে নিয়েই সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াই গানের বিভিন্ন সুর যথাক্রমে দরিয়া, ক্ষিরোল, সোয়ারি ইত্যাদির প্রকাশ দেখা যায় পালাগানগুলোতে। আবার লঘুস্তরের চটকা ছন্দেরও ব্যবহার দেখা যায় গানগুলোতে।

কাহিনীভিত্তিক সঙ্গীত বলে অনেক সময় একঘেয়ামো কাটানোর জন্য ধুয়া গান, খোসা গান করা হয়। এর সঙ্গে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই ধুয়া গান বা খোসা গান গুলি অত্যন্ত প্রাচীন। অনেকে বলে থাকেন, বর্তমান ভাওয়াই গান এই সকল ধুয়া, খোসা গানের মধ্যে ছিলো।

## রাজধারী

তরাই অঞ্চলের রাজধারী লোকনাটকের পরিচিতি বাংলা লোকসাহিত্যে নেই বললেই চলে। এই পালানাটকের শুরুতে মঞ্চে মূল গায়ক সহ সাতজন বাদ্যযন্ত্রী প্রবেশ করেন। মঞ্চের মাঝখানে তারা বসেন না। মঞ্চের এক কোণে একটি বিশেষ জায়গায় তাঁরা বসেন। মূল গায়ক বন্দনা শুরু করেন —

একবার দয়া করে আয় হে
একবার কৌশল্যার নন্দন হে প্রভু
রাম আয় হে
একবার সুমিত্রার নন্দন লক্ষ্মণ বীর
আয় হে
একবার কৈকেয়ীর নন্দন হে
ভরত-শত্রুঘ্ন হে

ভরত শত্রুঘ্ন আয় হে

.....

.....

একবার বালীর নন্দন হে

অঙ্গদ বীর আয় হে

রামচন্দ্র ও অন্যান্য বীরদের বন্দনা সবাই মিলে কীর্তনের সুরে গেয়ে ওঠেন। রামবন্দনায় পাই

ওহেরাম বন্দু বন্দু

রামের যুগল চরণহে

রাম বন্দু বন্দু

ওই যে ভকতি করে বন্দি

মাতা কৌশল্যার চরণহে

রাম বন্দু বন্দু।

এইভাবে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সবারবন্দনাকরা হয়। কিন্তু এই বন্দনাংশে আসরবন্দনার ক্ষেত্রে দিগ দেবতার বন্দনা নেই, সরস্বতী আবাহন বা আসরে উপস্থিত থেকে গান সম্পন্ন করবার অনুরোধ নেই। গৌরচন্দ্র বন্দনা এখানে দেখা যায়। গৌরচন্দ্রকে দেখতে না পারার জন্য খেদ প্রকাশ করা হয়।

একবার সোনার বরণ গৌর চান

কোথায় গেলে পাবো রে

ওই আমি আর না হেরিবো রে

হরি নাম সংকীর্তন প্রচার করিলোরে।

গৌর ঐ আমি আর না হেরিবোরে।

বলা হয়েছে বাংলাদেশের কীর্তনের সুরে এই বন্দনাগুলো করা হয়ে থাকে । রামায়ণের দীর্ঘ কাহিনীকে দ্রুততার সঙ্গে 'ডাক' নামক একটি বিশেষ সাঙ্গীতিক রীতিতে আহ্বান করা হয়। ডাক গুলোর মধ্যে সঙ্গীতের শুধু বিশেষত্বও নেই, রয়েছে সমৃদ্ধ কাব্যগুণ।

যেমন — "বিরাট বীর মারা পইরে অরণ শব্দ হইলো। গৃহ হইতে উর্মীলাবীর সাজানি করিলোরে।" নাটকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই গানে ভরা। মূল গায়ক ব্যতীত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরাও সঙ্গীতেঅংশ গ্রহণ করেন।

নাটকে ঘটনার গুরুত্ব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী চরিত্রগুলি সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। বেদনাময় দৃশ্যগুলি যখন উপস্থাপিত হয় তখনই এই গানগুলি বেশীর ভাগ সময় পরিবেশিত হয়। বিচ্ছেদ, কষ্ট, মৃত্যু এই রকম ঘটনময় পরিস্থিতিতে এই গানগুলো গীত হয়। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সেনাপ্রধানদের বীরত্ব বোঝাতে বীরসম্পূর্ণ গান পরিবেশিত হয় —

"ওই আরে দিম দিম তিরসিরা বীর যুদ্ধ করেরে
প্রথমেতে হইলো বীরের মুখোতে গালানি
ও বীর যুদ্ধ করে রে।"

আবার করুণ রসের গানে দেখা যায় সীতা বিহনে রামের বেদনা প্রকাশ —

"ও ভাই লক্ষ্মণ, তুমি ভাই মোর ছাড়রে
আমি যাছি গৃহমাঝেরে ভাই
হায় হায়রে দারুণ বিধি আর কিনা হইলো
ফুলের কমল সীতা কুন বা দেশে গেলো।"

সঙ্গীতের মধ্যদিয়েই সবচাইতে আবেগ ঘন মুহূর্তটি প্রকাশিত। রামচন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণের বেদনা রাবণ অপূর্ব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন।

রাবণের গান — এ প্রভু তুইহে মাতা মোর
তুইহে পিতা, তুই হলো মোর জনম দাতারে
এ প্রভু অভাগিয়া যার আর কেহো
নাই, শুনো প্রভু রঘুনাথ রে
এ প্রভু ছিলো পুত্র মোর মেঘনাদ
আহা মরিরে তাহায় গেলো মোর।
এ প্রভু ঘরে ঘরে মোর কান্দে
রানীগণ শুনো প্রভু রঘুনাথ রে।
এ প্রভু সর্বনাথার কথা ধরনু
লংকাপুরী শূন্য করনুরে
বাতি দিবার মোর কাহ না রহিলো
আররে হে।

এই বেদনাময় সঙ্গীতে রাবণের ক্রন্দন সকল শ্রোতার মধ্যে গিয়ে বেজে ওঠে। সবাই রাবণের মতো

ঈশ্বর রামচন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মহিলা-পুরুষ সবারই কণ্ঠে তখন হরি হরি ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। তখন এই লোকনাটকের অভিনেতা এবং দর্শক সাধাররের মনে একটি গভীর ভক্তিভাবে জেগে ওঠে। এই ভক্তিভাব তাদের এক আলোকসম্ভব অনুভূতিতে পূর্ণ করে তোলে। লোকনাটকের দর্শক ও অভিনেতা মোটের উপর একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষ তাদের আশা আকাঙ্খা এক। এই নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে তাদের সেই ভক্তিনত চিত্তের আকুতি চরিতার্থতা পায়। গানের সুরে। নাট্য সংলাপে, চরিত্রগুলির আচরণে এই ভাবটি ক্রমবিকশিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত একটি আনন্দরস মানসিক অবস্থায় তাদের মন পূর্ণ হয়।

কখনো কখনো গীতগুলি বাদ্য এবং নৃত্যকে ছাপিয়ে শুধুমাত্র সঙ্গীত, কথা, সুর, বাদ্য এবং নৃত্যের মধ্যে প্রাণ পায়। এই উপকরণগুলির বৈচিত্র্যে সঙ্গীতের রূপ পরিস্ফুট হয়। গানের ভাবাবেগে একাকার হয়ে ওঠে। গোটা উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন লোকনাটকে বিভিন্ন রকমের লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় দোতরা, কুশাণ, চোর-চুন্নী ইত্যাদি লোকনাটকে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। সেটা কখনো চটকারূপে আবার কখনো দরিয়া রূপে।

কিন্তু তরাই অঞ্চলের লোকনাটকে এখানকার লুপ্ত প্রায় লোকসঙ্গীত 'লাহাংকারী'-র ই প্রভাব সবচাইতে বেশী। দীর্ঘ-বিলম্বিত লয়ে লাহাংকারী গান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে বিরহই মুখ্যত ফুটে উঠে। কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গভীর বেদনাই এর মধ্যে ব্যক্ত হয়। 'লাহাংকারী' এই অঞ্চলের একটি প্রচলিত শব্দ যা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নারী মনের বেদনা, মৃত্যু চেতনার ভাবনা ছাড়াও জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে। ফলত, এই 'রাজধারী' লোকনাটকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই লোকসঙ্গীত 'লাহাংকারী' মূল উপজীব্য।

## নটুয়া

নটুয়া গানের দুটি ধারা, একটি বিরহ এবং আর একটি কুঞ্জ। এই নাটকে গীত-পরিবেশনের ক্ষেত্রে বাজনাদারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাদ্যযন্ত্র বলতে তেমন কিছু নেই। মৃদঙ্গও জুড়ি (করতাল) দিয়েই গোটা অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়ে থাকে।

মূল গীদাল বা গায়ক গান শুরু করলে গানের ধুয়া ধরে অন্যরা গান শুরু করেন।

'বন্দনা' গান দিয়ে পালাগান শুরু হয়। 'বন্দনা'-য় সব শিল্পীরাই অংশ গ্রহণ করেন। বন্দনা থেমে গেলে মূল গীদালই গান শুরু করেন।

বন্দনা গানের একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করার মতো। এখানে কালী বন্দনা করা হয়েছে। আর কালী

হনুমান নিরঞ্জন রাম, পীর পয়গম্বর এই কজন দেবতার নাম বন্দনা অংশে পাওয়া যায়। পীরপয়গম্বর আর কালী হনুমান আর নিরঞ্জন যাই হোকনা কেন সমসাময়িক পরিবেশ ও গ্রামীণ জীবনের শিক্ষা কবিকে একই সঙ্গে এই সম্প্রদায়োত্তীর্ণ হয়ে দেবদেবী বন্দনা করতে শিখিয়েছে।

কালীবন্দনা দিয়ে সাধারণত কোনো পালাগানের সূচনা হয় না। বন্দনা অংশ একটু উদ্ধার করি :

যবেরে মৃদিঙ্গারে মৃদিঙ্গা
মারে শান
বামে বসিলো কালীমা ডাইনে হনুমান
হে রাম।

এরপর দিগবন্দনায়ও আসে কালীমার কথা।

উত্তরে বন্দিনু মুই কালীমার চরণ
দক্ষিণে বন্দিনু মুই গঙ্গা সাগর।
আইসো আইসো কালীমা সভা রঞ্জায়ে যা
সভা ভঙ্গ হলে লইজ্জা হবে তোর কালী মা।

এরপরের অংশও অভিনব।

দেবী সাজে কালী সাজে
সাজে পঞ্চবহিন।
শ্রীমতী রাধিকা সাজে
উধব মাধব দোনো ভাই
মহামায়া পূজার কারণে
নামিল ভবানী
হে দেবের মহামায়া।

এই অংশের বন্দনাটি বেশ অসংলগ্ন রচনা। মনে হয় বন্দনাটির ভিতরের কিছু কথা বাদ পড়ে গেছে। ফলে এটি কিছু অগোছালো হয়ে পড়েছে।

হাতে নিলু বাচারে মুই
মিঠা পান
কাহাসে আইলো রাধাগে

দশমুনিক করিস পরনাম।

— এই সঙ্গীত পরিবেশনের পরে দোয়ার বা ছোকড়া একধরনের শ্লোক উচ্চরবে শোনান। তার মধ্যে ছন্দ এবং গীতময়তা থাকে। ফলে সঙ্গীত পরিবেশনের চলমান গতির মধ্যে কোনো ছেদ পড়ে না।

মূল গীদাল রাধিকার বিরহ ভাবকে ফুটিয়ে তোলেন করুণগানের পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে —

এখেতো অন্ধার রাতি

একালরে রহানি যায়

ওহো পরভূজি

হায় দেখি মোর কপালের লেখা রে

জার গেলো কোর কাপড়া বিনে

বয়স গেলো সোয়ামী বিনে

একালরে রহালনি যায়

গোকুলা নগরে ওহে পরভুজি।

এই বেদনাকে হাল্কা করার জন্য কিংবা রাধিকার বিরহকে ভুলে থাকার জন্য উধব দর্শক-শ্রোতাদের সন্মুখে মূল গায়ককে শ্লোকের মাধ্যমে প্রশ্ন করে বসেন —

ক্ষুদ্র বর্ণ বিত্তা নাল বর্ণ দেহ

ছাবেলা ছাবেলা সর্ব অঙ্গ ধরে

অধিক করি খাইলে

তোর মুখখান গন্ধ করে।

নাটুয়া-বিরোগের গান সম্পূর্ণ রূপে রাধার বিরহ ব্যাথার গান। এই বিরহের গানের প্রত্যেকটি পদ কাব্যময়। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াই গানের দরিয়া বিভাগে নারীর বেদনা ও বিরহের কথা মুখ্যত প্রকাশ পায়। উত্তরের তরাই অঞ্চলে দরিয়া শব্দটির তেমন পরিচিতি পূর্বে ছিলো না। এখানে নারীর ব্যাথা-বিরহ প্রকাশ হতো যে সুরে তা হলো লাহাংকারী। রাধিকার ব্যাথা-বেদনার প্রকাশই হলো এই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য — সেই বেদনা লাহাংকারী সুরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

"লাহাংকারী গানের সুর মূলত লৌকিক এবং প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষা নিরপেক্ষ এবং সহজাত। মাটির সুর বলেই তরাইয়ের এই ভূমির প্রকৃতির অনুসারী লাহাংকারী গানের সুরের প্রকৃতি উত্তরবঙ্গের অন্যান্য লোকসুর অপেক্ষা ভিন্ন। ... 'লাহাংকারী' গানের সুরে যে সুর কাঠামো ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ —

'সা, রা, মা, পা, ধা, না, সা. রা, সা, না, ধা, পা, মা, জ্ঞা, রা, সা, না, না, সা, জ্ঞা, রা, সা।

এই সুর কাঠামো, না ভীমপলশ্রী না দরবারী - কানাড়া অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট রাগের সুর কাঠামো দিয়ে বাঁধা যায় না, এবং এখানেই এই লাহাংকারী গানের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত হিসাবে গণ্য হওয়ার মতো মূল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।"[১২]

লাহাংকারী গানের সুর-বিন্যাসেরও অনেক বৈচিত্র্য। ভাসানী, টিপানী, উদাসী, পাথারী ইত্যাদি নামে বিভিন্ন প্রকার সুরের ব্যবহার হয়। নটুয়া গান যেহেতু উদাসিনী রাধার মনের জ্বালা যন্ত্রণার গান সেই কারণে মূলত দুটি সুরের ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়। উদাসী সুর এবং পাথারী সুর — সংসারের মায়া মোহ ত্যাগ করে মন যখন উদাস হয়ে যায় অথবা সব ছেড়ে দেওয়ার জন্য মন যখন ব্যাকুল হয় তখন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদাসী সুর ব্যবহার হয়। ত্যাগের গান উদাসী সুরে —

হাতের শাংখা করিমু দূর
গায়ের বস্ত্র করিমু দূর
দূর করিম নয়নের কাজল
সীথার সেন্দুর।

পাথারী সুরের গানে একান্ত দুঃখের কথা ব্যক্ত হয়।

'মনের অগুন তলে জ্বলেরে
নেকটের আগুন ধায়
জ্বলেছে মনের আগুন
সখিরে কি খাইলে জুড়ায়'।

তরাইয়ের 'নটুয়া' পালানাটকে লাহাংকারী সুরের বৈচিত্র্য সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট।

### শাস্তরী

### জ্ঞানবালা - পটপুটিয়া গোঁসাই

শাস্ত্রসম্মত তর্ক-বিতর্ক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে এই শাস্তরী তথা জ্ঞানবালা-পটপুটিয়া গোঁসাই পালা নাটকে। জ্ঞানবালা তাঁর যুক্তি অদম্য লড়াই সহকারে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। অনুরূপ ভাবে পটপুটিয়া গেঁসাইও তাঁর যুক্তি স্থাপনে সঙ্গীতের ব্যবহার করতে পিছপা হন না। ফলত, বিভিন্ন সুর স্থাপনে, তাল-ছন্দ-লয়ে মিলিত হয়ে এই পালা নাটক তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে লোক সমাজের চিন্তা চেতনার বিকাশ সাধন করে। নানা শাস্ত্রীয় জ্ঞান এই যুক্তি তর্কের পরম্পরার মধ্য দিয়ে লোকমানসের চিন্তার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে। অনুষ্ঠান শুরুতে মূল গীদাল সঙ্গীত দিয়ে বন্দনা শুরু করেন। এই বন্দনার গানের বিশেষত্ব শুধু সতী নারীদের বন্দনা করা হয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, সীতা, রাধা, দ্রৌপদী, অহল্যা, রঞ্জনা, পদ্মাবতী ও বেহুলা

— এই সকল সতীদের নিয়ে বন্দনা করা হয়। অন্যান্য পালানাটকে দেব-দেবতা, গিরী-পর্বতমালা, নদী-সাগর নিয়ে বন্দনার গান হয় — এই পালানাটকে এগুলোর উপস্থিতি নেই। বন্দনা গানের একটি অংশ —

"সতীর মধ্যে সীতারে ভাই
নামটি তাহার সীতা
সেও সতীটাক হরণ করিছে
লঙ্কার রাবণ রাজা।
আরেক সতীক বন্দি নেবো
নামে রাধা সতী
সেও সতীটা হইছে ভাইরে
ভাগিনা ভাতারী।"

রাধা দ্রৌপদী বা অহল্যার সম্বন্ধে যে উক্তি করা হয়েছে তাতে এইসব নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে অবিমিশ্র শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেনি। রাধাকে 'ভাগিনা-ভাতারী' বলার মধ্যে সতীত্বের প্রশংসা নেই। দ্রৌপদীকে পঞ্চভাতারী বলার মধ্যেও সেই সমালোচনার মনোভাব জেগে থাকে। তবু একটা ব্যাপার এখানে লক্ষ করা যায়। এই শাস্তরী পালাটিতে আছে জ্ঞানবালার সঙ্গে গোঁসাই এর তর্ক। এই তর্কে নারীরস্থান নিয়ে কথা হয়েছে। সতী নারীর প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়েছে। আর সেই সূত্রে নারীর নারীত্বের নানা অবস্থার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা এসেছে। যে ঐতিহ্যকে বলা যায় ভারতীয় সতী নারীর ঐতিহ্য। সেখানে অহল্যা আছে দ্রৌপদী আছে রাধা আছে। এঁরা একালের দৃষ্টিকোণ থেকে সতীবলে প্রশংসিত নন কিন্তু ভারতীয় নারীত্বের ধারণা এঁদের সতী বলে মেনে নিয়েছে।

এই লোকনাট্যটির বিশেষ একটি দিক হল তর্কপ্রাণতা। বিতর্ককে গ্রামীণ কবি নাট্যের ভাষায় সঙ্গীতের সুরে যে দক্ষতায় প্রয়োগ করেছেন তার প্রশংসা না করলেই নয়। লোকনাট্যগুলিতে সাধারণত গীতিপ্রাণতা দেখা যায়। একটি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নাট্যকার যে সঙ্গীত এবং সঙ্গীত ধর্মী সংলাপের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাতে প্রায়ই কোনো বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠেনা। দ্বন্দ্বময়তার অভাবই সেখানকার ধর্ম। কাজেই একটানা কাহিনীবর্ণনা সঙ্গীতের সুরে গীতোচ্ছল হয়ে ওঠে।

এগুলির সংলাপ ধর্মকেই নাটকের বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে শাস্তরী লোকনাটকে — যদিও নাট্যগুণান্বিত দ্বন্দ্বের ধর্ম ফুটে ওঠেনি — তবু এই বিতর্কে দুই পক্ষের যুক্তি প্রযুক্তির মধ্যে একটা নাট্যগুণ পাওয়া যায়।

এই শাস্তরী নাটকটিতে অন্যান্য সকল লোকনাট্যের মতোই বাংলা সঙ্গীতের মাঝে মাঝে স্থান পেয়েছে সঙ্গীত যাকে Song Poetry বলা চলে। যেমন: "ওই কান্দেরে কান্দেছে জ্ঞানবালা" কিংবা জ্ঞানবালার গীত — "কিনা কইছু দুশিরে বিধি কিনা কইছু হানি"। জ্ঞানবালার এই গীতগুলির মধ্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা ফুটে উঠেছে। এই গীতগুলি ব্যক্তির বেদনাবিদ্ধ জীবনের গান রূপে এই নাটকে সংযুক্ত হয়েছে। এই গানগুলি বিতর্কপ্রবণ নাটকটির মধ্যে একটি নারীর ব্যক্তিজীবনের দীর্ঘশ্বাস বয়ে নিয়ে আসে। গানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিসরের ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতির গভীরতাকে প্রকাশ করে। কিন্তু গানের পাশাপাশি আছে কাহিনীর চলা — সেখানে সংগীতের ধর্ম বর্ণনাত্ম বর্ণনামূলক গীতাংশের দ্বারা কাহিনী এগিয়ে যায়। দুধরনের সঙ্গীতের প্রয়োজনে এই শাস্তরী লোকনাট্যটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। লোকনাট্যের এই লিখিত বয়ানটিতেও পাই পদ্য কথা গীত তিন ধরনের নির্দেশ। পদ্য অংশের সঙ্গীত ধর্মিতা নেই পাঠনির্ভরতা আছে। "আড়ি নিন্দা করেচিস এইটা তোর ভুল / আড়ি মেয়েটা হচ্ছে ভবনদীর কুল।" — এটা পদ্য। আগের গানের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। নাটকে এ কথাগুলি গানের মতো করে গাওয়া হয়না। পদ্যের মতো করে বলা হয়। কিন্তু এই পদ্য অংশের শেষে মিল আছে। আর কথা অংশ মিলহীন নির্দিষ্ট ছন্দবিহীন। যেমন জ্ঞানবালার কথা — ঠকুর মন্ত্র যে দিবেন মন্ত্রটা কোন স্বরূপ ? পুটপুটিয়া। মন্ত্রটা শ্রীমতি রাস্বরূপ। এগুলি কথা। কথা পদ্য এবং গীত তিনের ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য এখানে দেখা যায়। আর একটি কথা। লোকনাট্যের ধরণকে বলা যায় সংগীতাত্মক কিংবা সংগীতের মাধ্যমে গঠিত সংলাপাত্মক রচনা। এই সংগীতের সুরের মধ্যে জেগেছে কথার গদ্য। সংগীত ক্রমে কথার বশবর্তী হয়ে পড়েছে। আধুনিক নাটকে সংগীত কথার অনুচর, কখনো বা কথা সংগীতকে একবারে গ্রাস করেছে। কাব্যনাট্যে কথা পদ্যধর্মী। লোকনাট্যে কথার মাহাত্ম্য কম সংগীতের মাহাত্ম্য বেশি। কিন্তু সেই বিবরণধর্মী বর্ণনাময় সঙ্গীতের মধ্যে যে তর্কাত্মক রচনা জেগে উঠেছে তার মধ্যে লোকনাট্যের শক্তির একটা বিকাশ ঘটেছে। বলা বাহুল্য সংগীতময় রচনা থেকে সংগীতকে নির্দিষ্ট স্থান নিরূপণ করে দিয়ে তার ভিতরে কথায় তর্কের শক্তি পরীক্ষা হয়েছে। এটা লোকরুচির লোক ভাষার শক্তি পরীক্ষার একটা বিশেষ দিক। মনে করি এধরণের শাস্ত্র আলোচনা লোকজীবনের নৈতিক চেতনাকে সম্প্রসারিত করেছিল। নারীর সামাজিক ভূমিকা কী — এই বিশেষত বিধবা নারীর ভূমিকা কী — তাই নিয়ে এই তর্কাত্মক নাট্যরচনা করা হয়েছে। এ ধরনের রচনা লোকনাট্যের আদিধরণ থেকে স্বতন্ত্র। হয়তো মধ্যযুগীয় যে সব বিতর্কমূলক বৈষ্ণবীয় কড়চা ছিল এ লেখায় তার প্রভাব পড়েছে। আর একটা প্রভাবের কথা মনে করা যায়। সে হল কবিওয়ালাদের তর্কের প্রভাব। শাস্তরী পালায় কবির গানের তর্ক বিতর্ক স্থান পেয়েছে বলে মনে হয়।

বন্দনার শেষে নাটক শুরু হয়ে গেলে বিধবা জ্ঞানবালার সঙ্গীত শুরু হয় পটপুটিয়া গোঁসাইকে উদ্দেশ্য

করে —

গলাত তোর তুলসি মালা

অহে আড়ি মাইয়া

রাধা হছে দুই ভাতারী

বোষ্টমের গোড়া

ওই শোনেক ঠাকুর মন দিয়া,

.....

.....

এক ভাতারী একেশ্বরী

নাই ভাতারী সাই

পাঁচ ভাতারী হছে

ভগবানের পিসাই।

কথোপকথন জাতীয় সঙ্গীতি মূলতঃ এইগুলি। পটপুটিয়ার উত্তর আবার এই গানের ভিতর দিয়ে —

পাঁচ ভাতারী কায়গে মাই

বতায়ে দিবা হোবে।

নিশুনিম তোর মুখের কথা

কোন শাস্ত্রত আছে।

পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের বক্তব্য গীতের মধ্য দিয়ে ঘটে। এই গীতই সংলাপের কাজ করে। খুব কম সময়ে ছোট ছোট বাক্যে সংলাপের ব্যবহার হয়। সংলাপ শেষ হওয়া মাত্রই গান শুরু হয়ে যায়।

এই গান গুলোতে ভাওয়াইয়া গানের দরিয়া-ভাগের প্রভাব আছে। আবার তরাই অঞ্চলের লাহাংকারী গানেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে

আর এক প্রকার সঙ্গীতের প্রকাশ লক্ষ করা যায় — মনো শিক্ষা বা তুখ্যা গানের প্রকাশ। এই গানে অধ্যাত্মকথা, পৃথিবীর নশ্বরতা পরলোকের বিষয় মুখ্য হয়ে ওঠে। উল্লেখ করা যায় —

"ওই মন মাতঙ্গ বান্দব

সদায় মন মোর আনন্দ

গুরু বলিয়া ডাকরে মন

এ দেহটা নিশির স্বপন।"

আবার সমকালীন বিধবা যন্ত্রণার ক্রন্দনও দরিয়ার বিলম্বিত লয়ে গভীর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে।

ছোটয় ছিনু ভালো ছিনু
বাপ মায়ের কোলে
বেহা হয়া হনু আড়ি
নিজ কর্মের দোষে।

এই পালানাটকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রীয় গান, মনোশিক্ষার গান, প্রশ্নোত্তর-মূলক গান এবং দুঃখ-যন্ত্রণার গান নানা বৈচিত্র্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

## খন

'খন' উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিশেষ গান। এই গান গ্রামে ঘটে যাওয়া কোনো বিষয়বস্তুকে নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। ''আঞ্চলিক অর্থে 'খন' অর্থাৎ কেচ্ছা বা বাখান। নারী-পুরুষের প্রেম ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান বিষয়বস্তু। সেই কারণে 'খন' কথাটি গ্রামাঞ্চলে অশ্লীল শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। সম্ভবত এই শব্দটি আঞ্চলিক বাংলাভাষায় এসেছে 'খত' থেকে। এখানে উচ্চারণে 'ত'-এর পরিবর্তে 'ন'-এর উচ্চারণ ব্যবহার করা হচ্ছে। উর্দ শব্দ 'খত' থেকে 'খন'। এক সময় গ্রামাঞ্চলের আনন্দ বিনোদনের বিষয়বস্তুই ছিল নূতন নূতন 'খন' গান বা কেচ্ছাগান।''[১৩]

'খন' গান পরিবেশনে গায়ক সর্বদেবতা লৌকিক দেবদেবী এবং দর্শক দশঠাকুরের বন্দনা করেন। সব ধর্মের লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় এই বন্দনার অংশে —

''বন্দিমাতা বীণাপানি জগৎমাতা জননী
তোমারি চরণে প্রণাম করি।
পূরবে বন্দনা করি ভানু দিগম্বর
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত।
সেই পরবতে বসত করে যত মুনিগণ
তাদের চরণে আমরা করিগো প্রণাম।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা-মদিনা
দক্ষিণে বন্দনা করি সপ্ত সাগর লঙ্কা।
লঙ্কা দ্বীপে বসত করে দশমুণ্ড রাবণ

তাহারি চরণে আমরা করি গো প্রণাম।

'খন' গানের বন্দনায় শ্রীলঙ্কার 'দশমুন্ড রাবণ'-কে শ্রদ্ধাসহকারের প্রণাম করা হয়েছে। অন্যান্য পালাগানে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল।

'খন' গানের ভৌগোলিক সীমানায় 'রাম-বনবাস' পালানাটকের প্রসার দেখা যায়। রাম-বনবাসের কাহিনীর মধ্যেও রাবণের প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে। তার প্রভাবও এখানে থাকতে পারে।

সামাজে ঘটে যাওয়া কাহিনী নিয়ে 'খন' গান রচিত হওয়ার ফলে দৈনন্দিন জীবনের কথাই গান হয়ে উঠেছে। চরিত্রের পরস্পর কথপোকথন অধিকাংশ সময়ে গান দিয়ে করা হয়। বলা যেতে পারে গীতিনাট্যের আদলে 'খন'-এর গান পরিবেশিত হয়। নির্বাচিত 'খন' গান থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে —

গান ঃ

ওনা সকালে উঠিয়া মুই
যাছু হাল খান ধরি-
তাড়াতাড়ি ওরে চেতনার মা
তুই যাইস খরাক দিবা।
ওনা সঙ্গে পিয়াইজ নিগাবু
আর নিগাবু আলুর ভাজা
এক দুফর বেলা হইলে-
ওরে চেতনার মা
ও কোম ভোক নাগে চন চন করিয়া।

গীতিনাট্যের আদলে সঙ্গীত গীত হয়ে থাকলেও একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। উভয় চরিত্রই শেষে একই কথা একইসঙ্গে গান আকারে পরিবেশন করে থাকে। কিছুটা তরাই অঞ্চলের পালাটিয়া বা পাঁচালী গানের ধরণকে মনে করিয়ে দেয়।

'খন' পালাগানের সঙ্গীতগুলির সুর প্রচলিত। নতুন গান প্রচলিত সুর দিয়েই গাওয়া হয়ে থাকে। পালাগানের অভিনেতা - অভিনেত্রিদের নিজস্ব দক্ষতার উপর এই গান নির্ভর করে। পালানাটককে পরিবেশনযোগ্য করে তোলার জন্য নাটকের কাহিনীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাদ্যযন্ত্র খোল, হারমোনিয়াম, করতাল সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। 'খন' গানের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর তৈরী হয়। কিন্তু কাহিনী পরিবেশনের জন্য সঙ্গীতের যে সুর ব্যবহার করা হয় তা 'খন' গানের প্রচলিত সুর।

## রাম বনবাস

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে রামবনবাস পালানাটকের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। শহর বালুরঘাটের আশেপাশের গ্রামে গেলে বিজয়া দশমীর পরের থেকে রাম বনবাস গানের সুর কানে ভেসে আসবে।

উত্তরবাংলার পালানাটক কুশান, দোতরা, চোরচুন্নী ইত্যাদি লোক নাটকে সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে রাম বনবাস গানের সুরের পার্থক্য বিদ্যমান। নাটকের বহিরঙ্গে এবং উপস্থাপনে অন্যান্যগুলোর সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও সঙ্গীতের সুরের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মূল গীদাল গান শুরু করেন —

আদি কান্ডে রামের জনম
বিবাহ সীতার অযোধ্যা কান্ডতে
শ্রীরাম ত্যাজে রাজ্য ভার
অরণ্য কান্ডতে সীতা হরিল রাবণ ...।

প্রচলিত গ্রাম-বাংলার রাম মঙ্গল গান যে ঢং-এ পরিবেশিত হয়ে থাকে অর্থাৎ দীর্ঘ লয়হীন কাটা কাটা সুরে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গীত হয় অনুরূপ ভাবে রাম বনবাস পালানাটকের গান শ্রোতার সন্মুখে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

একক ভাবে কোনো চরিত্র যখন গান গেয়ে ওঠে তখন সেই গানে রংপুর অঞ্চলের ঝুমুর গানের সুর পরিলক্ষিত হয় —

"ও ভাই লক্ষ্মণ চল যাই ভাই বনবাসে
বনে গিয়ে কাল কাটাবরে ভাই।"

এই গানের মধ্যে বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক এই গানটি তরাই অঞ্চলে কিংবা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এলাকায় গীত হলে সুর পরিবর্তিত হয়ে যেতো। দরিয়া বা লাহাংকারী সুরের প্রভাব রাম বনবাস পালাগানে নেই।

রংপুর-বগুরা অঞ্চলের প্রচলিত ঝুমুর যাত্রা যথাক্রমে কাজলকুমারী, 'মলুয়া', 'রূপবান' ইত্যাদি ঝুমুর গানের প্রকাশ আলোচ্য পালাগানের সুরে লক্ষ করা যায়। গানগুলি এরকম —

শূর্পনখা — শোন হে সুন্দর যুবক
আমায় কর বিবাহ আমায় কর সাধী
রাম — শোন হে সুন্দর যুবতী

না করিব বিবাহ, না করিব সাধী।

শূর্পনখা — শোন হে সুন্দর যুবক
কোথায় তোমার বাড়ী ঘর
কাহারো নন্দন।
কোথায় কি কারণে এসেছ
তোমরা পঞ্চবটী বন।

রাম — শোন হে সুন্দর যুবতী
অযোধ্যাতাতে বাড়ী মম দশরথের নন্দন
দশরথের চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম
পালিতে পিতার সত্য
এলাম পঞ্চবটী বন।

এই ভাবে কাটা কাটা গানের সুরে সুরে বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। এরূপ সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে নাটকীয় স্পন্দন জেগে ওঠে।

## গম্ভীরা

সঙ্গীতের নানাবিধ প্রকাশ 'গম্ভীরা'-য় একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। 'লোকনাট্য হিসেবে গম্ভীরা গানের আদিরূপের নিদর্শন বোলবাহি পালাগানে নিহিত ছিল...।'[১০]

বোলবাহি মানে কাউকে আহ্বান করে আনা। সঙ্গীত দিয়ে অন্যকে ডেকে আনা — এই জাতীয় গানের ব্যবহার 'বোলবাহী' পালাজাতীয় গানের মধ্যে পাওয়া যায়। এই রকম ডেকে আনার রীতি 'গম্ভীরা' গানের মধ্যে দেখা যায়। ''যেহেতু সাধারণ মানুষ আপন আপন সুখ-দুঃখের কথা এই সকল গানে তুলে ধরেন। তাই বিষয়বস্তুর পরিবিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত সামাজিক, প্রশাসনিক-রাজনৈতিক স্তরের ছোটবড় ঘটনা প্রাকৃতিক বিষয় অর্থাৎ খরা-বন্যা-ঝড়-শিলাবৃষ্টি-ভূমিকম্প— কোন কিছুই বাদ থাকে না। প্রতি বছরের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, প্রশাসনের ভালো-মন্দ ব্যক্তিগত নিন্দামন্দ প্রভৃতি গানের বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয় বলে সাধারণ মানুষের আগ্রহ দেখা যায়।''[১১]

সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতে কথার অর্থ এবং ব্যবহার সম্পর্কে শিল্পীরা অত্যন্ত সচেতন। গীতিকাররা

গান রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। সঙ্গীতে ভাবাবেগের চাইতে কথার অর্থকে বোঝাতে সচেষ্ট থাকেন। সুতরাং বলা যেতে পারে গম্ভীরার গান কথা প্রধান। ফলত, বন্দনা থেকে শুরু করে রিপোর্ট পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে সঙ্গীতকে কথা দিয়ে বুঝতে হবে। উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে 'বন্দনা'-র পূর্বের অংশ 'প্রস্তাবনা'-র বিষয়টি থেকে —

১। ব্যবসায়ী —

আমি ব্যবসা করে পাড়ার খরিদ্দারে
পন্য দিলাম ধার। দোকান গেল রসাতলে
চোখে দেখি অন্ধকার।

২। সাইকেল চোর —

বিনা পুঁজির ব্যবসা আমার
বুদ্ধি আর সাহস দরকার, তিনটা সাইকেল
করতে পারলে মার, মাসে দেড় হাজার

৩। পকেটমার —

মাত্র দুই আঙ্গুলে সংসার চলে

৪। নেতা চামচাদার —

আমি নেতার চামচা দারের
পালন করি নেতার যত অর্ডার
নেতার মদ মাংস জোগাড় করার পেয়েছি দ'য়িত্বভার
মাঝে মধ্যে নেতার কাছে পাওয়া যায় পুরস্কার

এই গানগুলি স্কেচধর্মী। জীবনের একটি বিশেষ নক্সা এতে চিত্রিত। এই কথাগুলি শ্রোতার মগজে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক লোকসুরে উচ্চারণের স্পষ্টতা রেখে গানগুলি উদ্দেশ্য মূলক ভাবে গাওয়া হয়। মানুষের কাছে নিজের প্রাস্তাব এখানে উপস্থাপিত হয় — এই প্রস্তাব শব্দটি নিজস্ব পরিচিতির অর্থ বহন করে।

'বন্দনা' অংশের একটি গান —

১। শিব হে — হে ভারত বিধাতা এই স্বাধীনতা
চায়নি জনগণ

দমন পীড়ন অত্যাচার অনশন অবিচার

এই কি শিব তোমার স্বাধীন শাসন।

বৈচিত্র্যময় ভারতবুকে বিচিত্র রাজনীতি

শিব হে — শকুনের মতো নেতাদের দৃষ্টি মৃতদেহের প্রতি হে

মরা দখল করার তরে — ঝান্ডা উড়ায় মরার উপরে

লুটে রাজনৈতিক কায়দা — ধন্য পলিটিক্সের কায়দা

সব দলের মতবাদ — ভারতে আজ বরবাদ

নীতি বিহীন রাজনীতি চালায় নেতাগণ।

২। ছদ্মবেশী শয়তান আর ভন্ডদের যোগসাজসে

ডাইনি নামে নরহত্যা চলছে এই দেশে হে

কুসংস্কারের ফলে নরবলি আজও চলে

ভন্ডরা ছলে বলে কৌশলে শোষণ করছে গরীব দলে

প্রশান্ত শেঠ কয় হে মৃত্যুঞ্জয়

নিরক্ষরতার এই হত্যার কারণ

তাইতো ভারতে সাক্ষরতার প্রয়োজন।

বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন ভাবে বন্দনা পর্যায়ের গান গাওয়া হয়। মালদা এবং মালদা সংলগ্ন এলাকার গ্রামীন মানুষের মধ্যে যে এলালাকাগত সুর খেলে বেড়ায় তাকেই অবলম্বন করে সুর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। এই 'বন্দনা' অংশের গানে অবশ্য গাম্ভীর্য লক্ষ করা হয়ে থাকে।

'চার-ইয়ারী' পর্বের গান গুলিতে চারটি চরিত্র উপস্থিত থাকেন। চারদিক থেকে চরিত্র গুলি গান গাইতে গাইতে আসরে চরিত্রগুলি প্রবেশ করবেন। গানের সুর এমনই হবে যা শ্রোতাদের কছে চারটি চরিত্রের গানের ভিন্ন অর্থ দ্যোতিত হবে।

প্রথম চরিত্র — লেবার কমিশনার ঃ-

পুঁজিপতি ব্যবসার

করছে অবিচার তাই,

রক্ষা করবো শ্রমিকের অধিকার

দ্বিতীয় চরিত্র — মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ-

মোদের সমিতি নারীদের প্রতি

সইবেনা অত্যাচার

তৃতীয় চরিত্র — শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা ঃ-

কর মোদের ইউনিয়ন

শ্রমিক বন্ধুগণ।

চতুর্থ চরিত্র (উচিৎ বক্তা) — উচিত বক্তা ঃ-

জন দরদী নেতা

তোদের ক্ষুরে নমস্কার

গদীর লোভে আর নিজের স্বার্থে

যত ভাষণ চিৎকার

সঙ্গীতের বিষয়-বৈচিত্র্য অত্যন্ত ব্যাপক। গীতিকারগণ সতর্ক ভাবে সঙ্গীত রচনা করে স্পষ্ট ভাবে তা আবার শ্রোতাদের মধ্যে পরিবেশন করেন। সঙ্গীতগুলোতে আত্মমগ্নতা নেই, আছে বাস্তবমুখিতা। এই বাস্তবতার গান লোক-ঐতিহ্যের ধারাকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে।

চার-ইয়ারীর পর 'ডুয়েট' পর্ব। এই পর্বে দু'জন চরিত্র আসরে উপস্থিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

প্রথম চরিত্র (স্ত্রী) —

আমি তোমাকে বিয়ে করে

মরলাম জ্বলে পুড়ে

না জেনে শুনে বিবাহ বন্ধনে

হলাম আবদ্ধ

কত ভাল পাত্র দিলাম ছেড়ে

দ্বিতীয় চরিত্র (পুরুষ) —

তোমার বাবা এসেছিল

বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে শতবার

বাবার পায়ে যেত তেল মাখিয়ে

বাড়ীর মাটি দিয়েছিল বসিয়ে

বাবাকে সোজা পেয়ে

তোমার বাপে মায়ে দিল গজিয়ে

একন রণচন্ডি আমার ঘড়ে।

দৃশ্যান্তরে গানের ভাব-রস এবং কথা পরিবর্তিত হয়।

ঠিক এই পর্বের পরেই আরেকটি বিদ্রূপাত্মক ভাবনা প্রকাশের পর্ব রয়েছে।

গীতিকারগণ এই পাঠটির নামকরণ করেছেন 'টনটিং'। প্রচলিত এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। কাউকে খোঁচা দেওয়া বা একটু বিদ্রুপ করাকে 'টনটিং' বলে। উল্লেখ করা যেতে পারে —

১। ভি.ডি.ও. পর্দায় সিনেমা হলে
বেআইনী অশ্লীল বই চলে
সভ্যতা ধ্বংসের ফলে পিষছে কিশোর বালক দল
তোদের কার্য কলান অন্ধের মতন।

২। মানুষের আস্থা নাই
তোদের পুলিশী ব্যবস্থার
করছিস তোরা দুর্নীতি পোষণ
অপরাধী যারা পড়ে না ধরা
বাড়ছে খুন ছিনতাই ধর্ষণ।

'টনাটিং' পর্যায়ের গান অনেক বেশী ক্ষুরধার। এই গানের কথা সকল সমাজকে উদ্দিষ্ট করে কড়া চাবুকের মতো নিক্ষেপিত হয়। গায়কের গায়ন ভঙ্গীতে থাকে দৃঢ়তা। সুরের খেলা বড় নয়, বড় কথা বক্তব্যকে মুখর করে তোলা।

শেষ পর্যায়ে গান হচ্ছে 'রিপোর্ট'।

শিবকে রিপোর্ট প্রদান —

নানা হে আমরা সদর্পে গম্ভীরা গাই
করবো না মাথা নত কাপুরুষের মতো
গুরু গোবিন্দ গোপীনাথ বলছে তাই।

১। মালদার বিখ্যাত আম
দিনে দিনে হারাচ্ছে সুনাম
তাইতো গবেষণা চাই
চিনি লটনট আম বাড়ছে সংখ্যায়

আম সংরক্ষণের মালদায় কোন ব্যবস্থা নাই।

২। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ টি.ভি.তে মাত্র ৩৬ টাকাতে
বাস্তবে অন্য চিত্র খরচ হাজার টাকা মাত্র
যদি হয় না বালিকা, জুতা সায়া পড়লেই সাবালিকা
গোঁড়ালি চ্যাড়া নাবালিকাকে সাবালিকা বানায়
রেজিস্ট্রি অফিসের পিওন চুল ভরে পায়ের তলায়।

এই রকম বিভিন্ন গানের বিষয়ের সম্ভার এই গম্ভীরা গানে। রিপোর্টে-র গানগুলোতে নানাকে অর্থাৎ শিবকে সব সংবাদ দেওয়া হয়। এই পর্বের সঙ্গীতের মধ্যে বাক বিন্যাস, শব্দচয়ন এবং সুরের আলাদা ধরণ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন ধারা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সুরে গানগুলি পরিবেশিত হয়। ভাবাবেগের দ্বারা গীত-রচয়িতারা সঙ্গীত রচনা করেন না। বিষয়ের বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব বোঝানোর জন্য গায়করা সঙ্গীতকে সচেতন ভাবে নানা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে 'গম্ভীরা'-য় প্রকাশ করে থাকেন।

## তথ্যসূত্র


১। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস ঃ ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃ: ৫২৭, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারী ২০০৩।

২। ঐ, পৃ: ৫২৮

৩। বাংলার লোকনাট্য ঃ যৌথস্মৃতি ও সজীব সামর্থ্য, তুষার চট্টোপাধ্যায়, চতুষ্কোণ, পৃ: ১১৬, বৈশাখ, ১৩৮৩।

৪। A History of Ancient Greek Literature : Gilbert Murray, p. 205, Fredrick Unger Publishing Co., New York. 1967.

৫। Orientation to the Theatre : Theodore Hatlen, p. 4, Peter Owen, 1962.

৬। কোচবিহারের লোকনাটক ঃ দ্বিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ: ১৩, অনিমা প্রকাশনী, ১৪০৩।

৭। উত্তরবঙ্গে লোকশিক্ষা সম্প্রসারণে কুশান ও দোতরা গানের ভূমিকা ঃ অবতরণিকা — ডঃ রমেন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃ: ১

৮। বৈতানিক ঃ তরাইয়ের ত্রাণ লাহাংকারী গান — পরেশচন্দ্র রায়, পৃ: ১৬

৯। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত — ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ২৮১

১০। ভাওয়াইয়া ঃ সুখবিলাস বর্মা, পৃ: ২৪৫

১১। ঐ, পৃ: ২৮৯

১২। বৈতানিক ঃ তরাইয়ের প্রান লাহাংকারী গান, পরেশচন্দ্র রায়, পৃ: ১৫

১৩। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 'খন' গান ঃ খুশী সরকার, লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর, ২০০৩।

১৪। গম্ভীরা ঃ পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ২৭

১৫। ঐ, পৃ: ৩৩

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের ভাষা

লোকসাহিত্যকে বলা হয় সংহত সমাজের সৃষ্টি। তার ভাষা লোকসমাজে প্রচলিত কথ্য উপভাষা। যে উপভাষায় লোকসমাজ কথা বলে লোকসাহিত্য সেই উপভাষাতেই রচিত হয়। উচ্চতর সাহিত্যের ভাষা যেমন সর্বজনবোধ্য মান্য চলিত বা সাহিত্যিক সাধুরীতি, লোক সাহিত্যের তেমন ভাষাগত ভিন্নতা নেই। যে অঞ্চলে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি তারই ভাষা সেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। লোকমুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার কোনো প্রভেদ থাকে না। মানুষের মুখের ভাষায় তার প্রাণের কথা উচ্চারিত হয়। এর ফলে লোকসাহিত্যের মধ্যে যেমন অকৃত্রিম প্রাণাবেগ প্রকাশ পায় তেমনি তার আঞ্চলিক রূপের জন্যই তা সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে না। অঞ্চল বিশেষের সাহিত্য আঞ্চলিক রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সর্বজনবোধ্য সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। বিশেষ অঞ্চলের উচ্চারণরীতি কিংবা ভাষাপ্রয়োগের ফলে তার অর্থ অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয় না। তার আবেদন অনেকটাই স্থানিক হয়ে পড়ে।[১] বাক্যব্যাবহারগত বিশিষ্টতা, শব্দ প্রয়োগ এসবই নিতান্ত আঞ্চলিক রীতির হওয়ার ফলে — অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সহজে তার রসাবেদন গ্রহণকরাও সম্ভব হয় না। অবশ্য কখনো কখনো এই সাহিত্যের কিছু বিষয় আঞ্চলিকতার সীমা ছাপিয়ে ওঠে। প্রথমত কোনো অঞ্চলের বিশিষ্ট কোনো সাহিত্যরূপ অন্যান্য অঞ্চলে প্রচারিত হলে তার প্রতি মানুষের মনোযোগ ক্রমে আকৃষ্ট হয়। এই সাহিত্যরূপ যদি গান হয় তাহলে তার সুরের আবেদন মানুষকে প্রথমে মুগ্ধ করে। পরে সে তার শব্দ বা অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়। তখন আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে সাধারণের উচ্চারণের কাছাকাছি আসে, শব্দের ও বাক্য প্রয়োগের দিকগুলিও পরিস্ফুট হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে সুরের ভূমিকা আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ বা বাক্‌রীতিকে ডিঙিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু যেসব সাহিত্য কথা নির্ভর যে ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করা সহজ হয় না। লোকনাট্য প্রধানত কথা নির্ভর সাহিত্য যদিও সংগীতের ভূমিকা তাতে কম নেই। কিন্তু সঙ্গীত যেখানে নাট্যঘটনার সহায়ক নাট্য সংলাপের একটি রূপ। সংলাপ সেখানে কেবল কথায় বলা হয় না তা গানেও বলা হয়। কাজেই সঙ্গীত সেখানে মনোভাবের প্রকাশাত্মক নয় কাহিনীও ঘটনার প্রকাশের বাহন। এই কারণে লোকনাট্য কদাচ অঞ্চলের সীমা ছাড়িয়ে সর্বসাধারণের রসাবেদনের বাহন হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই তা সীমাবদ্ধ থাকে।

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলির প্রতিষ্ঠাভূমি বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়ানো। যে ভৌগোলিক সীমারেখাকে উত্তরবঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয় তার ভাষাও সর্বত্র একরকম নয়। তবু মোটের উপর লোকসমাজের ভাষার মধ্যে নৈকট্য

আছে। একথা ঠিক কোচবিহারের ভাষা আর পশ্চিমদিনাজপুরের ভাষার মধ্যে প্রয়োগগত বা উচ্চারণগত কিছু প্রভেদ আছে তবু তা বোধগম্যতার স্তর অতিক্রম করে যায় নি। তাই একই ভাষারীতি না হলেও তা বোধগম্যতার মধ্যে থাকায় এক অঞ্চলের লোক এই উত্তরবঙ্গেরই অন্য কোনো প্রান্তের লোকনাট্য উপভোগ করতে পারেন। এর সংলাপ বা সংগীত রস আস্বাদন করতে পারেন। বর্তমান আলোচনায় উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের ভাষার একটি সাধারণ রূপের আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত আঞ্চলিক প্রয়োগরীতিও প্রদর্শিত হবে।

উত্তরবঙ্গের লোক প্রচলিত ভাষায় মান্য চলিতের মতই স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। স্বরধ্বনিগুলির সংখ্যা একইরকম। যদিও তাদের ধ্বনিগত রূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা। অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও, — এই সাতটি স্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। হ্রস্ব দীর্ঘেরও কোনো ভেদ দেখা যায় না। যখন লোকনাট্যগুলি লিখিত আকারে সংগৃহীত হয় তখনই কেবল তার লেখ্যরূপ ধরা পড়ে। নতুবা লোকনাট্যগুলির কোনো লিখিত রূপ থাকেন না। সংগীতের ক্ষেত্রে কখনো কখনো উচ্চারণে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ বা প্লুতও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কথ্য ভাষায় দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ হয় না।

লোকনাট্যের ভাষার ধ্বনিগত রূপ ও তার উচ্চারণ বৈচিত্র্য দেখান হল।

'অ' —

বাংলায় এই ধ্বনিটির উচ্চারণ দু'রকমভাবে হয়। 'অ' এর সাধারণ উচ্চারণ ব্যতীত 'অ' 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হয়। 'অ'-এর স্বাভাবিক উচ্চারণ — 'ঘরত বোলে কিছুই নাই, এই একিনি ধান পানু, বস্তাটাসুদায় লিয়া আসিচু।" (লোভী জোতদার) "সনার বরণ গৌরচান কথায় গেলে পাব।" (রাজধারী)

'অ' 'ও' এর মতো উচ্চারিত হয় — "অকি (ওকি) বিধাতা কর্মদোষে হারাইলাম গুণের ভাই।" (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

প্রভাত > পোহাত, রমণী > রোমনি

অ-এর উচ্চারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উ হয়। যেমন জন > জুন

অ-এর উচ্চারণ আ হয় যেমন না হয় > না হায়

'আ'-ধ্বনির উচ্চারণ কখনো হ্রস্ব কখনো দীর্ঘতে পরিলক্ষিত হয়।

"আরে ভাই যাসু যাসু।... মোকে আরহ তোক টানিয়া আনিয়া লাগেচে।" (লোভী জোতদার)

আ > উ, আ > ধ্বনি অতে পরিণত, চেয়ার > চেয়র, বিধাতা > বিধুতা

'ই' এবং 'ঈ' এই দুই ধ্বনির মধ্যে বিশেষ কোনো ভেদরেখা টানা হয় না। তবে 'ই' ধ্বনিই সংগীতে বা সংলাপে দীর্ঘ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় এমনকি তা প্লুতস্বরে গিয়ে পরিণত হয়। "কি ব্যাপার কাকা আজি এত সাকাল সাকাল মোক ডাকায়া ধরিচিত। (লোভী জোতদার)

উ ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

'ঊ'-এর বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় না।

শিক্ষার কি মূল্য স্বামী ধন

কেমনে জানিবেন।

ওনা — কুমারশালে মাটি শুদ্ধ

জমিন শুদ্ধ হয় চাষ দিলে।

ও কখনো অ রূপে উচ্চারিত হয় যেমন — তোমরা > তমরা

'এ' ধ্বনির উচ্চারণ দুরকম — 'এ' এবং 'অ্যা'-এর মতো।

"টাকা ফেরত (এ-র মতো উচ্চারণ) দিলু না মোক অপমান কল্লু।"

"এত টাকা টাকার গরম। আইজ ফের বুঝি ('এ'র উচ্চারণ)।

'ও' ধ্বনির উচ্চারণ মান্য চলিতের মতো।

ও-হো ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতর। পুত্রশোকে বৈসে রাজা ভূমির উপর। (লক্ষ্মণের শক্তিশেল - কুশান)

ঐ/ঔ দ্বিস্বর ধ্বনি। ঐ - ওই - একই। 'ঔ' ধ্বনি মান্য চলিত বাংলা যেভাবে ব্যবহৃত হয় এখানে তার পরিবর্তে 'ঐ' ধ্বনির প্রয়োগ হয়।

গৌরব > গৈরব — সেহ সীতা না ভাজে শিরামের গৈরবে (রাজধারী)

চৌদিকে > চৈদিকে — চৈদিগে — চৈদিগে নাগর চৈদিগে সাগর তাহার মধ্যে ঘর (রাজধারী)

কৌশিল্যা > কৈশিল্যা — একবার কৈশিল্যার নন্দন হে প্রভু (রাজধারী)

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির প্রয়োগ মোটের উপর মান্য চলিতের মতো। কিছু ক্ষেত্রে তাদের ধ্বনিরূপের পরিবর্তন হয়।

'ক' ধ্বনির শব্দের মধ্যে কখনো কখনো 'গ' ধ্বনিতে পরিণত হয়।

সনার চাইলন সনা আনিলেন ধরেয়া

পুত্রবধূ বরে নেগায় জয় জোগার (জোকার) দিয়া" (বিষহরি)

'খ' ধ্বনি শব্দের মধ্যে প্রায়শই 'ক' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে আসে।

"দেইকতে দেইকতে, কতলা বচর সেলসেল করি চলি গেইল। মুই এবার নিজের বিয়াও নিজে করিম।' (কুমারী কাঞ্চনবালা)

ত থ দ ধ ন ধ্বনির উচ্চারণ মান্যচলিতের মতো।

শ ধ্বনির উচ্চারণই মুখ্য।

স এর উচ্চারণ দেখা যায় কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহারে।

''ভাসুরটা ঠিকেই কহিগেল। মোর মরদের কথা শুনিলে হবানাহা। ছায়া ছটাক খিলাইয়া দিয়া ইসকুলত পাঠাম।''

স - চ এ পরিণত যেমন কিস্কিন্ধা > কিচকিন্দা (রাম বনবাস)

'দুঃখ' এই জাতীয় শব্দকে ভেঙ্গে 'ক' এবং 'খ' কে পাশাপাশি করে উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা যায়। দোতরা পালা — 'আলম সাধু'-তে আয়েষার একটি গানের মধ্য দিয়ে এরূপ উচ্চারণ প্রকাশ পেয়েছে — ''মনে বড় দুকষরে মরা চিতে বড় দুকষ। তোর জন্য দেখিবার না পাঁও পর পুরুষের মুখ।''

'ক্ষ' এর উচ্চারণ কখনো 'ক' এর মতো আবার কখনো 'ক' এবং 'খ' পাশাপাশি উচ্চারিত।

পূর্বের উক্ত ঐ গানেরই শেষের লাইনে পাই

''তোক হারাচুং বাড়ী হারানু মাও জননী

তোর বাদে না ঝুরে মোর এক চোকের পানি।''

চেক্ষের > চোখের > চোকের (আলম সাধু)

'ক' এবং 'খ' পাশাপাশি থেকে উচ্চারিত শব্দ —

''চলো ঐ যে গ্রামটা দেখা যায় ঐটে কোনা

গিয়া পুঁছি, যদি তোমার কুমারের দেখা পাওয়া যায়। ফির ঐটেকোনা ভিকখাও মিলবে। (ভিক্ষা > ভিক্‌খা)

'ব' এর উচ্চারণ কিছু ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে 'প'-এর মতো যেমন — 'মোর মরণের খপরটা যেমন করি হউক জমিদার কৃষ্ণকান্তক দেইস বৈন।'' (কুমারী কাঞ্চনবালা)

ব — শব্দ মধ্যে গ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত যেমন যুবতী > জুগতী

ব > ভ-বেশ > ভেশ, ব > ফ-দেখবা > দেখফা, রবে > রোভে

নাসিক্য ধ্বনি মালদার লোকনাটক 'গম্ভীরা' ব্যতীত উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার লোকনাটকে অনুসানিক হতে দেখা যায় না।

''চাদের বচনে লেংগা করিল গমন

কর্মকারের গৃহে যাইয়া দিল দরশন।'' (বিষহরি)

আর একটি উদাহরণ দেখানো যেতে পারে যেখানে নাসিক্য ধ্বনি লুপ্ত হয়ে পার্শ্বতী ধ্বনিতে অনুনাসিক পরিণত করেনি।

''ও মুই আছোং কান্দিয়া

বাশীটা তোর ফেলাম ডাঙ্গে ভাংগিয়া।'' (চোর-চুন্নী পালাগান)

র ধ্বনি - অ যেমন রাবাণ > আবান

রান্ধিচে > আন্ধিচে

র ধ্বনি > ন হয়। রোদ > নোদ, রোবু > নোবু

র > ড় — দেরি > দেড়ি

শব্দের আদিতে ল — ন এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন "পোহাতে উঠি ডাকাডাকি নাগালেন। সূর্যঠাকুর নাল হবার ধরিচে।"

'য' এবং 'জ' — এই দুটির উচ্চারণ চলিত বাংলার মতো 'য' কে 'জ'-রূপেই উচ্চারণ করা হয়। রাজধারী লোকনাটকের কিছু চরিত্রের ভিত্তি দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থিত করা যেতে পারে।

"যত (জত) শক্তি আছে বেটা
তত শক্তি ধর।
আজিকার রণে বেটা
তোক পাঠাম যম (জম) ঘর।

ধ্বনি পরিবর্তন —

আদিস্বরাগম — শব্দের প্রথমেই স্বরধ্বনির অবস্থান।

যেমন — "নেখা-পড়া করিতে ইসকুলে (স্কুলে)
পাঠান সবে বাচ্চাগণ।"

মধ্যস্বরাগম —

সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরধ্বনির আগমন লোকনাটকের বহু সংলাপে রয়েছে। যেমন পূর্ব পুরব, শত্রুঘ্ন শত্রুঘন

যদি মোর নাম বংশ ধরম (ধর্ম) আকির চাইস তাহইলে তুই ঐ কতা ভুলি যা।"

অপিনিহিতি — "কর্ত্তা বাবু, আপনি সত্য সত্যই কি এই দ্যাশ ছাইড়া চইলা যাবেন ? (কুমারী কাঞ্চনবালা)

রাক্ষস > রাইক্কস 'ধরিল রাইক্কস মূর্তি। (রাজধারী)

সংকলিত লোকনাটকগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। 'রাজধারী' লোকনাটক থেকে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে —

বাবুরে > বাপফুরে, যুবতী > জুগতী, বেশ > ভেস, অরণ্য > অরণ, রমণী > রোমনি, আযোদ্ধা > অযুতা

আদিস্বর লোপ — আছে > ছে, আছিস > ছিস

আদিব্যঞ্জন লোপ — রান্ধি > আন্ধি, প্রভাত > পোহাত

অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ — অরণ্য > অরণ, মৃত্যু > মিতু, অযোধ্যা > অজুতা, তপস্বী > তপসি

**ব্যাকরণ —**

কারক বিভক্তি — কারক বিভক্তিতে উত্তরবাংলার লোকনাটকে ব্যবহৃত বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত বিভক্তিগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

"তলোয়ার হস্তে রহিম টং থাকি নামে।" (আলম সাধু, দোতরা পালা)

'রহিম' কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি

'টং থাকি' (টং হতে) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি

'সীতাক লয়ে রাবণ যবে অশোক বনে গেলো।' (রাজধারী)

সীতাক — অক প্রাণীবাচক কর্মে 'অক' বিভক্তি।

প্রথমে যে হইলো বীরের মোর মুখরে গালাগালি। (রাজধারী)

মুখরে — মুখের দ্বারা — করণ কারকে 'দ্বারা' বিভক্তি।

সরবাংগে জ্বলে গেলো মোর অগ্নি দিল গায় (রাজধারী)

গায় > গায়ে — অধিকরণে 'য়' বিভক্তি।

সর্বদানা ফল বৃক্ষের সময়তে ফলে। (রাজধারী)

বৃক্ষের সম্বন্ধ পদ।

ওরে কুঠে হাতে আনিলো জামাই সাদা পাগেলা। (চোর-চুন্নী)

"আগুনের চায়া গরম আরো কেবা।

দুধের চায়া আরো কেবা সাদা।" (শাস্তরী)

ক্রিয়ার কাল —

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ — এই তিনটি কালের ব্যবহার লোকনাটকগুলির সংলাপের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান কাল — সাধারণ বর্তমানের উদাহরণ দেখানো যেতে পারে। যথা — এই বেটিডাক লিয়ায় বা মোর সংসার। মুই বাপের একেনায় বেটা। (লোভী জোতদার)

"আরে ভাই, যাসু যাসু।" — ঘটমান বর্তমান। (লোভী জোতদার)

"খোব আদরে যতনে মানষি হইচু" — পুরাঘটিত বর্তমান (লোভী জোতদার)

"আইসো আইসো ভাই মোরে

বস রত্ন সিংহাসনে

ত্রিফুল তামাকু মোরে

করহ ভক্ষণরে ভাই বিভীষণ।'' — বর্তমানের অনুজ্ঞার ভাব। (রাজধারী)

অতীত কাল — বড়য় আশা করিয়া বাপটা মোক বেহা থুয়া দিয়া নয়া বহুডার হাতে ভাত শাক নান্ধা খায়া স্বর্গে চলিয়া গেইল। — সাধারণ অতীত। (লোভী জোতদার)

''এই জোতদারীর ভারটা লিবার তানে মুইও একটা বেটা আশা করিসিনু'' — পুরাঘটিত অতীত (লোভী জোতদার)

''জননীর উদরে ছিলাম উত্তর শিয়র করি'' — নিত্যবৃত্ত অতীত (শাস্তরী)

''সত্যযুগে ছিলো নরসিংহ অবতার, গোলকের হরি হিরণ্যকশপ সাংহার করি।'' নিত্যবৃত্ত অতীত (শাস্তরী)

ভবিষ্যৎকাল —

''কায় জানে, অয় এতখান চালাকি করিবে।'' — সাধারণ ভবিষ্যৎ (কুমারী কাঞ্চনবালা)

''যতদিন কুমায়ক পাওয়া না যায় ততদিন উয়ার বাচায় খাবে।'' (বেঁচে থাকতে হবে) ঘটমান ভবিষ্যৎ (কুমারী কাঞ্চনবালা)

''মোক উয়ার অচিনা হয়ায় থাকা হবে।'' (ঘটমান ভবিষ্যৎ)

''এইঠে হামার পরিচয় দিবা লাগে'' — ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

মোর বাপটাক আজি জেহেল হাতে ছুটায় আনবা হোবে। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (লোভী জোতদার)

**সর্বনাম —**

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম-তুইত ভাই তামানে জানিস, আজি তোর ভাজি মরিবার বার-তের বছর হয় গেল।

তোমহা মরদ লোকলা কেনং সাটাং সাটাং করে বেড়াবে লাগে। তুই মোক পিটায় ঝাটায় আনিবো কি ?

নির্দেশক সর্বনাম — এই চেংরাডার মাও হামার ঘরত আসিবার কথা। এ বাউ তুই চুপ করি রভো। তাহলে ঐলা কিন্তু মোক দিবা হোবে।

অনির্দেশক সর্বনাম — বাবা এতয় দুঃখ দিলেনগে অন্তরে। অক কিছু টাকা পাইসা দিয়া দিসু অয় যাহাতে চুপ করি চলি যায়।

প্রশ্নবাচক সর্বনাম — কায় জানে, উয়ায় এতখান চালাকি করিবে ? আরে কার বেটা ঐডা দেখিবুতো ?

সংযোগবাচক সর্বনাম — মুই ভগবানটাক আরাধনা করেচু হামার গিরিদারা যেন আরহ গিরি হয়।

সাপেক্ষ সর্বনাম — তুই এলায় যেইঠে একা আসিলো সেইঠে ঘুরিয়া যা।

আত্মবোধক সর্বনাম — আরে মুই দেখিয়া আসিনু নিজের চোখে।

(উদাহরণগুলো 'লোভী জোতদার' পালা নাটক থেকে দেখানো হলো)

লোকনাটগুলোতে অব্যয়ের ব্যবহার —

ওহে রাম বন্দু

হে রাম বন্দু

ওরে মুনি হে

ওগো পিতা লংকেশ্বর

ওকিও মুনি ঠাকুর

ওই মন মানে না গো

আহা হারে মুখ মেলে রাইকষনি

এহে সারথি

গে সর্বনাখা

আরে তুই কে পরিচয় দে।

আরহার সনার হার মংগাইয়া প্রভু।

উহু মুই বুঝবানি পামু

ইহি ভগ্নি সর্বনাখা

অঃ ভাইরে চুসন

(রাজধারী লোকনাটকে ব্যবহৃত অব্যয় পদ)

ওগে নারী হইলো ভাই মায়ার কড়ি।

ওগে হাউস করিয়া যাবার চাছো।

ওগো এলাও কি তুই আছিস নয়া নদারি।

ও তুই চট করিয়া জল ভরিয়া কলসি নেক কাঁখে।

ওরে কি কহিম আর দুঃখের কথা।

যদি চরা না দিবো দেখা।

আর বুঝি মোর প্রাণ বাঁচেনা।

ওরে প্রেম পিপাস তোর গে চুন্নী। ('চোর-চুন্নী' পালাগানে ব্যবহৃত অব্যয়পদ)

আরে এটা একটা ঝগড়া হইল।

হারে এটা তো নুকুনের কথা কহছেন।

যাইতে এক, আসতে দুই

বুঝিমো গে স্বামী, তুই আর মুই।

তোর মাথাত বুদ্ধি আছে রে, ঠিক কহচিস।

ধূপ না লাগি লগি

মুই গেনু বৃক্ষ লাগি

সেই পত্র ঝড়ে পড়েরে

ওহোরে বিধাতা।

('নটুয়া' পালাগানে ব্যবহৃত অব্যয় পদ)

লোকনাটকগুলোতে বাক্যের মধ্যে শব্দদ্বৈতের অর্থ অনুধাবন করতে না পারলে নাটকের চরিত্রগুলির উক্তির মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিছু শব্দদ্বৈতের ব্যবহার দেখানো যেতে পারে —

হে তোর ধাইধাই করে দিছে নাকটা

হোংহোং শব্দেরে গিয়ান প্রেম ওরে ধারা

আরে দিম্‌দিম্‌ তিরসিরা বীর সাজিলরে

ওইযে সাল মুলমুষল বীরের মোর। ('রাজধারী' লোকনাটকে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত)

ভাগে ভাগে দেয় দেখা, দেখ বিষম কালের চাকা

মুই বায়রত দিনু পাও

মাথার উপরা জিটি করে টেঁও টেঁও। ('আলম সাধু' - দোতরা পালায় ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত)

আজস্র শব্দদ্বৈতের ব্যবহার সমগ্র লোকনাটক জুড়ে আছে। এই শব্দগুলোর অধিকাংশই চলিত বাংলা শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। আসলে উত্তরবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে এগুলো রয়ে গেছে। এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বিহার, আসাম, নেপাল এবং ভূটানের দক্ষিণাংশের অনেক দেশী-বিদেশী শব্দ এসে আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন পালা নাটক ধরে উদাহরণ সহযোগে তা দেখানো যতে পারে।

ভাট পালায় ভাটিয়া পালায় চণ্ডাল পালায় হাড়ি।

ঘরের ভিতর যুক্তি করে গাভুর গাভুর আড়ি। (বিষহরি)

আরে রন্ধন করিতে গেল বেহুলা সুন্দরী

তিনটা নারিকেল লইয়া করে টিহ্‌রি। (বিষহরি)

ও কইন্যা ধামনা বসন্তের বেলা

দুই চকখু হইয়াছে ঢেলা। (বিষহরি)

জলের উপর ভুরা টলমল করে

দূর হইতে শঙ্খ সাধু ভুরা দৃষ্টি করে। (বিষহরি)

আমার মনোত কোন কথা

উয়্যার খালি ব্যাড়বেড়ী আর ব্যাড়বেড়ি। (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

আরে দোয়ারী তোমার কান আছে নারে ? (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

শিদল ভুকাইম, শালা জমিদারের ঠ্যাং চাটা কুকুর। (কুমারী কাঞ্চনবালা)

ঐ ময়ালে দেখবু একটা মস্ত বড় টং ঐটায়

তোর দাদার ডেরা। (আলম সাধু)

দাড়ি ছুলবুল মুখ ভাকুরা

কাহাসে যাবোরে বন ঠাকুর' (নটুয়া)

ওগে যেইদিনা মুই করো মনে

ধরিস ফেকেনা (চোর-চুন্নী)

ওরে ঝাংগাউ ঝাংগাউ করে দেহা

যেলায় পড়ে ফম রে। (চোর-চুন্নী)

ওগো বড়লোকের মাইয়ার মতন।

শাড়ী পিন্দাম নানান মতন। (চোর-চুন্নী)

চুন্নী যেমন তোর শুয়াতি মাও

ঝঙ্গার ঝঙ্গার করে

আজ ডাঙ্গেয়া ফাটেয়া গাও (চোর-চুন্নী)

লোকনাটকগুলোতে তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দের আগমন ঘটেছে।

তৎসম শব্দের উদাহরণ — সরস্বতী, ভগবতী, চন্দ্র, হস্ত, পঞ্চ, পুষ্প, গর্ভবতী, নিদ্রা, আকাশ, বাতাস, পিতৃসত্য ইত্যাদি বহু তৎসম শব্দ যা কি না সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলার লোকনাটকে চলে এসেছে।

অর্ধতৎসম — লোনাট্যের ভেতরে সংলাপগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অর্ধতৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার।

পরণাম — প্রণাম > পরনাম

শাংঙ্খা — শঙ্খ > শাংঙ্খা

পরভু — প্রভু > পরভু

সেন্দুর — সিন্দুর > সেন্দুর

বিন্দাবন — বৃন্দাবন > বিন্দাবন।

কান্দন — ক্রন্দন > কান্দন।

আন্ধার — অন্ধকার > আন্ধার

তৎভব শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

শিয়াল — শৃগাল > শিয়াল

চুর — চূর্ণ > চুর

সোয়ামী — স্বামী > সোয়ামী

দেশী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ করি। ডোর, ময়াল, ফাফর, এলুয়া, কাশিয়া, ডেরা, জিটি, ফাওফ্যাচাল, ডাবরি, চেওয়ারী, ঝিয়ারী ইত্যাদি

বিদেশী শব্দ — ভুইচাল, বেটি, বাপু, নিকলনা মুরগা, ইত্যাদি শব্দগুলি হিন্দি থেকে এসেছে।

এছাড়াও একেবারে কিছু অঞ্চলগত শব্দ আছে — যা কি না বিশেষ লোকায়ত সমাজে প্রচলিত। এই শব্দগুলোর মধ্যে কিছু উদাহরণ সহযোগে তোলা হলো — নিয়র, চ্যাংরা, কাগা, ঝেচই (পাখী), দোয়ারী, ফাওফ্যাচাল, ডারাইস, আউকটা, মঞ্জুস, মারেয়া, গাভুর, ঢেনা, টিকর, ডারিকা, আহেলা, চেহর, ছাম, চুরা বাউ, ডাঙ্গুয়া, আচাংচা, ফেকেনা, দুরদুরি ইত্যাদি আরো প্রচুর শব্দ লোকনাটকে দেখা যায়। লোকনাটকের সংলাপে ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য — 'রাজধারী' লোকনাটকে সংলাপের ব্যবহারের পদ্যাকারে সংলাপের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার সাধারণ চরিত্রগুলি যখন কথা বলেন তখন গদ্যের ব্যবহারই লক্ষ করা যায়। লক্ষ করা যেতে পারে —

বড় বৌ — এ মাই তোক কুনো কহে গিছে ?

ছোট বৌ — মোক কুনেনি কহেগে বাই।

বড়বৌ — দাদাগে দাদ হামার বাপটা তমহার এইতি আইচি না কি গে, তমহা কাহো কভা পারবেন ?

সারথি — কায়, উলাতো মাই তমহার বাপটা খোব বেহানে হামার এই পাকে গিছে।

কখনো কখনো প্রধান চরিত্রগুলি গদ্য কথপোকথনের মধ্য দিয়ে পদ্যাকারের সংলাপে প্রবেশ করেন।

সূর্পনখা (গদ্যরূপে) — গে রাবণদাদা, হা মোর নাকটা কাটিয়া লিছে গে হে রাবণদাদা হা।

রাবণ (গদ্যরূপে) — ইহি ভগ্নী সর্বনাখা, এ দুঃখদশা তোর কে করেছে। সে তুমি প্রকাশ করে বলো রে।

সূর্পনখা (পদ্যরূপে) — ফুল তুলিতে গিসনু দাদা
পঞ্চবটির বনে
ধরিয়া নাক কান

কাটিছে শিরামের ভাই

অনুজ লক্ষ্মণে।

চরিত্রের সংলাপের মধ্যে পদ্যের প্রাধান্যই বেশী।

উত্তরদিনাজপুরের 'খন' লোকনাটক সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে রচিত হয়। এলাকার চলমান ভাষার কথপোকথন গদ্যের আকারে প্রকাশ পায়। বক্তব্যের প্রকাশ সঙ্গীত দিয়ে যখন হয় তখনই ছন্দের মিল পাওয়া যায়।

লক্ষ করা যেতে পারে —

বেঙ্গু — হে সবুজদা। খবর খুবই ভাল। এই যে বাড়ি বাড়ি যাই খবর নিহি কাহার বেটাবেটি ইস্কুলে যায় কাহার যায় নি। তাতে ভাল কাম হইলে — একুন সবাই বেটা-বেটি স্কুল পাঠায়।

এই সময় একজন গান করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করেন —

শুনেন শুনেন দাদাগণ

শুনেন শুনেন বৌদিগণ

নেখা-পরা করিতে ইস্কুলে

পাঠান সবে বাচ্চাগণ।

লোকনাটকে চরিত্রানুযায়ী ভাষার ব্যবহার দেখা যেতে পারে —

'আলম সাধু' দোতরা পালায় বেগম এবং আয়েষার সংলাপ উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গদ্য সংলাপ শেষ না হতে হতে পদ্যের সংলাপ শুরু হয়। আবার প্রয়োজনমত গানের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়।

বেগম — দেখ মা, তোক দেখামাত্র রহিম কাটি ফেলাইবে। যদি বাচির চাইস, দাদা-দাদা বলিয়া কেবার কমর জাড়েয়া ধরিলে আর মারির পাবে না। না হইলে তোর মরণ।

আয়ষা — ঠিক আছে মা।

বেগম — দেখ মা আয়ষা, ওই যে ঘোর বনের উপর কেটা বড় গছ দেখা যায় তার ঐ পাড়ে তোর দাদা আছে। ঐ ময়ালে দেখবু একটা মস্ত বড় টং। ঐটায় তোর দাদার ডেরা।

পয়ার — হায়রে, রহিল বেগম সেথা আয়ষা চলিল।

অনেক দূরও যাইয়া আয়ষা উপনীত হইল।

দাদা দাদা বলিয়া আয়ষা পাড়ে ঘন ডাক।

জাগিল নিদ্রার কত হাতী ঘোড়া বাঘ।
গহন বনে শুনে রহিম নারী কণ্ঠস্বর।
এক লম্ফে উঠে রহিম টংগের উপর।।
দাদা বলিয়া আয়ষা রহিম পানে ধায়।
টংএর নিকট গিয়া আয়ষা দাদা পানে চায়।
কে ডাকে দাদা বলি ঘোর বন মাঝারে।
তলোয়ার হস্তে রহিম টং থাকিয়া নামে।

নাটকে চরিত্রের স্বভাব ও কর্মের সঙ্গে মানানসই হয়ে আছে তাঁদের সংলাপ।

ধাইমার সংলাপ —

ধাইমা — বাপরে বাপ মুই যখন আসি পুচ্ছুং আর ভয় কিসের। রাণীমা, তোমার শাড়ীখান মুই গিন্দিয়া তোমার নিদান তড়াইম। আর ঐ শাড়ীখানত যত রাজ্যের পংখী-পয়াল দেকং, ওগিলা মোক ভাঙ্গি কনতো ?

লোকায়ত ভাষায় ধাইমার সংলাপ। যে স্তর থেকে তিনি উঠে এসেছেন সেই স্তরের ভাষা তাঁর শরীর ও মননে গেঁথে রয়েছে।

পাশাপাশি এই পালা নাটকে গাটু নাপিতের সংলাপ একঝলক দেখে নেওয়া যায় —

আয়েষার প্রতি গাটুর উক্তি — জঙ্গলে থাকির লাগিবে না। জাগীরাম বাদশা নিজে মোক ঘটক করিয়া পাঠাইছে। এলাখালি তোমার মতামত বাকি। বাদশা যে তোমাক কোনটে রাখিবে... কন কন তাড়াতাড়ি কয়া ফেলান।

ধূর্ত চরিত্র গাটু নাপিতের কথার ভেতরে রয়েছে কৌশল। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ ফুটে উঠেছে। 'রাম বনবাস' পালা নাটকেও দেখা যাচ্ছে চরিত্রগুলি পদ্যের আকারে কথা বলতে বলতে গদ্য-সংলাপে ঢুকে যাচ্ছে। যেমন —

রাম — শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে যাব আমি বন।
পিতা-মাতা ভাইসহ থাক একস্থানে।
চৌদ্দ বৎসরের জন্য যাব আমি ঐ অরণ্য কাননে।

লক্ষ্মণ — শোন দাদা আমার বচন।

আপনার সঙ্গে আমিও যাব বন।

রাম — ভাইরে লক্ষ্মণ, সত্যিই কি যাবি তুই আমার সাথে পিতৃসত্য পালন করিতে...।

আবার মূল গায়কও কাহিনীকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনমত গদ্য-সংলাপ ব্যবহার করছেন —

মূল গায়ক — বানরের রাজ দুই ভাই কিষ্কিন্ধ্যানগরে সুগ্রীব মেরে বালী বসেন সিংহাসনে।

একই সংলাপের মধ্যে পদ্য ও গদ্যের মিশ্রিত রূপটিও দেখা যায়।

বালী — শোন ভাই সুগ্রীব আমার বচন। আজি নিশীথে দেখিলাম সুস্বপন। কোথাকার দানব এসে আমার ঐ মধুবন ভেঙ্গে চুরমার করেছে। সেই দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাব ভাই দুইজন।

'নটুয়া' লোকনাট্যকে বাঁধা বা 'শ্লোক' ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। শ্লোকগুলোকে যাকে এলাকার লোকভাষায় 'ফাকড়ি' বলে তা শিল্পগুণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার দেখা যায় — যা কি না সীমিত এলাকার মধ্যেই প্রচলিত। সেই লোক-সমাজের কাছে 'ফাকড়ি'-কে বিশ্লেষণ করে তার অর্থ উদ্ধার করা হলে বেশ পরিতৃপ্তি আসে।

১। উপরেতে আং সাং
ভিতরে জাবরা
তলপাখে পাছাটা
উপরপাখে ডিমাটা

২। আবরান্তি জাবরান্তি
ভিজান্তি গাও
ধাপোত বসিয়া অন্ছোঁ মুই
মূলের মাও

৩। ঠাকুরঝি ভিটিস কইরলো কি
আখাত ছবা দিচু কাঁসলের বিচি
দুই একটা মাথা হামর ভিতি
এই জুয়াই বেটা
ওখান মোর বাও
তোমার যদি ওখান বাও।
তাহলে তোমরা খাও

৪। চ্যাংরাগুলাক উঠায়ে দেও।
আর বুড়াগুলাক ভুকায়ে দেও।

৫। শালবাড়ীত ছিল বীরটা
য্যালা ধরিল বীরটা
বেটি ছাওয়ার পাছ
স্যালা বীরটা ফুকুরদুম ফাকাশ।

৬। ট্যাংনা গিদায় গীত
দরই মাছের নাচন দেখি
ওংগি না পায় থির
শোল মাছের গিবির গাবার
শাল মাছের হুরা
মাথা সঠকায়ে দিচে
পানির তলের দুরা।

৭। আরোয়ার ব্যাটা জারোয়া
কিবা আনলো ঘরে
খরবর খরবর করে
ছোয়া পালালো ডরে
মোর আইছে জ্বরে।

লোকায়ত শব্দ দিয়ে তৈরী শ্লোকগুলির ব্যবহার পালানাটকটিতে দেখা যায়

বিভিন্ন পালানাটক আলোচনা করে লোকনাটকের ভাষার ব্যবহারের রীতি আলোচনা করে দেখানো হলো।

## তথ্যসূত্র

১। লোকসাহিত্য ও লোকভাষা : সংযোগ সমস্যা, সনৎকুমার মিত্র, দ্রষ্টব্য : বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান, পৃ:১৪৮

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে লোকজীবন

আমাদের নির্ধাচিত সংকলনে স্থান পেয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোকনাটক। এই লোকনাটকগুলিকে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের দর্পণ। মহাকাব্য, পুরাণ, লৌকিক, কাল্পনিক ও বর্তমান — বিষয়ের কিছুর কাহিনীকে অবলম্বন করে তৈরী এই সলক লোকনাটক। প্রত্যেকটি লোকনাটকে দেখা যায় লোকজীবনের ছাপ। বলা বাহুল্য কাহিনীগুলো লোকায়ত সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোচবিহারের 'কুশান' লোকনাটক রামায়ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে তৈরী। দোয়ারী বা বৈরাগী সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে কথা বলেন। তখন সেখানে ফুটে ওঠে লোকজীবনের ছবি। কুশান নাটকে দোয়ারী বা বৈরাগী রাবণের মামা কালনেমি সেজে লঙ্কার অর্দ্ধেক ভাগের পরিকল্পনা করছেন—

"হা-হা-হা বেটা ঠিকে কুম্ভীরাণীর প্যাটোত গেইচে। কেমন বেটা ঘরপোড়া (হনুমান)। হা-হা-হা, যাঁও এ্যালা মুই রাবণের গোচর। লঙ্কা অর্দ্ধ ভাগ করি লইব সত্বর। দড়ি ধরি লইব ভাগ উত্তর দক্ষিণে। পূর্ব দিকে লব ভাগ না যাব পশ্চিমে। রাণীগণ আছে যত স্বর্ণ বিদ্যাধরী। তার অর্দ্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী।"

লঙ্কা সাম্রাজ্য দড়ি দিয়ে ভাগ করা সম্ভব নয়। আসলে পারিবারিক জীবনের সম্পত্তির ভাগ বুঝে নেওয়ার কথা কালনেমির উক্তিতে মেলে। কালনেমি তখন লঙ্কা-অধিপতি রাবণের মামা নন। 'কুশান' পালানাটকের চারদিকের মানুষের সাধারণ প্রতিনিধি মাত্র। ঠিক এরকম আমরা দেখতে পাই 'রাজধারী' লোকনাটকে। কালনেমি এখানেও দড়ি দিয়ে লঙ্কা ভাগ করে নিতে চান। পাট দিয়ে তৈরী হয় দড়ি। শুধু পাট নয় দেখতে পাই তামাকের ব্যবহার 'রাজধারীতে'। মারীচ রাবণকে তামাক সেবন করতে বলেছেন।

মারীচ — "ইহি ভাগিনারে দশানন। আইস আইস ভাগিনা বস রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণ রে।"

আবার রাবণ তরণী সেনকেও একই কথা বলছেন। তরণী সেনকে যুদ্ধে পাঠানোর সময় রাবণের কথা — "ওরে পুত্র মোরে তরণী আইস আইস পুত্র মোরে বইস রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণে পুত্র মোরে তরণী।"

উত্তরবাংলার কোচবিহার জেলা তামাক চাষের জন্য বিখ্যাত। পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি এবং খড়িবাড়ীতেও এর প্রচলন। কৃষকদের বাড়ীতে কলাগাছের চাষ নানা কারণে করা হয়। পূজাপার্বণ, খাদ্য এবং বাজারে বিক্রির

জন্য কলা চাষ দেখা যায়। আবার এই এলাকায় কলাগাছ পুড়িয়ে ক্ষার তৈরী করা হয়। লবণের বিকল্প হিসাবে ক্ষারের ব্যবহারের প্রচলন এক সময়ে ছিলো। 'বিষহরি' লোকনাটকে চাঁদ তাই তাঁর বাগানের কলাগাছ নষ্ট করতে চান না। চাঁদের চরিত্রে গ্রামের কৃষিজীবী যে মানুষ অভিনয় করতেন তাঁর মুখ দিয়ে লোকজীবনের সত্যরূপটি ধরা পড়েছে —

কেলা বেচাম আনা আনা
মচকা দেড় বুড়ি
তাক খায়া বাচিম হামরা
দুই বুড়াবুড়ি
বুড়া হমো বৃদ্ধ হমে'
লবণ কোথায় পামো
পুড়িয়া কেলার মুড়া তাকে 'ক্ষার'খামো।

কলাগাছ এবং কলাপাতা উভয়েরই বিভিন্ন পূজা-পার্বণে যথেষ্ট প্রয়োজন। বাস্তু পূজাতে কলাগাছের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায় — "বাস্তু ঠাকুরের থানের সম্মুখে চারিটি, প্রতিঘরের দরজার সম্মুখে দুইটি, দেবস্থানগুলির প্রত্যেকটি ঘরের সম্মুখে দুইটি করিয়া কলার গাছ পুঁতিয়া মাটি সুন্দরভাবে লেপিয়া দেওয়া হয়।"[১]

কৃষকদের ফসল উৎপন্নের কথাই শুধু নয়। গ্রামের কারিগর যাঁরা আছেন যাঁদের রুরাল আর্টিসান বলা হয় তাঁদের তৈরী শিল্প-দ্রব্যের কথা বলা দরকার। খড়িবাড়ী নকশাল বাড়ী অঞ্চলে রাজধারী পালানাটকের মুখোশ তৈরী গ্রামীণ কুটীর শিল্পে পরিণত হয়েছে। 'রাজধারী'তে রাবণের দশমাথাসহ লংকার সবচরিত্রগুলির মুখোশ রয়েছে। এ-গুলি তৈরী করার জন্য গ্রামীণ শিল্পীরাই নিয়োজিত। পাশাপাশি এই মুখোশগুলোকে আলাদাভাবে বিক্রিরও ব্যবস্থা থাকে। শাড়ীতে নানারকমের পাখীর ছবি আঁকতেন তাঁত শিল্পীরা। দোতরা পালা 'আলম সাধুতে' এরকম কথা 'ধাইমা'র কাছে শুনতে পাই —

"বেগমকে ধাইমা বলছেন —
তোমার ঐ শাড়িখান পিন্দিয়া
মুই তোমার নিদান তড়াইম।
আর ঐ শাড়িখানত যত রাজ্যের পংখী পয়াল দেকং মোক ভাঙ্গি কনতো।"

ঘর-বাড়ী তৈরীতে বাঁশের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। 'আলম সাধু লোকনাটকে' রহিম 'টং'-এ (উঁচু তক্তপোশে) ঘুমোচ্ছেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষরা এই 'টং' তৈরী করে থাকেন।

— 'গহন বনে শুনে রহিম নারী কণ্ঠস্বর।
এক লম্ফ উঠে রহিম টংগের উপর।
দাদা দাদা বলিয়া আয়ষা রহিম পানে ধায়।
টং-এর নিকটে গিয়া আয়ষা দাদা পানে চায়।
কে ডাকে দাদা বলি ঘোর বন মাঝারে
তলোয়ার হস্তে রহিম টং থাকিয়া নামে।

বাঁশের ব্যবহার শুধু ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে নয়, বাঁশকে মর্যাদা সহকারে মদনদেবতার প্রতীক হিসেবে উত্তরবঙ্গে পূজা করা হয়। এ কথা জানতে পারি যে "চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে রতির দেবতা মদনকাম পূজা উপলক্ষে লম্বা লম্বা (২০ ফুট থেকে ২৫ ফুট) বাঁশের মাথায় চাম: বেঁধে বাঁশগুলোকে লালশালু কাপড়ে মুড়িয়ে তুলসী তলায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কোথাও বা বাড়ির বাইরের উঠোনে এই বাঁশ প্রোথিত করে পূজো দেওয়া হয়"।[২]

'রাজধারী' লোকনাটকে রাবণের সিংহাসন বাঁশ দিয়ে উঁচু ক.রে তৈরী করা হয়। অতি দরিদ্র মানুষের ঘরে বাঁশ যেমন প্রয়োজন গ্রামের ধনীলোকের বাড়ীতেও বাঁশ ঠিক তেমনি প্রয়োজন।

'বিষহরি পালায় বেহুলার কথায় গোদার বাড়ীর বর্ণনায় বাঁশের বেড়ার কথা আছে। সেই বর্ণনাতে গোদার শ্রেণী-চরিত্রও ফুটে উঠেছে। বেহুলার কথা — 'ও গোদা বলতো তোমার বাড়িটা কেমন।'

উত্তরে গোদা বলেন — "ও কন্যা চার পাকে নাই চাটি মাঝিয়াত নাই মাটি। ও কন্যা থাকিয়া মুই দেকং স্বর্গের তারা হে।

'চাটি' অর্থে বাঁশ দিয়ে তৈরী হাল্কা বেড়াকে বোঝায়। গোদার ঘরের মেঝেতে উঁচু করে মাটি তোলাও হয়নি। প্রান্তিক চরিত্র। তাঁর মাছ ধরার জাল নেই। ছিপ দিয়ে মাছ ধরেন। তাই বিক্রি করে বৌ-এর জন্য শাঁখা কিনে নিয়ে যান। গীতের মধ্যে সেই কথাই পাই —

"ন কাহন ছিপ গোদার ছালা খানেক সুতা আর ন কাহন ফলিতা।
গোদার বড় ঠাটরে গোদার বড় ঘাট।
মাওগের পাটানী গোদা টেরিয়া বান্ধে পাক।
হাড়িয়া খলই লইল গোদা কমরে বান্ধিয়া।
মৎস মারিতে চলে গোদা ত্রিপানী লাগিয়া।
প্রথমে গাথিয়া দিল ডাং বোল্লার টোপ।
সাগরে চান্দা মাছ খায় গোটা গোটা।
শাল শোল মারে গোদা ডাঙাতে ফেলায়।

আহেলা ডারিকা মারে গোদা খলইতে ভরায়।

শাল শোল মৎস খাইতে বড় মজা।

আহেলা ডারিকা বেচয়া হাতের কিনে শাঁখা।''

খাল-বিল-নদী জলাশয়ের মাছগুলির নাম পরিচিতি লোকায়ত ভাবে চলে এসেছে। মাছের নাম দিয়ে অসংখ্য গ্রামের নাম রয়েছে। শোলমারি, বোয়ালমারি, শালবাড়ী, ডারিকা মারি — গ্রামের এই নামগুলি এক সময় মাছের প্রাচুর্য্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'নটুয়া' পালার একটা চালু কথা বা ফাকড়ীতে মাছের কথা পাই —

'ঠনা বোলায় ব্যানা,

ট্যাংনা গীদায় গীত

দরই মাছের নাচন দেখি

ওংগি না পায় থির।

শোল মাছের গিবির গাবার

শাল মাছের হুরা

মাথা সটকায় দিচে

পানির তলের দুরা।'

খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় ছোট-বড় সব মাছই দেখা যায়। 'বিষহরি' লোকনাটকে বাসর ঘরে বেহুলা রান্না করেন।

'প্রথমেতে আন্ধে বালি শাক-সুগ বরা ভাজা।

চুচুরা মৎস আন্ধে বালি দিয়া বাঁশের গাজা।

রন্ধন আন্ধে সুন্দরী রন্ধনের জানে ভাও।

ঘৃতেতে ভাজিয়া তোলে কৌতরের ছাও।

রন্ধন আন্ধে সুন্দরী কানের নড়ে সনা।

তৈলতে ভাজিয়া তোলে শলমাছের পহনা।

নদীর খাটিয়া মৎস বেছে হালী হালী।

তাক দিয়ে আন্ধে বালি কোয়াসের জালি।

বোয়ালী মৎস আন্ধে তার নিকিলায় কোল।

অধ্যেক করে খাটা অধ্যেক করে ঝোল

বানিয়ার বৌ বানিয়ার বৌ রন্ধন ভাল জানে।

চেং মাছ পুড়িয়া বালি জামুরী দিয়া সানে।

বোয়াল মাছ, চ্যাং মাছ কিংবা শোল মাছের 'পোনা'-র কথাই নয়, খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় উঠে এসেছে লোক-সমাজের আরো খাদ্যের কথা। কচি বাঁশের মাথা থেকে গজিয়ে ওঠা সাদা অংশ এলাকার মানুষের সুস্বাদু খাবার। কবুতর বা পায়রার মাংস, কলাইয়ের বড়া ভাজা, লেবুর রস দিয়ে পোড়া চ্যাং মাছের সানা — সবই উঠে এসেছে বেহুলার রান্নায়। ধনপতি চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা এখানে বাসরঘরে কৃষক বধূ হয়েই রান্না করেন। তখন দেখা যায় এই লৌকিক জীবনের ছবি। আবার অভাবগ্রস্ত মহিলার খাবারের বস্তু দেখা যায় 'চোর-চুন্নী' পালা নাটকে। অভাবের ফলে চোরের স্ত্রী চুন্নী চোরকে বলছেন — ও তোর দুঃখ বারমাস। ওরে কতই মুই কাটিয়া আনিম আলির কচুশাক। সাধারণ গৃহস্তের বাড়ীতে বিশেষ দিনে বা কোনো উৎসবে পাঁঠার মাংস খাওয়ার প্রচলন আছে। 'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' পালায় বগুলা গোঁসাই পটপুটিয়াকে দীক্ষা দেওয়ার সময় বলছেন —

দিলাম তোকে গোপাল ভাং
দিলাম ঝোলা মালা
হাঁস পারো কাটা ছিড়া
এইলা খাতে মানা।

বৈষ্ণব হয়ে গেলে হাঁস বা পায়রার মাংস খাওয়া চলে না। কিন্তু পটপুটিয়া পাঁঠার মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছেন —

"সেবা বাড়ীত যায়া
মোর পাটাভাত খাওয়া শ্যাস।"

পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাতের কথা এই নাটকের এক জায়গায় পাওয়া যায় —

'ঠাকুর বাড়িত ঐল্যা সাধু
করেছে গীতা পাঠ
সকাল বেলায় পিঁয়াজ দিয়া
খাছেন পান্তাভাত

এই পান্তাভাত অবশ্য প্রতিদিন ভালো লাগে না। সে বিষয়টি উত্তর দিনাজপুরের 'খন' পালা নাটকের হরিহরের মুখে শোনা যায় — "মুই পাথারত হাল ধরি যাহু। তুই টপ করি খরাক ধরি যাবু। গরম গরম ভাত নিগাবু। পতিদিন ঠটরা পন্তা ভাল নাগে নি।" গ্রামীণ পরিবেশের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের বিচিত্র বর্ণনা লোকনাটকগুলির চরিত্রের সংলাপে এবং গীতে হয়েছে প্রতিফলিত।

'রাজধারী' লোকনাটকে গ্রাম-বাংলার লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থাকে দেখা যায়। রাবণ-ভগ্নী সূর্পনখার

নাক-কান কাটা গেলে গ্রামের ওঝাকে ডেকে এনে চিকিৎসা করানো হয়।

"অঝা — এ সর্বনাখা, তোর যে নাকটা কাটা গেল এনোং করি। রোভো না অউসত লাগাবো।

সর্বনাখা — আউসত ছে না কিতেরে, ছে তে দে।

অঝা — ছে, একখান কাটা ঘাউয়ার ঔষদ জামরির রস, বাঘ মরচি আর নুন এখেটে বেনালছে। যেদি এইখান লাগা দেবি আলায় খরখরা হয় যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

সর্বনাখা — দে দে লাগায় আউসতখান।"

লোক-চিকিৎসক ওঝা এবং সূর্পনখার পরস্পর কথার মধ্যে গ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আমরা বুঝতে পারি। সেই সঙ্গে দেখি চিকিৎসকের সঙ্গে লোকসমাজের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক।

নারীদের সামাজিক অবস্থানের চিত্র এই লোকনাটকগুলিতে দেখা যায়। প্রত্যেকটি পালায় নারী চরিত্রের ভূমিকা লক্ষ করার মতো। দোতরা পালার 'আলম সাধুতে' বেগমের স্বামী-নির্ভরতা, ধাইমার অভাবজনিত স্বভাব, আয়েষার যৌবন-বেগে ভেসে যাওয়ার আচরণ — এই বিষয়গুলি লোকসমাজে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করে। সাধারণ নারীর মতো বেগম বাদশাকে বিদেশ যাত্রায় সচেতন করেন। পরনারীর প্রলোভনে যাতে বাদশা না পড়েন সে কথাই গানে বলছেন —

"ওহো প্রাণ সাধুরে সাধু
যদি সাধু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্ধি খান ওরে
দাড়ি মাঝি সাধু রাখেন সাবধানেরে
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যায়
পরনারী সাধু আপন নয়রে
পরনারী সাধু বধিবে জীবনরে।"

নারী-সমাজের প্রতি অবহেলার চিত্রও পাই এই দোতরাপালায়। নারী অনেক সময় সর্বনাশের মূল, এ ধরনের সমাজপ্রচলিত বিশ্বাসেও দেখা যায় দোতরাপালার 'আলম সাধু' লোকনাটকে। আলম সাধু বাণিজ্যযাত্রাকালে পুত্র রহিমকে তাই নির্দেশ দেন —

"গর্ভবতী তোর মাক ছাড়িলাং নাটমন্দির ঘরে।
তোর মার উদরে যদি ভাই পয়দেশ করে।
লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা করিবু বসি দ্বারে।

তোর মার উদরে যদি বৈনি পয়দেশ করে।
সে বৈনিক কাটিবু, না রাখিবু ঘরে।''

আবার পাশাপাশি 'জ্ঞানবাল পটপুটিয়া গোঁসাই' শাস্তরী পালাগানে নারী তাঁর স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। নারী ব্যতীত সামাজিক এবং আধ্যাত্মি চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়  পটপুটিয়া গোঁসাইকে যুক্তি দিয়ে জ্ঞানবালা বাধ্য করেছেন তাঁর কথা মেনে নিতে —

''ঠাকুর, আগে সাধন কর নারী
নারী সাধন না করিলে
না হও বোষ্টম বৈরাগী।
না জানিলে নারী তত্ব
পুরুষের যে পরমাত্মা
সবে নিবে কাড়ি
তার আগে না হও বোষ্টম বৈরাগী।''

'লোভী জোতদার' লোকনাটকে চালাকিশ্বরী স্বামী প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখেন। কিন্তু পারিবারিক চিন্তা ভাবনায় চালাকিশ্বরী নেতৃত্ব দেন। এমন কি নিজের ছেলেও সেখানে গৌণ হয়ে যায়। 'খন' লোকনাটকে হরিহর স্ত্রীকে প্রহার করলেও শেষ পর্যন্ত দুর্গা (স্ত্রী) যুক্তি-তর্ক এবং বুদ্ধিমত্তায় সফল হয়ে ওঠেন। উত্তরবাংলার রাজবংশী অধ্যুসিত এলাকায় নারীদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার একটা ক্ষেত্র রয়েছে। যেখানে নারীরা হেরে যাচ্ছেন সেখানে অন্তত প্রতিবাদ করেন। কৃষি-সমাজ ব্যবস্থায় ফসল উৎপাদনে নারী-পুরুষের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে এরকম ভাবনার বিকাশ হতে পারে বলে মনে হয়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যুক্তি তর্কে পরিবারের এবং সমাজের কথা বলা 'চোরচুন্নী' ও 'গম্ভীরা' লোকনাটকে দেখা যায়। 'চোর-চুন্নী'তে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটি গীত উল্লেখ করা যেতে পারে।

চুন্নী — 'চরা তুমি আমার আমি তোমার
এই কথা না জানে কায়।
ওরে সঁপি দিলাম মন প্রাণ যৌবন,
তব রাঙ্গা পায়।
আ-হা-র দুই চার কথা জিজ্ঞাসি তোমায়
চরা বলগো আমায়, ওরে তমায়

আমায় কি সম্বন্ধ
বড় হমো কায়।
এইটা কথা বলগো আমায়।

চোরের উত্তর — আ-হা-র তুই হলো চুন্নীগে
আমি বলি যে তোমায়
ওরে স্ত্রী-পুরুষ গুরু-শিষ্য, সখা ভাবো হয়।
এই সমস্ত জানালাম তোমায়।

চোর-চুন্নী পালাতে শুধু অভাব-কষ্টের কথাই বড় নয়, নারী-পুরুষের মধুর সম্পর্কও বড় হয়ে উঠেছে। 'গম্ভীরা'তে সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের অনেক তর্ক আছে। আবার এই লোক সমাজে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকেও দেখানো হয়েছে।

স্ত্রী — আমি তোমাকে বিয়ে করে মরলাম জ্বলে পুড়ে।
না জেনে শুনে বিবাহ বন্ধনে হলাম আবদ্ধ
কত ভাল পাত্র দিলাম ছেড়ে।

পুরুষ — তোমার বাবা এসেছিল বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।
দিনে শতবার বাবার পায়ে যেত তেল মাখিয়ে।
বাড়ীর মাটি দিয়েছিল বসিয়ে বাবাকে সোজা পেয়ে।
তোমার বাপে মায়ে দিল গছিয়ে।
এমন রণচণ্ডী আমার ঘাড়ে।

স্ত্রী — রিহার্সাল কর গম্ভীরা, তোমার ষাঁড়ের মতো চিৎকার
শিল্পী-বন্ধুদের জন্য চা করে দাও তিনবার।
যেন কেনা দাসী তোমার।
পানের পিকে পোড়া বিড়িতে ঘর করে একাকার।
চলবে না সব ঐ ঘরে সব ফেলব ছুড়ে।

পুরুষ — তোমার ভাই, বোন, দাদা পরিজন আত্মীয় যত।

আমার বাড়িকে করেছে হোটেলে পরিণত।
এখানেই আব্দার যত।
সম্মানের খাতিরে বিছানা ছেড়ে ঘুমাই মেঝেতে।
আমিও দেব এবার বের করে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট ছোট তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা চোখে পড়ে না। বলা যেতে পারে লোকসমাজের মর্যাদাকে উঁচু করেই দেখানো হয়ে থাকে এই লোকনাটকগুলোতে। লৌকিক জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও লোকনাটকগুলিতে দেখা যায়। রাজধারী, রামবনবাস এবং কুশান পালার মধ্যে রামচন্দ্রের কাছে রাবণ নিজেকে সমর্পণ করেছেন। ''গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সামগ্রিকভাবে বাংলার সামাজিক জীবনের উপর তা প্রভাব বিস্তার করেছিল।''[৩] 'রাজধারী'তে রাবণের ক্রন্দনরত গানে তা স্পষ্ট —

''এ প্রভু লেহ সীতা তোর হাতে হাতে
আহা মরিরে।
রাক্ষসকুলে মোক করহ উদ্ধার
এ প্রভু রঘু নাথ রে।
এ প্রভু তুইহে মাতা মোর তুই হে পিতা
তুই হে হোলো মোর জনমদাতারে হে
এ প্রভু অভাগিডিয়ার আর কেহ নাই
শুন প্রভু রঘুনাথ রে।

এই নাটক অভিনয়কালে মাঝে মাঝে দেখা যায় মহিলা শ্রোতারা রামের প্রতি ভক্তি নিবেদন করে উলুধ্বনি দিয়ে ওঠেন। আবার দোতরা পালার আলম সাধু এবং সত্যপীর পালায় রয়েছে পীর-পয়গম্বরদের মাহাত্ম্যের কথা। লৌকিক দেবী মনসার কাহিনী নিয়ে বিষহরি পালা। সমাজের যে কেউ পূজা করলেই তার গুরুত্ব পায় না। প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষ চাঁদ সদাগর। শ্রেণী-বিভক্ত লোক-সমাজে দেবীর পূজা প্রচারের জন্য চাঁদ-সদাগরের প্রয়োজন। পূজা-পার্বন, ধর্মীয় ভাবনা, পীর মাহাত্ম্য-এগুলো লোকসমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে রয়েছে লোকবিশ্বাস এবং যাদু। 'আলম সাধু'তে রহিম সাগরে যাওয়ার আগেই অনেক বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হন। রহিম আয়েষাকে বলছেন —

মাথার উপুরা জিটি করে টেঁও টেঁও পঞ্চরাও। আজি দেও সাগরে যাওয়া বাদ দে বৈনি।

"ঐ যে বোলে কয়,
আরে মুতিম মুতিম ডাবরীত
তাও না মুতিম তোর মাথার খাপরিত।"

দোয়ারীর মাথা পেতে দেওয়ার সুযোগের চাইতে নর্তকীরা খোলা মাঠেই ব্যবহার করবেন। দোতরা পালা 'আলমসাধু'তে কিছু প্রবাদ বা জনশ্রুতি দেখি যার মধ্যে নিয়তির পরিহাসকে লক্ষ করা যায়। আয়েষা তাঁর নিজের দুঃখের জন্য অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের কপালের কথা বলছেন —

ভালক না কং ভাল্, মোর বিধাতা. মন্দক না কং ভাল্
মন্দ নয় কালিয়ার কলম মন্দ মোর কপাল।'

মূল গায়কের কথার মধ্যেও ভেসে ওঠে জনশ্রুতি।

"সুক-দুঃখ কপালের লেখা মৃত্যু লেখা পায়
যে দিকে মরিবে বান্দা পায় বা হাটি যায়।"

মানুষের সুখ-দুঃখ কাপালে লেখা থাকে। কিন্তু মৃত্যুর কথা লেখা থাকে পায়-এ। লোকজীবনের এই জনশ্রুতি। আবার এই পালায় বাদশা স্বপ্ন দেখে স্বপ্নের ব্যাখা করেন। সেটিও জনশ্রুতি মাত্র।

"স্বপনে অঞ্চলের সোনা খসিয়া জলে পড়ে
নিশ্চয় জানিবে তার গাভুর বেটা মরে।

এ ধরনের স্বপ্নে যুবক-ছেলের মৃত্যু হয় — এই ধারণাটিও সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায়। 'চোর-চুন্নী' পালা গানেও দেখি প্রবাদের ব্যবহার। প্রবাদের ভেতর দিয়ে শিক্ষা লাভও হয়।

চুন্নী চোরকে বলছেন — "চুরি, দ্বারী, পরার নারী
এই তিনটা কাম অনাচারী।

এগুলি লোকসমাজের গর্হিত কাজ। আবার বহুল প্রচলিত কথা প্রবাদের আকারে চোরের মুখে —

"চুন্নী চোর বিদ্যাটা উত্তম বিদ্যা
যদি চোর না পড়ে ধরা"

সমাজে সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে তত সমস্যা নয় যতটা অসুন্দরী মেয়েদের। এই কথাগুলিও প্রবাদে পরিণত। 'চোর-চুন্নী'তে তা চোরের মুখেই বর্ণিত —

... দেখ বৈনি, গছের শুকান ঠ্যালত পড়িয়া

কাগা কা-কা করির ধইচ্চে।

'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালাতে পটপুটিয়া গোঁসাই বিধবার হাতে খেতে চান না। গুরুর নিষেধ আছে।

পটপুটিয়া — ওই শুনেক মাই জ্ঞানবালা

মোর উপর তুই না হস গোসা

বিধবার হাতে মা মোর

কিছুই চলে না।

লোকায়ত সমাজের কোনো কোনো বৈষ্ণবদের এ ধরনের বিশ্বাস দেখা যায়। লোকনাটকের কুশীলবরা আসরে ওঠার আগে যাদু-মন্ত্রের ওপর বিশ্বাস রেখে কিছু নিয়ম করেন। তেল, জল ইত্যাদিতে মন্ত্র পড়ে তা শরীরে সবাই ছিটিয়ে নেন। দর্শক শ্রোতাদের ধরা রাখা এবং মুগ্ধ করার জন্য মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ক্লিং কৃষ্ণ মহেশ্বর

ডাইনে রয় কালী বায়ে হইল যমদূত

কিংবা

আল্লালাগে তাল্লা উঁচুল লাগে ধান্দা

এই মন্তর দিয়া সভার লোকের আঁখ কইলং বন্দি

এই বন্দি যদি ছোটে আল্লা উচুলের সিংহাসন কাঁপে।

বিভিন্ন পালানাটকের দলের মধ্যে কখনো কখনো প্রতিযোগিতা চলে। সেখানে 'বাণ' মারার রীতিও প্রচলিত। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে এরকম যাদু বা মন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়। এগুলো লোকনাটকের লোকজীবনের ভূমি থেকে তৈরী।

প্রবাদ-প্রবচন এবং ধাঁধা আমাদের নির্বাচিত লোকনাটক সংকলনে যথেষ্ট রয়েছে। এই প্রবাদ-প্রবচন বা ধাঁধাগুলি অভিনয়কালে বিভিন্ন চরিত্রগুলি নাটকের অংশ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। সংলাপ চলতে চলতে প্রবাদ-ব্যবহার করে বক্তব্যের অর্থকে আরো সংহত করেছেন। ধাঁধা ব্যবহার করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া বলে মনে করেন অভিনেতারা। সেগুলোকে সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে সমাজের বিভিন্নদিকের চিত্র ফুটে ওঠে। সেদিকে লক্ষ রেখে প্রবাদ-প্রবচন বা বাঁধাগুলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

'কুশান' পালা গানে দোয়ারীর সঙ্গে নর্তকীদের ঠাট্টা-তামাসা চলতে থাকে। দোয়ারী যাতে নর্তকীদের চরিত্রের কোনো সুযোগ না নিতে পারে সেদিকে সতর্ক থেকে নর্তকীরা দোয়ারীর মাথা পেড়ে দেওয়াকেও এড়িয়ে যান। এরকম একটা বহুল প্রচলিত কথা নর্তকীরা বলে থাকেন —

"ওগে বেটি যদি হয় পরমা সুন্দরী
তা হলে তার ভাবনা নাই।
ওগে কালোমুখী বেটি হলে
জীবনে শান্তি, নাই।"

'বিষহরি' পালাগানে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে বাসরঘরে প্রবাদের মাধ্যমে বলছেন —

"জীবন মাগিয়া যে বা খেলায় পাশা।
তার মত দেখি নাই, অতি বড় চাষা।

বোকারই জীবন-পণ করে পা া খেলেন। এই ছোট্ট কথায় রয়েছে গভীর অর্থ।

'লোভী জোতদার' খাস পাঁচালী পালা নাটকে জোতদারের পুত্র সন্তান নেই। একটি কন্যা আছে। পুত্র নেই বলে তাঁর দুঃখ —

"একটি পুত্র দেরে আল্লা দুইটি পুত্র দে
কামাই খাবার আশা নাই, মোর মাটি দিবে কে।"

শুধু পুত্র সংসারে রোজগারের জন্য নয় — মৃত্যুকালে পিতার ক্রিয়া করার জন্য পুত্রের বড়ো প্রয়োজন। সমাজের এই ধারণা থেকে প্রবাদটি তৈরী হয়েছে।

লোভী জোতদার-এর শেষ কথা একটি প্রবাদ দিয়ে শেষ হয়েছে।

"ওরে পরার মন্দ করিয়া সুখী হইচে কুনবা জন।
ধর্ম পথে চলিলে দেখিবে নারায়ণ।

প্রবাদটিতে রয়েছে নীতি-শিক্ষা।

ধাঁধা বা শ্লোক দিয়ে ভরা রয়েছে নটুয়া পালা। লোকায়ত ভাষায় এই ধাঁধাকে ফাকড়ী বলা হয়ে থাকে। উধব-মাধব মূল গীদালকে প্রশ্ন করছেন। প্রশ্নের ভাষা ধাঁধা বা শ্লোক দিয়ে প্রশ্ন।

ক্ষুদ্র বর্ণ বিত্ত (জিনিস) নাল বর্ণ দেহ
ছেলিবা ছেলিবা সর্ব অঙ্গ ধরে
অধিক করি খাইলে
তোর মুখখান গন্ধ করে।

মূল গীদাল উধব-মাধবকে বলেন, এর উত্তর পেঁয়াজ। আবার উধব প্রশ্ন করেন —

জন্মিলে শ্বেত বর্ণ

পরে হয় কালো

লাফে লাফে আহার ধরে

সেইত বিড়াল নয়

আহার ধরিয়া না করে ভইক্ষণ

বলতো গীদাল

এটা কোন জন।

মূল গীদাল উত্তর দেন 'ফিকা জাল'। মাছ ধরার জালের কথা মূল গীদাল উধবকে বুঝিয়ে বলেন। এই ধরনের শ্লোকের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। লোকসমাজের সঙ্গে বিষয়গুলো যুক্ত। আরো দু'একটি শ্লোক বা ফাকড়ি উল্লেখ করা যেতে পারে —

ঠাকুরঝি ভিটিস কইরলো কি

আখাত ছবা দিছু কাঁঠালের বিচি

দুই একটা মাথা হামার ভিতি

এই জুয়াই বেটা

ওখান মোর বাও।

তোমার যদি ওখান বাও

তাহলে তোমরা খাও।

বায়ুনির্গমনের শব্দকে চাপা দেওয়ার জন্য শাশুড়ি উনুনে কাঁঠালের বীজ পোড়ার শব্দের কথা বলেন। জামাই কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। জামাই-শাশুড়ির মজার ব্যাপারটাই এই শ্লোকের মধ্যে ধরা পড়েছে।

উধবের প্রশ্ন — শাল বাড়িত ছিলো বীরটা

য্যালা ধরিল বীরটা

বেটি ছাওয়ার পাছ

স্যালা বীরটা ফুকুরদুম ফাকাশ।

মূল গীদাল উত্তরে 'ছাম'-এর কথা বলেছেন। শাল কাঠ দিয়ে তৈরী 'ছাম'। ধান ভাঙ্গার জন্য 'ছাম-গাইন' কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি এলাকার গ্রামাঞ্চলে মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন। সেই ছাম-গাইনকে শ্লোকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। এই ধাঁধা বা শ্লোকগুলোতে বাইরের যেমন একটি রূপ আছে ভেতরে আর একটি অর্থ লুকিয়ে থাকে।

প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা বা শ্লোক ইত্যাদিতে দেখা যায় সমকাল পরিবেশ-পরিস্থিতির চিত্র। ''প্রবাদের ব্যবহারিক অর্থ জানতে হলে পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হয়। প্রবাদ আমরা প্রতিদিন কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি। কোন্ পরিস্থিতে, কখন এবং কিভাবে প্রবাদ ব্যবহৃত হয় সেটি না জেনে প্রবাদের গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়।''[৪]

লোকজীবন থেকে উঠে এসেছে এই প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা বা শ্লোকগুলি।

বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে বিয়েতে পণ দেয়া-নেয়া কিংবা উপহার সামগ্রী পাওয়া এটি সাধারণ ব্যাপার। এ বিষয়গুলির টুকরো টুকরো ছবি আমাদের সংকলিত লোকনাটকগুলিতেও প্রতিফলিত। যে লোকনাটকগুলির কাহিনী চলমান ঘটনা নিয়ে তৈরী হয়ে থাকে সেখানে বর্তমানের বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে ফোটে। 'চোর-চুন্নী', 'খন', 'গম্ভীরা', 'খাস পাঁচালী', 'লোভী জোতদার' — এগুলিতে আছে বর্তমানের পণ দেয়া-নেয়ার ছবি। মঙ্গলকাব্য বা পুরানো কাহিনী নিয়ে যে লোকনাটকগুলি আছে সেগুলোতে পণপ্রথা হিসেবে নেই। বরং কন্যাপণের কথা আছে। ''এক সময় এই বাঙ্গালী সমাজেই কন্যাপণ প্রচলিত ছিল।''[৫] আমরা বিষহরি পালায় দেখতে পাই বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন আশীর্বাদ করছেন। আশীর্বাদের সঙ্গে কোনো উপহার-সামগ্রী দান করছেন। এই উপহার দেওয়াকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর-দিনাজপুর এলাকার গ্রাম লোকসমাজে 'দান' দেওয়া বলে।

বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে 'দান' দেওয়ার চিত্র —

''প্রথমে কন্যার বাপ ধান্য-দুর্বা দিয়া করিল আশীর্বাদ।
তারপরে দান করে কন্যার মাও
ধামালী খেলাইতে দিল লক্ষ টাকার নাও।
তারপরে দান করে কন্যার খুড়া।
সোনা-রূপা দিয়ারে বান্দিয়া দিল পুরা।
তারপরে দান করে কন্যার কাকী।
হেটকানে সোনা দিল উপর কানে কাটি।
তারপরে দান করে কন্যার জ্যাঠো।
গরুকেনা দিল সবার থাকি ছোট।
তারপরে দান করে কন্যার আবো।
উঠিয়া না যাসরে ভারুয়া কিছু পাবো।
তারপরে দান করে কন্যার মামী

হাতের খারুখিল খসাইতে চোখের পড়ে পানী।

তারপরে দান করে কন্যার মাসী

দান নাই দক্ষিণা নাই খালি হাসি-খুশী।

বিয়েতে এই 'দান' দেওয়ার চিত্রে লোক-সমাজের মানুষের আর্থিক অবস্থাটিও ফুটে উঠেছে। লক্ষ্মীন্দর বিয়ে করে ঘরে ফিরলে তাকে দেখাতে হয় বিয়েতে কী কী সামগ্রী পেয়েছেন।

সনকা বলছেন — ওরে বাবা লখিন্দর, তোমার শশুর বাড়ীতে কী কী দান পাইয়াছ বাবা ?

লখিন্দর — তবে ভূমি দান পেয়েছি মাতাগো লখিয়ার কান্দর। তার সঙ্গে পেয়েছি মাতা, বেহুলা সুন্দর। আর অনেক দান পেয়েছি মাতা লেখা জখা নাই। দুধু খাইতে পেয়েছি মাতা সম্বন্ধের গাই।

ভূমি, সোনা, অর্থ, গরু — এই সকল দ্রব্য বিয়েতে উপহার হিসেবে পাওয়ার প্রচলন দেখা যায় বিষহরি লোকনাটকে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই 'দান' সামগ্রী দাবীতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'চোর-চুন্নী' পালা গানে চোর চুন্নীকে এই সমস্যার কথা জানাচ্ছে —

ওগে খাট পালঙ্ক ছাইকেল ঘড়ি

রেডিওটা দেওয়া চাই।

ওগে এ্যালা হইসে দোসরা নিয়ম

আগিলামতন নাই।

আ-হা-র যাহার ঘরে ঝাকুয়া বেটি

ও তার জ্বালা দিন-আতি

ওগে বেটির দায়ে কত লোকে

বেচাইছে মাটি

বেটিয়ালার নাইসে সুখ শান্তি।

যাদের ঘরে 'ঝাকুয়া বেটি অর্থাৎ অনেক মেয়ে সন্তান আছে তাদের সমস্যা আরো প্রখর। চোর উপলব্ধি করছেন সামাজিক সমস্যার কথা। মেয়েদের বর্তমানে বিয়ে দিতে গেলে ছেলে পক্ষকে কতকিছু দিতে হয়। অন্যদিকে একসময় এই অঞ্চলে মেয়েদেরকেই অর্থ দিয়ে নিয়ে আসতে হতো। এজন্যে 'বেটি বেচিখাওয়া' কথাটির প্রচলন এখনো আছে। ড. সঞ্জীব নাথ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রচলিত 'বোলান'-এ এই দৃশ্য দেখেছেন —

"কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে পিতামাতার চোখে ঘুম থাকে না। শান্তি থাকে না মনে। কিভাবে কন্যাকে পাত্রস্থ করবেন, তা ভেবে ভেবেই অস্থির হয়ে ওঠেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত বোলানের একটি রঙপাঁচালিতে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পিতামাতার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রূপ এভাবে প্রতিবিম্বিত —

"বাবা। দিনে দিনে মেয়ে হয়েছে সিয়ানা,
বিয়ে দিতে পারলাম না।
টাকা যে নাই ঘরে,
কেমন করে বিয়ে দিব চিন্তায় যাই মরে
গিন্নি কিছু যুক্তি দাও মোরে।
মা। টাকা সোনা নইলে বিয়ে, তো হবে না,
এখন কি করি বল না"।

এই সংকট থেকে উদ্ধারের আর কোনো পথ না পেয়ে বাবা সিদ্ধান্ত করেন —

"ঘর বাড়ি বিক্রয় করে,
মেয়ের বিয়ে দিব তারে রাখিব দূরে,
আমরা রব গাছতলায় পরে।"

স্বামীর এ কথা শুনে কন্যার মাতার কণ্ঠে অভিব্যক্ত হয় করুণ আর্তনাদ —

"মেয়ে গর্ভে ধরে এত যে যাতনা,
এ জ্বালা প্রাণে সহে না।"[৬]

পালাটিয়া লোকনাটক খাস পাঁচালী 'দহাই ভাইরে ডিমেন্ড চাহান না' শিলিগুড়ির তরাই অঞ্চলে বহু জায়গায় অভিনীত হচ্ছে। এই পালানাটকের রচয়িতা দুজন। কৈলাশ শর্মা এবং দেবলাল সিংহ। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা এই পালানাটকটি লিখে মানুষকে সজাগ করতে চান। তরাই অঞ্চলের রাজবংশী অধ্যুসিত এলাকায় ছেলে পক্ষকে পণ নেবার বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু বর্তমান সামাজিক আবস্থায় এই পণ নেওয়া প্রথাতে পরিণত হয়েছে। সেই আক্ষেপে তাঁদের রচনা 'দোহাই ভাইরে ডিমেন্ড চাহান না'। এই পালা নাটকের একটি ধনী লোকের চরিত্র চক্রধারী। জমিদার পিচাশ রায়ের সঙ্গে চক্রধারী কথা বলছেন এরকম ভাবে —

চক্রধারী — না না দাবী-দাবা কিছু ঠিক হয় নাই। গরীবের মেয়ে শুধু দেখতে শুনতে ভালো তাই বিনা দাবীতে কথা দেই দিসি। তা ছাড়া হামার বাড়ীত কোন অভাব নাই, এককিনায় বেটা এত সম্পত্তি কায় খাবে।"

পিচাশ — "তাই বলে বিনা দাবীতে বেহা। ছিঃ ছিঃ লোকে কি কোহবে। হামাক বিষয়ডা ভালো লাগেলনি। হামা তোমার বেটার জন্য মেয়ে ঠিক-ঠাক করিয়া রাখিচি। সঙ্গে একখান গাড়ী, ফার্নিচার সেট, রঙিন টি.ভি। মোটামুটিভাবে ভরি পাঁচেক সোনা আর হ্যান্ড ক্যাশ কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা।"

বর্তমান সমাজের পণ দেয়া-নেয়ার ছবি চলে এসেছে আমাদের লোকনাটকের লোকজীবনে। এই চিত্র আরো দেখা যায় 'গম্ভীরা'য়। পণ-প্রথার জন্য অত্যাচার, নারী-নির্যাতন, নারী-হত্যা, ধর্ষণ এসমস্ত কিছু গম্ভীরার বিষয়

হয়ে উঠছে। ডুয়েট পর্যায়ে স্ত্রী এবং স্বামীর গীতে সেই কথায় পরিস্ফুট।

স্ত্রী — তোমাকে বিয়ে করে শখ আহ্লাদ সব গেল চুলাই।
খাটতে খাটতে জীবন গেল তবু সুনাম নাই।
দুঃখেই কাটলো জীবনটাই
যদি টি.ভি. আলমারী পাকা বাড়ী চাও
আমার কথা শোন
অন্যত্র কর বিয়ের ব্যবস্থা।

পুরুষ — নারী নির্যাতন করছে সমাজ বিরোধীর দলে।
কত জীবন যাচ্ছে ভারত পণের কবলে।
লোভ আর নীরবতার ফলে।
তাই নারীসমাজ তোল আওয়াজ ভারত বুকে
রুখতে হত্যা ধর্ষণ পণপ্রথা
সাথে পুরুষ সমাজ তোল আওয়াজ
রুখতে পণপ্রথা
রুখতে নারী ধর্ষণ ড্রাগ মাদকতা।

পণপ্রথার গানে সমাজের আরো জটিল সমস্যার কথা ভেসে উঠেছে। নারী ধর্ষণ, পুরুষের ড্রাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 'গম্ভীরা' গায়কের দল গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে থাকেন। লোকনাটক লোকজীবনের চিত্রই শুধু নয়, লোকনাটক সমাজ-জীবনের শিক্ষার পাঠশালা।

গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র এই লোকনাটকগুলেতে দেখা যায়। শুধু ছবিই নয়, আর্থিক সমস্যায় মানুষের পরিকল্পনা কেমন করে নষ্ট হয়ে যায় সেই বিষয়টিও পরিস্ফুট। 'চোর-চুন্নী' পালানটকে চোর এবং চোরনীর পরস্পর সংলাপে সমাজের আর্থিক-চিত্র অত্যন্ত পরিষ্কার।

চোরের গীত — ওগে দেশের অভাবে পেটের ভোকে
লজ্জা সরম করিনু নাশ।
ওগে মনের দুঃখে মাটির টুকরি
মাথাত উবাস

চুন্নীর গীত — ওরে নানান কথায় জ্বলে দেহা
অন্তরে মোর নাইরে সুখ

ওরে মনটা কছে দশাপরাটার
ফিরিয়া না দেখ মুখ।
আহারে যেই হাতে বিয়ারে হইছে
ওদিন হাতে মোর দিন যাছে কাচালে
খাবার বাদে নাই মোর শান্তি
যেমন অন্তর জ্বলে দিন যাছে
মোর কাচালে গে।

অর্থের অভাবটাই এখানে বড়। তার থেকে তৈরী এই সমস্যা। জমিহীন মজুর শ্রেণীর লোক চোর-চুন্নী। চুরী করতে গেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চোর। বিভিন্ন উপায়ে মানুষের রাত জেগে পাহারা দেওয়ার ফলে চোরের চুরী করতে অসুবিধা। সমাজের এই অবস্থার কথাগুলোও গীতে প্রকাশিত।

''আহার যেমন হইসে আজি পার্টিলা
চুন্নী দেছ পহরা
ওগে কেমন করি যাইগে চুরি করিবার
চপর রাতি আছে পহরা।''

''বৃত্তিই যার চুরি করা, রাত্রে তাকে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতেই হবে।''[৭]

পুলিশের হাতে চোর ধরা পড়লেই পুলিশের বেদম প্রহার-এ কথাও চোর জানেন।

''আহার দারোগাবাবু রাগ করিয়'
মোক কছে ক্যান করলু চুরি গিয়া
মুই কছো, নাই করো মুই চুরি
ওরে এটা কথা শুনি য্যালা
ঝাঁপি উঠিল সিপাইগিলা
ওঠাইল পিটের দুরদুরি
কি কাম কোনু জান হারানু
করিয়া চুরি।''
আহ'র থানার পছিমা নিয়া যায়া
নাকে মুকে দিলেক মুতি
চিপিয়া ধরিয়া টুটি

কি কাম করিনু জান হারানু
করিয়া চুরি।

থানাতে পুলিশের শাস্তি দেওয়ার কথাও চোরের মুখে বিবৃত। অভাব-কষ্টের জন্য নিরুপায় চোরকে চুরি প্রথাকে অবলম্বন করতে হয়। সরকারী সুযোগ-সুবিধা যেখানে গেলে পাওয়া যায় যেখানেই চোর জীবন বাঁচাবার আশায় ছুটে যান। 'ইন্দিরা আবাসন'-এর জন্য বি.ডি.ও. অফিস, প্রধানের বাড়ী, রেশন-ডিলারের সঙ্গে দেখা করা সবকিছুতেই চোরকে ছুটতে হয়।

"ওগে প্রধান অধ্যক্ষ মেম্বার কের্ণী
সগায় তো ভাই গেলেক চলি
বি.ডি.ও. আসিবে নয়া হাট
ওগে চট করিয়া খাবার দেগে নোয়া যাবে না।"

রেশন কার্ডের গুরুত্ব চোর বোঝেন। তাই সেটাকে যত্ন করে রাখতে চান।

"ওরে ভাবিয়া দেখেক রেশন কার্ডখান
না হলে কিছুই না পাবেন,
হইসে বড়ই মূল্যবান
ওরে সাবধানে রাখেন
হুখান পেটের খতিয়ান।"

চোরের মুখে শুধু ব্যক্তি জীবনের চিত্রই ফোটে না, ফুটে ওঠে ভারত-বাংলাদেশের এলাকাগত সমস্যা। জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত হয়ে আছে। ভারত-পাকিস্থানের জমি জরীপের সময় থেকে এই অঞ্চলটিকে 'ছিটমহল' বলে চিহ্নিত। বর্তমানে সেই এলাকার বসবাসকারী মানুষ বাংলাদেশ কিংবা ভারত কোনো সরকারের দ্বারাই ঠিকমতো নির্দিষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্যাটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচনা চলছে। বিষয়টি চোরের মুখে গীতের আকরে প্রকাশিত।

"আহার শুনো ভাইরে ও ভারতবাসী
তোমরা করিয়া বিচার
ওরে জরীপ করেছে নাভিস্থানটা
ঐ ভারত সরকার, পঞ্চ অক্ষর করিলেক তৈয়ার"

এরকম সামাজিক সমস্যার কথা কম বেশী প্রায় সব লোকনাটকে দেখা যায়। তবে চোর-চুন্নী এবং গম্ভীরা পালায় তা রয়েছে তীর্যকভাবে। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কথা আছে গম্ভীরায় —

"৫৩ বছর অতিক্রান্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন
দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, মানুষ কর্মহীন।
কাটছে দিন অর্ধাহারে অপুষ্টিতে শিশু মরে
বহু গ্রামে পানীয় জল নাই, মরছে বিনা চিকিৎসায়।"

সমাজ-উন্নয়নে যাঁদের কথা সচরাচর শোনা যায় সেই সকল মানুষের মধ্যেও নানারকম দুর্নীতি আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদেরকে সজাগ করতে গম্ভীরা গান তৈরী হয়।

গম্ভীরার উচিত বক্তা — "জনদরদী নেতা, তোদের ক্ষুরে নমস্কার,
গদীর লোভে আর নিজেদের স্বার্থে
যত ভাষণ চিৎকার।
রাজনৈতিক ডুগডুগির তালে নাচে
এই বানরের যদি ভয় হয়রে তাল
হবে ডাল ভাঙ্গা বানরের হাল
শ্রমিক মাঝে দাঙ্গা লাগায়
তোদের মত নেতারাই
মারামারির সময় তোদের
পাত্তা নাই।"

দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ, ঘুষখোর, ছিনতাইকারী, ধর্ষণকারী, পকেটমার, সাইকেল-চোর, বেআইনী মদ-বিক্রেতা সমাজের নানা শ্রেণী মানুষের কর্ম-কলাপের প্রতিফলন ঘটে গম্ভীরার মধ্যে।

পকেটমারের কথা — "মাত্র দুই অঙ্গুলে
সংসার চলে।"

ঘুষখোর নিয়ে গম্ভীরা — "সাঁইবাবার কন্যা হলে
সোনা দানা চাকরী মিলে
ইঞ্জিনীয়ারকে দিল উপহার
হাত ঘুরিয়া সোনার হার
মন্ত্রীযন্ত্রী ছিল যত
অলৌকিক ঘটনায় অভীভূত
কবাজীর ধান্দাবাজী আর কার সাথী

ধরা পড়ল টি.ভি. ক্যামেরায়।"

সবসময় পুলিশের কাজ ঠিক হয়ে ওঠে না। তার ফলে সাধারণ মানুষ লাঞ্ছিত হয়।

"রাতের বেলাই চোর ছিনতাইয়ের ডর।
তার চাইতে পুলিশ ভয়ঙ্কর।
বিনা দোষে লিছে ধর‍্যা।
ডাকাতি কেসে দিছে ভর‍্যা।
নিরপরাধি ফাঁসছে বহু এমন।
চাল, ডাল, তেল, চিনি, কেরোসিন
বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে প্রতিদিন
সুরক্ষা আরক্ষার মদতে
চোরাকারবার চলছে জেলাতে
ধন্য তোদের পুলিশ প্রশাসন।

গম্ভীরা লোকনাটকে সমাজের প্রশাসনের মানুষদের কাজ-কর্মের চিত্র ধরা পড়ে। ছিনতাইকারী, সাইকেল চোর, বে-আইনী মদবিক্রেতার জীবনের গতি-বিধি গম্ভীরা শিল্পীদের চোখ কখনো এড়ায় নি।

"হায় কি হলোরে, কি করবো রে
কি করি উপায়ই।
জমি বেচালু বিশ হাজার টাকা
হয়্যা গেল ছিনতাই।"

যেখানে সেখানে মদ বিক্রী হচ্ছে। এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে গম্ভীরার সজাগ দৃষ্টি —

"হাসপাতাল, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড চত্বরে
বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রী করে
পুলিশ যখন আইন ফলায় এই মদের ব্যবসায়
দু'গ্লাস মদে বন্ধ হয় গর্জন।"

গম্ভীরা লোকনাটকের শুরু সামাজিক সমস্যা দিয়ে। তাই প্রস্তাবনাতেই আমরা দেখি মানুষের সমস্যা —

'হায় কি হলোরে, ওকি করবে রে, কি করি উপায়
বুড়াতি কালে প্যাটে পাথর
অপারেশনের টাকা নাই

অথবা

'আমি ব্যবসা করে পাড়ার খরিদ্দারে
পণ্য দিলাম ধার, দোকান গেল রসাতলে
চোখে দেখি অন্ধকার।'

এই সমাজ-সমস্যার কথা 'শিব'-কে আহ্বান করে এনে বোঝানো হয়।

''শিব হে ঃ—
স্বাধীনতার স্বাদ বড়ই তিতা দিন কাটছে অনাহারে শিব হে
কোটি কোটি টন খাদ্য শষ্য পচছে গুদাম ঘরে
বাজেট পাশ একবার বছরে মূল্য বৃদ্ধি বারে বারে।
চাল গম, তেল রেশনে চড়ছে দর দিনে দিনে
থ্যাকা থ্যাকা রেশন ভাগ্যে জুটে না।''

প্রস্তাবনা, বন্দনা, চারইয়ারী, ডুয়েট, টনটিং রিপোর্টিং গম্ভীরার প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে সমাজ-জীবনের নানাছবি উজ্জল হয়ে ফোটে। লোকনাটকের নাট্যাভিনয়ের অভিনেতারা অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাই কৃষকদের সমস্যা, জমির অধিকার, ভাগ-চাষীর আন্দোলন, বেনামী কৌশলে জমিদারের জমি-রক্ষার চক্রান্ত ইত্যাদির কথা ঘুরে ফিরে লোকনাটকগুলিতে এসেছে। 'কুশান' পালানাটকে দেখি কালনেমির সঙ্গে রাবণের লঙ্কাভাগের বিষয়ে জমি-বন্টন সমস্যা। কালনেমি রাবণের কৌলশ বুঝতে পারলে রাবণ খুব রেগে ওঠেন। রাবণ চরিত্রটি তখন শোষক জমিদারের মতো হয়ে ওঠেন। প্রজার উপর অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হন না। রাবণ কালনেমিকে বলে ওঠেন — ''তুই বেটা মোর মামা, না মোর শত্রু। মন্ত্রী, দ্যাওতো মোক ঐ হাতিয়ারখান। ব্যাটাকে একেবারে শ্যাষ করি দ্যাম।'' এ যেন বর্গা অপারেশনের সময় বর্গাদারের বিরুদ্ধে জোতদারের আক্রমণ।

পালাটিয়া মান পাঁচালী 'দস্যু রাণী কালিন্দী' পালায় কিষণলাল রাজার বিরুদ্ধে কৃষকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন — ''মহারাজ এই ক্ষুধার দিনে না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, খাজনা দিবে কি করে। খরায় কয়েকবৎসর জমিতে ফসল ফলাতে পারছে না। খাজনা দিবে কি করে মহারাজ।''

মহাজনের টাকার শোধ দেওয়ার ক্ষমতা নেই কৃষকদের। ফসল না হওয়ার জন্য খাজনা দেওয়াও সম্ভব নয়। কৃষকদের এই করুণ-অবস্থা অন্য নাটকগুলোতও রয়েছে। খাস পাঁচালী 'লোভী জোতদার' পালা নাটকে জোতদার সরকারের হাতে উদবৃত্ত জমিকে খাস জমি হিসেবে তুলে দিতে চান না। জোতদাররা প্রয়োজনে 'ঘরজামাই' রেখে মেয়ের নামে জমি রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এরকম সামাজিক চিত্র রয়েছে 'লোভী জোতদার' পালা নাটকে।

নাটকে মেয়ে দুলালীর প্রতি জোতদারের কথা — ''দেখমা আজি হাতে এইলা ঘরবাড়ী সয়-সম্পত্তি তামানলায় তোর। তুই নিজে এইল্যা দেখা-শুনা করিবো। আর বাবু (জামাই), বেহাই বেহানি তমহার ঐডা বাড়িত ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া সগায় এইঠে আসিয়া রহন। আর মড়ল, তুই আগত যেনং ছিলো তেনংয়ে এই জমি জিরোইতলা দেখাশুনা করিবো।''

জমির ফসলের ভাগসত্বকে কেন্দ্র করে আধিয়ারদের আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। উত্তরবঙ্গে তে-ভাগা আন্দোলন দিনাজপুর জেলায় প্রথম সংঘটিত হয়েছিলো। এই তে-ভাগাকে কেন্দ্র করে লোক কবিরা অনেক গান বেঁধেছেন।

''একে একে বলে যাই শোনেন বন্ধুগণ
খাঁপুর যুদ্ধের কথা করিব বর্ণন
১৩৫৩ সাল মাঘ মাসের
তেভাগার রণে কৃষক শেষ কুদ্দিল মাহামান্য
ভালকা বাঁশের ধনুক নিল হস্তেতে তুলিয়া
চোখা চোখা তীর নিল পৃষ্ঠেতে বাঁধিয়া
দলে দলে কৃষক সাজে বলে মার মার
কোমর বান্ধিয়া সবে হৈল তৈয়ার
ঘুটঘুটি আন্ধার রাতে ম্যাঘের ঝড়ে পানি।
জালিমে এই রাতে বুঝি করিবে দুশমনি।''

দিনাজপুর জেলার অধীনে খাঁপুরের ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ তেভাগা লড়াইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং খাঁপুরের তে-ভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড কালী সরকার রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকাকালীন ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল এই জংগানটি রচনা করেছিলেন।[৮]

এই 'তেভাগা' নামে 'খন' রচিত হয়েছে। 'তেভাগা' খনে জোতদার এবং পুলিশের অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে। এই লোকনাটকে জমিদারের নায়েব দয়াময়ের কথা — ''কি, সর্বনাশ, আধিয়ার করছে ফসলের তে-ভাগার দাবী। বেটারা উসকানীতে এইসব করছে। এই দাবী তাদের ন্যায় নয়। পুলিশ দিয়ে বেটাদের ঠেঙ্গাতে হবে। লাঠি চলাও গুলি চালাও। সব নিমকহারামের দল। বেইমান সব বেইমান।''

আধিয়ার উদাসু বর্মণের দাবী —

'' হামরা ভারতের স্বাধীনতা চাই, লাঙ্গল যার জমি তার। আধি জমির সত্ব চাই। আধি ফসলের তিনভাগ চাই। এইল্যা আর কি, আরও অনেক দাবী ছে।''

এই 'তেভাগা' খনে জমিদারের নায়েব, তহশিলদার, মহাজন, জেলখাটা নেতা, আধিয়ার, আন্দোলনকারী মহিলা, পুলিশ, এরকম বিভিন্ন মানুষের নানাবিধ কার্যকলাপের দৃশ্য বিদ্যমান। তেভাগার আন্দোলনের ছবি গম্ভীরাতেও ধরা পড়ে। মালদহের গম্ভীরা গায়ক ও কবি বনমালী কুণ্ডুর রচিত গানে শোনা যায় তে-ভাগার কথা —

"শোনরে ভোলা নানা মাঠে নাইকো দানা
ক্যানে দিলি এমন সাজারে
তোর ভুতের বেগার খাটা
ভাত নাই আধ পেটা
হামার খাচা হইয়াছে
বুকের পাঁজারে।"[৯]

"এটা ঠিকই যে মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকজীবনে প্রচলিত নাটকের উপজীব্যগুলি কী, তা সেখানকার মানুষ জানেন।"[১০]

লোকনাটকগুলিতে লোকজীবনের বিচিত্র কার্যপ্রণালী এবং কথা সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে। বলা যেতে পারে লোকনাটক লোকজীবনের দর্পণ।

## তথ্যসূত্র


১। ড. গিরিজাশংকর রায়, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃ: ৫০।

২। সুখবিলাস বর্মা, জাগ গান, পৃ: ২৫।

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ: ১৩৩।

৪। ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর ঃ পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, পৃ: ৪৫০।

৫। ড. সঞ্জীব নাথ, বাংলার লোকনাট্য ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পৃ: ১৭৫।

৬। তদেব, পৃ: ১৭৪।

৭। বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়, গ্রামীণ লোকনাটক : চোর-চুরনীর পালা : বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, সম্পাদিত সনৎকুমার মিত্র, পৃ: ১৫৫।

৮। ধনঞ্জয় রায়, সম্পাদনা, তেভাগা আন্দোলন, পৃ: ২০৯।

৯। তদেব, পৃ: ২১৪।

১০। পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পৃ: ২২৩।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের রূপান্তর এবং আধুনিক বাংলা নাটকে তার প্রভাব

বাংলা লোকনাটকের আলোচনা খুব বেশি পুরনো নয়। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা ড: অজিতকুমার ঘোষের একটি প্রবন্ধে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক পত্রিকাতে বাংলার লোকনাটক বিষয়ক আলোচনার পর থেকে এবিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

সঙ্গীত-গীত-বাদ্য-নৃত্য সমাহারে লোকনাট্যের রচনা। পৃথিবীর সমস্ত নাটকের উৎসমূলে রয়েছে সমষ্টিগত জীবনের প্রকাশ। জীবন ও জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই লোকনাটকের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিবর্তন ধীর গতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে।

"সঙ্গীতসহ শিকার নৃত্যই হোক আর রণহুঙ্কারসহ যুদ্ধ নৃত্যই হোক, কিংবা দেবতার কাছে প্রার্থনা করে অথবা মিলন আকাঙ্ক্ষামূলক গান গেয়ে চাষের মুখবন্ধনই হোক সর্বত্রই এক ধরনের নাটকীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়।"[১] এই নাটকীয়তা বা নাট্যক্রিয়া বর্তমান সমাজের গ্রাম সভ্যতা এবং নগর সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

লোকনাটক লোকসৃষ্টিকর্ম। তাই লোকনাটকের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিভার চেয়ে সামগ্রিকভাবে সংহত সমাজ জীবনের রূপই ফুটে ওঠে। কিন্তু সেই সমাজজীবন যখন বদলে যায় তখন তার প্রকাশও বদলাতে বাধ্য।

নগরপত্তন, যন্ত্র সভ্যতা, আধুনিক শাসন ব্যবস্থার রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাটকেরও নানা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধু লোকনাটকের ক্ষেত্রে নয়। সমগ্র লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্যের মধ্যে এই পরিবর্তনগুলি অনিবার্যভাবে এসে যায়। জাতীয় আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, স্বাধীনতার জন্য লড়াই — এই জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি জাতির ধারাবাহিক প্রচলিত রীতি-নীতিকে ত্বরান্বিত করে। ফলে প্রবাহমান জাতির সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ পরিলক্ষিত হয়।

লোকনাটক একান্তই সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাটকেরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। নগরায়নের এবং শিল্প-কারখানা স্থাপনের ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তা লোকনাটকেরও রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে। এই রূপান্তর সাম্প্রতিক নয়। লোকনাট্যের উদ্ভবের কাল থেকেই এই রূপান্তর ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। উৎসমূলে উৎসব অনুষ্ঠানে সংগীতের সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন,

ভাব বিনিময়ের প্রচেষ্টা, বিশেষ ধ্বনির সাহায্যে একটি নাট্য প্রক্রিয়ার আদল তৈরী হতো।

গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসের সময়েও নাটক ছিল বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন আশ্রয়ী। পরবর্তীকালে গীত-সংলাপের সংযোজন ঘটে। ''লোকনাট্য আদিতে ছিল নিছক অঙ্গভঙ্গি আশ্রয়ী, পরবর্তীকালে তাতে গীত ও গদ্য সংলাপ যুক্ত হয়েছে; এমন অনুমান হয়তো করা যায়।... আদিতে লোক পুরাণ ও পুরাণ ছিল লোকনাট্যের বিষয়। পরবর্তীকালে মহাপুরুষ জীবনী, রূপকথা, ইতিহাস ও সামাজিক প্রসঙ্গ বিষয় মর্যাদা পেয়েছে। একালের বহু লোকনাট্য পালায় সামাজিক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে।''[২]

''ফোকলোর জনগণের ঐতিহ্যের ধারাকে আশ্রয় করেই জীবিত থাকে। যুগের পরিবর্তনের সাথে নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে ফোকলোর-এর চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে। পুরাতন ফোকলোর সময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতিক্রম করে সমাজের দশজনের মুখে মুখে পূর্ববর্তী পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের অনেক স্তর পেরিয়ে বর্তমান সমাজে চলে এসেছে — এগুলোর পরিবর্তন সচরাচর হতে দেখা যায় না। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে নতুন পরিবর্তিত ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ফোকলোর সৃষ্টি হয়। যেমন একটি সমাজ কৃষিনির্ভর চরিত্র পেরিয়ে যখন শিল্পনির্ভর সমাজে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই সমাজে যে ফোকলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে চরিত্রের বা মেজাজের দিক থেকে তা ঠিক প্রাক্তন কৃষ্টিনির্ভর সমাজের ফোকলো-এর মত হয় না। হতে পারে না।[৩]

এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবাংলার লোকনাটকগুলোর বিষয়বস্তু, ভাব, আঙ্গিক এবং উপস্থাপন বিশ্লেষণ করলেই এই পরিবর্তনের ধারাটি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

কোচবিহারের দোতরা পালা অনেক প্রাচীন। সাধারণভাবে দোতরা পালার বিষয়বস্তু কল্পলোকের কাহিনী, বিস্মৃত অতীত ইতিহাসের অধ্যায় এবং রূপকথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। কিন্তু কাঠামো ঠিক রেখে যুগের প্রয়োজনে সাক্ষরতা অভিযানের তাগিদে দোতরা পালায় 'টটেয়ার টিপসই' কাহিনী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিন-চতুর্থাংশ গ্রামীণ মানুষের মনোরঞ্জনের মাধ্যম লোকসংস্কৃতির বিশেষ শাখার লোকনাটকের আবেদন কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারেননি। ফলে দোতরা পালা নাটকের আলম সাধু, মরুচমতি, করিম বাদশা, বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী'র পাশাপাশি, 'টটেয়ার টিপসই' সমানভাবে চলতে শুরু করলো।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাব, ভাষা, পরিবেশন, সবকিছুরই কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। 'টটেয়ার টিপসই' দোতরা পালাগানের পুরো বিষয়টি সাক্ষরতা আন্দোলনের উপর নির্ভর করে রচিত। এই পালার রচয়িতাকেও খুঁজে পাওয়া যায়। পালার গানের কথাতে বোঝা যায় কতখানি বিষয়বস্তুর দিক থেকে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে।

'হায়রে — এই কথা শুনিয়া টটেয়া পঁয়ত্রিশ বছরে,
পরার বাড়ীত কামাই করি নাইট স্কুলে পড়ে।
দেখিতে দেখিতে ভাইরে মাস ছয়খান গেইল।
অল্পদিনের মাঝে টটেয়োর সাক্ষর জ্ঞান হইল।
হইলো আরো নানা জ্ঞান দিনাত স্কুল যায়া।
ছোট ছাওয়া দুকনাট টটেয়া দেয় স্কুল পাটায়া।
এইভাবে কতদিন গত হয়া গেইল।
ধীরে ধীরে টটেয়ার সচেতন হইল।
হায়রে — জীবনে করিয়া ভুল বুঝিতে পাইয়া'
সচেতন টটেয়া বেরায়.. বুঝাইয়া।

(টটেয়ার টিপসই, বিষ্ণুপদ রায়)

শুধু বিষয়বস্তু নয় — ভাষা, উপস্থাপন, মঞ্চ-পরিকল্পনা, আলোর ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছদ, মেকআপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটছে। অতি জনপ্রিয় 'রূপবান কন্যা' পালানাটকের খোলস পরিত্যাগ করে আধুনিক যাত্রায় মঞ্চায়িত হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন অঙ্কে ভাগ করে দেখান হচ্ছে, চরিত্রদের প্রবেশ প্রস্থান যাত্রার আকারে উপস্থাপিত হচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষার স্থলে মান্য চলিতের ব্যবহার এসে যাচ্ছে। ব্যবহারিক আধিক্য নেই বললেই চলে। তবে গোটা থিমের ভেতরে গ্রামীণ ধারার পরিবর্তনের চেষ্টা তেমন নেই। বরং দেখা যায় সঙ্গীতের প্রয়োগে পুরোপুরি আঞ্চলিক গানই রয়েছে। জলপাইগুড়ির হেলাপাকড়ির প্রয়াত শ্রী অধরচন্দ্র সিংহের পল্লীশ্রী নাট্য সংস্থার 'সতী রূপবান' পালাগান প্রায় সম্পূর্ণই যাত্রার আদল গ্রহণ করেছে।

রূপবানে দাইমার উক্তি — রূপবান, রূপবান, এত আনন্দ ভাল নয়। অচিরে তোমার দুঃখ আসছে। বারদিনের শিশু তোমার স্বামী হবে।

রূপবানের গীত — আমার বাড়ির দক্ষিণ পাশে গো,
ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে গো,
আমার দাইমা, দাইমা গো।
বাজাইতে বাজাইতে বাদ্য গো
ও দাইমা আসে মোদের বাড়ি গো।
আমার দাইমা, দাইমা গো। (সতী রূপবান, প্রথম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য)

কুশান পালা নাটকের বিষয়বস্তুর কোনো রূপান্তর ঘটেনি। রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করেই

এই পালা নাটকটি চলে আসছে। ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। মঞ্চে আধুনিক আলোর ব্যবহার হচ্ছে। পুরুষ নর্তকের বদলে নারীরাই নিজেদের চরিত্রে অভিনয় করছেন। দর্শক ও যুগের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন চরিত্র যাত্রার আকারে 'প্রবেশ-প্রস্থানের' পথ ধরে মঞ্চে আসা যাওয়া করছেন। এই পরিবর্তনের সাথেই আবার অপরিবর্তনের ধারাটি অব্যাহত রয়েছে। কুশান সম্রাট প্রয়াত ললিত কুশানীর দলের সঙ্গে পুরোনো ফরমটি এখনো বজায় রয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার চোর-চুন্নি পালাগানের পরিবেশনের ক্ষেত্রে সমকাল যুগের ছবিই ধরা পড়ে। আঙ্গিকের খুব বেশী রদ-বদল ঘটেনি। তবে 'বন্দনা' অংশের মধ্যে বর্তমানে পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পূর্বে বন্দনা অংশে চোর চক্রপতি কৃষ্ণ ও রাধিকার কথা বিশেষ ভাবে পাওয়া যেতো। এখন সেখানে 'শ্যামাকালী'-র বন্দনা দেখা যায়।

"বন্দনা করি ওমা শ্যামা কালী / এমা তুমি জগৎ জননী, তুমি তো সকলি।"

বর্তমান অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজ জীবনের পরিবর্তন চিত্রের মতো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে গ্রামীণ রচয়িতাদের রচনায়। প্রচলিত বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে নতুন বিষয় নিয়ে গীত রচিত হয়ে থাকে। এখনকার লোকনাটকে রাজনৈতিক নেতাদের কথা, মিটিং মিছিলের প্রসঙ্গও স্থান পাচ্ছে।

ওগে জ্যোতি বসু মিছিল করে
শুনেক দিয়া মন
মিটিংটা হইল কলিকাতায়
বলি তাহার বিবরণ
সভা দেখি হাউ খানু মুই
লোকে লোকারণ।[৪]

তরাই অঞ্চলের পালাটিয়াতে অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রং পাঁচালি, খাস পাঁচালি এবং মান পাঁচালি — এই তিন ধরনের গানের পার্থক্য বর্তমানে বোঝা কঠিন হয়ে যায়। আধুনিক যাত্রা, নাটক এবং চলচ্চিত্রের প্রভাবে কাহিনী নির্বাচন এবং অভিনয় উপস্থাপনে পালাটিয়া তিন ধরনের পার্থক্যের সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলে একটি মিশ্ররূপে পরিবেশিত হচ্ছে। সাধারণ নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, স্বায়ত্বশাসন, দুর্নীতি, দমন-পীড়ন, অবক্ষয় প্রভৃতি বিষয় আজকের পালাটিয়ার বিষয়বস্তু। এই ধারাটির পাশাপাশি পুরানো ধারাও চলছে।

'নটুয়া' পালানাটক প্রায় এখন বিলুপ্তির পথে। হঠাৎ কোথাও প্রদর্শিত হলে সেখানে প্রাচীন ধারাটিই পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরকেন্দ্রিক ভাবনা, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে যে সকল লোকনাটক রয়েছে তাতে ভাষা,

মঞ্চ, আলো ব্যতীত বিষয়বস্তু এবং পরিবেশনে প্রচলিত ধারটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

জ্ঞানবালা-পটপুটিয়া গোঁসাই, বিষহরি এবং রাজধারী পালা নাটক এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। অতীতে যে দীর্ঘ সময় নিয়ে এগুলো পরিবেশিত হতো, সেই দীর্ঘ সময় নিয়ে আর এগুলি পরিবেশিত হয় না সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মঞ্চস্থ হলে সময় আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের 'খন' গানের বিষয়বস্তু পুরোপুরি বর্তমান সমাজের উপর নির্ভর করেই রচিত। ফলে বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের ধারা এই লোকনাটকে বিদ্যমান। উপস্থাপনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। নাটকের আঞ্চলিক ভাষার অনেক রদ-বদল ঘটছে। সংগীতের ক্ষেত্রে সুর এবং ভাষা প্রচলিত ধারাকেই বহন করে চলেছে।

দক্ষিণ-দিনাজপুরের 'রামবনবাস' পালাগান পুরনো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও বিদ্যমান। যুগের প্রয়োজনেও 'রাম বনবাস' পালার গান তার নিজস্বতা কখনোই ভোলেনি।

গম্ভীরা-র আদিরূপ 'বোলবাহি' নামে পালাগানের মধ্যেই ছিল। আহ্বান করে নিয়ে আসার পদ্ধতির নাম বোলবাহি। হাসি-ঠাট্টা-তামাশার মধ্য দিয়ে নাটকীয় আকারে ডেকে ডেকে জানানোর বিষয়ই হচ্ছে বোলবাহি। ক্রমশঃ এটি লুপ্ত হয়ে 'গম্ভীরা'র ব্যাপ্তি শুরু হলো। এই গম্ভীরা-র দু'টি রূপ — একটি উৎসব কেন্দ্রিক আর একটি নাট্যকেন্দ্রিক। গম্ভীরা উৎসবে নাচ, সঙের গান, মুখানাচ ইত্যাদি থাকে। মালদহ উত্তর অঞ্চলের রাজবংশী-দেশী-পলি সমাজে 'গম্ভীরা'-র একসময় উৎপত্তি হয়েছিল। এই সম্প্রদায় থেকে গ্রামের অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গান ছড়িয়ে যায়।

উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ঘটভরা, ছোট তামাশা, বড়ো তামাশা এবং অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অন্যদিকে গম্ভীরার অরেকটি নাট্যরূপ রয়েছে। 'পালাধর্মী গম্ভীরা গানের সূচনাপর্বটির নাম 'বন্দনা'। চার ব্যক্তি আসরে প্রবেশ করে পারস্পরিক সমস্যাদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। সমস্যাগুলির সমাধান প্রসঙ্গে তুমুল তর্ক-বিতর্ক করতে থাকেন, সমস্যার সমাধান করার জন্য, শেষ পর্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেব শিবকে আহ্বান জানান। 'শিবো হে' 'নানা হে' বলে সম্বোধন করেন। যথারীতি শিব হাজির হন, শিবের কাছে সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়, আবেদন নিবেদন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানানো হয়।"[৫]

এই গম্ভীরা গানের বর্তমান পরিবেশন ক্ষেত্রে রূপান্তর দেখা যায়। গম্ভীরা উৎসবের দিকটি খানিকটা স্তিমিত হয়ে লোকনাটকের আঙ্গিকের দিকে গম্ভীরার বর্তমান স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। 'গম্ভীরা'-র মধ্যে কোনো ঢিলেমির সুযোগ নেই। অত্যন্ত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে গম্ভীরা। নাটকের কাহিনীর বিষয়বস্তু ছোট ছোট স্কেচের আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সমসাময়িক কেন্দ্র করে গীত রচিত হয় বলে পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে

গম্ভীরা লোকনাটক ক্ষিপ্র গতিতে চলে থাকে। বন্দনা, চারইয়ারী, ডুয়েট, টনটিং এবং রিপোর্ট — এই বিষয়গুলো পূর্বের ধারাকে অনুসরণ করে রূপায়িত হলেও গম্ভীরার আসল চেহারার মধ্যে কিছু রূপান্তর ঘটেছে। যে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ভেতর গম্ভীরার সৃষ্টি হয়েছিল সেই গোষ্ঠীবদ্ধতা অতিক্রম করে বর্তমানে 'গম্ভীরা' বহুজনের সম্পদ হয়ে উঠেছে। তবে গম্ভীর' লোকনাট্যের প্রাণশক্তি প্রবল। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়েও এই লোকায়ত সংস্কৃতির নিজস্ব শক্তিটি উপযুক্ত উত্তরাধিকারের মধ্যে সঞ্জীবিত হচ্ছে। প্রাণিত ও বিকশিত হচ্ছে।''[৬]

কলকাতার যাত্রাপালার প্রভাব লোকনাটক শিল্পীদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। অনিবার্যভাবে সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি নাটকীয় দ্বন্দ্বে আঞ্চলিক যাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। গুণেশ্বর অধিকারীর পালা নাটক 'ময়নার চখুর জল' এবং 'ঘরজেয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকনাটকের চলতি ফর্ম ভেঙে এই দুটি পালা নাটক যাত্রার ঢং-এ পরিবেশিত হওয়া শুরু করলো। একসময় জনপ্রিয়তার চরমে উঠে এলো 'ময়নার চখুর জল' এবং 'ঘরজেয়া'। আঞ্চলিক ভাষায় এর স্বীকারোক্তি। '' নাট্যকার গুণেশ্বর অধিকারীর দুইখান ইতিহাস সিজ্জন করা পলা নাটক সাতশত রজনীর বেশী আসর হওয়া 'ময়নার চখুর জল' আর তিনশত রজনীর বেশী আসর হওয়া 'ঘরজেয়া' আজি ভাল্‌দিন বাদে ছাপার অক্ষরোত নিকিলা হইল।''[৭]

এইরকম পরিবর্তন দেখা যায় 'কুমারী কাঞ্চন বালা' পালা নাটকে। ভাষা, সংগীত, পোশাক, সংলাপে উচ্চারণ কৌশল, বিষয়বস্তু — সবকিছুতে লোকনাট্যের মূল উপাদান পরিলক্ষিত।

লোকনাটকের রূপান্তর নানা দিক থেকে ঘটেছে। বিষয়, আঙ্গিক, ভাষা, সাজ-সজ্জা, মঞ্চ এবং উপস্থাপনার মধ্যে আমরা দেখি পরিবর্তন।

'খন' লোকনাটকে একসময় রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণের বিষয়বস্তুই ছিল প্রধান। দক্ষিণ দিনাজপুরের 'খনগান' প্রবন্ধের লেখক খুশী সরকার লোকশ্রুতি (ডিসেম্বর ২০০৩) পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনিও মনে করেন, এক সময় খনের বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতো। সেই কাহিনীর ভেতরে সমসাময়িক ঘটনাকে যুক্ত করা হতো। এখন 'খন' সেই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে বর্তমানের ঘটনা নিয়েই চলছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ, সাক্ষরতার আন্দোলন, পঞ্চায়েতের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যবিধান — এই বিষয়গুলো 'খন'-এ গুরুত্ব পাচ্ছে। কৃষক আন্দোলনের কথাও বাদ যাচ্ছে না। তে-ভাগা আন্দোলন নিয়ে খুশী সরকার রচনা করেছেন 'খন'।

'গম্ভীরা' লোকনাটকের আদিরূপের সঙ্গে যুক্ত মুখোশ, মুখোশ নৃত্য এবং গাজন। এই সকল অনুষ্ঠানে রয়েছে তান্ত্রিক আচার ও অনুষ্ঠান। নির্দিষ্ট দিন থেকে শুরু হয় গম্ভীরা উৎসব। পূর্বে গম্ভীরার মধ্যে কৃষিকর্মের কথাই ছিল প্রধান। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে গম্ভীরার বিষয়বস্তু রূপান্তর ঘটে। পূর্বে কৃষির কথা ছিল—

"বৈশাখ মাসে শিবঠাকুর কার্পাস বুনিলেন।
বৈশাখ মাসে কিষাণ ভূমিতে দিল চাষ
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিলেন কার্পাস।

কৃষি-চাষের কথা শিবের মুখে এখন আর প্রধান নয়। বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নেতাদের ভূমিকা, দেশের সমস্যা — এগুলো নিয়েই গম্ভীরা। প্রায় সমস্ত লোকনাটকগুলোতে এই রূপান্তর পরিলক্ষিত। পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যনির্ভর নাটকগুলোতেও অভিনেতাদের মুখে এসেছে বর্তমান সমাজের সমস্যাজর্জরিত বিষয়।

এখন প্রত্যেকটি পালানাটকে ভাষারও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বে একটা অঞ্চলের ভাষার উপর নির্ভর করেই নাটকগুলোর সংলাপ তৈরী হতো। বর্তমানে নানা জায়গার মানুষের মিশ্রণের ফলে ভাষার আঞ্চলিক রূপটিও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন চরিত্রগুলির সংলাপে লক্ষ করা যায়।

মঞ্চের ব্যবহার বরাবরই সহজ-সরল ছিল। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে একই মঞ্চ সব দলগুলোর জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দলগুলোকে পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করতে হয়। অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য সাজ-সজ্জায় আর পূর্বের ঢিলে-ঢালা ভাব চলে না। আধুনিক সাজ-সজ্জার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রচলিত লোকনাটগুলোতে কোনো দৃশ্য বিভাজন ছিল না। আধুনিক নাটকের প্রভাবে অনেক লোকনাটকে দৃশ্য-বিভাজন বা অঙ্ক ভাগ থাকে। তরাই অঞ্চলের বর্তমান পালাটিয়া নাটকে অঙ্ক বিভাগ বা দৃশ্য বিভাগ দেখা যায়। লোকনাটকগুলোতে পূর্বে মঞ্চে আলোর উৎক্ষেপন এবং শব্দবিস্তার যন্ত্রের ব্যবহার হতো না। এ দুটোর ব্যবহার এখন সাধারণ ব্যাপার। লোকনাটকগুলোতে এ ধরনের পরিবর্তন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

এই লোকনাটকগুলোও আবার আধুনিক বাংলা নাটককেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। নাটকের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য আঙ্গিক ও উপাদানের দিকে দৃষ্টি দিলে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"বাংলা আধুনিক নাটকের সূচনা পর্বের বিখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন 'স্বপ্নধন' নামক একটি রোমান্টিক নাটক রচনা করেন। বাংলাদেশের একটি প্রচলিত রূপকথাকে অবলম্বন করেই 'স্বপ্নধন' নাটকের কাহিনীটি রচিত। দুটি ভিন্নদেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যা কিভাবে পরস্পরকে স্বপ্নদর্শন করে কিভাবে প্রেমাসক্ত হয়ে পরিশেষে মিলিত হলো, নাটকে তাকেই পরিবেশন করা হয়েছে।"[৮]

রূপকথা নিয়ে গিরিশচন্দ্রের 'মায়াতট', 'মলিনমালা', মীর মোশারফ হোসেনের বসন্ত কুমারী, অমৃতলাল বসুর 'বিমাতা' বা বিজয় বসন্ত নাটকটিও এক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়। সংলাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছড়ার ঐতিহ্যকে স্বীকার করা হয়েছে।

আধুনিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কল্কি অবতার' নাটকে নদীয়ার বোলানগানেরসংলাপের ব্যবহার বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অতি আধুনিক বাংলা নাটকে লোকনাটক এবং লোক আঙ্গিকে অভিনয় উপযোগী সাংস্কৃতিক বিনোদনের প্রভাব বিকশিত হয়ে উঠেছে। মূল শিকড় থেকে রস সঞ্চয় করে অনেক আধুনিক নাটক তার জীবন শক্তিকে ব্যবহার করেছে। এমনকি গণনাট্যের কথা ধরলে প্রকৃতপক্ষে তা জনগণের নাটক তথা লোকনাটকের কথাই এসে যায়। গ্রাম বাংলার কবি গান, তরজা, বনবিবিরপালা, আলকাপ, বোলান, দোতরা, কুশান, বিষহরা, পালাটিয়া প্রভৃতি পালা গান বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ। এই অগণিত গ্রাম বাংলার মানুষের সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে গণনাট্য তার নিজস্ব ধ্বজা উড্ডীন করেছে। একটু ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে তা লোকনাটকের ছবি।

"এক কথায় বলা চলে লোকাভিনয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত ধারাটি বারবার বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেছে। সমসাময়িক নাটক প্রসঙ্গে ঐ একই কথা বলা চলে। এ যুগের অধিকাংশ নাটকেই ছড়িয়ে আছে আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, ভাষা ও সংলাপও নানা লৌকিক প্রভাব।"[৯]

চল্লিশের দশকের 'নবান্ন' নাটক থেকে শুরু হয়ে গেল গ্রাম বাংলার লোক আঙ্গিকের বিষয়বস্তু এবং লোকনাটকের বিশেষে কৌশলকে গ্রহণ করার প্রবণতা।

"নবান্ন নাটকের শেষ দৃশ্যে গ্রামবাংলার জনপ্রিয় লোকউৎসবের একটি সার্থক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে কৃষকেরা অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে কৃষক রমণীরা গান ধরেছে, মোরগের লড়াই শুরু হয়েছে, যার মোরগ জিতেছে তবে নতুন একখানা কাস্তে উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে।

মোরগের লড়াই এর পরে গরু দৌড় সব মিলিয়ে লোক সংস্কৃতির একটি সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষক রমণী গান গেয়ে উঠেছে একান্তভাবে লোকসঙ্গীতের ঢঙে ও বিষয়বস্তুতে — "নিস লো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলী। ডুরে শাড়ী পাছাপাড় আর হার সাতনলি কনে দেখা আলো মেখে আসবে বধূ আলবেয়ে। দেখে হেসে সরে যাবি কথা না ক'য়ে।"[১০]

নাট্যকার সলিল চৌধুরীর 'মৌ-চোর'-এ সুন্দরবন এলাকার বনবিবি পালার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। নাটকের কাহিনী, সংলাপ, এমনকি গতিতেও লোককাহিনী বনবিবির প্রত্যক্ষ ছাপ দেখে আমরা বুঝতে পারি লোকনাটক আধুনিক নাটকের শিকড়ে গ্রথিত হয়ে আছে।

"বাংলা নাটকের ট্রাডিশন বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে যে একান্তভাবে যুক্ত এই যুগের কিছু কিছু

নাটক পর্যালোচনা করলে, তার বিষয়বস্তু প্রকাশরীতি, সংলাপ, শব্দ ব্যবহার ইত্যাদির গভীরে প্রবেশ করলে একথার সত্যতা অনুভূত হয়।''[১১]

নট ও নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' মনসামঙ্গলের কাহিনীর উপর নির্ভর করে তৈরী। মনসামঙ্গল বা বিষহরা পালানাটক শুধু উত্তরবঙ্গে নয় সারা বাংলাদেশে অভিনীত হয়ে থাকে। এই গ্রামীণ পালানাটক শুধু উত্তরবঙ্গে নয় সারা বাংলাদেশে অভিনীত হয়ে থাকে। এই গ্রামীণ পালানাটক 'চাঁদ বণিকের পালা' পরিকল্পনায় প্রয়োজনমাফিক মশলা জুগিয়েছে।

'' 'মারীচ সংবাদ' (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) যে রেখটিয় প্রভাবেই তৈরী হয়নি বরঞ্চ এই নাটকের সর্বাঙ্গেই যে একান্তভাবে লোকনাটক, লোকাভিনয়ের বিভিন্ন ধারার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট একথা নাট্যকারের সঙ্গে সকলেই একমত হতে পারেন। নাটকটির সর্বদেহে ছড়িয়ে আছে বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সুস্পষ্ট চিহ্ন। রামায়ণের রাবণ মারীচের চিরকালীন সংবাদটি লোকআঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার।''[১২]

'খড়ির গণ্ডি' আধুনিক বাংলা নাটকটিও বাংলার লোকনাটকের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেনি। নাটকটিকে মজবুত করার জন্য লোকনাটকে অবগাহন করতে হয়েছে।

মালদার গম্ভীরা লোকনাটকের আঙ্গিক, প্রকরণ-রীতি পরিবেশন পদ্ধতিতে বাংলা, আধুনিক নাটকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানা হে' নাটকের নামকরণের মধ্যে গম্ভীরার প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ পেয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শহর বালুরঘাটের 'ত্রিতীর্থ' বাংলার নাট্যজগতে একটি পরিচিত নাট্য সংস্থা। ত্রিতীর্থের 'দেবাংশী' নাটকের বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে লোকনাটকের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনসার গানের বর্ণনা, লোকজীবনের থিম, বাদ্যকারদের বাদন প্রক্রিয়া - প্রায় সবকিছুই লোক আঙ্গিকে লোকজীবনের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে 'ত্রিতীর্থ'। লোকনাটকের রস সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে এই নাটকে। ফলেই 'দেবাংশী' এত বেশি আকর্ষক হয়ে উঠেছে। হরিমাধববাবুর মন্ত্রশক্তিতে যশোদার চরিত্রের মধ্যে লোকনাটকের ব্যবহারিক দিকটিও প্রকাশিত হয়ে উঠেছে।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি উত্তরবঙ্গের পদ্মপুরাণ বা বিষহরি পালাগানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর কালজয়ী নাটক 'ছেঁড়াতার'-এর ভাষা আঞ্চলিক। অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার লোকনাটকের ভাষাকে 'ছেঁড়াতার' নাটকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে লোকসংস্কৃতির লোকনাটক, লোকজীবন এবং লোকগানের প্রভাব সাতের দশকের পর থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠতে শুরু করলো। বিদেশী প্রভাবে আমাদের থিয়েটার জগৎ একসময় গড়ে উঠেছিলো। নানা জনমুখী আন্দোলন এবং গরমুখী ভাবনাচিন্তার প্রয়াস ঘটার সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারগুলি দেশের শিকড়ের সন্ধানে মুখ ফেরাতে শুরু করলো।

''১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নান্দীকার প্রযোজিত 'তিন পয়সার পালা' দিয়ে বাংলা মঞ্চে নিয়মিত ব্রেখট চর্চা শুরু হল। ব্রেখটের অনেক নাটক অনুবাদ ও রূপান্তর ঘটিয়ে যেমন অভিনীত হতে শুরু হল। তেমনি ব্রেখটীয় আঙ্গিকের ব্যবহার করে অসংখ্য নাট্যচর্চা হতে লাগল। এইসব নাটকে নাচ-গান কোরিওগ্রাফির ব্যবহার করে একটি বিশেষ ধরনের চলনের নাটক তৈরী করা শুরু হল এবং এক্ষেত্রে বাংলা লোকগানের নানান রকমের সুর প্রযুক্ত হতে লাগল।''[১৩]

লোক আঙ্গিককে ব্যবহার করে শাঁওলি মিত্র 'নাথবতী অনাথবৎ' নাট্য গড়ে তুলেছেন। এতে দেশের পুরানো লোকনাটকের ঐতিহ্যের কথা দর্শকদের মনে করিয়ে দেয়। বহরমপুরের 'প্রান্তিক' নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের পাঁক নাটকে 'আলকাপ' লোকনাটককে সচেতনভাবে ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করেছেন। নির্দেশক প্রদীপ ভট্টাচার্য আলকাপ দিয়ে 'মায়া' নাটক নির্মাণ করে পরিবেশন করেন। ময়মনসিংহের গীতিকা অবলম্বনে নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তীর 'মাধব মালঞ্চি কইন্যা' তৈরী। লোকগীতিকার বর্ণনাময়তাকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে নাট্যকার যেভাবে পরিবেশন করেছেন — বাংলা নাটকের ইতিহাসে তা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কোচবিহারের দোতরা পালা লোকনাটকের ভাষা, সংগীত, নৃত্য-বাদ্য সবকিছুর প্রভাবে তৈরী হয়েছে, 'ময়নার চখুর জল' এবং 'ঘরজেয়া' দুটি যাত্রাধর্মী নাটক। 'নবাব' নাটক কোচবিহারের নীরজ বিশ্বাসের লেখা। 'নবাব' অভিনয়ের প্রতি দৃশ্যে লোক জীবনের ছায়া ছড়া লক্ষ করা যায়। দোতরা বা কুশান গানের দোয়ারী যেমন মাঝে মাঝে বর্তমান আর্থকাঠামোর কথা বলতে গিয়ে নিজের অভাবের কথা বলেন ঠিক তেমনি ভাবে 'নবাব' নাটকের শেষ দৃশ্যে পাল মামুদের উক্তি শোনা যায় — ''বেশিদিন ধরি কাম নাই। ঘরত খাবার নাই। বাতি জ্বালাবার ক্যারাসিন নাই। সতে সতে মোর বাতিটাও নাই। সব শ্যাস...।''

নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 'খারিজ' নাটকের বিষয়বস্তু পালাটিয়া নাটক মাইয়া বন্ধকী অথবা হালুয়া হালুয়ানী-র কথা মনে করিয়ে দেয়। কাব্য নাট্যের মধ্যেও লোকনাটকের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অজিতেশ ভট্টাচার্যের লেখা 'লখিন্দর যুদ্ধে যায়' উল্লেখযোগ্য। শিলিগুড়ির নাট্যচর্চার ইতিহাসে লোক আঙ্গিকের ব্যবহার খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারাই অব্যাহত। তবে অনুসন্ধানে জানা যায় ''১৮৯২ খ্রী: জমিদার দর্পনারায়ণের বাড়িতে দুর্গাপূজো উপলক্ষে শিলিগুড়িতে প্রথম নাট্যবিষয়ের সূচনা ঘটে। এই নাট্যাভিনয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ফর্মে নয়, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকে লোকনাট্যের ফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।''[১৪]

শিলিগুড়িতে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, মিত্র সম্মিলনী থেকে শুরু করে বর্তমান 'সৃজন সেনা' পর্যন্ত বহু নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা প্রচুর আধুনিক বাংলা নাটক বঞ্চস্থ করেছেন। এগুলির বেশির ভাগ নাটকেই লোক আঙ্গিকের ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। এক্ষেত্রে সমালোচকের কথা লক্ষ করা যেতে পারে — "সামগ্রিকভাবে দেখলে বাংলা নাটক যেমন তার নিজস্ব লোকরীতির যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান প্রভৃতির উত্তরাধিকার পায়নি, অনুসরণ করেছে বিদেশী প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঐতিহ্য, যা এসেছে এলিজাবেথীয় থিয়েটার থেকে, তেমনি বলা যায় 'উত্তরবঙ্গ' — আমাদের আলোচ্য শিলিগুড়ির, দেশের সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাট্যচর্চার মূল ধারাটির উত্তরাধিকার পায়নি। তাই পালাটিয়া, খন, গম্ভীরা ইত্যাদির পরিবর্তে এ অঞ্চালেও মূলতঃ দেখা যায় প্রসেনিয়াম থিয়েটারভিত্তিক নাট্যচর্চা গ্রামে গঞ্জে শহরে। বিগত একুশশতক ধরে তাই চলে আসছে। এক্ষেত্রে কলকাতার পেশাদারী-অপেশাদারী নাট্যচর্চার প্রভাব অপরিহার্য ভাবে পড়েছে — মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া।"[১৫]

শিলিগুড়ির মিত্রসম্মিলনী মঞ্চে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক সংঘের আয়োজনে 'ছেঁড়াতার' মঞ্চস্থ হয়। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার'-এর মধ্যে লোকভাষা ও লোক আঙ্গিকের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'ছেঁড়াতার' অবশ্য শিলিগুড়ির রঙ্গনও মঞ্চস্থ করে। 'রঙ্গন'-এর একটি নাটক 'তিতাস'-এ লোকজীবনের চরিত্র, জীবন-জীবিকার সংগ্রামের দৃশ্যে প্রতিফলিত হয় লোকনাটকের কিছু ভাবধারা।

'মঙ্গলকাব্যের' প্রভাবে তৈরী নাটক 'রয়নি পালা', 'কর্ণিক' নাট্যগোষ্ঠীর নাট্য প্রযোজনায় লক্ষ করা যায় লোকনাটকের প্রভাব। দামামার 'দংশিত চাঁদ' চাঁদ সদাগরের লোককাহিনীকে নিপুণভাবে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। লোকায়ত জীবনের বিষহরি পালার ভেতরের সুরকে মনে করিয়ে দেয়। 'সৃজনসেনা' নাট্যগোষ্ঠী বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে লোকনাটককে আধুনিক নাটকে ব্যবহার করে সফলতার চরমে নিয়ে যাচ্ছে। 'কবিগান'-এর আদলে লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

'তিস্তাবুড়ির গান বা মেছেনি'র গানকে মনে রেখে 'সৃজনসেনা'-র 'কান্দন মুছিবার গল্প' লোকআঙ্গিকে ভরা নাটকটি মনে রাখার মতো। বলা যেতে পারে বর্তমান বাংলার আধুনিক নাটকেও লোকনাটকের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

"মাটি ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না, মাটির মধ্য থেকেই বৃক্ষ যেমন তার প্রাণরস আহরণ করে। তেমনি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদনা — তার নৃত্যগীতি, প্রবাদ-প্রবচন, কিংবদন্তী, লোককথা, পাঁচালী, কথকতা, লোকবিশ্বাস, আচার-আচরণ ইত্যাদি বাংলা নাটকের মাটির কাজ করেছে। যার মধ্যে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আজও সে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।[১৬]

সুতরাং আমরা বলতে পারি লোকনাটকেরও বিভিন্ন বিষয় নানাভাবে বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেছে।

## তথ্যসূত্র


১। ড. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ।

২। মানস মজুমদার, লোক ঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ: ১৪৬।

৩। ড. ময়হারুল ইসলাম, ফোকলোর ঃ পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, পৃ: ৪৯৫।

৪। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায়, উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা, পৃ: ৯৩।

৫। পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ: ৩১।

৬। পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ: ৭৪।

৭। গুণেশ্বর অধিকারীর পালা নাটক 'ময়নার চখুর জল', 'ঘরজেয়া'র নিবেদন অংশ থেকে গৃহীত।

৮। ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, পৃ: ৯০।

৯। ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, পৃ: ২৪৩।

১০। ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, পৃ: ২৪৭।

১১। ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, পৃ: ২৫৫।

১২। ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, পৃ: ২৬৩।

১৩। তথাগত চক্রবর্তী, অনুষ্টুপ ঃ নাট্য বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা।

১৪। ড. অপরেশ লাহিড়ী, উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাস, পৃ: ১৯৮।

১৫। ড. অপরেশ লাহিড়ী, উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাস, পৃ: ১৯৭, ১৯৮।

১৬। ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, পৃ: ২৭৩।

# উপসংহার

১.

আমরা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য পরিক্রমা এখানে সমাপ্ত করলাম। লোকনাট্য লোকসাহিত্যের একটি প্রকাশ রূপ। লোকসংস্কৃতির পকাশ নানামুখী। লোকনাট্য লোকসাহিত্যের একটি শাখা বিশেষ। উত্তরবঙ্গের জনসমাজ দীর্ঘকাল সংহত এক মানবগোষ্ঠীরূপে একটি ভূখণ্ডে, একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে আসছে। এদের মধ্যে জাতিগত বৈচিত্র্য আছে। সব জায়গায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হারও সমান নয়। তবু মোটের উপর সেই জাতি-উপাদানগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে একটি সংহত সমাজের সংস্কৃতি রূপে অভিহিত করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো জনজাতি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু মূল ধারার সংস্কৃতির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটেনি। সমাজের উপরে পরিবর্তনের হাওয়া অল্পবিস্তর বয়ে গেছে বটে, কিন্তু তার মূল প্রকৃতিকে বদলে দিতে পারেনি। বদল হয়েছে বাইরে বাইরে, কোথাও কোথাও তার অভিঘাত কিছু দূর পর্যন্ত ভিতরে এসে পৌঁছায়নি এমন নয়, কিন্তু মানবগোষ্ঠীর জীবনধর্মকে তা সমূলে নাড়া দিতে পারেনি। দীর্ঘকাল সে তার প্রজন্মবাহিত ঐতিহ্য পরম্পরাকে রক্ষা করে চলেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে নগরায়ণের নানা প্রক্রিয়া এ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে। পরিবর্তনের নানামুখী অভিঘাত মানবজীবনে এসে পড়েছে। বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির ধরন-ধারনে অনেক বদল এসেছে। কিন্তু সমাজের যে সৃষ্টিশীল মন লোকসাহিত্যের স্রষ্টা, তার ভিতরে ভাঙনের ঢেউ তেমন করে লাগেনি। এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও (সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও) লোকসংস্কৃতির এই দিকটির প্রতি উদাসীন নয়। তার ফলে ঐতিহ্যবাহিত এই সংস্কৃতির রূপ পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি। মনে হয় এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ভিতরেই একটা প্রাণ-শক্তির প্রবলতা আছে যা হাওয়া বদলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পেরেছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় লোকনাট্যের এক একটি পালা আগে যেখানে দীর্ঘ সময় নিয়ে অভিনীত হত, এখন তার সময় সঙ্কুচিত হয়েছে বটে, কিন্তু লোকনাট্য একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। সংস্কৃতির এই শিকড়সন্ধানী মানসিকতা এর মূলে কাজ করে যায়। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ একে বিনষ্ট হতে দেয় নি। উত্তরবঙ্গের লোকসামজে সাহিত্যরূপকে এই প্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

২.

সে বিচারে যাবার আগে সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য সম্বন্ধে একটি কথা বলা যায়। উত্তরবঙ্গ নামের যে প্রচলিত ভূভাগ আসাম সীমান্ত থেকে পূর্বে গঙ্গা বিধৌত মালদহ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত, তার জনজীবনের সংহতি থাকলেও তা এক এবং অবিভাজ্য নয়। এখানকার মানুষের প্রধান অংশ যদিও রাজবংশী জনসাধারণ,

কিন্তু অন্য শ্রেণীর মানুষও এখানে কম নেই। তাছাড়া জনজাতির যে অনুপাত এই সাহিত্যের রসায়নে কাজ করে তার অল্প বিস্তর পরিবর্তনে সাহিত্যের রূপ ও রসের বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই বৈচিত্র্য উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের একটা লক্ষণীয় দিক। পশ্চিমে কোচবিহার থেকে পূর্বে মালদহ পর্যন্ত এলাকায় লোকনাট্যের কত না বৈচিত্র্যময় রূপ। কোচবিহারের ইতিহাসে দেখা যায় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ গান কুশান হিসেবে একদিন শুরু হয়েছিল। তারপর ৪০০ বছর ধরে তার রূপের বিবর্তন হয়েছে কিন্তু সে ধারা অব্যাহতভাবে চলেছে। কী ছিল যে রাজাদের মনে, যখন তাঁরা এই রামায়ণ গানের শিল্পীদের উৎসাহবর্ধক সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন — তার খবর কিছুটা আঁচ করা যায়। কিন্তু এখানে সেকথা বলবার প্রয়োজন নেই। আমাদের আসল লক্ষ্য — এই দেখানো যে উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের বৈচিত্র্য কতো রূপময়। কুশান অবিসংবাদিতভাবে পুরাণনির্ভর রামকথার সঙ্গীত-নাট্য রূপায়ণ, এবং তা কোচবিহারেরই নাট্যরূপ। কিন্তু কোচবিহারেই তার পাশে আছে দোতরা পালা যা একান্তই রসবাদী গীতিনাট্য চেতনার ফসল। রামকথার সঙ্গীতনাট্য যদি হয় পুরাণ কথার বিস্তার — যদি তার উদ্দেশ্য হয় ভারতকথার আদর্শকে জনজীবনে রূপায়িত করা, তাহলে তরাই অঞ্চলের রাজধারী কিংবা অন্য জায়গার রামবনবাস বা রাবাণ-এর উদ্দেশ্যও অনেকটা সেই মহৎকথাদর্শে মানবজীবনকে সঞ্জীবিত করা। বিশেষ করে শিলিগুড়ি সন্নিহিত অঞ্চলের 'রাজধারী' এই রাম রাবণের বিরোধকেন্দ্রিক পালানাটক যেখানে রামায়ণের মহৎ আদর্শের সঙ্গে এসে মিশেছে লৌকিক বৈষ্ণবতা — গৌরবন্দনা দিয়ে এ পালার সূচনা — 'গৌর ওই আমি আর না হেরিবো রে গৌর', আর রাবণের রামচন্দ্রের কাছে আধ্যাত্মিক আশ্রয় ভিক্ষা করে এর সমাপ্তি। উত্তরবঙ্গের এই নাট্যপালাগুলিতে রামভক্তির বিচিত্র রূপ — লোকজীবনে এই ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে।

কুশান যদি হয় পুরাণ নির্ভর পালা — কোচবিহারের দোতরা সেখানে লৌকিক কিংবা কিছুটা রূপকথা, পীরকথা, পুরাকথার রসমিশ্রিত পালানাটক। আর এই নাটকগুলিতে বেশি করে ফুটে উঠেছে লোকজীবনের আকাঙ্ক্ষা, লোকজীবনের ছবি — তার পরিচয়। বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলীতে ফুটেছে অধরা প্রেমের জন্য জীবনব্যাপী প্রতীক্ষার ছবি, তীব্র ঈপ্সা, রমণীপ্রেমের জন্য হৃদয়ের গভীর আততি, আর অপ্রাপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস — যে প্রেমের ছবি প্রাচীন ভারতীয় নাটকে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং রসভাস্বর — এখানে তার লৌকিক প্রতিবেদন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লোকজীবনের কথাকাব্যে কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে হয়। "কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"[১] দোতরা পালায় লোককবির কল্পনার একদিকে আছে অতিচারী অতীতচারী বিস্তার অন্যদিকে তাকে নিজের সমাজের জীবনকে রূপ দিতে হয়েছে। এসব পালানাটক গ্রামীণ মানুষের কল্পনাকে, রোমান্টিক ভাবনাকে যেমন উদ্রিক্ত করে দিয়েছে তেমনি

দিয়েছে তাকে গল্পরসের অফুরন্ত যোগান। এই দোতরা পালার কাহিনীগুলি পুরাণকথার থেকে আলাদা, তার নৈতিকতা পুরাণের নৈতিকতা নয়, কিন্তু তার ভিতরে লোকসমাজের নৈতিকতা এবং লোক সমাজের মনোধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক মানস মজুমদার এই পালাটিকে বলেছেন রূপকথাধর্মী[২]। রূপকথার মধ্যে থাকে নায়কের অসম্ভবকে সম্ভব করার কাহিনী। এই নাটকেও তাই দেখতে পাই। কিন্তু বাস্তব জীবনের শিক্ষা মানুষকে বলে এখন আর অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় না। রূপকথার কাহিনী ইচ্ছাপূরণের কথা বলে, আর লোকনাটক বলে বাস্তবতার কথা। অধরাকে যে পাওয়া যায় না সেটাই লোককবির শেষ সত্য নয়, তাকে পাবার জন্য চাই সাধনা। বিশ্বকেতুর সেই জীবনভর সাধনায় পালা শেষ হয়।

মুনি — "হু মুই অনেকদিন থাকি জানং বিশ্বকেতু, তুই মোর কাছে আসিবু। ক তো কেনে বিরাচিস।

বিশ্বকেতু — মুনিঠাকুর, মুই চন্দ্রাবলী কন্যার জন্য বাহির হইচং। মুই কেমন করি চন্দ্রাক পাইম ঠাকুর। একটা উপায় করি দেও।

মুনি — বিশ্বকেতু, তুই সামান্য মানুষ হয়া দেবকন্যা বিয়া করিব চাস — এতে তোর বহুত কষ্ট হবেরে।

বিশ্বকেতু — তা হোক মুনি। আমাক চন্দ্রাবলী কন্যা আনি দেও।

মুনি — তবে তুই এইটে থাক সন্ন্যাসী হয়া — আমি একটা উপায় করি চন্দ্রাবলী কন্যা আনি দিম্।"[৩]

এখানে নাটক শেষ হয়। এই জীবনব্যাপী সাধনাই অধরাকে পাবার সাধনা। লোকজীবনের এই দর্শনটুকু যেভাবে পরিণতিতে ব্যক্ত হয় — নাটকের উপসংহার হিসাবে তার উপস্থাপনা এবং তার সৌন্দর্য বিস্ময়কর।

অন্যদিকে 'আলমসাধু' দোতরা পালায় পাই সমাজের বিশেষ মতাদর্শ প্রভাবিত জীবনের কাহিনী। নারীর প্রতি পুরুষের যে যুগ যুগ সঞ্চিত অবিশ্বাস, সংসারে কন্যা সন্তানের যে অপ্রয়োজনীয়তা, তাকেই লোকমানসে প্রতিষ্ঠা দিতে কাহিনীর আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের এই সমাজ সম্পর্ক দীর্ঘকালের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক। 'আলমসাধু' গল্পে সেই সম্পর্কের অবিশ্বাসের দিকটি যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি তার উপরে একটা অনুলেপন হিসেবে এসেছে পীরের অলৌকিক শক্তির কথা। এইসব লোকনাটকের কাহিনীর মধ্যে সমাজে মতাদর্শ ফুটেছে — তাতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই একটা বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে — নারী অবিশ্বাসিনী — নারী অপ্রয়োজনীয় — নারীকে যদি যথাসময়ে বশ করা না যায় তাহলে সে সংসার জীবনের স্থিতিকেও বিঘ্নিত করতে পারে। শত সহিষ্ণুতাতেও তাকে সহনীয় করে তোলা যায় না।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার অঞ্চলের এই পুরাণ ও পুরাকথা নির্ভর কাহিনী জলপাইগুড়ির 'চোরচুরণী' পালায় নেই। একান্ত লৌকিক জীবনের কাহিনীকে সেখানে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। তাতে একদিকে আছে

সম্ভবত পুরাতন যাদু বিশ্বাসের রেশ, অন্যদিকে আছে নিতান্ত দরিদ্র মানুষ — যে অভাবে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে তার দৈন্য পীড়িত জীবনের উন্মোচন।

চোর চুরণীর প্রেম ভালোবাসা - তাদের অভাব অভিযোগ — চুরি করে উপার্জন করার চেষ্টা, সংসারে একটু সচ্ছলতা আনার উপায় — স্ত্রীকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেবার অভিপ্রায় এবং পরিণতিতে চুরি করবার অপরাধে ধরা পড়ার কাহিনী বেশ নাটকীয় ভাবে বাস্তব মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে চিত্রিত করেছে। 'কুশান' পালায় মানুষের আদর্শ লোকের প্রতি অনুরাগই লক্ষ্য আর 'চোর চুন্নী'তে তার বাস্তব জীবনের রূপ ফুটিয়ে তোলাই কবির অভিপ্রায়। উত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের 'খন'গানে ফুটেছে এই দৈনন্দিন বাস্তবতার ছবি। এই গান বা পালা নাটকের কাহিনীতে এসেছে দৈনন্দিন জীবনের পরিচয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য এইগুলির মধ্যে লোকনাট্যের যথার্থ রূপ খুঁজে পেয়েছিলেন। এগুলির ধর্ম নিত্য পরিবর্তনশীলতা। প্রতিবছরের লোকসমাজের টাটকা কোনো আখ্যান, বিশেষত কোনো অবৈধ্য প্রেম-প্রসঙ্গই এর বিষয়। একারণেই এগুলির প্রাচীন রূপ রক্ষিত হয় না। পালার বিষয় প্রায়ই বদলে যায়। প্রতি বছর নূতন গান বাঁধা হয়। সেইগান অভিনীত হয়। পালার এই পরিবর্তনশীলতাই লোক সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম। সেখানে কোনো কিছুই স্থির থাকে না। বাংলা ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রেই ছড়াগুলিকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[৪] লোকসাহিত্যের যে কোনোর শাখারই এই পরিবর্তন ধর্ম তার প্রকৃতি ধর্ম। খন গানে সমাজের কথা অনেক বেশি পাওয়া যায়। এই পালাগুলির পরিবর্তন হলেও পালাগুলির ভিতরে গ্রামীণ মানুষের যে জীবনবোধ তাতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বলেছিলেন। ''আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পল্লীর কবি যে ছড়া রচনা করিয়াছে, তাহাকে এক হিসাবে মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলা যায়; কারণ গ্রামের প্রাণটি যেখানে ঢাকা থাকে কালস্রোতের ঢেউগুলি সেখানে তেমন জোরের সঙ্গে ঘা দিতে পারে না।''[৫]

এই যুক্তিতেই বলা যায় লোকনাট্যগুলির বিষয়ের পরিবর্তন হলেও তার মর্মমূলে গ্রামের ঐতিহ্য শাসিত প্রথাগত জীবনবোধই কাজ করে যায়। এই দিক থেকে লোকনাট্যের বিষয়গত পরিবর্তন যাই ঘটুক, তার জীবনধর্মে সেই সংহত গ্রামীণ লোকসমাজের ধ্যানধারণাই থেকে যায়। 'গম্ভীরা' পালা নাটকের যে রূপে উপস্থাপনা দেখা হয় তাতে পালাগানের রূপ প্রতিবছরই সমসাময়িক বিষয়কে নিয়ে রচিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এই পালার গানগুলিতে থাকে আধুনিকতার সমালোচনা, এবং প্রথাশাসিত জীবনের প্রতি সহানুভূতি। আমরা আগেই গম্ভীরা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন উদ্ধৃত করেছি। সেখানে স্ত্রী বাইরে চাকরি করতে চায় — চাকরির পক্ষে যুক্তি দেখায় — স্বামী স্ত্রীকে চাকরি করতে দিতে চায় না।

স্বামী : তুই ভাজিস মুড়ি, হামি বেচবো, কোথাও যেতে দিব না।[৬]

এখানেই ধরা পড়েছে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের প্রথাবাহিত গ্রামীণ জীবনধর্ম প্রভাবিত চিন্তা। কিন্তু উত্তরবঙ্গের একটি বিশেষ পালায় ফুটেছে নারীর স্বাধীন বোধের কথা। 'শাস্তরী' পালা 'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' পালায় তারই স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। মুকচাটু গোঁসাই-এর পালা কিংবা নয়ানশোরীতেও তা দেখা যায়। বৈষ্ণব গোঁসাই-এর সঙ্গে লোক সমাজের কোনো বিধবা নারীর বিতর্কে — বিধবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখানো এসব পালার লক্ষ্য। এই পালায় লোক সমাজে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব — দোতরা পালার 'আলম সাধু' ইত্যাদির বিপরীত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। নারী এখানে নিজের স্বাধীন ভূমিকার স্বীকৃতি লাভ করে। অন্য সমাজে বিধবানারীর শুভকর্মে অধিকার নেই। উত্তরবঙ্গে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার শাস্ত্রীয় তর্ক এই শাস্তরী পালাগুলিতে দেখান হয়েছে। নয়ানশোরী বা মুকটাকু বা জ্ঞানবালারা নারীর সামাজিক ভূমিকা বিষয়ক বিতর্কে গোঁসাইদের যুক্তিকে খণ্ডন করে। গোঁসাইরাও তাদের অধিকার মেনে নেন। আমরা আগে বলেছি লোকনাটক নানা আচার প্রথা বা লোকজীবনের নানা ঘটনার অনুকৃতিমূলক। সম্ভবত এ ধরনের কোনো সামাজিক বিতর্কই এ পালার অনুকরণের বিষয়। এ থেকে মনে করা যায় উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে নারীর ভূমিকার স্বীকৃতি ছিল। 'দস্যুকন্যা কালিন্দি' নাটকেও তার পরিচয় পাই। এই নাটকগুলি নানা দিক থেকে জনজীবনের নানা প্রশ্ন ও সমস্যাখচিত বাস্তবচিত্রকে নাট্যরূপে প্রতিফলিত করেছে। তার ভিতরে বাস্তব অবস্থার চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে কল্পনা লোকের চিত্র, তার পাশে আছে নৈতিক জীবনের একটি আদর্শকে লক্ষ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করে তার জীবনকে সেই আদর্শে প্রাণিত করে তোলা। আর অঞ্চলভিত্তিক এ লোকনাট্যগুলির রসবৈচিত্র্যও — যথেষ্ট তা উল্লেখযোগ্য।

৩.

এখন প্রশ্ন এই লোকনাট্যগুলির শিল্প সার্থকতা কতোখানি ? লোকসাহিত্যের শিল্প সার্থকতা বিচার সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের বিচার সূত্র প্রয়োগ কিছুটা অবিচারেরই নামান্তর। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। যদিও বিচার প্রসঙ্গে নয়, তবু তিনি যে কথা 'ছেলে ভুলানো ছড়া (১)' প্রবন্ধে বলেছিলেন তা এক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। তিনি বলেছেন "আট ঘাট বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয় — যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা।"[৭]

এই কথা মনে রেখে কয়েকটি বিষয়ে, লোকনাট্যের শিল্পমূল্য বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত এই লোকনাট্যগুলি দীর্ঘকাল লোকায়ত সমাজ মানসের রস পরিতৃপ্তি সাধন করে আসছে। মানুষ এগুলি থেকে মনোরঞ্জনের উপাদান যেমন পেয়েছে তেমনি তার ভিতরকার লোকশিক্ষার উপাদানও যথেষ্ট পেয়েছে। ড.

অজিতকুমার ঘোষ মনোরঞ্জন এবং লোকশিক্ষাকেই এই নাট্যের লক্ষ্য বলেছিলেন। গ্রামীণ মানুষের রসতৃপ্তির উপকরণ হিসেবে এ লোকনাট্যগুলির ভূমিকায় পুনর্বিচার করা চলে না। দীর্ঘকালে ধরে সমাজে তার প্রচলনই তার প্রমাণ। কালের বিচারই এখানে শ্রেষ্ঠ বিচার লোকসাহিত্যের একটি ধর্মের কথা আগেই বলেছি। তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। যদি তার দ্বারা মানুষের এই মনের ক্ষুধা না মিটত তাহলে তা কবেই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেত। তা যখন হয়নি তখন একথা ধরেই নিতে হবে — যে সমাজে এগুলির উদ্ভব সেই সমাজের মানুষের মনে দাগকাটার মতো একটি ভূমিকা এই লোকনাট্যগুলির আছে। কোনদিক থেকে তা মানুষের মনের তৃপ্তি সাধন করে ? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমত বলা যায় — তার কাহিনীরসই মানুষের পরিতৃপ্তি সাধনের প্রথম সহায়ক। লোকনাট্যগুলির কাহিনী জটিল কিছু নয়। সরল সহজ একটানা কাহিনী নির্মাণ তার লক্ষ্য। কিন্তু এই কাহিনীর ভিতর মানবজীবনের এমন একটি সহজ রসমূল্য নিহিত থাকে যাতে গ্রামীণ মানুষের মনে তার একটা স্থায়ী রূপ মুদ্রিত হয়ে যায়। সভ্যতার যতই ক্রমবিকাশ হোক না কেন — এখনো মানুষ সেই মানবজীবনের কাহিনীর রসমূল্যকে মর্যাদা দেয়। আমাদের উপন্যাসগুলি সেই কাহিনী রসের যোগানদার। উচ্চতর সাহিত্যে কাহিনীর জায়গায় এখন এসে গিয়েছে বুদ্ধির চর্চা; সরল মানব জীবনের কাহিনী অপেক্ষা প্রবল তত্ত্ব চেতনা তাতে বেশি মূল্য পাচ্ছে। তাছাড়া তার কৌশল-রচিত-কাহিনী, চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব সবই মূল্যবান তবু বুদ্ধিনির্ভর পাঠকের কাছে তা যতই দাম পাক না কেন, সর্বসাধারণের মনে তার প্রতিক্রিয়া তেমন গভীর নয়। অন্যপক্ষে এই লোকনাট্যগুলির কাহিনী গঠনে বা সংলাপ রচনার কিংবা সঙ্গীতের ভাষায় ও সুরের গঠনে তেমন শিল্প কৌশল হয়তো নেই কিন্তু তার সহজ মানবিক আবেদনই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। এইসব নাটকের ভিতরে থাকে গ্রামীণ মানুষের লোকঠকানোর ও পরিণামে ধরা পড়ে যাওয়ার গল্প (চোখা ঠক) লোভী জোতদারের পরস্ত্রী লাভের ইচ্ছা ও প্রতিপক্ষের চাতুর্যে তার ব্যর্থতা (লোভী জোতদার) এবং সেই কারণে দর্শক সাধারণের সহজ আনন্দলাভ, পণপ্রথার ফলে কীভাবে একটি সংসার নষ্ট হয়ে যায় এবং কীভাবেই বা শেষ রক্ষা হয় (দহাই ভাইরে ডিমেন্ট চাহান না) তার কথা — এরকম বহু বিচিত্র কাহিনীর উপস্থাপনা। বর্তমানে তাতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার মতো বিষয়ও ঢুকে পড়েছে। মানুষ এইসব কাহিনীর রস বহুবছর ধরে উপভোগ করে রসতৃপ্তির আনন্দ পেয়ে আসছে। এই সব অতি সাধারণ সহজ কাহিনীর উপস্থাপনা কেন আমাদের রসতৃপ্তি সাধন করে সে প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাঙলার লোকসাহিত্যের প্রথম খণ্ড থেকে একটি উক্তি উদ্ধার করি। আশুতোষ ভট্টাচার্য সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের এই রসপরিমাণ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন "আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবা নাগরিক জীবনে লোকসাহিত্যের স্থান কি ?" তিনি নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন এইভাবে "লোকসাহিত্য চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই রচিত হয়। রচনার বহিরঙ্গ গঠন আধুনিক সমাজের বিচারে যতই স্থূল হউক না কেন, ইহার অন্তর্নিহিত ভাবে সর্বজনীন

আবেদন থাকে। বিশেষত ইহার ভিতর দিয়া চিরন্তন সামাজিক নীতি ও ধর্মের জয় ঘেষিত হয়। চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা সমূহও ইহাদের ভিতর দিয়া কৌশলে প্রকাশ করা হয়।"[৮] এই চিরন্তন মানবিক রসবেদনই লোক নাট্যের আবেদন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিচার্য। লোকনাট্যগুলি উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহুবছর ধরে অভিনীত হয়ে আসছে। বছরের পর বছর মানুষ এগুলি রস উপভোগ করে আসছে। এইভাবে উপস্থাপিত হতে হতে তার কাহিনীর বৈচিত্র্য এসেছে নানা ধরনের সামাজিক কাহিনীকে নাট্যরূপ দেবার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তার রূপগত উন্নতিও সাধিত হচ্ছে। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি কথা স্মরণীয়। বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ডে তিনি বলেছেন লোকসাহিত্যের যে কোন সৃষ্টিই ব্যক্তিগত রচনা, কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তন ও বারংবার পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তা লোকসমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিতে Group-Product-এ পরিণত হয়।[৯] এই প্রসঙ্গে তিনি আর এক বিশেষজ্ঞের মতামতের পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন এই বারংবার পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তার পরিমার্জনা ঘটে এবং তার ক্রমোন্নতি ঘটে থাকে।[১০] এই ব্যক্তিকে মান্য করে বলা যায় লোকনাট্যগুলির ফর্মেও ক্রমে একটা উন্নতির লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

প্রসঙ্গত লোকনাট্যের কাহিনী বিন্যাস কৌশল (Plot) নিয়ে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। আগেই বলে রাখা দরকার তার Plot গঠন শিথিল এবং তার রচনা কৌশল তেমন জটিল নয়। তাতে নাগরিক নাট্য কলার গঠনের দক্ষতা নেই। কিন্তু তাতেও আছে লোকশিল্পীর শিল্পবোধ। লোকনাট্যের কোনোটিরই অঙ্ক দৃশ্য বিন্যাস নেই। সমস্ত নাটকই একটানা উপস্থাপিত হয়। যেহেতু এসব নাটকের মঞ্চের চারদিক খোলা এবং পর্দার কোনো প্রয়োগ নেই, কাজেই তাতে মঞ্চমায়া সৃষ্টিরও কোনো অবকাশ থাকে না। শিল্পীরা মঞ্চের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়েই পুরো অভিনয় করে যান — প্রবেশ বা প্রস্থানের মতো ঘটনাও এখানে নেই। এমনকি স্বগতোক্তি বা মনের অবস্থা দেখাবার জন্য বিবেকশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে মনের ভিতরে কথার উন্মোচন করবারও কোনো অবকাশ এখানে থাকে না। সরাসরি তাদের বিষয়টিকেই সংগীতে সংলাপে উপস্থাপিত করতে হয়। লোকশিল্পীর মূল অবলম্বন নৃত্য সঙ্গীত ও সংলাপ। তাই তাঁকে অনেকটা সীমাবদ্ধ পরিসরে কাজ করতে হয়। যে ভাব কথায় পরিস্ফুট হয় না তাকে তিনি সঙ্গীতে প্রকাশ করতে চান। কিন্তু যে সঙ্গীতের প্রকাশ ক্ষমতাও পর্যাপ্ত নয়। তাই ভাবে সূক্ষ্মতা অপেক্ষা ভাবের অবস্থার পরিস্ফুটনই তাঁকে করতে হয়। সেখানে তাঁর অবলম্বন সামাজিক ভাষা প্রচলিত সঙ্গীতের সুর। কাজেই লোকনাটকের মধ্যে অভিব্যক্তির চারুত্ব ফুটিয়ে তোলা যায় না। সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও সূত্রধারের মতো এখানে প্রথমেই থাকে বন্দনা, তারপর মূল গীদালের মাধ্যমে হয় কথোপকথনে না হয় একক গানে বিষয়ের উপস্থাপনা হয়ে থাকে। যেমন রাজধারী পালার সমবেত গৌর বন্দনার পর এসেছে রাম বন্দনা। তারপর ডাকের পদ্য সংলাপে এসেছে রামের বনবাস ও সেই সম্পর্কিত

কাহিনীর উপস্থাপনা। কুশান পালা 'লক্ষণের শক্তিশেল' এ মূল গীদালের রঘুনাথ বন্দনার পরে পাই গীদাল ও দোয়ারির কথোপকথনে নাট্য উপস্থাপনা।

মূল — পুত্র শোকে মন্দোদরী করিছে ক্রন্দন

মন্দোদরীর রোদনেতে রুষিল রাবণ

দোয়ারি — হ্যা এ্যাও কত্তা কি কইলেং দেখোং

আর একবার কন্তো

এইভাবে লোকনাটকের উপস্থাপনা করা হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এই উপস্থাপনা রীতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন বিষহরি পালায় দেখি মূল গীদাল বন্দনার পরেই এসেছে পদ্মার গীত। তারপর পদ্মা ও নেতোর কথোপকথন।

পদ্মা — ওগো দিদি আমি এই চম্পালা পুরীর চাঁদ বানিয়ার হস্তে কি বুদ্ধিতে পূজা পাব দিদি ?

নেতা — আমার বচনে পদ্মা শীঘ্র করে যাও। ধনমতরি রূপে যাও চম্পালা নগর। ইত্যাদি

এই বর্ণনার পর পরই মঞ্চে ধন্বন্তরীরূপী পদ্মা ও সনকাকে উপস্থিত করা হয়েছে। রাম বনবাস পালায় বন্দার পরই এসেছে রামের কথা —

শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে যাব আমি বন।

আরও আধুনিককালে যে সব নাটক রচিত হচ্ছে তাতে অনেক সময় সরাসরি বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে। সেখানে বন্দনা গানও নেই। যেমন লোভী জোতদার পালায় নাটককে দৃশ্যে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং আসরে এসে পাত্রপাত্রী নিজেদের পরিচয় দিয়েছে।

জোতদার। নমস্কার মোর নামডা বাগে লোভী জোতদার আর এইডা বা মোর বেটি।

তোর নামডা কোহো বেটি।

দুলালী। তে বাবা তুই হে কয়হা দে না তে মোর নামডা।

এইভাবে নাট্য উপস্থাপনার মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। নাটকের কাহিনী বিন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায় সরল বিন্যাসরীতি কিছুটা বদলে গেছে।

দস্যুকন্যা কালিন্দী পালায় বন্দনার পরই এসেছে রাজা ও মন্ত্রীর সংলাপে রাজকর আদায়ের কথা।

গরীব রমনাথের কাছে জোর করে খাজনা আদায় করতে গিয়েই কাহিনীর মূল বিষয় উঠে এসেছে। রাজা রমনাথের কন্যাকে বন্দী করে প্রাসাদে এনেছেন। নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করেছেন রাণী। নারীলিপ্সায় উন্মাদ রাজা রাণীকেও নির্বাসন দিয়েছেন। পথশ্রমে কাতর রাজপুত্র সতানন্দকে বসিয়ে রেখে রাণী জল নিয়ে ফিরে এলে দস্যু রঙ্গলাল রাণীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। গাজী দস্যু নারীর সতীত্ব রক্ষা করে। সতানন্দকে দস্যু রঙ্গলাল কালী কাছে বলি দিতে চায়। দস্যুকন্যা কালিন্দী তাকে ভালোবেসে ফেলে এবং উদ্ধার করে। কাহিনীর পরিণতিতে কাহিনীর রহস্য খুলে যায়। গাজীদস্যু আর রঙ্গলালের পালিত কন্যা ভাইবোন। শেষ পর্যন্ত রাজা সতানন্দ ও কালিন্দীর বিয়ে দিয়ে তাদের রাজত্ব দিয়ে যান। রমনাথের বন্দনার সঙ্গে কিষণলালের বিয়ে হয়। এ নাটকের কাহিনী সামাজিক নয় — দূর অতীতের কোনো উপকথার রেশ এতে আছে। এই অতীতের রাজারাণী ভিখারী দস্যু পরিবৃত কাহিনীর রহস্যে একদিন দর্শকেরা বেশ আপ্লুত হয়েছেন। কিন্তু লোকনাট্যকার সমস্ত পালা জুড়ে যে কথাটি বলতে চান তা শেষ পর্যন্ত রাজার মুখে এবং গায়েনদের মুখে শুনিয়েছেন।

রাজা — সত্য বুঝিলাম, ধর্ম এখন আছে, নারীর লাঞ্ছনাকারীর কভু জয় না হবে (গায়েনদের মুখে মিলনের গান)

সাঙ্গ হইলরে ও ভাই ভেবে দেখ অন্তরে
ও ভাই ধর্মের জয় হয় চিরকাল।

এই কাহিনী রস এবং নারীমর্যাদার শিক্ষাই এই লোকনাট্যের শিক্ষা। এই বিষয়ই ভিন্নভাবে কোচবিহারের চোখাঠক পালায় দেখানো হয়েছে। চোখাঠক কীভাবে অন্যের মেয়েকে ভুলিয়ে আনতে গিয়ে ধরা পড়ে লাঞ্ছিত হয় — এ নাটকে তার কথাই বলা হয়েছে। পরিণতিতে চোখা ঠকের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করিয়ে নাটকে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিরন্তন ধর্ম ও নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে।

চোখা ঠক — উঃ বাপরে এমন কাজও মানুষ করে।
(সাধারণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া)

দেখলে ভাই সব ধর্ম কিভাবে নিজের চাকা চালায়। কতকিছু কৌশল করলাম। তাও কিছুই করতে পারলাম না। সতী দেবীই সতীর সতীত্ব রক্ষা করলেন। আমারও শিক্ষা হল। আর আমার দেখে তোমাদের শিক্ষা হউক।

এসব উপদেশ বাক্যের মূল্য আধুনিক নাটকে নেই — লোকনাটকে আছে। এইভাবে চিরন্তন ধর্ম ও নারীর সতীত্বে বিশ্বাসের ফলে লোকজীবনে মানুষের বেঁচে থাকা অনেক সুখের হতে পেরেছে। আধুনিক সমাজে যতই বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে জীবন ততই হয়ে উঠেছে অস্থির। নারীর সতীত্বের মূল্য থাকুক আর নাই থাকুক আধুনিক সমাজে পরনারীর উপর জোর খাটানোর চেষ্টা সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে অস্থিরতা সঞ্চার করেছে। লোকনাটকে তা নেই। তার পরিবর্তে একটি সহজ বিশ্বাসে জীবন কতো শান্তির ও সুখের হয় — তার

শিক্ষা এই সব নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। নারী জীবনে আজ হয়তো স্বাধীনতা প্রচুর কিন্তু আজকে নিজ দেহ সৌন্দর্যে হরিণীর মতো ব্যাধভীতা। অন্যপক্ষে লোকনাট্যে তার রক্ষাকর্তার দেখা পাওয়া যাবেই। চোখাঠক পালায় নিজের ধর্ম রক্ষা করতে পেরে নারী নিজেই বলে "শিখলে ও দর্শকবৃন্দ, নিজ মহত্ত কীভাবে হয় প্রকাশিত। দেখ তার জ্বলন্ত নিদর্শন পিতার আচরণে। ...আমায় দেখে তোমরা শেখ, যেন ভবিষ্যতে তোমরা না পড় বিপদে।"

লোকনাট্যকার এই উপদেশ নির্দেশ, এই নীতিশিক্ষাটুকু দিতে ভুলবেন না। এই নীতি শিক্ষাটুকু গ্রামীণ দর্শক সাধারণ নাট্যরস উপভোগের আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে রাখবে। লোকসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গিয়ে একটা কথা একালে প্রায়ই বলা হয়। নাগরিক সাহিত্যের কলা কৌশলে মানুষের মন যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন সে এই লোক নন্দনের ভিতরে সহজ পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। সেই রসানন্দই সাহিত্য পাঠের ফল। সঙ্গীত সংলাপ নৃত্য ও কাহিনীর যৌগপতো এইভাবে উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য যেমন মানুষের মনোরঞ্জন সাধন করেছে তেমনি জীবন ও সমাজনীতির নিরিখে তার মনকে আদর্শায়িত করেছে। জীবন সমালোচনাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। একথা সমালোচকদের মুখে শোনা যায়। লোকনাট্যকার জীবনের ছবিটুকু মাত্র উপস্থাপন করেই সমালোচনার কাজ শেষ করেন না — তাকে একটা পথ নির্দেশও দিয়েছেন। এই নির্দেশটুকু শিল্প, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র সবখান থেকে আহরণ করে গ্রামীণ মানুষের জীবন সংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে ওঠে।

একথা স্মরণযোগ্য যে লোকনাট্যগুলিতে জীবনের জটিলতা তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের বা মানুষের সঙ্গে মানুষের বহির্দ্বন্দ্বই তার মুখ্য বিষয়। মানুষের মনের ভিতরকার দিকটি তাতে তেমন উদ্‌ঘাটিত হয় না। লোকশিল্পের একটা বৈশিষ্ট্য হল মানুষকে সেখানে একমুখী সরল একটি রূপে উপস্থাপনা করা। যে মানুষ খল সে খলই, যে ভালো সে সব সময়ই ভালো। এই এক-রৈখিক মানুষই লোকনাট্যের মানুষ। খল চরিত্র অনেক সময় ঘটনা বিন্যাসের ধারা বেয়ে কাহিনীর পরিণতিতে এসে ভালো মানুষ হয়ে যায়। তার একরকম পরিবর্তন হয়। কিন্তু লোকনাট্যের মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মানুষ নয়। সে মানুষের রূপ প্রাচীন লোকসমাজে বিরল ছিল। আধুনিক লোকসমাজেও তার পরিচয় কম। নাগরিক মানুষের এই মনস্তত্ত্ব লোকনাট্যের অঙ্গীভূত হয় নি। কাজেই মানুষ সেখানে প্রায়ই এক-রৈখিক টাইপ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু এই মানুষগুলি যথার্থই লোকসমাজের বাস্তব মানুষেরই প্রতিমূর্তি। এই লোকনাট্যের মানুষগুলির জীবনের দ্বন্দ্বও সরল সহজ - একমাত্রিক। কোনোখানে কোনো চরিত্র শত্রুতা সাধন করতে চায়, কেউ অন্যকে ঠকাতে চায়, কেউ অপুত্রক অপবাদে রাজ্য ছেড়ে পীরের কৃপালাভে বেরিয়ে পড়ে, কোনোখানে পণ নেবার জন্য কিছু অনাবশ্যক কৌশল অবলম্বন করতে হয়, পল্লীর সাধারণ নরনারীর প্রেম ও মিলনের জন্য নায়ক চরিত্রের চেষ্টা

করে ব্যর্থতা বা সাফল্য লাভ করতে হয়ে — এই সবই লোকনাটকের পাত্রপাত্রীর ভূমিকা। লোকনাট্যে যেখানে কাহিনীর মধ্যে অতিরিক্ত ঘটনা সঞ্চার করে কাহিনীকে জটিলতা দেবার চেষ্টা হয়েছে সেখানে তা লোকনাট্য থেকে নাগরিক নাট্যের ধর্মকে বেশি আত্মসাৎ করেছে। 'দহাই ভাইরে ডিমেন্ট চাহান না' — এরকম একটি নাটকের উদাহরণ। আমরা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের আলোচনা এখানে সমাপ্ত করলাম।

এই আলোচনার **প্রথম পরিচ্ছেদে** আমরা লোকনাটকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছি। 'লোকনাটক' কথাটি যে বাংলা লোকসাহিত্য আলোচনায় একটু পরে এসেছে তা আমরা দেখেছি। লোকনাট্যের উদ্ভবসূত্র খুবই প্রাচীনা প্রাচীন আচার ধর্ম লোকজীবনের নানা ঘটনার অনুকরণ সূত্রই যে লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে — একথা এখন পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন। এই লোকনাট্যই আদিরূপ — তারই ভিতর থেকে উদ্ভূত হয়ে নাগরিক নাট্যকলা শিল্পে ও প্রয়োগে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যপক্ষে লোকনাট্য নিজের পথেই বিকশিত হতে হতে এখনো তার জীবনী শক্তির বলে বিষয়-বৈচিত্র্যে ও সাহিত্যরূপে নিজের একটা জায়গা পেয়েছে। এই অধ্যায়ে লোকনাট্যের প্রকৃতি ও নাগরিক নাট্যকলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পার্থক্যের দিকগুলি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এ পথে আমরা লোকশ্রুতিগণের পন্থাই অনুসরণ করেছি।

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে** আমরা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনরীতি গত দিকগুলির কথা বলেছি। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য বেশ সমৃদ্ধ। অঞ্চলভেদে তার বিষয় ও রূপ যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। উপস্থাপনায় কখনো তা সঙ্গীতাশ্রয়ী কখনো বা কথোপকথনে তার রূপ ফোটে — কখনো বা তা স্পষ্ট কোনো লোক মনোরঞ্জক সামাজিক কাহিনীর অবতারণা করে — কখনো বা তাতে কোনো সমস্যার রূপায়ণ ও প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়। উত্তরবঙ্গের কুশান নাট্য পালায় ফোটে পুরাণের আদর্শ অনুসরণের কাহিনী, গম্ভীরা নাট্যপালায় অবস্থা বিপর্যয়ের জন্য শিবের কাছে মানুষের নালিশ জানানো হয়। খন পালাগানে প্রখর সামাজিক সমস্যার উত্থাপন ও তার নিরসন করা হয়। এই সব বিষয়ের আলোচনা এ অধ্যায়ের বিষয়। **তৃতীয় পরিচ্ছেদে** আমরা লোকনাট্যে সঙ্গীতের মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করে বিভিন্ন লোকনাট্যে সঙ্গীতের প্রয়োগগত গুরুত্বের কথা বলেছি। লোকনাট্য বিশেষভাবে সঙ্গীতনির্ভর; তাই একদা তা গান হিসেবেই প্রচলিত ছিল — সে কথা সকলেই জানেন। উত্তরবঙ্গের এই পালা নাটকে আমরা গানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। **চতুর্থ পরিচ্ছেদে** নাটকের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লোকভাষাতেই লোকনাটকের স্বতন্ত্র পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকনাটকে থাকে আঞ্চলিক ভাষার স্বতন্ত্র চিহ্ন। তাতে লোকনাটকের সর্বজনীন আবেদন হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু আঞ্চলিক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আঞ্চলিক ভাষার রূপ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। লোকজীবনের আলোচনা করা হয়েছে **পঞ্চম পরিচ্ছেদে**। লোকজীবনের অব্যর্থ লক্ষণ নিয়েই লোকনাটকের পুষ্টি ও সার্থকতা। লোকনাট্য লোকজীবনের রূপকার এবং

লোকজীবনের সমালোচক। একে এই জন্যই লোকনাটক বলা সার্থক। লোকনাটকের একটি দিক 'লোক' আর অন্য দিকটি 'নাটক'। লোকনাটক যেখানে লোকজীবনের সার্থক রূপকার সেখানেই লোকমূল্যের প্রতিষ্ঠা। এই লোকজীবনের সংস্কার বিশ্বাস, ধর্মবোধ, আচার আচরণ, লোক-রঙ্গ এই নাটকগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে। ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়ার প্রয়োগ, মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার এসবই লোকজীবনের চিহ্ন। লোকনাট্যের মধ্যে এগুলির যথার্থ প্রয়োগেই তার লোকধর্ম পরিস্ফুট হয়। **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে** আমরা লোকনাটকের রূপান্তর ও আধুনিক বাংলা নাটকে লোকনাটকের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। উপসংহারে লোকনাট্যের বৈচিত্র্যময়তা এবং তার নাট্যসার্থকতা ও রসরূপের মূল্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। লোকনাট্যের এই নানাকৌণিক আলোচনা থেকে উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

তথ্যসূত্র


১। গ্রাম্য সাহিত্য, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, ১৯৬১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৭১৬।

২। লোক ঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৩৪-১৩৫।

৩। কোচবিহারের লোকনাটক, দিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ: ৩৬।

৪। ছেলে ভুলানো ছড়া-১, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, ১৯৬১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৬৮৯।

৫। তদেব, পৃ: ৭১৭।

৬। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ১০৭।

৭। লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, ১৯৬১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৬৬৭।

৮। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১০।

৯। তদেব, পৃ: ৫।

১০। তদেব, পৃ: ৭।

# নির্বাচিত লোকনাটক সংকলন

# নির্বাচিত লোকনাটক সংকলন


| লোকনাটক | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কুশান | ২৮২ |
| দোতরা | ২৯৭ |
| চোর-চুন্নী | ৩২২ |
| খাস পাঁচালী | ৩৬৬ |
| মান পাঁচালী | ৩৯০ |
| বিষহরি | ৪০৪ |
| নটুয়া | ৪৫১ |
| শাস্তরী | ৪৭১ |
| রাজধারী | ৫০৭ |
| খন | ৫৬০ |
| রামবনবাস | ৫৭৭ |
| গম্ভীরা | ৬১৬ |

# কুশান
## লক্ষ্মণের শক্তি শেল

### প্রার্থনা

ও এস হে প্রভু দয়াল মোরে রঘুনাথ
এস আমার আসরে — এ হে হে
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে
দীন দেখি নৌকা প্রভু
লইয়া গেলে দূরে
যার কাছে আছে কড়ি যায় পার হয়ে
কড়ি নাই যার কর পার তারে
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে
দয়া কর রামচন্দ্র দয়াল ভগবান
তোমার চরণে প্রভু লইনু স্মরণ
পুত্র শোকে মন্দোদরী করিছে ক্রন্দন
মন্দোদরীর রোদনেতে রুষিল রাবণ

বৈরাগী— হ্যা এ্যাঁত্ত কত্ত কি ? কইলেং দেখোং আর একবার কন্তো ?

মূল— আরে দোয়ারী তোমার কান আছে না রে ? বলে, পুত্রাশোকে মন্দোদরী ...

বৈরাগী— এই যে জুড়িল কাতোন আর মন্দোদরীর কোতোনোতে রুষিল রাবণ।

মূল— আরে কুলোক, কোতোন কি রে ? আরে কোতন নোয়ায়রে ক্রন্দন। দেখ দোয়ারী এই আসরে উঠতে উঠতে যে কাউরহাটি — এমনটা কিন্তুক ভাল নোয়ায়।

বৈরাগী— আচ্ছা ন্যাও নাও কাউরহাটি না করি। হ্যাঁ, তোমারে মুখ খান বোল অসুদ্ধ মিছাঁও খালি ফাও ফ্যাচাল।

(দূরে সীতার ক্রন্দন ও গান)

ও কি প্রভু হে
কোথা প্রভু রঘুনাথ
তুমি হে অনাথের নাথহে

হায়রে আজি দেখা দিয়া
প্রাণ রাখ মোরে
ও মোরে প্র—ভু—হে
তুমি মোর প্রাণেশ্বর
আর যত সবে পর হে
হায়রে আজি প্রাণ যায় মোর
দুষ্টারো না হাতে
প্রভু রঘুনাথ হে।
দেবর লক্ষ্মণ রইল কোথা।
না শুনিন তার কথা
হায়রে এই ছিল
মোর কপালে লেখা
প্রভু রঘুনাথ হে।
মুই অভাগীর কর্মের ফলে
ধরিতে ভাঙ্গে ডালরে
হায়রে কোন ডালে
সইবে নারীর ভর
প্রভু রঘুনাথ হে

রাবণ— ঐ—ঐ সীতা করিছে ক্রন্দন আর পুত্রশোক সহ্য হয়না। ঐ সীতা লাগি মজিল কনক লঙ্কাপুরি, আজি সীতাক কাটি আমি ঘুচাব সব বৈরী।

মন্দোদরী— ছিঃ ছিঃ মহারাজ, এমন মহাপাপের কাজ আর করবেন না।

রাবণ— না, না মন্দোদরী, মুই কোন কথা শুনিম না। মৈলে আজি পুত্র মোর সীতার জন্যে।

মন্দোদরী— শোন প্রভু এই রক্ষকুলের মধ্যে তোমরায় মহাজ্ঞানী মহাপন্ডিত। তবে কি জন্যে সামান্য একটা নারী হত্যা করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করির চাও? বিশ্বশ্রবা পিতা তোমার সংসারে পুজিৎ। তোমার এ নারীবধ না হয় উচিৎ।।

**মূলপদ**

হায়রে —

হাতে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে।

ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে।
রাবণ দেখিল সীতা ফিরাইল আঁখি।
(আচ্ছা বেশ ভাই বেশ)
রাবণ ভাবয়ে সীতা দিলেন কটাক্ষে.
হয় নাকি?
ওহো ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতর।
পুত্রশোকে বৈসে রাজা ভূমির উপর।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া রাজা যায় মহা ক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে

মন্দোদরী— ক্ষান্ত হন প্রভু যা হবার তাত হয়ায় গেইচে, আর সর্বনাশ কইরবেন না। আপনার দোষে প্রভু কইল্লেন সর্ব্বনাশ রামের সীতা রামকে দেও যাউক গৃহবাস।

রাবণ— না, না মন্দোদরী ইয়ার প্রতিশোধ মুই চাওঁ। সারথী রথ সাজাও।

সারথী— দোহাই মহারাজা। আপনার কথার আগতে মুই রথ আনি দুয়োরৎ খারা কইচ্চোং।

রাবণ— দ্যাখ সারথী রথ চালাও ঐ পশ্চিম দোয়ারে রাম লক্ষ্মণের আগে। আগে ঐ নর দুইটাক্ শেষ করি — বানরের কথা পরে।

(দ্রুত রথ গেল)

মূলপদ

সারথীরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
সারথী চালায় রথ পবন গমন।
মরি মরি হায়রে
হায়রে — সারথী চালায় রথ
পবনের বেগে।
ত্বরিত চলিয়া যায় শ্রীরামের আগে।
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন।
বিরস হইয়া কেন হইব বিমুখ।
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক।

রাবণ— কি রে বিভীষণ তুই ! এখনি বধিব তোরে রাখে কোনজন।। এই দ্যাখ শেলপাট দ্যাখোং তোকে কায় রক্ষা করে।

বিভীষণ— ঠাকুর লক্ষ্মণ মোক বাঁচাও।

লক্ষ্মণ— ভয় নাই বিভীষণ শুনহ

বচন— দ্যাখো এই বানেতে শেল করিনু ছেদন।

রাবণ— কি এদ্দুর কথা! বাণ মোর বৃথা নষ্ট হয়। আচ্ছা এই বার দেখি আমি কত শক্তি ধরে তোর রক্ষাকর্তা। (বাণ ছাড়ার শব্দ)

**মূলপদ**

কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময় দানবের শেল এখন পড়ি গেল মনে।
রঘুনাথ চিন্তা করে ভাইয়ের কুশল
শেলের করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল।।
দেবমূর্ত্তি শেল তুমি দেব অধিষ্ঠান
এবারে লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণ দান।।
শেল বলে কেন মোরে করিছ স্তবন।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া নাহি মারি অন্য জন।।
থাকি আমি যার কাছে তার আজ্ঞাকারী।
যার কাছে থাকি আমি তার হিতকারী
শ্রীরামের কাতর দেখিয়া শেল নাহি থাকে
শূন্যবেগে পড়িল শেল লক্ষ্মণের বুকে।।

লক্ষ্মণ— (ঘন ঘন শ্বাস) উঃ — ভাই রঘুনাথ প্রাণ যায় উঃ— দাদা — দা—দা। (পতন) বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি শেল দিল টান। উপাড়িয়া শেল পাটি করে খান খান।।

রাম— (শোকে) হায় হায় লক্ষ্মণ মোর! — না এখন আর চিন্তা করার সময় না। বানরগণ! তোমরা সকলে যুদ্ধে আগে পড়। (ক্রোধে) শোন বেটা রাবণ। লক্ষ্মণোক্ জিনিলু বলি না ভাবিস্ মনে। মারিয়া পাড়িব তোরে আজিকার রণে

(উভয় পক্ষের যুদ্ধ)

রাবণ— উঃ সারথি সারথি রথ চালাও, আর রক্ষা নাই। চালাও একেবারে লঙ্কার ভিতর বুলি রথ চালাও। (রই চালাইয়া রাবণের পলায়ণ) বানরগণ। পলাইল পলাইল ধর ধর।

রাম— (গান) কি হইল রে বিধি আজি বুঝি ভাঙ্গিল চান্দের বাজারে। দেশেতে ছাড়িলাম পিতা,

বনেতে হারাইলাম সীতা, ওকি বিধাতা কর্মদোষে হারাইলাম গুণের ভাই। কি হইল রে বিধি আজি বুঝি --- (রোদন) ভাই লক্ষ্মণরে! কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী। মইল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী।। লক্ষ্মণ সুমিত্রা মার পরাণের ধন। কি বলিয়া নিবারিব তাহার ক্রন্দন।। সীতা মৈলে সীতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ মৈলে ভাই বলিব কারে।। উঠবে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ভোবে পাশ। কেন বা আমার সঙ্গে সঙ্গে এলি বনবাস। পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস। বিধাতা ঘটাইল তাতে এত সর্ব্বনাশ।

রামের কথ --- (নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) এই যে সুষেণ! লক্ষ্মণোক মোর বাচাও। লক্ষ্মণ বিহনে মোর অন্য নাহি গতি। লক্ষ্মণে জিয়াও যদি তব অব্যাহতি।।

সুষেণ--- প্রভু রঘুনাথ কাতর হইবেন না। লক্ষ্মণের নিঃশ্বাস যখন ভাল্ ভাবে চলির ধইচ্চে, নাড়ীর গতিটাও এক রকম ভালে দেখনু তার মধ্যে তো লক্ষ্মণ মরায় মুইতো কোন কারণ দ্যাখোং না! তবে একটা কথা প্রভু! এই হনুমানোক ঔষধ আনির জন্য পঠে দেন।

রাম--- দ্যাখো সুষেণ! ভাইয়ের শোকেতে সুষেণ মোর হিয়া শোষে। তুমি পাঠাইয়া দ্যাও ঔষধ উদ্দেশ্যে।

সুষেণ--- প্রভু! ওটা একটা আস্ত গোয়ারগোবিন্দ। ওটা এই বুড়ার কথা কখনো শুনবে না। আপনে নিজে উয়াক কন্।

রাম--- শোনো শোনো বাছা মোর পবন নন্দন। ঔষধ আনিয়া বাচাও লক্ষ্মণের প্রাণ।

হনুমান--- প্রভু আজ্ঞা মোর শিরোধার্য্য।

সুষেণ--- শোন্‌রে পবন নন্দন। ঔষধ আনিয়া বাচাও লক্ষ্মণের প্রাণ।

হনুমান--- প্রভুর আজ্ঞা মোর শিরোধার্য্য।

সুষেণ--- শোন্‌রে পবন নন্দন। ঔষধ অছে সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে। সই পর্ব্বতের নওটা শৃঙ্গ। এই পত্তমটা হৈল্ মাহাদেবের স্থান। তারপরেরটাং চন্দ্র। তারপরেরটাং ---

হনুমান--- (ধমকাইয়া) হেই বুড়া চট্‌চটেক। তারপরেরটাং তারপরেরটাং এক কথা বার বার।

সুষেণ--- দোহাই আপনার প্রভু! ঐ দেইখ্‌চেন কেমন? উয়ার আক্কেলটা কেমন, তাক বুঝি ন্যাও। কার সাথে কিভাবে আল্লাপ শাল্লাপ করির লাগে তাক ধুলাও শেকে নাই।

রাম--- হনু! দ্যাখ উহার বুড়া বয়স কথা বইলেতে একটু দেরী হয়। সেজন্য রাগ করা উচিত না।

হনুমান— যে আজ্ঞা প্রভু।

সুষেণ— তারপরেটাৎ তিনকুটি গর্দ্ধব্ব। তার পরেরটাৎ নানান রকম গাছ। তারপরেরটাৎ একটা খুব খড়া খড়া ধারের নদী। সেই নদীর দুই কুলে বহু ঔষধ আছে। সেই ঔষধের রং নীলবর্ণ, ফলফুল পিঙ্গল বর্ণ, পাতা রক্তবর্ণ, ডাল তার স্বর্ণবর্ণ লতা। রাইতের মধ্যে আনো ঔষধ বাচাব সহজে। রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্য তেজে।

রাম— হায় হায় গন্ধমাদন পথ আঠারো বৎসর। কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিতর। ক্যানে দাও সুষেণ তুমি আমারে প্রবোধ। লক্ষ্মণ মরিলে পরে কি হবে ঔষধ।

হনুমান— প্রভু, ঐ শ্রীচরণে যদি মোর মতি থাকে তা হয় না ক্যানে আঠার বছরের পর, সিলা আর এ্যালায় গল্লো না করি না কওঁ।

রাম— বাছা হনুরে তুই ছাড়া আর কি উপায় আছে বাছা?

হনুমান— আচ্ছা তা হইলে মুই চলনু। জয় রঘুপতি রামচন্দ্রের জয়।

**মূলপদ**

এইমতে হনুমান বিদায় হইয়া।
বায়ু বেগে গন্ধমাদন চলিল ছুটিয়া।।

(রাবণের সভা)

রাবণ— দ্যাখোতো মন্ত্রী এতো রাত্রি ওটা কিসের শব্দ শোনা যায়?

মন্ত্রী— মহারাজ! ওটাতো বেটা ঘরপোড়া বলি মনে হয়।

রাবণ— ঠিক কথা মন্ত্রী, ঐ ঘরপোড়া বেটায় হবে। লক্ষ্মণোক জীবিত করির জন্য বেটা গন্ধমাদন পর্ব্বত ঔষধ আনির যাইবে। মন্ত্রী তুমি একবার মাম কালনেমীকে ড্যাকে আনতো।

মন্ত্রী— মহারাজ! এই যে আপনার মামার খুব পরমাইর জোর। খালি নাম কইতে কইতে হাজির।

রাবণ— বইসেন মামা! ডন্ডোবোধ ডন্ডোবোধ। মন্ত্রী মামাকে বসির জন্য সোনার খাটখান আনি দেও।

মন্ত্রী— যে আজ্ঞা।

রাবণ— বইসেন মাম! মামা ডন্ডোবোধ ডন্ডোবোধ।

কালনেমি— আরে বাপুরে আজি বা ক্যানে এত বড় ভক্তির ঠেলাঠেলি দ্যাখোং। ইয়ার যে মুই ভাবে

পাওঁনা।

রাবণ— আঃ হা মামা! দ্যাখোতো তোমার ছাড়া লঙ্কাত মোর কাঁয় আছে। তবে একটা কথা মামা। চিরদিন করি মামা ভরসা তোমার, আজি তুমি কিছু মোর কর উপকার।।

কালনেমি— নারে বাপু মুই তাক পাইম না। মুই তোক পূর্ব্ব হতে কওঁ বোলে এ্যালাও যদি বাচির চাইস তা হইলে রামের সীতা রামোক ফিরি দে। এ্যালাও রাজ্যটা শান্তি হউক।

রাবণ— (ক্রোধে) কি মামা এদ্দুর কথা। তুই মোক উপদেশ দিবার আচ্ছিস? বল যাবু কি না? তা না হইলে এই যে হাতিয়ার দেখিস, আজি এইটে তোক শেষ করিম।

কালনেমি— আহা হা হারে বাবা অতো রাগ হইস ক্যানে রাগের কথাটা কি হইল ভালা, উপকারের কথাটা খুলি কইস না ক্যানে।

রাবণ— তবে শোনো। আজি রণে লক্ষ্মণ পড়িছে শক্তিশেলে, মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে। বিশল্যকরণি আছে গন্ধমাদনেতে। ঘরপোড়া ব্যাটা গেল সেই ঔষধ আনিতে। মায়া করি ধরি আইস হনুমান বীরে। লঙ্কার অর্দ্ধেক ভাগ দিলাম তোমারে।

কালনেমি— আরে বাপুরে, মনোত বড় লাগে ভয়। বড় দুষ্ট সে বানরা, কিসোৎ কোনটা হয়। বানরের প্রধান বেটা বুদ্ধি বড় শঠ। কেমন করি যাবার কইস তাহার নিকট।

রাবণ— মামা, সেই ঘরপোড়া বেটাকে এতো ভয় কিসের। এমন যুক্তি করি যাইবেন যাতে চিনবার না পায়।

কালনেমি— আরে বাবা সৌগ কথা মিছে। কোন বুদ্ধি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে।।

রাবণ— মামা সেজন্য কোনো চিন্তা নাই। গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি। গন্ধ কালী নামে এক আছে কুম্ভীরাণী। সেখানে তুমি তার আগে যায়া সন্ন্যাসী হয়া কোনমতো সরোবরে গাও ধুবার জন্যে পঠে দিবেন। তাহলে কুম্ভীরাণীর মুখোৎ পইল্লে বেটা আর ঘুরির পাইবে না, মায়াতে বাধিয়া তারে আইস মোর আগে। লঙ্কাপুরীর সব তোমাক দিম অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে।

কালনেমি— হায়রে রাবণ তুই কি বলিস বচন। ঘরপোড়র কাছে গেইলে হারাব জীবন। ভাগ্যে সেদিন বাঁচি আচ্ছি লঙ্কার ভিতর। প্রাণ দিবার পাঠাইস মোক হনুমানের আগে। মুই মৈলে লঙ্কা তোর কাঁয় নিবে অর্দ্ধভাগে।।

রাবণ— (ক্রোধে) কি তুই বেটা মোর মামা, না মোর শত্রু। মন্ত্রী দ্যাও তো মোক ঐ হাতিয়ারখান বেটাকে একেবারে শেষ করে দেঁও।

কালনেমি— আহারে, বাবা শোন শোন কথা শোন। অতোবরি রাগ ক্যানে ভালা। আরে বা রাগ তুই করেন সম্বরণ। তুই মারেক আর সেই মারুক অবশ্য মরণ। আচ্ছা তা হইলে আমি চল্লাং। দ্যাখ যে কথা কচিস্ সেটা যেনো মনে থাকে। পাচোৎ যাতে ঠগাঠগী না হয়। (গন্ধমাদন পর্ব্বতে কালনেমী ও হনুমান)

কালনেমি— ঐ হনুমান আসির ধইচ্চে। এ সময় মুই তপস্বী সাজিয়া ঠিকঠাক হয়া বসোং।

হনুমান— মুনি গোসাঁই শ্রীচরণে ডন্ডবোধ ডন্ডবোধ।

কালনেমি— কায় বাও অতিথের ছাওয়া। ওঃ হো বাছা মোর কন্দুর হাতে যা হাপ্সিয়া আস্লু। তা একটা কথা বাও, একেরে কি ন্যাও হোর আজি সরোবরে যায়া গাও ধুইয়া আসি কিছু ফল ফুল খায়া শান্তি হও?

হনুমান— না মুনি গোসাঁই মুই কোন প্রাণে কেমন করি খাইম মুনি গোসাঁই? ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে। প্রাণ দান পাইবে সে ঔষধ নিয়া গেলে। ফল ফুল শিরে রাখ্যোং ক্ষমা দাও আপনি। ঔষধ চিনিয়া দ্যাও বিশল্য করণী।।

কালনেমি— তবে কি বাও, মুই যে এতা কল ধরি তপস্বা করি আসনু, সে তপস্যার কোন ফল মোর নষ্ট করির চাইস? আজি আশ্রমে অতিথ আসিয়া তুই উপাসে ঘুরি যাইস্। মোক বুঝি তুই নরকোৎ ডুবির চাইস? ঐ দ্যাখো সরোবর, তপের প্রসাদ, কোনমতে স্নান কর ঘোচুক বিষাদ।। পান যদি করিস ইয়ার এক আচুল পানী। এক বছর ভোগ তৃষ্ণা কিছুই না জানি।।

হনুমান— গোসাঁই মুই কিন্তুক বেশী দেরী করির পারোং না। তাহলে মুই তাড়াতাড়ী গাও ধুইয়া আইসোং। (হনুমান সরোবরে ঝম্প দিল) (চমকিয়া) উঃ — কি এটা রে। ও এটা কুমির, আচ্ছা রতো। (কুমিরকে আছার দেয়ার শব্দ) (শূন্য পথে কন্যা গন্ধকালী)

গন্ধকালী— দেবা কন্যা ছিলাম আমি নামে গন্ধ কালী। দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্য কেলী। কুবের নিবাসে যাই নৃত্য গীত রঙ্গে। ঠেকিল আমর অঙ্গ দক্ষ মুনি অঙ্গে। পথে মুনি তপ করে নাম তার দক্ষ। কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য।। যখন হইবে হরি রাম অবতার। তার সেবকের হাতে পাইবে নিস্তার।। চিরজীবি হয়ে থাক সাধ রাম কাজ। তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ।। আর এক কথা বলি শুন হনুমান। ভন্ড তপস্বীর কাছে হও সাবধান।।

কালনেমি— হা—হা—হা বেটা ঠিকে কুম্ভীরাণীর প্যাটোত গেইচে কেমন বেটা ঘর পোড়া হা হা হা, যাও এ্যালা মুই রাবণের গোচর। লঙ্কা অর্দ্ধ ভাগ করি লইব সত্বর।। দড়ি ধরি লইব ভাগ

উত্তর দক্ষিণে। পূর্ব দিকে লব ভাগ না যাব পশ্চিমে।। রাণীগণ আছে যত স্বর্গ বিদ্যাধরী। তার অর্দ্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী।।

হনুমান— (দূর হইতে) কি এ্যাদ্দুর কথা আচ্ছা, (নিকটে আসিয়া) কিরে বেটা ভন্ড তপস্বী। স্বরূপে তপস্বী হইয়া অতিথিরে হিংসে।। রাবণের কাজ করিস্ তপস্বীর বেশে। মোর হাতে পচ্চিস আজি যাবু যমের পাশে।।

কালনেমি— আর ঐ না ঘর পোড়া (ভয়ে) কাঁয় বাও অতিথের ছাওয়া, গাও ধুইয়া আসলু? বা বইস ঐটে। এই যে বাও ফল জল নে। খায়া দায়া একটুকা শান্তি হ।

মূল পদ

তপস্বী ভাবিল মায়া হইল বিদিত।
ধরিল রাক্ষস মূর্ত্তি অতি বিপরীত
লাফদিয়া হনুমানে কালনেমি মারে।।
লেজে জড়াইয়া তারে ঘুড়ায় আকাশে।
লঙ্কায় ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে।।
(রাবণের সভায় কালনেমি পড়ার শব্দ)

রাবণ— দ্যাখোতো দ্যাখোতো মন্ত্রী, অন্ধকারে সভার মাঝখানে অতো বড় শব্দ করি ওটা কি পইল্?

মন্ত্রী— মহারাজ! আমরা মনে হয় এটা কালনেমি হবে।

রাবণ— কি মাতুল কালনেমি? ইঃ ঘর পোড়া বেটা এত ধূর্ত্ত। মন্ত্রী কও দেখি এলা আমি কেন বুদ্ধি করি? হ্যাঁ মনে হইচে। তুমি শুনরে ভাস্কর। তুমি যায়া উদয় হও গিরির উপর।। তোমার উদয় হইলে মরিবে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন।।

সূর্য্য— মহরাজ! দ্বীতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে। এখন উদয় বল হইব কেমনে।।

রাবণ— তাতে ক্ষতি কি তোমার মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার।

মূল পদ

দিবাকর পূর্ব্ব দিকে হইল প্রকাশ।
তাহা দেখি হনুমান পাইল তরাশ।।
লাফ দিয়া অশ্বগণে ধরিল সত্বর।
রথে ধরি হনুমান দিলেন চক্কোর।।

হনুমান— কোন্ দেব তুমি কোন মায়াধর। স্বরূপ করি কন্ তুমি মোর বরাবর।।

সূর্য্য— দিবাকর সূর্য্য আমি ছাড়ি দাও পথ। উদয় হইতে যাই উদয় পর্ব্বত। মোর উদয় হইলে মরিবে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যাজিবে জীবন।

হনুমান— দেব মোর একটা কথা। যতক্ষণ লক্ষ্মণ না প্রাণ দান। তাবৎ উদয় গিরি না করেন গমন।

সূর্য্য— আরে যা, কে শুনেরে তোর এতেক বচন। না পারি রাবণের আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন।।

হনুমান— শোনো তোমরা দেবারে প্রধান। সদয় হয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ। রাবণের কথা মত যাও যদি বলে, রথ সুদায় ডুবি ফ্যালাইম সাগরের জলে।

সূর্য্য— শোনো হনুমান! শ্রীরামের অনুরোধে যদি ফিরি যাই। রাবণের কোপে বল রক্ষা কিসে পাই।।

হনুমান— রাম রাম ইয়ার বুদ্ধি মোরটে আছে। মোর গার বগলে আইস। কথা কানে কানে কওঁ। তোমার নাম ভানু মোর হনু নাম হয়। নামে নামে মিলি গেইচে আর কিসের ভয়। দোনো পাকে রক্ষা পাইবে সুমন্তোনা বলি। হনু ভানু দোনো জনে করিব মিতালী।

সূর্য্য— বেশ বাই এযুক্তি মোর মনে নাইগচে। আচ্ছা তা হইলে আইস দোনো মিতায় কোলাকুলি করি। ডম্ভবোধ ডম্ভবোধ (সুর্য্যকে কক্ষতালী করিল)। আরে ভাই ইয়াঁয় কেমন?

হনুমান— ভাইরে ইয়ার থ্যাও এই রকম।

**মূল পদ**

মহা তেজোময় সূর্য্য
কে রাখিতে পারে।
আপনি হইল বন্দি
লক্ষ্মণের তরে
পুনরায় গেল হনু সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া বেড়ায়
বীর হনুমান।।
নর্তকীদের নৃত্য ও গান পিরীত করিব রে
দক্ষিণা বাতাসে।
দক্ষিণা বাতাসে রে
পরাণের হাওয়াতে।

আমরা গন্ধর্ব্বের নারী

আজি পূর্ণ শশী —

সুজন পাইলে পিরীত করি রে

আমরা কাটাই নিশী।

পুরুষের গান — তোমরা হইলেন ফুলের মধু

আমরা ভ্রমর জাতি

ফুল কুমারী পাইলে কন্যা রে

আমরা কইরব পিরীত।

নারীর গান— যৌবন আমার টলো মলো

আমার দিকে চান

উভয়ে। চোখে বুকে মিলি নিয়ারে

আমার যৌবন করি দান

হনুমান— তোমরা গুলা কাঁয় ভাইরে? তবে মোর একটা কথা শোনো। শক্তিশেলে পড়িচে ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ। ঔষধ নিবার আসনু মুই এ গন্ধমাদন। ফিরি যাইম লঙ্কায় মুই থাকিতে রজনী। ঔষধ চিনি দাও মোক বিশল্যকরণী।।

গন্ধর্ব্ব— শোনো শোনো ভাইরে কি বলে বানর। কাহার নরে বেটা কাহার কিঙ্কর। হা হা হু হু মহারাজ এইমাত্র জানি। কোন ঠাকার রাম তাক কক্ষণো না চিনি। আসিয়া বানর বেটা কোন কার্য্য করে। চুল ধরি সগায় গুলা কিল মারে তারে।

**মূল পদ**

কুপিল সে হনুমান সংগ্রামের শূর।

কিল মারি গর্ন্ধব্বের মাথা কৈল চূর।।

মেসার গান— ও মাঁই গুলমতী

কি ভাবনা করিস মাঁই

রাস্তায় বসি।

যার জন্য করিস মাঁই এতো ভাবনা

তাঁয় তোর জন্য মাঁই ভাবেনা

পরের জন্যে কেনে মাঁই

তোর এতো ভাবনা।।

ও মোর যাদুয়া রে —
ঔষধ না চিনে হনু ভাবে মনে মন।
একটানে উপারিল সে গন্ধমাদন।।
পর্ব্বত লইয়া শিরে বীর হনুমান।
বায়ুবেগে দক্ষিণেতে করিল গমন।
ভারতে প্রশংস রাম মনেতে পড়িল।
নন্দীগ্রামে আসি বীর উপনিত হইল।।
সভা ছাড়িবশিষ্ট আইলেন সেই স্থানে।
সকল বৃত্তান্ত জানে মন্ত্র ব্রহ্ম জ্ঞানে।।
এইমতে হনুমান পর্ব্বত লইয়া মাথে।
উপনীত হইল আসি রামের সাক্ষাতে।।

বিভীষণ— মিত্র! আর চিন্তার কোন কারন নাই। এই যে হনুমান একেবারে পর্ব্বত সুদ্ধায় ধরি আইচ্চে।

হনুমান— জয় রাম! প্রভু! দাসের প্রণাম নেন্। প্রভু ঔষধ চিনির না পায়া একেরে পর্ব্বত সুদ্ধায় উকড়ী আইনচ্চোং।

রাম— বৎস পবনকুমার। কোন কার্য্য পৃথিবীতে অসাধ্য তোমার। সুষেণ, এখন তুমি নিজে ঔষধ চিনি নেও।

সুষেণ— যে আজ্ঞা প্রভু। আর কোন চিন্তা কইরবেন না। আমি এই ঔষধ খুজির চইল্লোং।

**মূল পদ**

এই মতে সুষেণ কোন কার্য্য করিল।
পর্ব্বত উপরে ঔষধ খুঁজিতে লাগিল।।

বৈরাগী— আর বাপু থেন্ তোমার ব্যাড়ব্যাড়ী। দ্যাখোত ঐ যে লোকটা সঙ্গা থাকি বুড়া বক্‌ড়ীর ঢক্ করি ম্যালম্যালের দেখ্চে তা সেকথা আর কি কও। মোক একেরে অনিচ্চা নাগাইলেক্;

মূল— হেই কুলোক, তুই উলা কৈস কিরে?

বৈরাগী— কি আরো কও মোক, এ্যাকেরে ত্যক্ত নাগাইলেক্। মূল মুই বুড়া বক্‌ড়ী? আরে কুশন্ড, মোক তুই দশজনের আগোত এমন করি অপমান করিস? ও - মাইহে ন্যাওতো এই বেটার কান ধরি তুইলবেন।

ছুকরী— ধর হের দিদি-ধর। গোলামের কান দুইটা ছিড়ি দেই।

বৈরাগী— খবদ্দার হাতাইবেন না। হাতাইলে কিন্তুক ভাল হইবে না।

ছুকরী— কি করবুরে গোলাম কি করবু। হাতে না পাবু তা এ্যালায় দাতে উকড়াবু। তুই ক্যানে তা তাল ভঙ্গ করি আমার মূল গীদালোক অপমান কল্লু।

বৈরাগী— আচ্ছা তোমরায় বিচারকর। এই লোকটা সঙ্গু থাকি কি ভবে চলির ধৈচ্চে। আমার মনোৎ কোন্ কথা, উয়ার খালি বাড়ী অরা ব্যাড়ব্যাড়ী।

ছুকরী— সে ও দোয়াড়ী তোমার আরো কি হইচে?

বৈরাগী— সে কোনো হউক। তোমাক কয়া তা আমার কি হইবে। আচ্ছা তা হোর এ্যাও কি কয়, তোমার গালোৎ ওক্না কি?

ছুকরী— ছিরে গোলাম, গাৎ হাত দেইস ক্যানে?

বৈরাগী— ই — বাইশ তাতে আরো তা কি হইল মাঁরা।

ছুকরী— কি কইস্ কি কইস্ গোলাম। কি কইস্ পাচে বা গালাৎ পাট্টানী নাগে ধোয়া চড় চওড়ে ন্যাও। তোর ঘরের মান্ষি পাচিস?

বৈরাগী— তা আরো কোন কপালোত। তাতে আরোতো কি হই। এ্যাও হোর কি কয় চিম্টা চিম্টি খেলাই।

ছুকরী— না খেলাই খেলাই। ঐ যে বোলে কয়, আরে মুতিম্ মুতিম্ ডাবরীত্, তাও না মুতিম দোয়ারী তোর মাথার খাপ্রিৎ।

মুল— আরে মাই তোমাক মুই কইচোং কি? এলাও নিলাজ বেটার শাস্তি হইল না।

ছুকরী— নেও ধর হেইর দিদি ধর।

বৈরাগী— মন্নু আইও

ছুকরী— ঘুণ্ডরে ঘুণ্ড মাটিয়া ঘুণ্ড থৈ পাইলে দেঁও খা। নাক কান তোর মোচড়ে দিলোং বাড়ীত নাগিয়া যা।

মুল— আরে দোয়ারী হৈচে?

বৈরাগী— হু —

মুল— আর এমন কাজ করব না?

বৈরাগী— উঁহু

**মূল পদ**

আনন্দে সুষেণ হনুমানের বাখানী।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী।।
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ রাম জয় ডাকে।।
জয় রঘুপতি রামচন্দ্রের জয়।
অন্তরে অন্তরে বিদ্ধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ।।
ভাই ভাই রাম হইল উতরোল।
পলকে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দিল কোল।।

রাম— বৎস হনুমান, এক কাজ কর বাছা। যেখানকার পর্ব্বত সেখান রাখি আয়। আচ্ছা হনু তোর শরীর সুর্য্যের কিরণ দেখা যায় কেনে।

হনু— হ্যাঁ এ্যাও এ্যালা সেনে পাজির আক্কেল হইল না। ওটা কথাতো মোর মরিক্ বুলি ফমে নাই।

রাম— আচ্ছা কথাটা কি খুলি ক দেখি?

হনু— প্রভু! মুই গন্ধমাদন পৌছিবার আগোৎ দেখোং উয়ায় বোলে রাবণের হুকুম মতো উদয়গিরি যাবার ধইরচ্ছে উদয় হবার জন্যে। তখন মুই উয়ার আগোত ছান্দি যাঙ। এতো যে কাউসা কাউলি করি কওঁ। তবু কিছুতে মোর কথা শোনেনা। তখন চাল্লাকি করি মিতা সম্বন্ধ পাতেয়া কোলাকোলি কৈত্তে অদি এ্যাকেলা যে পাকের ভিতর ডুবি থুইচোং তা সে কথা মাত্রয় মোর খ্যালে নাই।

রাম— হনু তুই কচ্চিস কি। দে এক্ষণে ছাড়ি দে। ও — এই জন্যে রাত্রি প্রভাত হয় না।

হনু— মিতা বিরাও ভাইরে মনে কোনো করিসনা। ডন্ডোবোধ ডন্ডোবোধ।

রাম— আদি কত্তা আপনি বংশ দিবাকর। তোমা হৈতে প্রাণ পায় লক্ষ্মণ বসুন্ধর। তারে দাসের প্রণাম—

সূর্য্য— তোমার জয় হউক।

সকলে— জয় রঘুপতি রামচন্দ্রের জয়। জয় রঘুপতি রামচন্দ্রের জয়।

**মূল পদ**

শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন।
অপার দুর্গতি তার খণ্ডে সেইক্ষণ।।

---

সংগ্রহসূত্র

কোচবিহার জেলার ঘুঘুমারির বিখ্যাত মূল গীদাল এবং ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী প্রয়াত কেশব বর্মণ এই কুশান লোকনাটকটিকে মৌখিকরূপ থেকে লিখিত আকারে আনেন। প্রায় ষাট বছর আগের পুরানো এই লেখাটি কোচবিহারের প্রয়াত হরিশ্চন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পালাটিই এখানে সংকলিত হলো। পরবর্তীতে কুশান সম্রাট ললিত গীদালের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাট্যানুষ্ঠানও গোসানিমারি ও শীতলকুচিতে দেখেছি। কাহিনী একই রয়েছে। 'কুশান' নাট্যানুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন দেওয়ানহাটের লোকশিল্পী মণি সরকার।

# দোতরা

## আলম সাধু

**আসর বন্দনা ঃ—**

আইসেক মাও মোর সরস্বতি মা
ওহে মা মোর সভার ভিতর হে
আইসেক মাও মোর সরস্বতি মা।...
আইসেক মাতা সরেস্বতি রথে করিয়া ভর
জৈ জোগারে নামেক মা তুই মোর সভার ভিতরে
মোর সভা ছাড়িয়া যদি মা অন্যের সভা যাও
আরো কোন কিড়া না দেও হে
ওহে মা ধর্ম্মের মাথা খাও হে।
প্রথমে বন্দনা করি শিবের চরণ।
তার পরে বন্দনা করি দেব নারায়ণ।
শিবেরও ঘরণী বন্দং মাও ভগবতী।
তাহার দুটি কন্যা বন্দংহে ওহে মা
আইসেক... লক্ষ্মী সরেস্বতি হে।।
মালি যেমন গাঁথে মালা হারের মধ্যে দিয়া
তোর আরে ও হে...
ঐ মতন জোগেয়া দে মা গানের আগান
হায় হায়রে ।।...

**ধুয়া ঃ—**

আমি হইলাম তব ঐ চরণ ভিখারী হে হরি
আমিতো হইলাম।।
আমার মরণ কালে চরণ দিও হরি হে
আমার মরণ...
ও চাঁদ হরি হে দয়াল আমিতো...

**পয়ার ঃ** হায়রে, বন্দনা গানেরও কথা রইল ভালেভালে
দোতরা পালা গানের কথা শুনি সকলে।।
ধর্ম পুরে ছিল সাধু ধর্ম অধিকারী।
সোনা রূপার বানাইচে সাধু আট মহলা বাড়ি।।
ধনে আসন ধনে বাসন ধনের নাইরে সীমা।।
ধন দিয়া বান্ধিতে পারে অগম দরিয়া।।
তার পুত্র আলম সাধু নামেতে সংসারে।
১৪ বছর যাবে সাধু বাণিজ করিবারে।।
যখন যাবে দেখ বাণিজ করিবারে।
তিনটি গোপন কথা বলিবে ছাইলার আগে।।
একটি মাত্র পুত্র বিধি দিছে তাহার কোলে।
সেই পুত্রে ডাকি কথা লাইগাছে বলিবারে।।

আলম ঃ রহিম - রহিম

রহিম ঃ কেন পিতা ডাকিছেন আমারে।

আলম ঃ ওরে বাছা রহিম ১৪ বছর যাব আমি বাণিজ করিবারে। তিনটি গোপন কথা বলিয়া তোমারে।।

রহিম ঃ কন পিতা কন।

আলম ঃ না না বাছা, তার আগে তোমাকে সত্য অঙ্গীকার করিতে হবে।...

রহিম ঃ পিতা, এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি। তোমার সত্য না পালিলে প্রাণে যেন মরি।।

আলম ঃ তাহলে শুনো বাছা ---
এই যে গর্ভবতী ঘুড়ীটাক ছাড়িলোং ঘোড়শালাটার মাঝে। ঐ ঘুড়ীর উদরে যদি ঘোড়া পয়দেশ করে লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা বসিয়া করিবু দ্বারে। আর ঐ ঘুড়ির উদরে যদি ঘুড়ি পয়দেশ করে, সে ঘুড়িক কাটিবু না রাখিবু ঘরে।।

রহিম ঃ সামান্য এই কাজের জন্যে আমাক সত্য করাইলেন পিতা ?...

আলম ঃ গর্ভবতী হস্তিনী ছাড়িলাং হস্তিশালের মাঝে। ঐ হিস্তিনীর উদরে যদি হস্তী পয়দেশ করে --- লক্ষ টাকা দান করিবু বসি দ্বারে। আর হস্তিনীর উদরে যদি হস্তিনী পয়দেশ করে সে হস্তিনীক কাটিবু, না রাখিবু ঘরে।।

রহিম ঃ পিতা এই সামান্য কাজের বাদে মোক...

আলম ঃ গর্ভবতী তোর মাক ছাড়িলাং
নাট মন্দির ঘরে
তোর মার উদরে যদি ভাই পয়দেশ করে
লক্ষ টাকা দন দক্ষিণা করিবু বসি দ্বারে
তোর মার উদরে যদি বৈনি পয়দেশ করে
সে বৈনিক কাটিবু, না রাখিবু ঘরে ।।

রহিম ঃ আঃ আঃ আঃ (কান্না)

আলম ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সত্য।

রহিম ঃ পিতা। এ কি সত্য কারাইলেন পিতা। কেমন করি মার কোল থাকি বৈনিক কাড়ি নিয়া হত্যা করিম এই সত্য তোমরা ফিরিয়া নেও পিতা ফিরিয়া নেও।

আলম ঃ আর সেটা হবে না রহিম, পিতৃ সত্য কোনদিন লঙ্ঘন হয় না।...

হায়রে ঃ বিদায় লইয়া আলম সাধু রহিমের কাছে।
বেগমের নিকটে সাধু লাইগছে যাইবারে।।
নাট মন্দির ঘরে বেগম বসিয়া যে ছিল।
বেগম বেগম বলিয়া সাধু ডাকিতে লাগিল।।
চৌদ্দ বছর যাব আমি বাণিজ করিবারে।
রাজ্য বাড়ী দেখ তুমি অতি সাবধানে।
রহিম থাকিবে গুরুর ও পাঠশালে।
করিও স্মরণ তারে বিপদে পড়িলে।।...

বেগম ঃ ও হো প্রাণ সাদুরে সাদু
যদি সাদু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্ধি খান ওরে
দাড়ি মাঝি সাধু রাখেন সাবধানে রে।।
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যয়।
পর নারী সাধু আপন নয়রে
পর নারী সাধু বধিবে জীবন রে।।...

হায়রে ঃ বেগম আর আলম সাধু ক্রন্দন করিয়া।
চলিল আলম সাধু বাণিজ্য বলিয়া।।
দুলাই দুলাই বলিয়া সাধু ডাকিতে লাগিল।
মাঝি মল্লা যত ছিল আসিয়া পৌঁছিল।
ওরে দুলাই যাব আমি বানিজ্য করিতে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা মধু কর সাজাও ত্বরা করে।
মাঝি ভাই ভাইরে, ভাল করি ধরেন নায়ের হাইল।

পয়ার ঃ প্রথমেতে সাজায় ডিঙ্গা নামেতে চিতর।
১৪ বছরের খাবার তোলে সেই ডিঙ্গার ভিতর।।
তার পরে সে সাজায় ডিঙ্গা নামে আগল পাগল
সেই ডিঙ্গাতে তুলিছে সাধু ১৪ পাল ছাগল।।...
এইভাবে ডিঙ্গা খানি দুলাই সাজাইল।
গোধূলি লগনে ডিঙ্গার ডোর কাটিয়া দিল।।
ধীরে ধীরে মধুকর ভাইটাইতে লাগিল।
নিজ রাজ্য ছাড়ি সাধু বৈদ্যাশে পাও দিল।
আলম সাধুর কথা এবার রইল ভালেভালে।
বেগমের কথা এবার শুনি নেও সকলে।।

মূল ও দোয়ারী ঃ এক মাস ও হইলে গর্ভ জানি কি না জানি।
দুই মাসও হইলে গর্ভ লোকের কানাকানি।।
তিন মাসত হইলে গর্ভ রক্তে পুছে গোলা
চার মাস ও হইলে গর্ভ হাড়ে মাংসে জোড়া।
পাঁচ মাস ও হইলে গর্ভ পঞ্চ পুষ্প ফুটে।
ছয়ও না মাসের বেলা এ গের ও গের করে।।
সাত মাস ও হইলে গর্ভ স্বাদ খাইতে চায়
আট না মাসের বেলা অষ্টমী মেলায়।।
নয় মাস ১০ দিন পূর্ণ হইলে ভুসিতে বসতি।।
ওকি হায়রে হায় ও হো বিধিরে।।

পয়ার ঃ হায়রে, প্রসবের বেদনায় বেগম কোন কাজও করিল
দাসীরে ডাকিয়া কথা বলিতে লাগিল।।
ত্বরা করে ধাই মারে আনহ ডাকিয়া।
প্রসব যন্ত্রণায় আমি যাই যে মরিয়া।।
যন্ত্রণায় ছটফট করিছে বেগম।
হেনকালে ধাইমা আসি দিল দরশন

ধাইমা ঃ রানীমা - রানীমা।

বেগম ঃ প্রসব যন্ত্রণা থাকি মুক্ত কর ধাইমা।

ধাইমা ঃ বাপরে বাপ মুই যখন আসি পুচ্চুং আর ভয় কিসের। আচ্ছা রানী মা ঐ যে শাড়ীখান দেকা যায় - তোমার ঐ শাড়ীখান পিন্দিয়া মুই তোমার নিদান তড়াইম। আর ঐ শাড়ী খানত যত রাজ্যের পঙ্খী পয়াল দেকং ওইগিলা মোক ভাঙ্গি কনতো ? কি ব্যাপার।...

হায়রে ঃ একেতো যন্ত্রণায় বেগম হইছে কাতর।
ধাইমার কথা শুনি খাইল ফাফর
না ছাড়িতে ধাইমা যখন বলিল বেগম
ঐ শাড়ী পিন্দিয়া মোর নিদান তরান।।
শাড়ীখানের নাম হইল নিয়র মেলানী।
পাঁচ কুড়ি মুদ্রা গেইচে তাঁতীক দিতে বানি।
দিন হইলে শাড়ীখান নিয়রে ভিজি থাকে।
রাতি হইলে ঐ শাড়ীখান চটক ধরি উঠে।
যেইকালে ধাইমা শাড়ীত হাত দিল।
হাড়িয়া মেঘের মতোন শাড়ীখান গর্জিয়া উঠিল।
সেই শাড়ী পিন্দিয়া ধাইমা বেগমক ধরিল।
আন্ধার ঘর আলো করি ছাওয়া জন্ম নিল।
বিধির বিড়ম্বনা দেখ কি হইতে কি হইল।
কইনা ছাওয়া দেখি বেগম কান্দিতে নাগিল।
ধাইমা বলে রানীমা কান্দ কি কারণ।
এত সুন্দর কইনা তোমার সোনার বরণ।

ধাই ঃ রানীমা তোমরা কান্দেন ক্যানে ?

বেগম ঃ ধাইমা, বিধির লিখন না যায় খন্ডন

অকালে অভাগীর মরণ

মোর পুত্র রহিম আছে গুরুর পাঠশালে।

শুনা মাত্র ধায়া আসি কইন্যারে কাটিবে।

রহিম যে পিতৃ সত্যে আবদ্ধ, ধাইমা। পিতৃ আদেশ রহিম পালন কইরবেই।

ধাই ঃ এই বুদ্ধিটায় নাই পান। শুন মোর কথা, মুই কালি যাইম রহিমের পাঠশালা। যায়া কইম, রহিম, তোর মার ওদরে একটা ভাই জন্ম নিচে। আর ঐ ভ্যাবা পন্ডিত রহিমক গণনা করি কয়া দিবে। রহিম - আজ থাকি ১২ বছর পর্যন্ত তুই তোর ভাইএর দেখা করির পাবু না। দেখা করিলে তোর ঝালা নাগি তোর ভাই মরিবে না হয় ভাইএর ঝালা নাগি — তুই মরিবু। এই জন্যে পাঠশালা ছাড়িয়া তুই ঘোর বনে যা।

পয়ার ঃ হায়রে, মিছা কথা মিছা খবর দেয় রহিমের কানে।।

যুক্তি করি তখন ধাইমা বেগমের সনে।

১২ বছরের লাগি তার আনন্দিত মন।।

এই ভাবে বাঁচাইল কন্যারে বেগম।

খোসা গান ঃ কালা আর না বাজান বাঁশরি ঃ

সাধের ঘরে কালা রইতে না পারি ..

পয়ার ঃ বিধিরে — এইভাবে আরো কত দিন চলিয়া যে গেল।

দিনে দিনে কন্যা দেখ বাড়িতে লাগিল।

হাসিয়া খেলিয়া কইন্যা খেলেয়া বেড়ায়।

নাবালিকা কইন্যা দেখ সাবালিকা হয়।

কন্যার নাম রাখিছে বেগম আয়ষা সুন্দরী।

বিজলীর ছটা যেন মহলও মাঝারি।

যখন কালে আয়ষা দেখ যুবতী হইলো।

রহিমের কথা সব জানিয়া ফেলিল।।

একমাত্র দাদা তার রহিম পালোয়ান।

রাজ্য বাড়ী ছাড়া দাদা বৈনির কারণ।

জিজ্ঞাসে মায়ের কাছে না পাইয়া উত্তর।

কপাট দিয়া নাট মন্দিরে করিছে রোদন।

উপায় অন্ত না পাইয়া জননী বেগম।

কহিল খুলিয়া সব সত্য বিবরণ।

শুন শুন শুন বাছা জবাব শুনেক মোরে।

পিতৃ সত্য পালিবে রহিম কাটিয়া তোমারে।

এই কথা শুনিয়া আয়ষা জননীরে কয়।

কাটুক মারুক নাই কোন দুঃখ দেখা যদি হয়।।

আয়ষা ঃ মা, না দেও যদি দাদার সনে হইতে দরশন।

জানিয়া রাখ মাতা আমার মরণ।..

পয়ার ঃ হায়রে - কন্যার রোদন শুনিয়া জননী বেগম।

আজ্ঞা দিল রহিম সনে হইতে দরশন।

মায় বেটি গালা ধরি কান্দিয়া কাটিয়া।

গমন করিল তারা ঘোর বনও বলিয়া।।

কতেক দূর হইতে দেখ কতেক চলিয়া গেল।

ঘোর বনের নিকটে আসি উপনীত হইল।।

বেগম ঃ দেখ মা, তোক দেখা মাত্র রহিম কাটি ফেলাইবে। যদি বাচির চাইস দাদা - দাদা - বলিয়া একবার কমর জড়েয়া ধরিলে আর মারির পাবে না। না হইলে তোর মরণ।

আয়ষা ঃ ঠিক আছে মা।

বেগম ঃ দেখ মা আয়ষা, ঐ যে ঘোর বনের উপর একটা বড় গছ দেখা যায় তার ঐ পাড়ে তোর দাদা আছে। ঐ ময়ালে দেখবু একটা মস্ত বড় টং, ঐ টায় তোর দাদার ডেরা।

পয়ার ঃ হায়রে রহিল বেগম সেথা আয়ষা চলিল।

অনেক দূরও যাইয়া আয়ষা উপনীত হইল।

দাদা দাদা বলিয়া আয়ষা পাড়ে ঘন ডাক।

জাগিল নিদ্রার কত হাতী ঘোড়া বাঘ।।

গহন বনে শুনে রহিম নারী কণ্ঠস্বর।

এক লম্ফে উঠে রহিম টংগের উপর।।

দাদা দাদা বলিয়া আয়ষা রহিম পানে ধায়।
টং-এর নিকট গিয়া আয়ষা দাদা পানে চায়।
কে ডাকে দাদা বলি ঘোর বন মাঝারে।
তলোয়ার হস্তে রহিম টং থাকিয়া নামে।

রহিম ঃ কে। দেবতা দানব কিন্নর নাকি মায়াবী রাক্ষসিনী।

আয়ষা ঃ দাদা - দাদা - নোয়াং দাদা রাক্ষসিনী নোয়াং পিচাষিনী।
ভাল করি চায়া দেখ মুই দয়ার বৈনি।

রহিম ঃ না, না, না, মায়াবী হও আর রাক্ষসী। হও এই মুহূর্তে দূর হও। চাইলে এই তলোয়ারের আঘাতে মুন্ডছেদ করব।

আয়ষা ঃ দাদ, মুই তোর দয়ার বৈনি।

রহিম ঃ না না আমার কোন বৈন নাই।
জন্ম নিচে মোর ভাই।।
আলম সাধুর দুই পুত্র এই সংসারের মাঝে।
লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা বসিয়া করব দ্বারে।

আয়ষা ঃ শুনেক শুনেক দয়ার দাদা জবাব শুনেক মোরে।
মিথ্যা খবর দিছে ধাই নিকটে তোমারে।
মুই তোর দয়ার বৈনা আয়ষা মোর নাম।
আলম সাধু পিতা দাদা জননী বেগম।

পয়ারঃ হায়রে এই কথা বলিয়া আয়ষা কোন কাজও করিল
দাদা দাদা বলিয়া রহিমক জড়েয়া ধরিল।।
যেই না কালে এইনা কথা কানেতে শুনিল।
কপালে চাপড় মারিয়া কান্দিতে লাগিল।।
ভালক্ না কং ভাল্ মোর বিধাতা মন্দক্ না কং ভাল
মন্দ নয় কালিয়ার কলম মন্দ মোর কপাল।।
না পারি পিতৃ সত্য করিতে পালন।
ভাই বৈন মিলি দেখ করিছে রোদন।
রহিম বলে দয়ার বৈন ফিরিয়া যাও ঘরে।

আর দেখা না হইবে পিতা মাতার তরে।
বহিনের ক্রন্দনে গাছের পাতা ঝড়ে।
আঞ্চলে মুছিয়া দেয় বৈন বারে বারে।
আয়ষা বলে চল দাদা ফিরিয়া যাই ঘরে।
অভাগী জননী যদি হামার শোকে মরে।।

রহিম ঃ না না বৈন, রহিম মহাপাপী দুরাচার
পালিতে নারিল পিতৃ সত্য একবার।
এই বন এই রাজ্য ত্যাগিয়া যাব চলি।
মায়েরে বুঝিয়া রাখ ঘরে যাও ফিরি।।

আয়ষা ঃ সত্যই যদি ফিরিয়া না যাও আমি দোষের দুষি
তোর সনে আমি দাদা হব বনবাসি।
মোর জন্যে হচিল দাদা রাজ্য বাড়ী ছাড়া।
তোর সাথে বনের মাঝে রব জীবন ভরা।।
ভাই ভগ্নী এই ভাবে করিয়া রোদন
সেথা হইতে অনেক দূরে করিল গমন।।
কতেক দূর হইতে দেখ কতেক দূরও গেল।
সহস্র যোজন দূরে উপনীত হইল।
লতা পাতা দিয়া একখান বানাইল বাসর।
ভাই ভগ্নী বসত করে সেই ঘরের ভিতর।

পয়ার ঃ হায়রে, পিতা রইল কোন বা দেশে মাতা বা কৈ রইল।
পুত্র কন্যা বনের মাঝে কত না দুঃখ সইল।
দেখিতে দেখিতে কত দিন চলিয়া যায়
বনের মাঝে যুবতী আয়ষা ভাবে একেলায়।
পড়িলে যৌবন কাল নদীর ভাঙ্গে পাড়।
ভায়ে নিয়া যায় ঝাড় জঙ্গল এলুয়া কাশিয়া খার।।
ভর যুবতী আয়ষা এখন ভাবে মনে মনে।
উতাল পাথাল করে মন বন্ধুয়া বিহনে।

বসন্তে কুকিলা ডাকে করে মধুর গান।

ঘরে বসি আয়ষার ঝুরে দুই নয়ন।

বিধির লিখন দেখ বিষম কালের চাকা।।

না যায় খন্ডন ভাগেভাগে দেয় দেখা।

ঘোর বনের ঐ পারে হইল জাগীরাম বাদশার ঘর।

রাজ্য বাড়ী নিয়া বাদশার সুখের সংসার।

জাগীরাম বাদশার মহলে যায় গাটু নাপিত ভাই।

পক্ষে পক্ষে করে নাটু রাজ বাড়ীর কামাই।।

দিবা যখন দ্বিপ্রহর গাটু চঞ্চল হইয়া।

ক্ষৌর কাজে ধায় নাপিত রাজ বাড়ী বলিয়া।

দূর হইতে দেখে গাটু এক সুন্দরী রমণী।

পন্থে দান্ডইল ভয়ে বিষম প্রমাদ গনি।।

খোসা গান ঃ হায়রে - অপূর্ব সুন্দরী দেখি জঙ্গলের মাঝারে।

আনমনে ভাবে গাটু নানা চিন্ত করে।

গাটু ঃ দানব দানবী না কি রাক্ষস দুরাচার। মোর সতে আসিল আজি ছলনা করিবার না, না, চ্যাংড়া থাকি আজি বুড়া হ-ুং — দেও দেবতা তো এমন করি কোন দিল দেখা দেয় নাই না ভাল করি দেখং তা। খানেক আগেয়ায় দেখং ভয়ও নাগে।... বাপরে বাপ কি কৈন্যাটার রূপ। মোর চৌক দুইটা লসি গেল ... নিশ্চয় স্বর্গে অপসরি না হয় কোন রাজার কন্যা। না আরো একনা আগে দেখং। গাওখানও কাপে... (নাপিতের কান্ড দেখে আয়ষা বুঝতে পারে কোন এক পথিক তাকে দেখে ভয় পেয়ে এদিক ওদিক করছে। তাই আয়ষা হাত তুলে ডাক দেয়।)

গাটু ঃ ওরে বাপ এবার তো হাত তুলি ডাক দিচ্চে। তাহাইলে নিশ্চয় মানবী। দেও দেবতা নোয়ার। কার ঘরের কন্যা তোমরা জঙ্গলের ভিতর। তোমাকে দেখিয়া কন্যা মোক লাগিছে ডর।। কায় তোমরা কায়?

আয়ষা ঃ পরিচয়ের নাই কাম ওহে পথিক ভাই।

নয়নে দেখিছ যাহা সত্য সে তাহাই।

গাটু ঃ কিন্তু কি কারণে হইচেন কইন্যা তোমরা বনবাসী। এহেন সুন্দর বদন রাজ রানী সাজে।

নিশ্চয় রাজার কুমার তোমার সাথে আছে। কোনবা দুঃখে হয়া দুঃখী বনে বান্ধিবেন ঘর।

পয়ার ঃ নাপিতের কথা আয়েষা যে দন্ডে শুনিল,
যৌবনে নারী হৃদে দংশন করিল।।
তাহা ভাবি আয়ষা তখন কোন কাজ করিল।
ধীরে ধীরে গাটুর নিকট পরিচয় দিল।।
পিতা আলম সাধু পথিক, জননী বেগম
উজান দ্যাশে ঘর পথিক আয়ষা আমার নাম।
না পারিতে পিতৃ সত্য করিতে পালন।
রাজ্য বাড়ী তেয়াগিয়া সন্ন্যাসী জীবন।।
দাদা মোর রহিম বনে আসিলাম

আয়েষা ঃ তা, তোমরা কায় পথিক?

গাটু ঃ মুই, নাপিত। এই বনের ঐ পাড়ে জাগীরাম বাদশার বাড়ী। পক্ষে পক্ষে আইসং মুই ক্ষৌর কাম করং। যাই কইন্যা। তা, হ্যাঁ কইন্যা জাগীরাম বাদশার ছয় রানী কিন্তু তোমার মতোন হওয়া তো দূরের কথা তোমার একটা ঠ্যাং এরও যোগ্য না হয়। তোমার বদন যদি বাদশা এক পলক দেখে ছয় রাণীর ঘরক তোমার দাসী করি দিবে। কন্যা এ্যালা যাং। কাইল এই দুপর সময় আসিম ঠিক এই পান্থ দিয়ায়।

পয়ার ঃ হায়রে এই বলিয়া ধূর্ত নাপিত চঞ্চল হইয়া।
জাগীরাম বাদশার নিকট উপনীত হয় গিয়া।।
বাদশার কাছে - গিয়া নাপিত বলে ধীরে ধীরে।
অপরূপ সুন্দরী এক বনেরও ভিতরে
কি বলিব ওহে বাদশা রূপের বর্ণনা
কিঞ্চিত যোগ্য নয় আপনার বেগম ছয় জনা।
শুনিয়া গাটুর কথা বলিছে বাদশাহ।
বিবাহের প্রস্তাব আমার তারে গিয়া কহ।
এতেকশুনিয়াগাটুআনন্দে মগন।
কন্যারে আনিয়া দিলে পারে রত্ন ধন।।

পয়ার ঃ হায়রে, কি করিল নাপিত ভাই ক্ষৌর কাজও করি।

যেদিকে আয়ষার ডেরা সেই পন্থ করি।।

চতুর ঐ নাপিত দেখ কোন বা কাজও করে।

কইন্যা কইন্যা বলিয়া তখন লাইগছে ডাকিবারে।।

গাটু ঃ কইন্যা, তোমারা দুঃখের হইবে অবসান।

আয়ষ ঃ কি দুঃখ নাপিত ভাই।

গাটু ঃ জঙ্গলে থাকির লাগিবে না।। জাগীরাম বাদশা নিজে মোক ঘটক করিয়া পাঠাইছে। এ্যালাখালি তোমার মতামত বাকি। বাদশা যে তোমাক কোনটে রাখিবে কন-কন তাড়াতাড়ি কয়া ফেলান।

আয়ষা ঃ শুন নাপিত ভাই পখীর বসন্ত কালে ডালে বান্ধে বাসা।

ফুলেরও বসন্ত কালেরে ঐনা করে ভোমরার আশা।। কিন্তু ...।

গাটু ঃ কোন কিন্তু নোয়ায়। শুন কইন্যা ঐ কয় যৈবন জোয়ার একবার আইসেতে না ফিরে বারেবার এ সময় চলিয়া গেইলে পাওয়া না যায় আর।।

আয়ষা ঃ শুন নাপিত ভাই, সঙ্গে আছে দাদা রহিম বীর পালোয়ান।

জিন্না পীরের শক্তি ধরে ক্ষণেতে বিদ্বান।।

এহেন দাদার সাক্ষাতে যদি বাদশা মহল যাই।

না রবে বাদশার রাজ্য গুড়িয়া করিবে ছাই।।

না রবে কাহারো প্রাণ রহিমের হাতে...

গাটু ঃ কন্যা, কথায় কয় বড় থাকি বড় আছে দেশ ঘুরিলে জানা যায়। হবার পায় পালোয়ান জাগীরাম বাদশাও কম নোয়ায়। এক একটা হাত্তীর মতোন চেহের এক লম্বা সৈন্য তার সওয়া লম্বা ঘোড়া। সেই হস্তি পালে পালে সিংহ ৫০ জোড়া। জাগীরাম বাদশা ইচ্ছা করিলে এক দন্ড তোমাক নিয়া যাবার পায়।

আয়ষা ঃ তাহাইলে কন গিয়া বাদশার কাছে।

পালোয়ান ভাই তার আছে বনের মাঝে।

ভাইয়েরে বধিয়া যদি পাও জিতিবারে।

আয়ষা সুন্দরী তখন যাবে তোমার ঘরে।।

হর রোজ যায় দাদা শিকার করিবারে।

সারা দিন থাকে দাদা বনের ভিতরে।

ঘরে ফিরে ঠিক ভাটি বেলা।।

গাটু ঃ ঠিক আছে কইন্যা ঠিক আছে।

বাদশার সৈন্যদল ঘোর বন ঘিরিয়া।

মুই এলা গেনুং বাদশার কাছে।।

যুমিবে রহিমেরর মনে সারা দিন ধরিয়'

পয়ার ঃ হায়রে - ধুর্ত নাপিত দেখ কোন কাম করিল।

জাগীরাম বাদশার নিকট গিয়া বলিতে লাগিল।।

মহারাজ আপনার তরে কন্যা আছে পদ্দু চাহি।

একটি কারণে কন্যার মন হইচে ভারি।।

জাগীরাম বাদশা বলে শুন গাটু রাম।

বিবাহের পুর্বে কি চায় হীরা মানিক ধন

কত মুল্য চায় সে রত্ন আর কাঞ্চন।

দিয়া আইস গাড়ী গাড়ী যত লয় মন।।

নাপিত বলে রতন কাঞ্চন না চায় সুন্দরী।

এক মাত্র দাদা তার জীবনেরও অরি।।

আনিতে হইবে তারে দাদাক নিধন করি।।

হায়রে - এই কথা শুনিয়া বাদশা মন্ত্রিরে ডাকিয়া।

আদেশ করিল তারে যাও সৈন্য লইয়া

ঘিরিয়া গহন বন কর আক্রমণ।

বন্দী করি নিয়া আইস আমার ভবন।।

প্রথমেতে যাছে সৈন্য মাথায় লাল পাগুরী।

ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সৈন্য যায় যে উড়ি উড়ি।।

তার পরে যাছে সৈন্য দেকিয়া লাগে ভয়।

হাটুয়া পারি বন্দুক ফুটায় দলান ফাটিয়া যায়।।

হায়রে, সাজিয়া সৈন্য সবে বনের দিকে ধায়।

সেই বনে শিকারে গেইছে রহিম হায়রে হায়।।

এই দিকেতে দেখ ভাই কি কান্ড ঘটিল।

শিকারে আসিয়া রহিম শিকার নাহি পাইল।
রহিমের দুই বান্দা জীবনের দোষর।
প্রমাদ গনিয়া দেয় প্রভুকে খবর।
আহারে, শিকারের নেশা বুঝিতে না পাইল।
বিনা দোষে কুত্তা, ঘোড়ায়, চাবুক মারিল।
সুখ দুঃখের সাথী তার কুত্তা আরো ঘোড়া।
শিকারে বসিছে রহিম করে হুড়া জুড়া।।
ইতি মধ্যে ঘিরিল বন বাদশার সৈন্যগনে।
মার মার করিয়া সবে খোঁজে রহিমেরে।।
মাল্ শাট মারি সৈন্য আইসে আগাইয়া।
বনের পশু পাখী - পালায় ছুটিয়া ছুটিয়া।।
সৈন্যের কোলাহল উঠিল গগনে।
করিয়াছে আক্রমণ বুঝে এতক্ষণে।।
উঠিয়া দাড়াইল রহিম নয়নে দেখিল।
শত শত সৈন্য তারে ঘিরিয়া ফেলিল।।
তাই দেখিয়া রহিম তখন কোনবা কাজও করে।
জীন্নাপীরের স্মরণ করি ঘোর পৃষ্ঠে চড়ে।
ঘোর পৃষ্ঠে চড়িয়া রহিম বাতাসে উড়ায়।
হুঙ্কার ছাড়িয়া দেখ পূর্ব দিকে ধায়।।
হস্তের তলোয়ার যেন বিজলিরও ছটা।
যত সৈন্য, হস্তির মুণ্ড গেল কাটা।।
ঘুরিয়া চলিল রহিম হইয়া উত্তরমুখী।
নিমেষে করিল শূন্য যত মহরথী।।
তারপরে দক্ষিণে চলে প্রলয়ের ঝড়ে।
শতসৈন্য ঢালি দিল গোদা দেও সাগরে।।
তাই দেখিয়া পশ্চিমের যত সৈন্যগণ।
রনে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন।।

নিজ প্রাণ নিয়া নাপিত দৌড়ায় ত্বরা করি।
ভাঙ্গিল দক্ষিণ পদ ও আছাড় পড়ি পড়ি।।
হায়রে, দিবা শেষে মহাযুদ্ধ হইল অবসান
সাগরের জলে রহিম করিল সিনান।
এদিকেতে আয়ষা দেখ কোন বা কাজও করে।
উচাটন মন তার ঘরে আর বাহিরে।
যুদ্ধের কোলাহল আয়রা শুনিয়াছে কানে
নিশ্চয় মরিবে দাদা না বাচিবে প্রাণে।
হেন কালে রহিম আসি ডাকে বৈনী বলি।
বন মাঝে কি হইল না বলিল খুলি।।
হায়রে এদিকেতে গাটুরাম বাদশার কাছে গিয়া।
মন্ত্রণা করিছে দেখ সাত দিন ধরিয়া।।

পয়ার ঃ বড়ই, চতুর বাদশা ভাবিয়া কহিল। আয়ষার কাছে গাটুকে যাইতে বলিল।

গাটু ঃ মহারাজ মুই আর আয়ষার বাড়ী যাবার যাবার পাইম না। যদি রহিম দেখে মোর জীবনও যাবে। তোমার বহু মুল্য ধনও যাবে। মুই মরিলে মাইয়া ছাওয়া না খায়য়া মরিবে।

পয়ার ঃ জীনা পীরের বরে রহিম হইছে বলীয়ান।
নিশ্চয় তার আছে কোন মৃত্যুর বিধান।
এই কথা শুনিয়া নাপিত কোন বা কাজও করে।
চলিল আয়ষার কাছে হিয়া কাঁপে ডরে।
বৃক্ষ ডালে চড়িয়া নাপিত চায় চারিভিতে।
এ্যাকেলা কইন্যাক দেখি শান্ত হইল চিতে।।

গাটু ঃ কইন্যা, তোমরা ঠিক কথায়। বাপরে বাপ বাদশার কতগুলা সৈন্য তোমার দাদা একলায় খালি ঘ্যাচা ঘ্যাচ ...

আয়ষা ঃ নাপিত ভাই জীন্না পীরের বরে দাদা হইয়াছে অমর।

গাটু ঃ কইন্যা এটা ঠিক কথা। কিন্তু তোমার দাদার নিশ্চয় কোন মরণের বিধান আছে। আজি রাইতের বেলা যেমন করি হউক দাদার কাছে মৃত্যুর বিধানটা জানি নেওয়া চাই। কইন্যা এই কাজ না হইলে কোন উপায় নাই।

পয়ার ঃ হায়রে, এই ভাবে দুই জনে কুবুদ্ধি করিল।
কেমনে বলিবে দাদাক ভাবিতে লাগিল।
সন্ধা কালে ভাই বৈনে করি ফলাহার।
সায়ন করিল দোহে শয্যার উপর।
নানা কথা কয় তারা দুই বৈনী ভাই।
আর আয়ষা বলে তার মাঝে রহিমের ঠাই।
শুনেক শুনেক শুনেক দাদা বলি যে তোমারে।
আর দুইটা বলং কথা নিকটে তোমারে।
বহুদিন আছি দাদা বনের ভিতরে।

আয়ষা ঃ যদি কোন বিপদে আইসে তোর কিংবা মোর। আচ্ছা দাদা - কেমন করিয়া বাচিব পড়ানে।

রহিম ঃ বৈনি - বিধাতা পাঠাইছে এই জগৎ মাঝারে। তার ইচ্ছা না হইলে কে মারিতে পারে।।

আয়ষাঃ দাদা - তবু যদি হয় কোন ফাড়া।

রহিম ঃ শুন বৈনি তোর কোন বিপদ হবে না।।

আয়ষা ঃ দাদা, মায় কইছে দাদা তুই অক্ষর অমর। মারিতে পারিবে না কাঁও করিয়া সমর। কিন্তু দাদা ছলে কিংবা কৌশলে তো তোক মারিবার পায়?

রহিম ঃ না বৈনি। কোন ছলে বলে মোর মৃত্যু নাই। মৃত্যু হবে -

আয়ষা ঃ ক দাদা ক,

রহিম ঃ না বৈনি শুইয়া নিদ্রা যাও।

আয়ষা ঃ দেখ দাদা মুই তোর একমাত্র বৈনি। আজি তুই মোক অবিশ্বাস করিল। যদি তোর কোন দিন বিপদ হয় মুই বৈনি হয়া কিছুই করির পাইম না।

রহিম ঃ তুই পাগলি বৈনি, ঐ বিপদ মোর কোনদিন হবে না।

আয়ষা ঃ দাদা কিসের ছলে মরিবু তুই, সাক্ষাতে থাকিয়া। মুই তোক দাদা না পাইম রক্ষা করিবার। দাদা এই মধ্য রাতি হামরা দুই ভাই বৈনি। কাক পক্ষী সব নিদ্রা গেইচে, তুই যদি তোর মৃত্যুর বিধান মোক কইস, কাও শুনির পারিবে না। ক দাদ কিসত তোর মরণ হবে।

রহিম ঃ না না বৈনি শুইয়া নিদ্রা যাও।

আয়ষা ঃ ও দাদা তুই মোক অবিশ্বাস করিস। তুই মোক নিজের বৈনি বলিয়া মনে করিস না। মিছায় তোর সতে মুই বনবাসে আছং। আঃ আঃ (কান্না) দাদা - আঃ আঃ

রহিম ঃ বৈনি মরণের বিধান আজি খুলিয়া বলং তোকে। দোহাই লাগে কাক পক্ষী কাও যেন না জানে। শুন বৈনি - বিশ্ব কর্মা দিয়া এক লোহার পিঁজিরা। সপ্ত কোটা সপ্ত তালা নির্মাণ করিয়া তার মাঝে ছেদ সুয়া রাখিলে বানেয়া। নিশ্চয় জানিবে দাদার মরণ পিঁজিরা। সেই পিঁজিরা ভীতর গেইলে আর ফিরিয়া আসির না পাইবে।

পয়ার ঃ হায়রে, নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা কে খন্ডাইতে পারে।
হইলেও পন্ডিত জনা না পায় বুঝিবারে।
রাত্রিখান্য গত হইল যেমন বিহান কালে
রহিম চলিল দেখ শিকারের সন্ধানে।
দুষ্ট বৈনি তখন হায়রে কোন কাজও করিল।
নাপিতের পন্থ পানে চাইয়া রহিল।
হেন কালে গাটু নাপিত দিল দরশন।
হরিষ অন্তরে তারা করে আলাপন।
আয়ষা বলে নাপিত ভাই অতি সাবধান।
বিশ্ব কর্মা দিয়া পিঞ্জিরা করহ নির্মাণ।
সপ্ত কোটা সব কথা শুনিয়া নাপিত চলিল সত্বর।
বাদশার নিকটে গিয়া কহিল খবর।
বিশ্ব কর্মা দিয়া পিঞ্জিরা বানাইল সপ্ত দিনে।
অষ্ট দিনে আইসে নাপিত আয়ষা দরশনে।

গাটু ঃ কইন্যা বিশ্বকর্মার পিঞ্জিরা বানা শ্যাষ। এলা ঐ পিঞ্জিরা রাখা খাবে গোদা দেও সাগর পাড়ে। আর তোমরা রহিমক নিয়া যান ছলে বলে কৌশলে ঐ সাগরের পারে সিনান করিবার ছলে। বাকি বুদ্ধি তোমার।

আয়ষা ঃ ঠিক আছে নাপিত ভাই, আইজ রাদে কাইল তাই হবে।

গাটু ঃ কইন্যা খুব সাবধান ভুল ঝনি না হয়। তাহাইলে তোমরা মরিবেন কি মোক মারিবেন। মোর বড়লোক হবার শখ মিটি যাইবে।

পয়ার ঃ হায়রে, যুক্তি করি দুই জনে নাপিত চলিয়া গেল।
হেন কালে রহিম দেখ গৃহেতে ফিরিল।।
শুনেক শুনেক দয়ার জবাব শুনেক মোরে।

কয় দিবস ধরিয়া মোর অঙ্গ ছমছম করে
না জানি কি বিড়ম্বনা বিধাতা জানে।
কিছু কাল থাকিস বৈনি তুই সাবধানে।
আয়ষা বলে দাদা তুই বড় পালোয়ান।
তোর ডরে রাক্ষসকুল হয় কম্পমান।

আয়ষা ঃ দাদা-বহুকাল ধরি যাই গোদা দেও সাগরে। আজি সাগরের জলে দাদা করিয়া সিনান।
জীন্না পীরের কাছে দাদা করি আরাধন।

পয়ার ঃ হায়রে, দুষ্টা বৈনির মিষ্টি বানী কানেতে শুনিল।
না বুঝিয়া আয়ষার ছলে সম্মতি জানাইল
সুখ দুঃখ কপালের লেখা মৃত্যু লেখা পর
যেদিকে মরিবে বান্দা পায় বা হাটি যায়
ঝেচুই করে ঝিকমিক কুকিলায় করে রাও
খেদ কাগা উঠিয়া বলে রাতি পোহাও রে পোহাও।
হায় হায় রে। শেষ নিদ্রা হইতে রহিম উঠিল জাগিয়া।
দুষ্টা বৈনি কয়যে কথা দাদারে ডাকিয়া।

আয়ষা ঃ দাদা - দাদা - চল দাদা অনেকটা বেলা হইল।

রহিম ঃ হ্যাঁ বৈনি অনেক বেলা হইল চল। দেখ বৈনি ঘর হাতে বেরেয়া মুই বায়রত দিনু পাও।।
মাথার উপুরা জিটি করে টেঁও টেঁও পক্ষরাও আজি দেও সাগরে যাওয়া বাদ দে বৈনি।

আয়ষা ঃ দেখতো দাদা তুই কেমন মানুষ। মাথার উপর জিটি টেঁও টেঁও করিবারে পায়। তাতে হামারকি? চল দেরী হয়।

পয়ারঃ হায়রে, তাই ভাবিয়া রহিম দেখ চলিতে লাগিলো।
পোষা বান্দা কুত্তা-ঘোড়া- এক সনে চলিল।
কতেক দূর হইতে রহিম গেল কতেক দূরে।
শুকনা ঠ্যালত পড়িয়া কাগা কিড় কিড় করে।।

রহিম ঃ দেখ বৈনি গছের শুকান ঠ্যালত পড়িয়া কাগা কা-কা করির ধইচ্চে।

আয়ষা ঃ তাতে কি হইচে। কাউয়া কান্দিবারে পায়। চলতো দাদা- বেলাটার দুপর হইল।

রহিম ঃ না বৈনি - (জিটি, সর্প, কাগা ইত্যাদি তা শুভ সংকেত) এত বাধা ফেলে যাওয়া যায়না বৈনি।

আয়ষা ঃ দাদা তুই যে কি কইস। তুই এই বিশ্বাসগিলা তোর মনত ক্যানে দাদা।

পয়ার ঃ হায়রে, গোদা দেও সাগর আর নয় বহুদূর।
সঙ্গে যায় সে পোষা বান্দা ঘোড়া আর কুকুর।
পথি মধ্যে দুই জনে করে হুড়া হুড়ি।
আওলিয়া ধরে পন্থ, টানে বস্ত্র ধরি।।

রহিম ঃ দেখ বৈনি ঘোড়াটা মোর বস্ত্র ছিড়ি দেইল। ঘরে ফিরি চল বৈনি। এটা বিষম অমঙ্গল।

আয়ষা ঃ দাদা, এই দুইটা তোর খেলার সাথী। তোর মতে এমন না করিবে তা কার সথে করিবে। চলতো পরপর হায়রে, নানা ভাবে নানা কথায় নানা ছলনায়। দুষ্টা বৈনি দেখ আজি রহিম কে ভুলায়। হাঁটিতে হাঁটিতে আইল দুর থাকি দুরে। উপনীত হইল আসি গোদা দেও সাগরে।। সাগরের পাড়ে আসি রহিম দাড়াইল। মরণ পিঞ্জিরা তার নজরে পড়িল।। আসমান ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়। কে বানাইল এ পিঞ্জিরা রাখিল হেথায়।।

রহিম ঃ বৈনি-বৈনি সপ্ত দিন আগে তোরে বলিয়াছি আমি। সেই মরণ পিঞ্জিরা কেন হেথা এসে দেখি

আয়ষা ঃ কোনটে দাদা। কৈ চলতো দেখি।

রহিম ঃ ঐ যে বৈনি ঐটায় মোর মরণ পিঞ্জিরা। চল বৈনি। ঘরে ফিরি চল।

আয়ষা ঃ সাগরে আর সিনান করব না দাদা! তুইযে কি কইস। হামরা সিনান করি যামো। কায় হামাক আটকায়। দাদা, সত্যয় যদি তোর মরণ পিঞ্জিরা হয় চল দাদা, মোক ভাল করি দেখাও। (পিঞ্জিরার কাছে চলে যায়) আচ্ছা দাদা-সাতটা তালা সাতটা কোঠা তার মাঝে একটা সুয়াপখি। দাদা-সত্যয় যদি কোন দিন ঐ পিঞ্জিরাত কাও তোক ঢুকায়, মুই বৈনি হয়া কেমন করি তোক বাচাইম দাদা।

রহিম ঃ ও হো বৈনি দেরী করিস না দেখ সারা দেহ অবশ হয়া গেল।

আয়ষা ঃ দাদা, মোক ঐ ৭টা তালা কেমন করি খোলে বন্ধ করে শিখিয়া দে দাদা। তা হাইলে মুই তোক বিপদ হইলে রক্ষা করিম।

পয়ার ঃ হায়রে, কি করিবে তখন রহিম না দেখি উপায়
বৈনির কারণে রহিম হাত দিল তালায়।

৭ তালা খুলিয়া দিয়া বৈনিরে দেখাইল।

(গান)

ওমোর দাদারে, ঘরে থাকং দাদা মুই একলা নারী।
পিঞ্জিরার সুয়া পাখী আমাকে দেও ধরি।
সারা দিন খেলা করিম সুয়া পাখি সনে।
জননীর কথা দাদা না পড়িবে মনে।

পয়ার ঃ এই কথা শুনিয়া তখন রহিম কি করিল।
ঢুকিয়া পিঞ্জিরার সুয়া ধরিবারে গেল।।

রহিম ঃ বৈনি এটা তুই কি কইস বৈনি।

আয়ষা ঃ না দাদা, সুয়া পাখি মোক ধরি দে এই সুয়া নিয়া খেলা করিম।

পয়ার ঃ হায়রে, যেইনা কালে রহিম গেল পিঞ্জিরার ভিতরে।
পলকে পিঞ্জিরার তালা আয়ষা বন্ধ করে।
সাত কোটা বন্ধ করে দন্ডের ভিতরে।
হস্তে সুয়া পাখী, রহিম কান্দে উচ্চ স্বরে।

রহিম ঃ মুক্ত করি হে বৈনি সুয়া পাখী ধর। বেলা অবসান বৈনি চল যাই ঘর। ধর বৈনি।

আয়ষা ঃ মনে বড় দুঃখরে মরা চিতে বড় দুঃখ। তোর জন্যে দেখিবার না পাঁও পর পুরুষের মুখ।
হারচুং বাড়ী, হারানু মাও জননী। তোর বাদে না ঝুরে মোর এক চোকেরও পানী।

রহিম ঃ শুনেক শুনেক দয়ার বৈনি জবাব শুনেক মোরে। মরিব মরিব বৈনি সাগরের পাড়ে।
পিপাসায় প্রাণ যায় দে মোক পানী। মরণের কথা যেন না শুনে জননী। ওকি বিধাতা।

আয়ষা ঃ পানী খাবার চাইস মরা মনে বড় সাধ। মল মূত্র দিব তুলি বারাইস যদি হাত।

রহিম ঃ উঃ বিধাতা। প্রাণ যায় - প্রাণ যায়।

পয়ার ঃ হায়রে, এই সব কথা শুনিয়া রহিম কোন কাজ করিল।
কপালে চাপড় মারি কান্দিতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে রহিম দুই চক্ষু মুছিল।

রহিমের প্রাণ পাখী ছাড়িয়া পালাইল।

(খোসা গান)

ওরে প্রাণ পাখীটা যে দিন তোরে যাইবে ছাড়িয়া।
অবোধ মন রে, সোনার খাচার দরজা ভাঙ্গিয়া।
মন তোর মিছা বাড়ীঘর রে অবোধ মন।
প্রেমের বাজারে একদিন ভাঙ্গিবে নারায়ণ।
মিছা বাড়ীঘর রে মন রবে তো পড়িয়া।
আসিবে যমের দূত লইয়া যাইবে বান্ধিয়া।

পয়ার ঃ বিধিরে - যেইনা কালে রহিমের প্রাণ পাখী উড়িগেল।
আগমে থাকিয়া জিন্নাপীর জানিতে পারিল
ভক্তের কারণে জিন্না কোন কাজ করিল।
গোদা দেও সাগরে আসি উপনীত হইল।।
মাছি হইয়া জিন্নাপীর রহিমের দেহে রে।
প্রবেশ করিল পীর রক্ষা করিবারে।।
এদিকেতে নাপিত ছিল জঙ্গলে লুকিয়া।
আয়ষার পানে চায় মস্তক তুলিয়া।
হাত বাড়েয়া আয়ষা যখন তারেরা ডাক দিল।
দুই জনে ধরিয়া পিঞ্জর সাগরে ফেলি দিল।
সাগরে ফেলিয়া আয়ষা কোন কাজ করিল।
জাগীরাম বাদশার ঘরে গিয়া উপনীত হইল।।
এই সব হইতে সেই সব কথা রইল ভালে ভালে।
আলম সাধুর কথা এবার নিয়া নেও সকলে।
হায়রে স্বপনে আঞ্চলের সোনা খসিয়া জলে পড়ে।
নিশ্চয় জানিবে তার গাভুর বেটা মরে।।
বিষম স্বপন সাধু যে দন্ডে পাইল।
দুলাই মাঝি রে ডাকি বলিতে লাগিল।

ওরে দুলাই, বাণিজ না করিব আর ফিরিয়া চল ঘরে।
দাড়ি মাঝি সবে মিলি ১৪ ডিঙ্গা ভাসিল সাগরে।।
এক মাসও ধরি নৌকা চলিতে লাগিল।
গেন্দা দেও সাগরে আসি উপনীত হইল।
যেইখানে ফেলিয়াছে মরণ পিঞ্জিরা।
সেই খানে ১৪ ডিঙ্গা পৌছিল আসিয়া।
সাত দিন সাত রাত্রি পার হইয়া যায়।
না যায় উজানে ডিঙ্গা ভাটি না ভাইটায়।।

পয়ার ঃ

হায়রে, সাত দিন ধরি ডিঙ্গা ঘুরে আরো দূরে।
নিশ্চয় কোন ধন আছে সাগরের ভিতরে।
তাই ভাবিয়া আলম সাধু কোন কাজও করিল।
সন্ধান করিবার তরে ডুবারু নামাইল।
প্রথমেত নাহম ডুবারু নামে হইল তার হিয়া।
পানীর তলত নামে ডুবারু শুকা ভূতি নিয়া।।
তার পরে যে নামে ডুবারু অজাত আর বেজাত।
পানীর তলত ডুবে ডুবারু নিয়া চিড়া ভাত।।
তারপরে যে ডুবে ডুবারু নামে হইল ভাংরা।
পানীর তলত ডুবিতে পিঞ্জিরাত লাগিছে ন্যাংড়া।।
বিধিরে ধীরে ধীরে ন্যাংড়া ধরি টানিতে লাগিল।
সাগরের পারে পিঞ্জিরা তুলিয়া ফেলিল।
যেইনা কালে আলম সাধুর নজরে পড়িল।
পুত্রকে দেখিয়া সাধু কান্দিতে লাগিল।।
রহিমকে দেখিয়া সাধু করে হায়রে হায়।
কেমনে ঢুকিল পুত্র মরণ পিঞ্জিরায়।।
পুত্রকে কাড়িয়া যখন বিধাতায় নিছে।
ফিরিয়া না যাব আর আপনার দেশে।

অরুণা করুণা করি কান্দিয়া কটিয়া।
মরিবার যায় সাধু সাগরে ঝম্প দিয়া।।
যখন কালে আলম সাধু যায় মরিবারে।
ফকির বেশে জীন্না পীর ডাকিল তাহারে।
শুন শুন ওহে সাধু কি করিছ তুমি।
শুনহ আমার কথা বলিতেছি আমি।
পিতৃসত্য পালিবারে পুত্র নাহি পারে।
তার লাগিয়া পুত্র রহিম বৈনির হস্তে মরে।।
যখনে মরিল রহিম পিঞ্জিরার মাঝারে।
জিন্না পীর হয়া ভর তারে রক্ষা করে।
ওহে সাধু জীন্না পীরের নাম নিয়া আনো সাগরের পানী।
সেই পানী ছিটাইয়া দেও বিসমিল্লা জানি।

(খোসা গান)

"হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল
পার কর আমারে
আমি দীন ভিখারী পারের কড়ি
ফেলাইছি হারাইয়া"

পয়ার ঃ হায়রে, পানী সাধু আনিল গামছায়।
সেই পানী ফকির পিঞ্জিরায় ছিটায়।।
একবার দেয় পানী নিশ্বাস বহিল।
দুই বা বারও দিলে পানী দুই চক্ষু মেলিল।
তিন বার দিল পানী উঠিয়া দাঁড়াইল
পিতা কে দেখিয়া রহিম কান্দিতে লাগিল।
খণ্ড খণ্ড হইল পিঞ্জিরা নিমেষেতে ভাই।
পিতা পুত্রে রোদন করে দাড়েয়া দেখে সাঁই।
ফকির বলে ওহে রহিম আমার কথা ধর।

পিতৃসত্য পালন করি ধর্ম রক্ষা কর। কুত্তা ঘোড়া
বান্দা দুই জন দিলাম জিইয়া।
গমন কর জাগীরাম বাদশার মহল বলিয়া।
এই কথা শুনিয়া রহিম কোন কাজ করিল।
পিতারও চরণ বন্দি গমন করিল।

পয়ার ঃ হায়রে, দাড়ি মাঝি নিয়া সাধু ফিরিয়া আসিল ঘরে।
এ দিকেতে রহিম পালোয়ান কোন বা কাজ করে।।
জাগীরাম বাদশার বাড়ি গিয়া উপনীত হইল।
ঘোড় শালাটার মাঝে গিয়া চাকুরি লইল।
তিন দিন পরম করি কোন কাজও করিল।
মধ্য রাতি বড় পালোয়ান হুঙ্কার ছাড়িল।।
হুঙ্কার ছাড়িয়া রহিম উঠে লম্ফ দিয়া।
নাট মহলের কপাট ভাঙ্গে পদাঘাত করিয়া।
কোথায় আছে দুষ্টা আয়যা পালংকেতে শুইয়া।। নিমেষেতে
কাটিয়া মুন্ড নামিল হস্তে নিয়া।
ঘোড়া পৃষ্ঠে উড়িয়া রহিম উড়াইল বাতাসে।
পিতা, পিতা বলিয়া রহিম ধর্মপুরে আসে।
পিতা পিতা বলিয়া রহিম কোন কাজও করিল।
পিতার চরণে বৈনির কাটা মুন্ড দিল
আজি হইতে পিতৃ সত্য হইল পালন।
আলম সাধু বলে পুত্র কান্দ কি কারণ।
রহিম বলে ওগো পিতা জননীর তরে।
দেখিয়া এই কাটা মুন্ড কি বলিবে মোরে।

আলম ঃ না না রহিম তোমার জননী বেগম সব জানে। তার ভুলেই আইজ এই বিপত্তি। চল, চ ল
পুত্র বহুদিন পরে আজ এক সঙ্গে জীন্না পীরের আরাধনা করব। ওরে জীন্নাপীর,জীন্না পীর
করিয়া যদি করো মনস্থির। ওরে, আগমে থাকিয়া মনস্কাম পুরায় পীর।

ভাইরে, এই পর্যন্ত করিলাম ক্ষান্ত পালাগানের কথা।
নাই কোন ভয় হবেরে জয় ধর্ম যথা তথা।।

---

## সংগ্রহসূত্র

কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের মীরাপাড়া গ্রামের দোতরা পালার গীদাল বিষ্ণুপদ রায়ের কাছ থেকে এই লোকনাটকটি সংগ্রহ করেছি। দীর্ঘদিন গীদালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে, নাটকটিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই কাজে সহযোগিতা করেন দিনহাটার রমণীমোহন বর্মা এবং সুবল রায়। 'আলম সাধু' দোতরা পালার একাধিক নাট্যানুষ্ঠান দেখেছি।

# চোর-চুন্নী

| | | |
|---|---|---|
| গড়ান | ঃ | ওরে হায়গো সখী বড়ই |
| (মূল গীদালের | | নৈজ্জা দিলো শ্যাম কালা। |
| কথা শুরু) | | ওরে কদমডালে বাজায় বাঁশী |
| | | ঠিক দুফোর বেলা। |
| চিতান | ঃ | আ-হার বাঁশীটা তোর এতয় বোল ধরা |
| (সবাই মিলে | | ডাকায় মোর নাম ধরিয়া। |
| গান ধরে) | | ওরে এমন মোহন বাঁশী কী সুন্দর বাজে। |
| | | কিবা আছে তোর বাঁশীটাতে। |
| পাঠ | ঃ | ওরে হাতে নিয়া মোহন বাঁশী। |
| (কথা হিসাবে | | আলোক চিতে মুখের হাসি। |
| বলা) | | হিলা ও তোর কেমন চলন। |
| | | ওরে নদীর পারত বাজাইস বাঁশী |
| | | পাগেল্যার মতন। |
| চিতান | ঃ | আ-হার নন্দের বেটা চিকনরে কালা |
| | | কেনে দিলো এতয় জ্বালা |
| | | ওরে সেই জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচেনা |
| | | হায়রে যাতনা কতয় শুনিস বাঁশির বাদে। |
| পাঠ | ঃ | ওগে নারী হৈলো ভাই মায়ার কড়ি |
| | | চান্দয় নারী শুধু নারী |
| | | সংসারিক তুই বুঝিস না। |
| | | ওগে যেইদিনা মুই করো মনে |
| | | ধরিস ফেকেনা। |

## চোরের গীত

গড়ান ঃ ওগে হাউস করিয়া যাবার চাছো
নানান সে তোর ফেসটানি
ওগো এলাও কি তুই আছিস নয়া নদারি।

চিতান ঃ আ-হা-র নাই নাগে তোক গারেস্তি -গলা
বাপ তোর দিসে কতলা
ওগে কত টাকা নিসে পণ তোর মনে নাই
কাম ধরিতে ধরিস ফেকেনা।

কথা ঃ ওগে দিন মুই করো মনে আটুস
তুই কেনে যাবার নাদিস বিদ্যাশে
ওগে অন্তরে না নাগে খুশি নানান জ্বালাতে।

চিতান ঃ আ-হা-র হিটা কথা তুই কছিত কুন নাজে।
নৈজ্যা নাইকি তোর মুখে
দিনযে কাটাছো চুন্নী কী কষ্টভাবে
নারী জাতি কিছুই না বুঝে।

পাঠ ঃ ওগে গরু যাছে মোর হিতিহুতি
এলা ও মুই হারাম শুতি
বাছুরলা মোর ডডাছে
তোর মাও দেখিলে এলায় কী করে।

গড়ান ঃ ও তুই চট করিয়া জল ভরিয়া কলসি নেক কাঁখে।
ওগে বেলটা ডুবিয়া যাছে হর দেখেক পশ্চিম পাকে।
তোর মাও দেখিলে এলায় কী করে।

চিতান ঃ চুন্নী যেমন তোর শুয়াতি মাও
ঝঙ্গার ঝঙ্গার করে
আজ ডাঙ্গেয়া ফাটাবে গাও।

পাঠ ঃ ওগে তৎকরায় তোর মাও ডাকাছে

সগাক পুছি বেড়াছে কানু হামার গেলো কুনঠে
ওগে তোর মাও দেখিলে এলায় কী কবে।

চিতান ঃ বেলা ডুবা মুখ আন্ধারি
ঘাটের পারত নাই কাণ্ডারি
ঝাকে ঝাকে বগের সারি উড়িয়া যাছে।

গড়ান ঃ ওরে কি কহিম আর দুঃখের কথা
বসিয়া ভাবেছ মুই
ওরে কইলে কি পৈতাবে দুঃখে
প্রাণের কালা তুই

চিতান ঃ আ-হা-র তুই বেড়াছিত একেলায় থুইয়া
ও মুই আছো কান্দিয়া
বাঁশীটা তোর ফেলাস ডাঙ্গে ভাঙ্গিয়া

কথা ঃ ওরে পরার নারীক ভালোবাসিস
নিজের নারীক মন্দ বাসিস
এমন কি তোর চলন গিলা
ওরে এমন করিয়া মোর বিছানাত
না থাকিস আসিয়া

চিতান ঃ আ-হা-র আর কতদিন রোহিম চরারে
ও মুই হিয়া বান্দিয়া
ওরে চরা যৈবন যায় চলিয়া
তুই হেলো মোর ভাবেরো চরা

কথা ঃ ওরে দুঃখের কথা বোলবো কারে
হিলা খালি ছলনা ওরে
কেমন যে তুই প্রাণের কালা
মনে আছে জানা

গড়ান ঃ প্রেম করিয়া হোল নিদয়া
মোক কি মারিবো কান্দেয়া
ওরে এমনভাবে মধুর সুরে
বাঁশী বাজাইস না।

চিতান ঃ আ-হা-র বাঁশীটা তোর এতয় বোল ধর'
ডাকায় মোর নাম ধরিয়া
ওরে মুই নারীটা পরার ঘরের বান্দি
না পারো যাবার, মনটা চাছে তোকে দেখিবার

কথা ঃ যদি চরা না দিবো দেখা
আর বুঝি মোর প্রাণ বাঁচে না
যেমন যে আগুনের ঝালা
ওইরকম মনের আগুন উঠে জ্বলিয়া।

চিতান ঃ আ-হা-র যবুনার ঘাটে চরারে
চরা না দেয় মোক যাবার
মুই বোলে ছল করিয়া যাও তোক দেখিবার
বাড়ি হাতে নাদেয় বিরিবার

গড়ান ঃ তুইরে চরা ধর্ম ছাড়া
ভালো কাজোত তোর নাইরে মন
ওরে পরার হিংসা করিয়ারে তুই
বেরাইস কি কারণ

চিতান ঃ আ-হ'-র আহিংসা পরম ধরমরে
চরা সর্বশাস্ত্রে কয়
ওরে হিংসাতে অকালে মরণ হবেরে নিশ্চয়
চরারে তোক বুঝাবে আরো কায়

কথা ঃ ওরে চুরি-দ্বারী পরার নারী
এই তিনটা কাম অনাচারী

গড়ান ঃ চুন্নী কেবা তুমি কেবা আমি
কেবা হবে কার।
এ সংসারে দেকগে চুন্নী কান্দা কাটায় সার।

চিতান ঃ আর পুত্র কন্যা প্রেমের নারী
ও চুন্নী কেহ না হয় আপনার
ওগে পড়ি রবে ঘর-বাড়ি
কেবা হবে কার।
দিনা চারিক এ সংসারে খেলা নিলা সার

কথা ঃ ওগে এ সংসারে ওগে চুন্নী মিছা ভবের বসতি
কেহ না হয় আপনার
এ ভব সংসারে খালি কান্দা কাটায় সার

চিতান ঃ আর স্বর্গে থাকি ওগে চুন্নী
ও মুই পাতালে দিসু সিঙ্গ
ওগে ষোল জনে করে চুরি রাতিদিন
সিঙ্গের দ্বারে দুইজনা রাখি গেইসে চি

চুন্নীর কথা ঃ ওরে নিন্দতে স্বপন দেখি
মুই নারীটা উঠো চমকি
হাস্তে দেখো বিছানাত
ওরে মোর নিরাশির চরা স্বামী গেইসে উঠিয়া।

চুন্নীর গান

গড়ান ঃ আজি কথায় গেলি আমায় ছাড়ি
ওকি ওমোর প্রেম চরা

ওরে এমনভাবে বারে বারে

মোক আর কান্দাস না।

চিতান ঃ আর তুইরে চরা সোয়ামী হয়য়া

ও মোক গেলো মারিয়া

ওরে যাবার বেলা কেনে তুই মোক

না গেলো কয়া।

হ'লো মোর মায়া ছাড়া

কথা ঃ ও গে কথায় গেলি আমায় ভুলি

দেখ কর দয়া করি

একবার ও তুই আসিয়া

ওরে এমনভাবে নিশিদিনে মোক আর কান্দাস না।

চিতান ঃ আ-হা-র এমন বয়সে গেলো ছাড়িয়া

ও তোর কঠোর হিয়া

ওরে এমনভাবে গেল ছাড়ি

মুই নারীটা জানয় না

দিয়' গেল অধিকো জ্বালা

কথা ঃ ওরে প্রেম পিপাসা তোর গে চুন্নী

মিটিস আজি ভালো করি, বিছানায় থাকি

ও গে তোকে আগত সাজাম আজি যেমন নিত্যকী।

গড়ান ঃ অমি চট্ করিয়া উঠতো চুন্নী জ্বলাগে বাতি

ও গে ঘরের ভিতোর কেনে তুই হের কান্দেছিত বসি

চিতান ঃ আর বাতিটা জ্বলেয়া চুন্নী ও তুই কপাট দে খুলি।

ওগো হিদয় অলন করিম।

শীতল বিছানায় থাকি, খালি খালি কান্দিস না বসি।

কথা ঃ ওগো তোর বাদে ওসে চুন্নী আনিসু হের কত কী,
জ্বলাগে বাতি, ওগে হাতে, কানে আজি ও তোক পেন্দাম ভাল করি।

চিতান ঃ আর তোর বাসনা আজি চুন্নী গে
চুন্নী মিটাইস ভালো করি
কান্দিয়া ভিজাইসনা বসন জ্বলালে বাতি
খালি খালি কান্দিস না বসি।

গড়ান ঃ আজি প্রেম চরা কালো চেংরা (নাগালো মোক কি ময়হা), ওরে এমনভাবে
নদীর ঘাটে বাঁশী বাজাইস না।

চিতান ঃ আর শুনিয়া তোর বাঁশিটার বাজন
ও মোর মনটা মানে না।
ওরে মুই নারীটা পরার বান্দি
হুসকিবার পারো না।
হোকোর কাম মোর এল্যাও ফুরায় না।

কথা ঃ ওরে শাশুড়ী আর ননদিনী,
উমরায় দুইজন হইসে বাদি।
হুসকিবার আর পারো না
ওরে এমনভাবে কদমডালে বাঁশী বাজাইস না।

চিতান ঃ আর বাঁশিটা তোর এমন বোল ধরা
ও তুই যেলায় দিছিত ফোক
ওগে মনটা মোর ছটপট করে
দেখিবার বাদে তোক
শুট করিয়া দেখা দে তুই মোক

গড়ান ঃ ও মুই বন্দনা করেছ আজি
ও মা সাম কালী
ওরে জোড় হস্তে করিয়া মাগো

করেছ ভকতি

চিতান ঃ আ-হা-র তুমি কালি কমলিনী

এমা জগততারিণী

ওরে তোর চরণ করি সুহারণ

দে পদধূলি, জোড় হাতে মা করেছো ভকতি

কথা ঃ এ মা যদি পুরাস মনের আশা

হাউসে রঙ্গে করিম পূজা

ওরে মনের আশা সর্বনাশা

না করাইস আজি

চিতান ঃ আ-হা-র আমি রতি মুরোমতি

এ মা অন্যায় না নিস যে

তোর চরণ সুহারণ করি

জোড় হাতে করি

চোর করিবার যাছো মুই আজি

চিতান ঃ আ-হ-র নামের তরী লইয়া যে ডাকে

চরা ভবের কাণ্ডারী। ওরে ভবঘাটে

নাম ছাড়া নাই কাণ্ডারী। ভবঘাটে নামের ভিখারী

কথা ঃ ওরে নামের ঘর, নামের বাড়ি।

নামে নামে নামজারি নামে হোলেক মূলাধারি।

ওরে নাম বিনে ভবনদী কেমনি হবে পার

গড়ান ঃ ছাড়েক চরা ভোবের খেলা

নামের ঝোলা করেক ভার

চিতান ঃ আ-হা-র যেলা হবে অন্ধকার

ও চরা ভাঙ্গিবে বাজার

ওরে সঙ্গের সাথী গেলে ছাড়ি

ভবো নদী কেমনি হব পার।

কথা ঃ ওরে নামের গুনে ভব নদী
কত মুনি, যোগী ঋষি হইয়া যাছে পার
ওরে নাম বিনে ভব ঘাটে
কান্দা কাটা সার।

ঘষা ঃ চরা তোর জন্যে মোর প্রাণ কান্দে
তোর প্রেমে মজিল মন,
ওরে অনেক মত লোক দেইখাছি
না হয় তোমারো মতন।
আ-হা-র হাতে তোমার মোহন বাঁশী
মুখে মধুর হাসি, ওরে হাসিয়া হাসিয়া ওরে
মনচরা মন কোল্লো চুরি,
শূন্য ভাণ্ড রহিল পড়ি।
ওরে নারী কুল, ধম্ম, জীবন যৈবন মান অভিমান
লৈজ্জা সরম ভাণ্ডারত মোর নাইরে ধন
ওরে অনেক মতন লোক দেইখাছি
না হয় তমারো মতন।
আ-হা-র তুই চরা মোর অভাগীর জীবন
ও মোর সাধনারো ধন,
ওরে কি মায়া নাগেয়া ও তুই
পাগল কোল্লো মন,
না দেখিলে বাঁচে না জীবন।

কথা ঃ ওগে যদি চুরি করিবার না-যাও
এমন সাজা শাস্তি নাপাও
এলা ধরিছে পিরীতির জ্বালা
ওগে তোর ভাণ্ডারে চোর করিয়া
ও মুই পরিসু ধরা।।

ঘষা ঃ ওকি চুন্নী চোর বিদ্যাটা উত্তম বিদ্যা
যদি চোর না পড়ে ধরা,
ওগে তোর ভাণ্ডারে চোর করিয়া ও
মুই পরিসু ধরা
ওকি ও চুন্নী
আ-হা-র মোক ধরিল তুই মায়ায় ভুলিয়া
বাঁধিল প্রেম জ্বালা সহেনা প্রাণে.
রহিতে পারি না
ও মোর চুন্নী তমায় ছাড়িয়া
চুন্নী তোর কারাগারে হয়া বন্দী
কান্দেছ মুই দিবানিশি
কি বাদে কনু পিরীতি, না হইস চুন্নী ময়াছাড়া
ওগে তোর ভাণ্ডারে চোর করিয়া মুই পরিনু ধরা
আ-হা-র তুইতো চুন্নী বড়য় গে চাল্লাক
ও মোক করালো হাল্লাক
ওগে বুদ্ধি বুদ্ধি প্রেমের ফাঁসি পড়ালো গলাত
নিজের দোষ মোর কাক দুষি করিম

## চুন্নীর গীত

চিতান ঃ বিধি তোর মনে কি এই ছিল.
সংসারে মোক ভাসালো
ওরে শয়নে স্বপনে প্রেমের
আইসেছেরে নানান জন.
তুই মোরে মারিয়া গেল প্রাণেশ্বর।

পাঠ ঃ মরিবে ওরে ফুটিলো বাগানে ফুল
ফুলের গন্ধে কেমন শোভা চমৎকার

ওরে ভমরা বিনে ফুলের গাছে না ধরে বাহার

চিতান ঃ চরা ভাবিয়া আর কর কি, একা ঘরে বসতি

ওরে কালার জন্যে কান্দি কান্দি বসিয়া দুপুর রাতি

ওরে চরা বিনে কেবা করে মোর নারীর গতি।

পাঠ ঃ ওরে একদিনা যবুনার জলে

কালা দেখে আমায় বলে,

আরতো বসে ভেবোনা ওরে,

যায়া থাক আপন ঘরে

আরতো বসি কান্দিস না।

ঘষা ঃ চরা মোক ছাড়িয়া কুনবা দেশে রইলিরে

ওরে কেমনে পাসুরিম রে তোরে।

চিতান ঃ চরা তুই মোর গুনের ধন,

ও মোর যেমন করে মন

ওরে ঝাঙ্গাউ ঝাঙ্গাউ করে দেহা

যেলায় পরে ফমরে

হে তুই মোর গুণের চরা

পাঠ ঃ চরারে ওরে তুষিরো আগুনের মতন

ধিকির ধিকির করে মন মোর দেহা, জল দিলে

আর নিভে নারে নিভে না।।

চিতান ঃ চরা এতয় নিদয়া, ও তোর কঠোর হিয়া

ওরে বুক ফাটি চৌফালা হচে, তোমার না দেখিয়া রে

হে তুই মোর গুণের চরা।

পাঠ ঃ চরারে ওরে ন্যাপ-তোষক-বালিশ-বিছানা

যেইটে যেইখান গেইসেন থুইয়া

দেখিয়া বাউল হচ মুই কান্দিয়া রে কান্দিয়া।

ঘষা ঃ ওগে কি ময়হা নাগালো চুন্নী নাগেয়া মোক প্রেম জ্বালা

ওগে মুই না কান্দ তোরে বাদে কান্দে মনুরা।

চিতান ঃ আ-হা-র প্রেম জ্বালায় ফেলালো চুন্নী মোক
ওমোক না নাগায় তিষ্যা ভোক ওগে রাইতে দিনে ফম পড়েচে
কি আর কহিম তোক, আইসেক চুন্নী বইসেক মোর গোড়োত

পাঠ ঃ ওগে হাসি মুখে কথা কলো, বান্ধা চিৎ মোর পাগল কোল্লো,
তুই মোর গলার মালা ওগে মুই না কান্দ তোরে বাদে কান্দে মনুরা

চিতান ঃ আ-হা-র কি ময়হা নাগালো চুন্নী মোক
ও মোক না নাগায় তিস্যা ভোক
ওগে রাইতে দিনে ফম পড়েছে কি আর কহিম তোক
আইসেক চুন্নী বইসেক মোর গেড়োতে

ভাব খেচেরা

ঘষা ঃ ওরে মুই নাই ফেলাও প্রেমের ফাঁদে
খালি কি তুই চোদন খাইস
ওরে আজিকার মনে ফিরিয়া যা তুই মনুটাক বুঝাইস।।

চিতান ঃ আ-হা-র প্রেম জ্বালায় পরিছিত চরারে
ও-তোর না নাগায় তিস্যা ভোক
ওরে রাইতে দিনে ফম পড়েছে কি আর কোহিম তোক,
আইসেক চরা বইসেক মোর গোড়োত

পাঠ ঃ ওরে আজি মন অশান্তি মোরে মন্দির ঘরে
কালি তুই ঐঠে যাইস
ওরে আজিকার মনে ফিরিয়া যা তুই মোনুটাক বুঝাইস

চিতান ঃ আ-হা-র জ্বলা দেহা জুরাইম তোর আজি হে
ও তোর বগলে বসি, ওরে আজিকার মনে
ফিরিয়া যা তুই মনে নাই খুশী
কায় দিলে তোক এতেলা বুদ্ধি।

ঘষা ঃ ওরে বিয়ার অতিতে হোনু আড়ি
কি হইলো আমার কপালে
ওরে মৃতু স্বামী কোলে নিয়া ভাসিনু জলে।

চিতান ঃ আ-হা-র সুদয় থাকো সমুদ্দুর ঠাকুর
আমি যাবো দেবপুর, ওরে জিয়া আনিবো
প্রাণের পতি, আরো ছয় ভাশুর
আমি মাগো যাবো দেবপুর

পাঠ ঃ ওরে জিয়া আনিবো প্রানের স্বামী,
তারপর ফিরিবো বাড়ি।
যা হয় আমার কপালে,
ওরে মৃতু স্বামী কোলে নিয়া ভাসিনু জলে।

চিতান ঃ আ-হা-র সুকয় থাকো মা পদ্মাবতী,
ও তোক করি মিনতি, ওরে জিয়া দে মোর
প্রাণের স্বামী তোমারে বলি, মাগো
মোরিবো আমি।

পাঠ ঃ ওগে ধন্য মাগো বেফুলা সতী,
তুষ্টি হয়া দিনু বর, ওগে পূর্ণ জীবন
পাইলো বালা ঘরে ফিরি চল।

চিতান ঃ আ-হা-র ধন্য মাগো আমার পতিব্রতা,
ও স্বামীক নিগাছেন জিয়া
ওরে পূর্ণ জীবন পাইলো বালা
ঘরে ফিরিয়া যা, চাঁদের হাতে
করিস মা পূজা।

পাঠ ঃ ওগে পায়া তোরে পূর্ণ ভক্তি, আমি মাগো হইলাম
তুষ্টি, দিলাম তোমায় পূর্ণ বর, ওগে পূর্ণ জীবন

পাইলো বালা ঘরে ফিরিয়া চল।

চিতান ঃ আ-হা-র চাঁদ যদি মোর না করে পূজা
পূর্ণ করি ছলনা, ওগে এইলা কথা
তোমার শ্বশুর কেন বুঝে না,
চাঁদের হাতে কোরিস মা পূজা।

পাঠ ঃ ওগে ধরিয়া চন্ডীরো কথা তার জন্যে
তোর এমন দশা, তোমার শ্বশুর
বুঝে না, ওগে পূর্ণ জীবন পাইলো বালা
ঘরে ফিরিয়া যা।

## চোরের গীত

ঘষা ঃ ওগে কুত্তি গেলো ওগে চুন্নী একটা কথা
শুনেক মোর, ওগে চট করিয়া খাবার দে মোক,
করিবার যাম গে চোর।

চিতান ঃ আ-হা-র দেখিনু মুই খুলি গে পাঞ্জি
আজি যাত্রা আছে ঠিক, ওগে মাথার উপর
জিঠিটা যে করেছে ঠিক ঠিক।
যাত্রাটা মোর হইসে গে সঠিক।

পাঠ ঃ ওগে যা কেনে তুই তাড়াতাড়ি,
আর নাকরিস তুই গে দেরী,
সাজ্‌পাড়া করো মুই।

চিতান ঃ আ-হা-র দেখিনু মুই গণনা করি
একঠে আছে গে টাকা, ওগে
এলা যদি কুনমতে পারো আনিবার
তাহলে কি অভাব গে হামার।

ঘষা ঃ ওরে বাড়ী আসিলো ভালো করিলো

শুনেক চরা বিবরণ, ওরে তোর বাদে
পত্যেক দিন খাচো চোদন

চিতান ঃ আ-হা-র এলায় আসিয়া গেলেক দেউনিয়া
চরা কয়া গেলেক মোক, ওরে আজিকার
আতিটা বাড়িতে চরা নবার কইসে তোক
আজিবোলে আসিবে আইতোত।

পাঠ ঃ ওরে ফাগুন চৈত চলিয়া যাছে
বৈশাখ মাসের দিন পড়েছে,
কোকিল ডাকে খনে খন
ওরে হিমতল দহলা জমি যান
তুই পারিলো ছন

চিতান ঃ আ-হা-র কাচানি দমকানি মাটিরে যেমন
তিস্তার মাইঝালি ওরে বিনা বর্ষনে জল
ভরেছে, নাই ডাঙ্গা জমি, জমিখান ভাই
দেখিতে সুন্দর।

ডের

পাঠ ঃ ওগে বেটি যদি হয় পরম্য সুন্দরী,
তাহলে তার ভাবনা নাই
ওগে কালোমুখি বেটী হলে
জীবনে শান্তি নাই।

ভাব

ঘষা ঃ ওগে বিয়ার কথা কবার কছিত
শুনেক ওগে চুন্নী মাই, ওগে
এ্যালা হৈসে দোসরা নিয়ম,
আগিলা মতন নাই

চিতান ঃ আ-হা-র মেট্রিক পড়ালার বারিসে
সম্মান, ও তাক বেটি করিলে দান
ওগে হাজার টাকা খরচা নাগে জিনিস
তামান, আরো নাগে বেটিটা বিদ্বান।

পাঠ ঃ ওগে খাট পালঙ্ক ছাইকেল ঘড়ি
রেডিওটা দেওয়া চাই, ওগে
এ্যালা হইসে দোসরা নিয়ম,
আগিলা মতন নাই।

চিতান ঃ আ-হা-র যাহার ঘরে ঝাকুয়া বেটি
ও তার জ্বালা দিন-আতি,
ওগে বেটির দায়ে কত লোকে
বেচাইছে মাটি।
বেটিয়ালার নাইসে সুখ শান্তি।

## চুন্নীর গীত

ঘষা ঃ ওরে কিসোত কিকাম কোল্লো চরা
কার বুদ্ধি তুই ধরিয়া, ওরে কুঠে হাতে
আনিলো জামাই সাদা পাগেলা।

চিতান ঃ আ-হা-র ঘর মধ্যে মোর এ্যাকেনা ছাওয়া
ও তার নামটি মতিবালা
ওরে রূপে গুনে দেখান সুয়ান
স্বামী পাগেলা, মহা দুখোত
ফেলালে ছাওয়া

পাঠ ঃ ওরে ১০০ পাইসায় ১ টাকা, ৫০ পাইসায়
আট আনা, ২৫ পাইসায় চার আনা,
ওরে এইলা হিসাব কেমন করিয়া

কোরিবে সেলা।

চিতান ঃ আ-হা-র যেমন দিন দাড়াইসে
চরারে ও তুই দ্যাখেক
ভাবিয়া, ওরে এইমন দিনত
যেই পুরুষটা হিসাব জানে না
ও তার জনমে মিছা।

সুর নাচারি

ঘষা ঃ ওরে ইন্দিরা গান্ধী হয়া মন্ত্রী নয়া আইন করিলো জারি
ওরে রাস্তার বগলের কত-লোকের ভাঙ্গিয়া দিল বাড়ি।

চিতান ঃ আ-হা-র এমন আইন করিলেক জারি, না মানে গরীব আর ধনী
ওরে সুন্দর সুন্দর দালান কঠান ফেলালেক ভাঙ্গি
কত লোকে ভাই কান্দেছে বসি।

পাঠ ঃ ওরে রাস্তার বগলের কত বাড়ি, আছেরে ভাই সারি সারি
তাগান দিসে হুলাক তাড়েয়া, ওরে বাড়ি বাড়ি বান্দিবার
বাদে সরকাল দিসে কিছু টাকা করি।

চিতান ঃ আ-হা-র ঘর ভাঙ্গেছে দালান ভাঙ্গেছে
ও ভাই আরো কতকি, ওগে দোমনি
হাতের জালিয়া টাড়ির কল দিলো কাটি
এমন আইন করিলেক জারি।

ঘষা ঃ ওরে যা কেনে তুই ওরে চরা সরকারী হাসপাতালে
ওরে মিছায় না কও তোকরে চরা যাছে কত লোক।

চিতান ঃ আ-হা-র কত সুবিধা করিসে সরকার
ও দেখ হোলে অপ্রাশন
একশত পাঁচ টাকা বোলে করেছেরে দান
তুইও যায়া হরে অপ্রাশন।

পাঠ ঃ ওরে মানষির মুখে যাছে শুনা, যার আছে ভাই তিনটি
ছাওয়া, হবার নাগে তাক অপ্রাশন, ওরে সরকার বোলে
আইন জ'রি করিসে এইসন।

চুন্নীর গীত

গড়ান ঃ ছি ছি লজ্জায় মরি আমি, তুইরে কেমন বৈরাগী
ওরে ভিক্ষা দিতে হাত ধরিলো এখন কি করি।

চিতান ঃ আ-হা-র শুনিলে মোর প্রাণ স্বামীধন
স্নেহের দেওরারে লক্ষ্মণ,
ওরে সীতারে না পাইলে বুঝি
বধিবে জীবন, ছাড়ি দে মোক ধরি দুই চরণ।

পাঠ ঃ ওরে শুনিলে মোর মহা রাজন
আমারে বধিবে জীবন, কেমন ঠাকুর
তোর চলন, ওরে কাঁদিবে মোর
প্রাণেরে স্বামী দেওরারে লক্ষ্মণ।

চিতান ঃ আ-হা-র চড়েয়া মোর রথেরে উপর
দেহাত হাত নাদিবেন মোর
ওরে তুই হোলে মোর পিতার সমান
আক্কেল নাইরে তোর পাপোতে
মারিবোরে পাগল।

ঘষা ঃ ওগে ত্রেতা যুগের কথা হুটা, সবে জানা আছে
মোর, ওগে সাধুরূপ রাবণ রাজা সীতাক
করিলো চোর।

চিতান ঃ আ-হা-র সাধুরূপে আসিলো পঞ্চবন
সীতাক করিলেক হরণ, ওগে তা না হলে
না পারে সীতাক করিতে যে ছল

সাধুরূপে ধরিসে রাবণ।

পাঠ ঃ ওগে মারিচ রাক্ষস মায়া করি
হরিণরূপো ধারণ করি
বনে তৃণ খায়, ওগে না বুঝিল
রাক্ষসের মায়ায় সীতা ভুলে যায়।

## চোরের গীত

গড়ান ঃ শুনেক চুন্নী এইবেলা পরিচয় তুই নে
এ্যালা নন্দের বেটা মুই ননি চোরা

চিতান ঃ ওকি ও চুন্নীগে ওগে পিতারো
চোর করিলাম চৈতন্যকে, সেই সাধনার কথাগে চুন্নী
বলবোনা তোরে।

পাঠ ঃ ওগে যদি কথা শুনতে চাও, সাধন ভজন করিয়া
নেও। সভার মাঝে ওগে চুন্নী বলবো না এখন।

চিতান ঃ ওকি ও চুন্নীগে, ওগে চৈতন্যভুবন মারে
করিনু চুরী মুই নদের ব্যাটা

ঘষা ঃ ঐ শুনেক চুন্নী মোর রোদন
পাগল হইলো আমার মন
ঐ দেখিয়া তোর ওগে চুন্নী, এমন চাঁদ বদন।

চিতান ঃ ওকি হায় চুন্নীগে, রূপযৌবনের মুখের আয়,
মন করে মোর হায়রে হায়
তোকে ছাড়িয়া চোর করিবার
মনটা মোর না যায়।

পাঠ ঃ ওগে দেখিয়া তোর ফ্যাসন,
রসে ভরে জীবন,
ঐ মধুর মিষ্টি নাগেসে

চুন্নী আজিকার মিলন।

হায়রে বিধির লেখন, হাতে মোর নাইসে কাম

তোক দেখিয়া কেনেগে চুন্নী হনু এই মতন।

চুন্নীর গীত

গড়ান ঃ ওরে কি হইলো, মোর অভাগীর

কপালে, ওরে শূন্য বিছানায় শুইয়া আছু

মুই, একা ঘরে।

চিতান ঃ আ-হা-র বিছানাতে আছোরে শুইয়া,

হায়রে কতয় আনন্দে, ওরে স্বপনে

দেখেছে চরা নাইমোর বগলে, কি হইলো

বিধি মোর কপালে।

পাঠ ঃ ওরে এমন অন্ধকার রাতি, কুন আক্কেলে

গেলো ছাড়ি, দয়া নাই তোর অন্তরে,

ওরে স্বামী হারা দারুণ বিধি করালো মোকে।

চিতান ঃ আ-হা-র পুত্র হারা যেমন মায়ের মন

চরা সদায়রে কান্দে, ওরে স্বামী

হারা হোলে নারী, ঐমতন

কান্দে, বুক ভিজে ভাই দুই চোখের জলে।

পাঠ ঃ ওরে নিশিতো প্রভাত হইলো

ওরে পশুপাখী ওরে সবে জাগিলো,

ওরে হায় হায়রে মোর প্রাণের চরা

এ্যালাও না আসিলো।

চোরের গীত

গড়ান ঃ ওরে শুনরে ভারতবাসী,

হিটা কেমন আসিলো দিন

ওরে ঘরের কোনার কোটোরাই

বেঙলা তাও যাছে মিটিং।

চিতান ঃ আ-হা-র জলোতে ভাই ভাসেছে মুরগী.

ও ভাই ডাঙ্গাতে ভাসে হাঁস.

ওরে ভেরায় খাচে মাছ আর মাংস

বাঘে খাছে ঘাস.

দেখিয়া ভাই নাগেছে হাতাশ।

পাঠ ঃ ওরে ভাবিয়া দেখেক রেশন কার্ডখান

না হলে কিছুই না পাবেন.

হইসে বড়ই মূল্যবান.

ওরে সাং .ানে রাখেন হুখান

পেটের খতিয়ান।

চিতান ঃ আ-হা-র শুনো ভাইরে ও ভারতবাসী, তোমরা

করিবেন বিচার, ওরে জরিপ করেছে নাভিস্থানটা

ঐ ভারত সরকার পঞ্চ অক্ষর করিলেক তৈয়ার।

চোরের গীত

গড়ান ঃ ওরে উচিৎ কথা কবার গেলে

বন্ধু বুঝি বেজার হয়.

কলি যুগের মেয়ের কথা কি আর বলা যায়।

চিতান ঃ আর কত ফ্যাশানের বান্ধিছে খোপা

আরো বান্ধেছে ফিতা।

কপালোত টিপ নাগেয়া ঠোঁটত দেয় আলতা।

পায়ে ভাইরে পিন্দেছে জুতা।

পাঠ ঃ ওরে হাতে লাগায় লেডিস ঘড়ি

পড়নে টুঙ্কেলের শাড়ি, বলিতেছে

মায়ের আগে, আজি মাগো যাবো
আমি ছিনিমা দেখিতে।

চিতান ঃ আ-হা-র গরীব বাপের না শুনে কথা
মেয়ের ফুটানি কথা,
ওরে রাগ করিয়া বন্ধুর সঙ্গে মিশেছে যায়া
রাস্তায় কেমন বেরায় ঘুরিয়া।

## চুন্নীর গীত

গড়ান ঃ চরা তুমি আমার আমি তোমার
এই কথা না জানে কায়।
ওরে সঁপি দিলাম মন প্রাণ যৈবন,
তব রাঙ্গা পায়।

চিতান ঃ আ-হা-র দুই চার কথা জিজ্ঞাসি তোমায়
চরা বলগো আমায়, ওরে তমায় আমায়
কি সম্বন্ধ বড় হমো কায়
এইটা কথা বলগো আমায়,

পাঠ ঃ ওরে কয়জন চোরে কর চুরি,
সিঙ্গটা দিলেন কুন জাগায়,
বল চরা হে দয়াময়,
ওরে তোমায় আমায় কী সম্বন্ধ
বড় হমো কায়।

চিতান ঃ আ-হা-র কোন অস্ত্রেতে কোরিলেন চুরী
অস্ত্রের কিবা নাম হয়
ওরে কোন দরজায় ঢুকিলেন ভিতর ঘর
বল চরা আমায়, সিঙ্গটা চরা
দিলেন কোন ঘরে।

পাঠ ঃ ওগে আছে তার ষোলটি স্তর.
স্তরে স্তরে সন্ধান করে
শুনেক চুন্নী কথা মোর
ওগে কুন স্তরে যায়য়া
চোরটি সোন্দাইলো ভিতর ঘর।

**চোরের গান**

গড়ান ঃ ওগে শুনিবো যদি দুইচার কথা
শুনেক চুন্নী সংক্ষেপে.
ওগে নুন-তেলের তে কথা না হয়
কাও কনেক দিবো
চিতান ঃ আ-হা-র তুই হলো চুন্নীগে
আমি বলিযে তোমায়,
ওগে স্ত্রী-পুরুষ গুরু-শিষ্য, সখা ভাবো হয়।
এই সমস্ত জানালাম তমায়।
পাঠ ঃ ওগে তিনজন চরায় করে চুরি.
দুইজন মোর শিষ্য হয়.
শুনেক চুন্নী বলি তোমায়.
ওগে সিঙ্গের পারোত
রয় উমুর ঘর সোন্দায় মুই এ্যাকেলায়।
চিতান ঃ আ-হা-র যেই অস্ত্রেতে করগে চুরি.
তাকে খন্ত পাছন কয়
শুনেক চুন্না জানাইলাম তমায়।
গড়ান ঃ ওগে চুরি করিবার যামগে চুন্নী
হাসি মুখে বিদায় দে
ওগে গলার মালা কানের সোনা

আনিম তোর বাদে।

চিতান ঃ আ-হা-র চুন্নী ধওলা বাড়ীত করিম চুরি
টাকার বাকসো আলমারি
সন্দুকোত রাখেনা মালা
আছেগে পড়ি,
এ্যালা মুই যাম চোর করি।

পাঠ ঃ ওগে ফোক দিলে খসিবে তালা
বোদ না পাবে কোনো শালা
ভাবিবার তোক না নাগে
গলার মালা কানের সোনা
আনিম তোর বাদে।

চিতান ঃ চুন্নী ঢাকাইয়া সতরের শাড়ি
মুই আনিম চুরি করি
চুন্নীগে।

পাঠ ঃ ওগে বড়লোকের মাইয়ার মতন
শাড়ি পিন্দাম নানান মতন
ভাবিবার তোক না নাগে
ওগে গলার মালা কানের সোনা
আনিম তোর বাদে।

গড়ান ঃ ওগে ধরা পড়ি সংসারের আশা
চুন্নী দিলো ছাড়ি,
ও কি হায় করি কি কাম
ক্যানে জান হারানু
করিয়া চুরি।

চিতান ঃ আ-হা-র দারোগা বাবু রাগ করিয়া
মোক কছে ক্যান করলু চুরি গিয়া

মুই কছে. নাই করো মুই চুরি।

পাঠ ঃ ওরে এটা কথা শুনি যেলা
ঝাপি উঠিল সিপাই গিলা
ওঠাইল পিটের দুরদুরি
কি কাম কোনু জান হারানু
করিয়া চুরি।

চিতান ঃ আ-হা-র থানার পছিমা নিয়া যায়া
নাকে মুখে দিলেক মুতি
চিপিয়া ধরিয়া টুটি
কি কাম কোনু জান হারানু
করিয়া চুরি।

## চুন্নীর গীত

গোড় ঃ ওরে নানান কথায় জ্বলে দেহা
অন্তরে মোর নাইরে সুখ
ওরে মনটা কছে দশাপরাটার
ফিরিয়া না দেখ মুখ।

চিতান ঃ আহারে যেই হাতে বিয়ারে হইছে
ওদিন হাতে মোর দিন যাছে কাচালে
খাবার বন্দে নাই মোর শান্তি
যেমন অন্তর জ্বলে দিন বাছে
মোর কাচালে গে।

## চোরের গীত

গোড় ঃ ওগে খেতকে নাক মুখের নাজে
তেতকে আহ্লাদ ভাবিছিত

ওগে না কয়া ও তুই মুখে গে পাই শীত।

চিতান ঃ আ-হা-র টাড়ি বাড়ি আশ-পড়শি
ও চুন্নী কায় বা ভাল কয় তোক
ওরে উচিত কথা করার গেলে পরে দারুণ শোক
ও তুই কেমন জাতের লোক।

ঝুমুর ঃ ওগে তুই হলো নালাকারি
মুখের দোষে শুনিস গালি
ওরে মাও মাপ তোর এই শিখাইছে
ওগে কাহয় ভাল্ না কয় তোক্
মুখখানের দোষে

গড়ান ঃ ওগে আশেপাশে যতয় আছে
সগারে তুই মুখ খাইসিত
না কয়া তুই মুখে গে পাইসিত

চিতনা ঃ আ-হা-র না মানিস তুই শ্বশুর শাশুড়ী
ননদ আরো জাও
ওরে মুখ খচরানি গাও ঝকলানি কত দেখি বাও
এইলাতে মোর যেমন উঠিছে তাও

ঝমুর ঃ চুন্নি ভইলাতে মোর উঠিছে রাগ
কতয় আরো দিমগে মাপ
ওমোর প্রাণে সহেনা
কুনবা দিন খাচিত আরো চদন
হালুয়া পেন্টি দিয়া ও তুই বুঝিবো সেলা

কথা ঃ ওগে ধরিস সেইদিন বুঝিবো সেইদিন
পিঠির চাম তোর থুম মাটিত
নেকেয়া ও তুই মোকেগে পাইসিত

গড়ান ঃ ওগে তুই হোলেগে নালাকারি আসল নম্পটি

ওগে নাই কথাতে অপমান

ও তুই করিস মোকে সদায়

চিতান ঃ আ-হা-র আক্কেল জ্ঞান নাই তোরগে চুন্নী

ওগে স্বামীটা যে কি তার মুখত

মুতিব চাছিত নাগাছিত বাধিনী

ও তুই আসল নম্পটি।

কথা ঃ ওগে যেইদিন ধরিয়া সরত টানিম

দোহাতিয়া মাইর মারিম

সেইদিন রক্ষা তোক করিবে কায়

ওগে নাই কথাতে অপমান ও তুই

খইণস এঙঅখ সদায়

চিতান ঃ আ-হার তোর চলন দেখিয়া চুন্নী গে

ও মোর যেন উঠে রাগ

ওগে কুনবাদিন তুই সোজা হোবু

সেইদিন করিবু বাবরে বাপ

চুন্নীর গীত

গোড়া ঃ ওরে মুখ সামলি বলিস কথা

চিনিস নাই তোর মকুরানীক

ওরে খবরদার

নাগম বাধিনি

চিতান ঃ আ-হার যেইদিনত ওমোর উঠিবে মনের ভাও

ওরে উচিত কথা কোইতে ওতোক

কি হয়তো হোক

তোবু সবার না মনায় মোক

কথা ঃ ওরে নাই কতাতে পারিম গালি

তুই হোলুযে মদ্দের শালি

ওরে খবরদার

নাইতে লাগাম বাধিনি

চিতান ঃ আ-হা-র তুইও যদি কবো চরারে

ও চরা মুই কি করার ছাড়

তিন সিঁড়ি স্বাদ জোগোতে

মুখোত মুতি দিবার পার।

কথা ঃ ওরে হের দেখিস পাটানির চোর

হাত দুইটা বান্ধিয়া তোর

বুড়া বারুনে উঠাইস পর।

ওরে খবর্দার খবর্দার নাইতে নাগাইম বাধিনি

গোড় ঃ খটা খটা কথা শুন তোর ওমোর চরারে

দেখিস আজি কেমন মদ্দের জোর

ওই বড় বুলিয়া মান তোকেরে

দয়া না দেখ তোর।

কথা ঃ ও তুই মাইয়ার আগোত গল্প করিস

সন্দেয়া ঘরের ভিতোর

দেখিম আজি কেমন মদ্দের জোর

চিতান ঃ ঐ তোর কথা শুনিয়া ওমোর চোরারে

মনটা যে হাসেছে মোর

পরান ঃ ওরে গছের খোকে পেঁচা হয়া

পার পাছিত তুই মোর উপর

দেখিম আজি কেম মদ্দের জোর

চোরের গীত

গোড় ঃ ওই আজে বাজে না করিস তুই আও

ও মোর চুন্নীগে

ভাল না হোবে ভাসলে মোর তাও

চিতান ঃ ঐ সমাদর করিমা ও মোর চুন্নীগে

ভাল কথা কতয় শিকাও।

কথা ঃ ওগে তোবুও তুই মাঝে মাঝে

ভেন্যন মারা করিস আও

ভাল না হোবে উঠিলে মোর তাও।

চিতনা ঃ ঐ মুখের দোসে ঠেকিবো ওমোর চুন্নীগে

ধোরিবো তুই চোরের পাও।

ঘসা ঃ ওগে মুখখান তোর খুব চলেছে

না দেখ তোর ভয় হাতাশ

খালি খালি মোক দেখাছিস।

না দেখ তোর ভয় হাতাস

চিতনা ঃ আ-হা-র যেলায় দেখিবো হাটের মোটা মাছ

ও তুই চরেবার যাবো ভাত

তুইগে চুন্নী আইক্কোশনীর জাও।

কথা ঃ ওগে এক মাস যদি ধান ভুকাবো

তাতে ও তোর বিষায় হাত

দেখাচ্ছিত তুই টাড়ির মাইলাক

আরের কিনা চাউলের ভাত

ওগে আরো খাবার কান্দাছিত

হাটের মোটা মাছ।

চিতান ঃ আ-হা-র তুইগে চুন্নী কামের কুতুরি

ও তোর মুখখান খুবে ধার

খাবার পায়া মক মোকাছিত

কাক বা দেখাছিত তাও

ওইলাতে মুই দুইচার কথা কও।

কথা ঃ ওগে মুই টাড়িটা ড়ি ব্যারেবার তোক দেখেছ
তুই না হোলো ভাল মানষির জাত
ওগে কার সঙ্গে তুই করিছিত আও
দেবরের সাথোত

চুন্নীর গীত

ঘষা ঃ ওরে তোর ঘরত আসিয়া চরা
দুঃখোতে মোর যাছে দিন
ওরে দিব' নিশি শুনশুন চোখোত
না ধরে নিন।

চিতান ঃ আ-হার মোর হাটের কিনা মাছ
ও তোর দুঃখ বারো মাস
ওরে কতয় মুই কাটিয়া আনিম
আলির কচুশাক।
তোর মুখোত নাদেখ লাজ।

চিতান ঃ ওরে মোর কপালে সুখ হবার কনেকে নাদেখ চিন
যেমন তুই বুদ্ধিহীন,
ভাবিতে ভাবিতে মোর সদায় যাচ্ছে দিন

কথা ঃ আর হার তোর চোরটার দেখিয়া চলন
ওমোর করেছে যেমন মন,
ওরে মনটা কছে বাধিনি দিয়া
মুখোত ডাঙাও

পরান ঃ আ-হার বারো মাসে তোর সদায় হাদাং ধাং
ও তুই কুড়িয়া নাদান
ওরে দিনে রাতি কতয় ও মুই ভুকরি

বাই চাও ধান।

গোড়া ঃ ওরে কানু বাজাইস বেনু আজি পাইলে নাগাল
ওরে ডাঙ্গেয়া চামেড়া
পিঠির ওঠাইম রে তোর

চিতান ঃ আর-হার ভাল্ মানষির ছাওয়ারে হয়া
চোর বিদ্যা শিখিলু কতদিনা
ননী চোরা তোক সগায় কয়
নইজ্যা নাইরে মুখোত তোর।
আ-হ'র হাতোত তোর দিয়ারে দড়ি
পিঠিত দিম তোর চামড়ার বাড়ি
আজি নাই আর তোক ছাড়াছাড়ি।

কথা ঃ আ-হার আজে বাজে কথা কোইস
হয়া ও তুই চুয়ার ব্যাঙ
ওরে একটা আছার খাবার গেলে
তোর ভাঙ্গিবে ঠ্যাং।

চিতান ঃ আ-হার যাচিয়া তুই চান্দাছিত সম্মান
ও তোর না দেখ জ্ঞান

কথা ঃ ওরে টাড়ি বাড়ি আশে-পাশে কায়বা
তোক ভাল্ বাসে।
তোক কছে চুয়ার ব্যাং
ওরে একটা আছার খাবার গেলে
তোর ভাঙ্গিবে ঠ্যাং।

## চোরের গীত

গড়ান ঃ তোক ধরিয়া কাচাল করিয়া, না চলে মোর সংসার।
ওরে দিনে আতি খেচের খেচের কতয় করিম আর।

চিতান ঃ আ-হার দেখ বেলাটা হইসেগে দুপুর
এলাও কাজো না ফুরায় তোর।
ওগে দুপর ছাড়া সাকালে খোরাক, মুখে না চরে মোর।
এমন গে টিপানি চলন তোর।

চুন্নীর গীত

গড়ান ঃ ওগে নাই তোর সংসারের জ্বালা,
তাতে খাছিত কেমন বেলা
তবু করিস অবহেলা তাহো আক্কেল না হয় তোর।
ওগে তোক ধরিয়া সংসার বুঝি না চালিবে মোর।

কথা ঃ ওগে চলিয়া যা তোর বাপের বাড়ি,
না করিস তুই বাড়াবাড়ি তোর গেলানি বাড়ি বাড়ি
গায়া বেড়ায় পাড়ার লোক।
ওগে তোর মতন নম্পটি নারী না নাগে আর মোক।

গড়ান ঃ শুনরে চোরা ফুলের ভ্রমরা।
আজি নাগাল পাইস তোর,
কুন দেশে যায়া আছিত
হয়ার তুই ভোর।

চিতান ঃ আ-হার তোর বাদে মুই হোইসরে পাগোল
দয়া নাইরে তোর
ওরে কুনঠেটা পালাবো আজি
নাগাইম প্রেমের ডোর
ও তোর দেখিম কেমন জোর।

কথা ঃ ওরে মানষির মুখের নানা কথা কোহিস মোকে
মুখের আগোত কাহ তোক
আজি দেখিম মদ্দের জোর

ওরে মুখে বুকে কোম কথা সবারে উপর।

চিতান ঃ আ-হ'র আজি দেখা কোরিসে বিধাতায়
ও তুই মনে না খাইস ভয়
ওরে পোরিসিত তুই মোরে হাতে, নাই তোর উপায়
আছি পালাবো কোনঠে তায়।

কথা ঃ ওরে আজি এড়ান নাইরে তোরে
বুঝিবে তুই আতির ভোরে
ঐ সময় তুই উপায় বার করিয়া সবার ভিতর
না করিস চিন্তা নেচতার নাইরে তোরে।

চোরের গীত

গোড়ান ঃ ওকি ও চুন্নী শুনিয়া তোর মুখের আশু
যেমতন মোর উঠেছে তাও
মনটা কছে তোক টানিয়া ঢুডিয়া ডাঙ্গাও

চিতান ঃ ওকি ও চুন্নী গে মুখ খুলি কথা কোইস
কথায় তুই বড় না হোইস
একটা কথা বারে বারে খবর্দার নাকোইস।

কথা ঃ ওগে হোক নাহোক অপমান করিম
সাত গোতের নাম সদায় ধরিস
আক্কেল জ্ঞান না দেখ তোর
সদয় কেবা এমন করিম।

চিতান ঃ ওকি ও চুন্নীগে কুনবা দিন তুই আছিত সুখী
তুই বেড়াইছিত টাড়ি টাড়ি
কুনবে দিন তোক ঢুডিয়া মারিম

কথা ঃ ওগে কুনঠে পাও আর কুনঠে না পাও
টিপ টিপ করি মুই তোক খাওয়াও

তারে বাদে আছে ও তোর পুদুর পুদুর গাও।

গড়ান ঃ পাড়ায় পাড়ায় বেরাইস সদায় গে
কাম কাজে তোর নাইতে মন।

চিতান ঃ ঐলাত তুই কুনবা দিনা খাবগে চোদন
সদায় ও তোর বেরানি যেমন।
মুখের লাজে নাক তোকে গে
নিলে পাবো সরম।

কথা ঃ ওগে টাড়ি বাড়ী মানষি গিলা নিন্দা করে তোর চলন।
সদায় ও তোর বেরানি যেমন।

## চুন্নীর গীত

গড়ান ঃ ওরে তুই হলো নাম কাটা চোরা
শুনিছ মুই সেটা কথা
ওরে তারে বাদে উসম দেছিত
পরার ভাসা যায়া।

চিতান ঃ আ-হার কেচেরি পাখির ছোটার ভাসা
কুহুলি ঐঠে কোলেক বাসা
ওরে কেচেরি কেলকেলিতে মনটা যাছে উড়িবানা।
ঠেকিনু মুই বাক্যটা দিয়া।

## চোরের গীত

গোড় ঃ ওরে আত্তি পাহালে কার বা কুত্তি
সন্ধ্যা হোলে আইস জুটি, পারিয়া না ভাইরে
বাঁশের আগালিতে
ওরে সানজা সাকালে কতয় শুনিবো
উমার কেচকেচি।

চিতান ঃ আ-হার চোর করিম মুই আজি হাতে মা
করেছ তোক শুভারনা।

কথা ঃ ওগে সিং খুরিম সন্দাম ঘরে।
চোর করিম মুই সারা ঘরে।
লোক যেন না পায় চেতন
দিনে রাতি পূজিম তোর চরণ।

চিতান ঃ আ-হার চোরগিলা তোর সগায় বেটা মা।
রইক্ষা করেক নিরঞ্জনা।

কথা ঃ ওগে মুন্ডো মালা গলে দিয়া হাতে
একখান খাড়া নিয়া।
পতির বুকে দুই পতি দিয়া ভয় নাগাছে মোক যেমন
দিনে রাতি পূজিম তোর চরণ

## চুন্নীর গীত

গোড় ঃ চল চল ওগে সখি আপন বসনপড়ি
ওগে বসন পাড়িয়া নিজো কুঞ্জে গমন করি

চিতান ঃ আ-হার কি হইলো কি হইলো প্রাণ সখী
খাটে বস্ত্র পরি
ওরে কদম ডালে বাজায় বাঁশি রাখিয়া শাড়ী।

গড়ান ঃ তোক দেখিয়া জ্বলছে দেহা, ও মোর শ্যাম কালা
যত মাইয়ার পহরা দেওয়া।

চিতান ঃ একদিন সখীসহ সবে মিলি
নামিলাম যমুনার জলে
যমুনার জলের রঙ্গ দেখিয়া, তোক কয় বেহায়া,
যত মাইয়ার পাটানি চোরা।

কথা ঃ একদিন কাপেড়ালা ধরিয়া, কদম গাছে চড়িয়া

কি দেখেছিত ভুলকি মারিয়া।
তোকে কয় বেহায়া
পরার মাইয়ার হাত ধরিতে লজ্জা নাগে না।

চিতান ঃ একদিন বাঁশি হাতে নিয়া
কদম গাছে চড়িয়া কি দেখেছিত ধিয়ান দিয়া।
ওমোর শ্যাম কালা তোকে কয় যত
মানষি বেহায়া।

চোরের গীত

গড়ান ঃ ওগে দেশের অভাবে পেটের ভোকে
লজ্জা সরম করিনু নাশ।
ওগে মনের দুঃখে মাটির টুকরি
মাথাত উবাস।

চিতান ঃ আ-হার বেটি ছাওয়ালা করেছে মজামাত
ওমোক দেখিয়া নাগেছে নাজ.
ওগে এক টুকুরি মাটি ফেলেয়া
করেছে বাপ রে বাপ।
ওমোক দেখিয়া নাগেছে লাজ।

গড়ান ঃ ওগে শুনেক চুন্নী মোর কথালা.
মনত দেখেক ভাবিয়া,
ওগে কেমন করি দিন কয়টা কাটিম এলা

চিতান ঃ আ-হার যেমন হইসে আজি পাটিলা
চুন্নী দেছ পহরা।
ওগে কেমন করি যাইগে চুন্নী চুরি করিবার।
চপর রাতি আছে পহরা।

কথা ঃ ওগে চুরি করিবার গেইলে
চুন্নী হঠাৎ পড়িলে ধরা।
জীবনটার ভাই নাইরে আশা।
ওগে কেমন করি দিন কয়টা কাটিম এলা।

চিতান ঃ আ-হার চুরি করাটা উত্তম বিদ্যা
যদি না পর ধরা
ওগে আনির পারিলে খাম হামেরা ভাল করিয়া।
ওগে সাজনি নয়া দেউনিয়া।

কথা ঃ ওগে যেমন হইসে আইনের ধারা
দিনে রাতি আছে পহরা।
ওগে কেমন করি করিম চুরি
এইবার বুঝি মরণ হবে দেখেক তুই চুন্নী।

গড়ান ঃ যোগোত যাগাত চাইরটা চুন্নী, দেখেক খাবার করি
ওগে টোকোন নিবার যাবার নাগে জয়নালের বাড়ী

চিতান ঃ আ-হার সাকাল সুকাল যাবারে নাগে
আজি ভীর বড়য় হোবে
ওগে চাইরো বেটার মোর টোকোন চুন্নী, একদিনো দরে
না গেলে চুন্নী কালি না দিবে

কথা ঃ ওগে টোকোন নিতে টিপ সই নাগে
ওগে টোকো নিবার যাবার নাগে জয়নালের বাড়ী

চিতান ঃ আ-হার জয়নালের বাড়ীত টোকোন খান
নিয়া ওইদি যাম মুই মলানি
ওগে ভেন্ডারোক টোকোন খান দিয়া
নবার নাগে নাইন ধরিয়া

চুন্নী তুই আর নাকরিস দেরি।

কথা ঃ ওগে নামে নামে ডাক পড়িবে
পাকা খাতাত টিপ সই নিবে
কনেক টোকোন ফারি
ওগে ওই কিনা টোকোন দেখিয়া চুন্নী
দিবে গোম নাপি।

চুন্নীর গীত

গড়ান ঃ তুইরে চরা চোরা জাতের লোক
কি আর কেহিম তোক, ওই বাদে মানষিলা
কহে ভোদোক দোক।

চিতান ঃ চোরা কবার যদি কছিত মোক
হের কাথাটা কছ তোক
কানের গোড়োত কুকুয়ায় উড়াইছে
মাথাত দিবার তেল নাই বোতোলোত

কথা ঃ চোরা যেইদিন হাতে তোর হাতোত দিন যাছে
মহ দুঃখোত মস্তকত ওরে তেল
খইলা নাগিছে টাড়ির লোক।

চোরের গীত

গড়ান ঃ তোরগে চুন্নী কাথালা অপার
এতয় সহ্য নাহয় আর
ওগে নয়ন খুলি দেখেক, ও তোর কি হোইসে সংসার

চিতান ঃ চুন্নী খায়া দায়া হোলো বুড়ি, কাথালা তোর অসংসারী
ওগে খালি অহংকার তোর কি নাই বিচার,
ওগে নিজের দুন্নাম নিজে গাছিত তুইতো অনাচার

কথা ঃ ওগে লোকের মুখোত শুনা পাই
খাইয়া লোকের বিশ্বাস নাই
খায়া দায়া নিন্দে খালি তোক বুঝাবে কায়।

গড়ান ঃ ওহোগে তুইগে চুন্নী এতয় দেরি
খড়াক এলাও তুই করিস না
ওগে আজি বোলে আসিবে বি.ডি.ও
ইনকোয়ারি করিবার

চিতান ঃ আ-হার মিথ্যা কাথা কবার গে নাগে
বাড়ি ভাঙ্গিসে হামার ঘর
ওগে ২০০ (দুইশ) টাকা পাওয়া যাছে বাড়ী বান্দিবার
আজি বোলে আসিবে দেখিবার।

চিতান ঃ আ-হার টাকা পালে হোবে সুবিধা
চুন্নী নাই আর ভাবেনা
ওগে মোর বাদে এক জোড়া জোতা, তোর বাদে শাঁখা
এইবার বুঝি নাই আর ভাবনা।

কথা ঃ ওগে প্রধান মেম্বার কেরাণী
সাগায় তো ভাই গেলেক চলি
বি.ডি.ও আসিবে না হাটি
ওগে চট কোরিয়া খাবার দেগে নোয়া যাবেনা

গড়ান ঃ ওরে সাধের কি প্রেম কোরিয়াছিনু
কালিয়ারো সনে,
ওরে চিত্র পটে দেখিনা গেল নয়নে।

চিতান ঃ আ-হার কালায় কি জানেরে যাদু
বাঁশিতে উড়ায় মধু

ওরে অবলায় ভুলাইয়ে শুধু ওই বাঁশির গানে
দেখিযে শয়নে স্বপনে।

কথা ঃ এইযে যমুনার ঘাটে জল আনিতে গেলাম
জলের ছায়ায় রূপ দেখি মুই হোনু পাগেলা
ওরে কুন্ঠে গেইলেক শ্যাম কালা
দেও না মোকে দেখা।

চিতান ঃ আহার নয়ন বাঁকা ভুমিরে বাঁকা
মস্তকের চূড়াটি বাঁকা
এমন বাঁকা নাই আর জগত মাঝারে
দেখ তোমাক শয়নে স্বপনে।

গড়ান ঃ ঘরত বসি দেখাইস সান,
কুন্ঠেটা ঢকা দিলো হায়রে সিয়ান।

চিতান ঃ যেগুনে ভাই দেউনিয়াটা ভাল, উয়ায় বুঝে
দুঃখ জঞ্জাল, ওরে দুঃখের সময় খাড়া হচ্ছে।
ফাটো দিসে কাল
চরারে তোর কোরিসে ভাল।

কথা ঃ ওরে দেউনিয়া পাড়া হামার বাড়ী
আধা মাইলের কাছাকাছি
মাথায় নিয়া ধানের ঢাকি
আনিতে মোর যাছে জান।

গড়ান ঃ বানাভাসা হয়াগে চুন্নী না নাগেছে সুখ
মনে মোর বড়য় দুঃখ
নি হালুয়া লোকগিলার ভাই হোলেক এইসন সুখ।

চিতান ঃ চুন্নী বোসিয়া বোসিয়া খাচে

ওগে চাউল আটা ছিলিপে পাছে

দিন গিলা উমার শান্তিতে যাছে।

কথা ঃ ওগে পাছে আরো শাড়ি সায়া

ঢুসা আরো গরম জামা

কিছুই উমার নাইগে দুঃখ

নি হালুয়া লোকগিলার ভাই

হোলেক এই সন্ সুখ।

চোরের গীত

গড়ান ঃ ওগে মোর বাদে তুই প্রাণ সখী,

কান্দিস কেনে অকারণ,

ওগে অবশ্য তুই পাব দেখা যদি থাকে মন।

চিতান ঃ আ-হার সারা রাতি জননী মায়ের কোলায়

আমি শুইয়া নিদ্রা যাই,

ওরে রাতি না প্রভাত হইলে, বলে চলিয়া যাই

ও বনে ঘুরিয়া বেড়াই।

কথা ঃ ওগে ধেনু চড়াই বনে বনে, খেলা করি সখীর সঙ্গে

ঘুরিয়া বেড়াই যত সখীগণের।

ওগে কুন সময় যে হবে দেখা

সময় না জুটে।

চিতান ঃ আ-হার দেখিয়া তো বনের সগাকে

কত ফুল ফুটিছে ভালে

ওগে ফুলের সৌরভ দেখিয়া, তমার সদায় ফম পড়ে।

কথা ঃ ওই ফম করিয়া হবে কি

সময় না পাও দিন রাতি।

ওগে কুন সময় যে হব দেখা সখীর
ওমোর সময় জুটে না।

গড়ান ঃ ওরে এ্যালা কেনে না আসিস চোরা
নাগাল না পাও তোর, আগের মতন।
ওরে প্রেম করেয়া চোরা এলাকি হারালো ফম।

চিতান ঃ আ-হার বিছিনায় থাকিয়া চোরারে
ওমোক নিন্দে না ধরে
ওরে নানান মতন ফম পড়েছে তোরে না কথা
ও তুই শুনেকরে চোরা।

কথা ঃ ওরে তুই মোর চক্ষুর মণি, না দেখিলে
মন পাগিলি তোর জইন্যে মোর ঝুরে মন।
ওরে দারুণ প্রেম করেয়া চোরা এলা হারালো ফম।

চিতান ঃ আ-হার দেহা আজি দেছ সঁপিয়া ও চোরা
এ প্রাণ যৌবন।
ওরে নানাগে মোক বিয়ার স্বামী
নানাগে ধন জন।
ও তুই মোর শুনেক প্রাণেশ্বর।

কথা ঃ ওরে এ জীবনের কিবা শান্তি
নানাগে মোর টাকা কড়ি।
তোর কথা মোর সদায় পড়ে ফম
ওরে দারুণ প্রেম করেয়া এলাকি
হারালো ফম।

গড়ান ঃ ওগে দিবা নিশি কান্দ বসি
বুক ভাঙ্গে মোর পশ্চিয়া বায়,
ওগে তোর যে আছে বিয়ার স্বামী

মোক যে নাগে ভয়।

চিতান ঃ ওগে এক বার আগাও দুই বার পাছাও
ভয়তে তোর বাড়ি না যাও,
কোন্টে গেলে দেখা পাও
তোর শোকে পেটত ভাত না যায়
ওগে তোর যে আছে বিয়ার স্বামী
মোক নাগে ভয়।

চিতান ঃ আ-হার শুনিয়া তোর মুখের সাও
ওমোর ঠান্ডা হয়গে গাও
ওগে দেখিয়া তোর দেহার ঠসক খড়াকে নাখাও
মনটা কয় যে সদায় দেখিয়া নেও।

কথা ঃ ওগে তুই যদি মোর থাকিস সয়,
কাহকে না কর ভয়
তোর পিছোতে জীবন যদি যায়।
ওগে তোর যে আছে বিয়ার স্বামী
মোকে যে নাগে ভয়।

গড়ান ঃ সখী মনের কথা বলি তোমায়
প্রেম জ্বালায় আমার প্রাণ যায়,
ওরে কোথায় গেল ওই রসিক জন
আনি দেও আমায়।

চিতান ঃ আ-হার ও মোর প্রাণ সখীরে সখী, আর বা কায় আছে।
ওরে ভাল মন্দ কথা সখী জানাই তোমাকে
অভাগিনীর কি গতি হবে।

ঝুমুর ঃ সখী মন মোরে ছতকার হয়া এ দুঃখ পাই তারে কায়

ওরে হাত ধরিয়া সখী বলি তোমায়।
ওরে দুই চক্ষে মোর জল পড়েছে থাকিয়া বিছানায়।

কথা ঃ ওরে আম গাছে ফুল ফুটিছে
তোমার বিনা মধু কায় আর খাবে
মধু মোর শুকিয়া পচিয়া যায়।
ওরে কোথায় গেল ওই রসিক জন
আনি দেও আমায়।

চিতান ঃ আ-হার সারা রাতি প্রাণ সখীরে
ওমোক নিন্দে না ধরে
ওরে মনের আগুন জ্বলে তেগুণ জল দিলে
না নিভে সখী বলি তোমারে

ঝুমুর ঃ শুন শুন প্রান সখী মন কান্দে মোর দিবা রাতি।
ওরে প্রেম জ্বালায় আমার প্রাণ যায়,
ওরে মনের বেদন মনে জানে,
আর জানিবে কায়।

---

## সংগ্রহসূত্র

চোর-চুন্নী লোকনাটকটি সংগ্রহ করা হয়েছে মূল গীদাল কামেশ্বর রায়ের কাছ থেকে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার সিঙ্গিমারী গ্রামে তিনি বসবাস করেন। একটি ব্লক-ভাওয়াইয়া উৎসবে এই চোর চুন্নী পালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ময়নাগুড়ির লোকসঙ্গীত শিল্পী দীপ্তি রায় এবং দীনেশ রায়ের সহযোগিতায় এটিকে লিখিত আকারে আনা হয়েছে। এছাড়াও 'চোর-চুন্নী'র অনেক নাট্যানুষ্ঠান দেখেছি।

## খাস পাঁচালী

## লোভী জোতদার

### পুরুষ চরিত্র

(১) লোভি জোতদার, (২) ল্যাঠালাগা— মড়ল। (মোড়ল)

(৩) দয়াল সিং — পরজা। (প্রজা), (৪) শক্ত সিং — দয়াল সিংয়ের বেটা।

### স্ত্রী চরিত্র

(১) চালাকিশ্বরী — দয়াল সিংয়ের স্ত্রী, (২) দুলালী — লোভী জোতদারের বেটি।

### অন্যান্য

দারোগা, পুলিস, প্রধান, এবং পাড়ার শয়তান ছেলে বেংচু।

### প্রথম দৃশ্য

(লোভী জোতদার ও দুলালীর প্রবেশ)

আসরত্ আসিয়া চাইরা পাখে প্রণাম করিয়া নিজে নিজের নাম কহা।

জোতদার — নমস্কার। মোর নামডা বাগে লোভী জোতদার আর এইডা বা (দুলালীক দেখায়) মোর বেটি, তোর নামটা কোহো বেটি।

দুলালী — তে বাবা তুইহে কয়হা দেনা তে মোর নামডা?

জোতদার — নাহায় বেটি নাহায়, এইঠে নিজের নামডা নিজে কহবা লাগে।

দুলালী — তে বা মোর নামডা দুলালী।

জোতদার — এই বেটিডাক লিয়ায় বা মোর সংসার। মুই বাপের একেনায় বেটা। খোব আদরে যতনে মানছি হইচু। বড়য় আশা করিয়া বাপটা মোক বেহা থুয়া দিয়া নায়া বহুডার হাতে ভাত শাক নান্ধা খায়া স্বর্গে চলিয়া গেল। এই নং করিয়া বা দুই তিন বছর যাবার পর ঘরোত উপজিল মোর বেটি দুলালী। যদিও বা বেটার আশা সগায় করে। ঐ যে কাথায় কহে না, যে একটি পুত্র দেরে আল্লা দুইটি পুত্র দে। কামাই খাবার আশা নাই মোর মাটি দিবে কে? তো ... বা মোর এই জোতদারীর ভারটা লিবার তানে মুইও একটা বেটা বোলে আশা করিসিনু। তো ভগবান তা মোক বেটা দিবার আগোত দুই দিনকার জ্বরতে মোর দুলালীর মাওক লিয়া লেগাল। তারপর মুই আর বা বেহা থুয়া করিনু নি। এই বা বেটিডা আর কুন্ঠে পাছাল। তে বেটি তুই ঘরেরতি যা। আর মুই মড়লটাক ডাকায় দেখুত অয় কুন্ঠে গেল।

দুলালী — আচ্ছা বাবা।

জোতদার — মড়ল রে মড়ল এ .... মড়ল। (মড়লের প্রবেশ)

মড়ল — তুই মোক ডাকালো গিড়ি দা।

জোতদার — হ্যাঁ ডাকানু, তে তুই লোকটা গেইসিত কন্থি তেরে।

মড়ল — কন্থি গিসু আরহ গোরু বাড়ি গিসু রে।

জোতদার — গোরু বাড়ি গিসিত তে এত দেরী হয়া গেল।

মড়ল — ওঃ ঐডা কাথা, আর না কহিস ভাই একেবারে, অচাক কাইন্ড।

জোতদার — আরো অচাক কাইন্ড নাহায়রে, অবাক কাইন্ড।

মড়ল — ঐত্য একদম অবাক কাইন্ড। তে ডাকালো কিতায় তে?

জোতদার — ডাকানু কিতায় আরহ এই যে আসরটাত আচি হামা কায় কার কি নাম, পরিচয় দিবা হবে না।

মড়ল — অঃ ... পরিচয় দিবা লাগে আরহ। তে দিলেছি পরিচয় বা দিয়া ফেলাই।

জোতদার — আরে হামারলা হয়া গিসে, এলা তুই আসরটাত ভক্তি দিয়া তোর নামডা কোহো।

মড়ল — আচ্ছা আচ্ছা তে আরহ নামডাও কহবা লাগে নাকিতে।

জোতদার — লাগে নিতে। না হলে তোক লোকলা চিনিবে কেনং করিয়া।

মড়ল — বাবুগে নমস্কার, মোর নামডা বাবুগে ল্যাঠালাগা ঐ বাছোটতে মারবেল খেলাইতে খেলাইতে মুইত বা সদায় জিতিয়া ছাড়া হাড়িয়া রহমনি। সেলাবা চুয়ায় চুয়ায় লাগি যাবে বলাবলি। সেলা ঐ বা অমার মাওবাপলা মোক আসিয়া ধরিবে, এই বাউ তুই খুবে ল্যাঠা লাগাচিতরে। ঐ নং করিয়া বা মোর নামটো পড়ি গেল ল্যাঠালাগা।

জোতদার — হইচে, হইচে, এইবার তোর অচাক কাইন্ডডার কাথা কোহোদি কনেক শুনি।

মড়ল — বয়েল দুইডা আর ঐয়ে হামার সাদা বাচ্ছিডা ছে না। হুডাতো সদায় বান্ধায় রহে। আজি ছেড়া পায়া ভাই এইয়ে নেড অঠায় দৌড় মারিল না যতয় হুঁ হুঁ করচু ততয় দৌড়েচে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলিগেল একে বেলায় লচকা লোদির পাও ঐঠে ভাই দেখেচু গোরুডা ভাই বাঘটাক খাচে।

জোতদার — কি? গোরুত বাঘটাক খাচে, না বাঘটা গোরুডাক খাচেরে

মড়ল — আরে মুই দেখিয়া আসিনু রে নিজের চোখে। বাঘটা মুখ খান মেলিয়াছে। আর পাছিলা পাখে গোরুডা একেলে গাউস গাউস করিয়া বাঘটাক খাচে।

জোতদার — এহে মড়ল, তুই একেলে এলাও আগের লাখায় ছিসরে। তোর বুদ্ধি সুদ্ধি সেলা করদিনে হোবেতে সেলারে।

মড়ল — কিতায় গিরিদা।

জোতদার — আরে ঐডা জিনিস বুঝাইপাইনি। এই কয়দিন আগত হামার দুর্গা পূজা হোল না?

মড়ল — হ্যাঁ

জোতদার — ঐ পূজাটুজা করিয়া প্রতিমাডা তো ভাসায়দিসে। তে ঐ প্রতিমালা কিদিয়া বেনাচে কোহোদি?

মড়ল — ঐতে বাঁশ খেড়ি আর মাটি দিয়া।

জোতদার — হ্যাঁ, তে ঐ মাটিলাত জলপায়া ধুইয়া পালাইচে। সেলা খেড়িলা নিকিলিয়া গৈসে। ঐডা তুই দেখি সয়া তুই আসিয়া কইচিস, গোরুডা বাঘটাক খাচে। তোক লোকলা বকা কোহবেরে মড়ল।

মড়ল — হ ... এলান বুঝা পানু। মুই দেখিয়া ভাবিচু বধায় গোরুডায় বাঘটাক খাচে।

জোতদার — তে মড়ল ঐলা বাদদে, এলা মুই তোক কি কাবা ডাকানু। তোক দুইডা দুখ সুখের কাথা কবা চাছ, মোর কাথালা শুনিবো কি?

মড়ল — অ: ... তোর আরহে কাথাছে নাকিতে তে কোহোদি।

জোতদার — তাহলে শুনিম।

**জোতদারের গান**

ঘসা — মড়ল দেখিয়া সংসারের গতি, মনে নাই শান্তি।
ওহোরে চিন্তায় ভাবনায় মড়ল পোহাচু রাতি।

চি — মড়ল কলি যুগ অবতার হইচে
অসুর দুর্গা দেখা যাছে।
আজি কারোহ কাথা কাহ শুনে নারে হে
লোকের মাথা লোকে খাচে ॥

কাথা — তে বুঝিলো মড়ল, তুইত ভাই তামানে জানিস আজি তোর ভোজি মরিবার বার তের বছর হয়গেল, আজি আরহ নায়া করিয়া ফম পড়েচে। তে মড়ল গোরু বাচুর খন খালালা ভোল করে দেখিস। আর মুই কনেক একখান জমি গোল মাল লাগিচেতে ঐ তাতে মুই কনেক জলপাইগুড়ি যাসু চল চল মোক কনেক ঝুলুংগিরা আনিদে।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### দয়াল সিং আর চালাকিশ্বরী

চালাকিশ্বরী — কৈতেরে, এত খানে পাছালোতে।

দয়াল — আরে ভাই যাসু যাসু। এতয় ধোদোর খোদোর লাগালোতে।

চালাকিশ্বরী — তোমহা মরদ লোকলা কে নং সাটাং সাটাং করে বেড়াবে লাগে। তুই মোক পিটায় ঝাটায় আনিবোকি। মোকে আরহ তোক টানিয়া আনিবা লাগেচে।

দয়াল — লে, লে হইচে কি কভা ডাকালোতে।

চালাকিশ্বরী — এইত্য, লেদি, বাউরা কুন্ঠে গেলতে। এলাও নাই

দয়াল — তোর বেটা তুই জানিস, কুন্ঠে যাসে না যায়।

চালাকিশ্বরী — কাজে কাজে উডা খালি মোরে বেটা তোর কি নাহায় ছুয়া ডাক তকনেক হাক ডাক ও নাদিস তুইতে কেনং ছুয়ার বাপ।

দয়াল — হাকডাক দিমকি। মোর হাক ডাক মানিলেতে। ডাক নাতে ডাকা।

চালাকিশ্বরী — বাউরে বাউ, এ বেটা

(শক্ত সিংয়ের প্রবেশ)

শক্ত — এই খালি ডাকা ডাকি। কি তায় ডাকাচিত তে আই।

চালাকিশ্বরী — বাবুরে, তুই এলা এতয় চঞ্চল মতি হয়া গেলোরে। ঘরত এখেলায় বাওয়ে বান্ধিস না।

শক্ত — এহে আঈ ঐলা কাথা মোক একদমে কহিসনা, মুই বাপের মাকে মুখে এক কিনায় বেটা। তমারলা বহিতে মোর কি আর জ্বালা চিন্তা। হ্যাঁ কোহোদি কিতায় ডাকালো।

চালাকিশ্বরী — ডাকানু কিতায়, এইযে আসরটাত আইচ্চি, এইঠে হামার চিনা পরিচয় দিবা লাগে। লে লে (নমস্কার) মোর নাম বাগে চালাকিশ্বরী, (এইডা মোর হালুয়া) (দয়ালক দেখায়) আর এইডা মোর বেটা (দেখায় দিয়া) (নিজা নিজি নাম কয়হা চিনা পরিচয় পর্ব সমাধা)

শক্ত — আঈ মোর আর টাইম নাই। মোর দোসর না মোর তানে বাচিয়াছে। মুই রাতি করে আসিম। আসিম নাই নাই। মোর তানে ভাত টাত থুবার দরকার নাই। মুই একেবেলায় কালি আসিম গেনু বা - (বাবাক উদ্দেশ্য করিয়া) প্রস্থান।

চালাকিশ্বরী — এই ছুয়াডা মোর কেনং তে হবে। এত বড় হয় গেল এলাও আর খেলার ধুনডায় গেলনি। তে শুনেচিসনাতে, তহকি কামত যাবনি?

চালাকিশ্বরী — কি কামত জামাগে মোক ও কুনোলা কামে হাতোত আসেনা।

চালাকিশ্বরী — আরে তে'র লাখা লোকলা রিকসা চালাচে লেবারি করেচে আর তুই ঘরের হালখানও বড়ুবা না পারিশ। তে এইবার মোর একটা কাথা শুনিস।

দয়াল — তোর আরহ কাথা ছে নাকিতে, কোহোদি কোহোদি।

**চালাকিশ্বরীর গান**

ঘসা — আজি হিতি আইসেক কাথা শুনেক ওরে স্বামী
ওহোরে কাম কাজের তোর নাইরে ধান্দা আলসিয়া
খালিতোর বেড়ানির গিসা।

চিতাং — স্বামী নামের করেছিত হাল গিরস্তি
বেড়াবা পারিলে মন হয় ফুর্ত্তিহি।
স্বামী বিচার নাইরে তোর
নামের খালি ভাতার হোলো মোর।

চালাকিশ্বরী — কাথা তে ভাই শুনিলো নাতে। তোমা দুই বাপ বেটাক ধরিয়া কত কাচাল করিম। তে তুই ঘরোত রহিস, মুই কনেক পিসাই ঘর যাও দি, পিসাইটা মোক কিছু দিবা চাহিচে।

দয়াল — আচ্ছা যাদি, মুই ঘরতে ছু।

**তৃতীয় দৃশ্য**

**(জোতদারের প্রবেশ)**

জোতদার — মড়ল, মড়ল — এ মড়ল, লোকটা সেই যে গেইল! (মড়লের প্রবেশ)

মড়ল — হ্যা গিরিদা আসিলো তাহালে।

জোতদার — হ্যারে লোকলা কায় কুত্তি গিসন তেরে, মহলডা এখেলে ধাই ধাই হয় গিসে, মাইরা কইতে, কুত্তি গিসে।

মড়ল — কেই জানি ভাই, কুত্তিতে গেল, চেংরি মানছি, একেলায় আর কতয় এই মহলডাত রোহবে। তে গিরিদা তুই এত তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া আসি দোল?

জোতদার — হ্যা তাড়াতাড়ি কাম হয়া গেল তাতে চলিয়া আসিনু ত হ্যারে মড়ল, হামার পছিম বাড়ির ঐ পরজারা তো মেলা করজা বাকি পইচ্চে নারে?

মড়ল — কায় ঐ তোমার কি কহচে দয়াল নাকি নাম জানি হুডাতো আলছিয়ার যম। যে নাকে কানে একেনা বেটা, হুডা তো কুন কামেরে নাহাঁয় ঐ মায়াডার জোরে খালি লোকটা বাচিয়াছে।

জোতদার — তে মড়ল একটা কাম করা তুইয়া, অমহার ঘর যায়া বাকি করজা বাবদ, থাপাবো একদম লিয়া সোজা চলি আসিবো।

মড়ল — গিরিদা, কোথারাত কোহোলো, বেলে যেইলায় পাবো সজায় লিয়া বলি আয়, আমহার ঘরটাত ছে কিডারে, অত কিছু রোহোলে কি আরহ করজা বাকি থয়, তুই বুনা অমহার করজার আশা বাদ দে।

জোতদার — ও: হো তোর আরহ কুন্ঠে কার ময়হা খান উথলিয়া উঠিলতে। ঐনং ছেরিয়া দিলে না মোর জোতদারি আস্তে আস্তে রসাতল যাবে। যা, যেই ডাকোহনু ঐডা করেকদি।

মড়লা — মুই আরহ কিতায় জোতদার হবা যামরে। মানে কহিচিনু কি আমদার ঘরত জোরকরে আনিবার মত কিছুই নাই।

জোরদার — তে ছে, না নি ছে, যায়া আগত দেখিবো ত।

মড়ল — ঠিকছে মুই তাহালে এলায় যাচু। (প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য

### চালাকিশ্বরীর প্রবেশ, হাতে আধাবস্তা ধান

চালাকিশ্বরী — কইরে, লোকটা কুন্ঠে গেলোতে।

দয়াল — হ্যা, আসি গেলো ঐলা আরহ কি লাতে।

চালাকিশ্বরী — ধান লারে, ধানলা। পিসাইটারঠে আনিমু। (এমন সময় মড়ল)

মড়ল — এ...দা, দা রে, ঘরত ছননা? নাইগে ভোজি?

চালাকিশ্বরী — এই অ'লছিয়া, যাত আগে দুয়ারে কায় ডাকাচেরে।

দয়াল — ধেত তেরিকা কায় উডা ক্যাত ক্যাত করে চ্যাচাচে কায়রে, ও মড়ল, কিরে আজি আরহ কিমনে করিয়ারে হামার ঘর আসিলোরে। আয় আয় বস। দেখরে কায় আসিচে।

চালাকিশ্বরী — কিরে মড়ল, হটাত করে তুই ..

মড়ল — হ্যাঁ ভোজি হটাত করিয়ায়। আচ্ছা কহদি তমহার করজা কতলা বাকি পইচ্চে।

চালাকিশ্বরী — সেইরাত ভাই হয়, কিন্তক মুই ক্যানং করে মেটাম কোহোদি? তোর দাদারাত ঠিক করে গিরস্তিয়ে করিবা নাপায়।

মড়ল — সেই বাত আর গিরিরা বুঝিবেনি,। দাদারা নাপারে দাদার পারর বেটারাত ছে। উডাওকি নাপারে

চালাকিশ্বরী — বেটারার কাথা কহচিত, অয়ত আজি তিন চাইর দিন হাতে, ঘর আসে না। চেহরগরা মানছি কুন্ঠে কুন্ঠেতে ভাই বেড়াচে।

মড়ল — এই দেখ মুই তমহার ঐলাকাথা শুনিবা আসুনি। তমহাক গিরিদারা আজিয়া করজা মেটায় দিবা কহিচে।

দয়াল — কুন্ঠে পায়া দিমতেরে। খানি কোহোলে হয় যাবে।

মড়ল — ঐলা মুই বুঝু না। মোক যেইটা কয়হা পেঠাইচে ঐটায় মুই কহচু। এইলাকি এইলা।

চালাকিশ্বরী — এইলা ধান লারে ওহো পিসাইটা ভুকুবা দিলা। এলায় করে আননুকে যায়া।

মড়ল — মুই তাহলে এই লায় তাহায় লেগানু।

চালাকিশ্বরী — ঐলা ধান কিতায় লেগাচিত তেরে মড়ল। ঐলা হামার নাহায়রে।

মড়ল — মুই হুলা বুঝুন' কেনং লোক তমহাগে দুই বছর হয়া গেল এলাও করজালা মেটান না। মোক মালিকের হুকুম মানির হোবে ভাই। মুই এইলা লিয়ালেগেছু।

চালাকিশ্বরী — তমহা গরীপের দয়া মায়া দেখন নারে, হামাযে কেনং করে দিন কাটেচি ঐডাত তমহা কি বুঝিবন। চলদি মহ তোর সতত গিরিঘর যাম।

মড়ল — যাবা পারিস। তাতে মোর কুন আপত্তি নাই। মুই তাহালে গেনু।

চালাকিশ্বরী — ঐ মড়ল, শুনরে মড়ল একটা কাথারে মড়ল, মড়ল থামা নাতে কনেকরে।

মড়ল — তমহার ঐলা কাথার গুষ্টি মারু। এই বান্দা গেনু তমহার কুনো কহবার থাকিলে মালিকটাক যয়া কহন

চালাকিশ্বরী — অ'লসিয়া, শুন মুই গিরিঘর গেনু, তুই ঘরতে রহিস।

দয়াল — যাত যাত মড়লডা কনেক খোপে বাড়িয়ে গিসে। (সগারে প্রস্থান)

## পঞ্চম দৃশ্য

মড়ল — গিরিদা, গিরিদা

জোতদার — কি মড়ল আসিলো। সেলা কি পালোতে।

মড়ল — আর না কহিস, মারাত্তক লোক ভাই। খরদটা যেনতেন মায়াড়া আরো চাইর গুন। ঘরত বোলে কিছুই নাই এই একিনি ধান পানু, বস্তাটা সুদায় লিয়া আসিচু। মায়াড়া বধায় মোর পাছুতে আসি বা ধরিচে নাকি তে কায় জানে।

জোতদার — আসোকত অমহার চালাকিটা ছুটায় দিম মুই আজি। চালাকি আগদুয়ার হাতে।

চালাকিশ্বরী — মড়লডে মড়ল।

মড়ল — ওই ডাক শুরু হয় গিসে। গিরিদা, কহনু তে ও দেখ কহিতে কহিতে চলয়ায় আসিল। কায়। ও ভোজি। আয়া আয়। গিরিদারা ঘরতে ছে। গিরিদা, ওহো ভোজিরা তোর দেখা করিবা আইচ্চে।

চালাকিশ্বরী — নমস্কার গিরিদা

জোতদার — নমস্কার কোহোদি মাই কি কভা আসিলো

চালাকিশ্বরী — গিরিদা আরকি কোহাম হামার অবস্থাত দেখায় পাতিত। আজি মড়লডা যায়া বাহেচার ধান লা মুই পিসাই ঘর তকা আনিনু। ঐলা ধান জোর করি লিয়া আসিল।

জোতদার — দেখেই মাই মড়লডা কিছু অন্যায় করেনি। অক মুইহে কয়হা পেঠাইচু। আর তমহা কেনং লোক মাই. করজা খায়া এলা দিবার নাম নাই। আজি আর বছর তকা করজা বাকি পরিয়াছে তমহার কি কনেক্ক হুস গিয়ান নাই

চালাকিশ্বরী — কেনং করেদি মত গিরিদা আরবছর হাতেতে আবাদে হয়না। মালিক টা হামার আর আগের মতন খাটিবাও পারে না। আর বেটারাতে ঘরতে রহেনা মুই একে লায় আর কয়তি সামুলিম কোহদি। চিন্তায় চিন্তায় মায়া মানছি হয়া মোর, ছেহারায় হেস হয় গেল। হামারতি কনেক দয়া করেক গিরীদা। তুই ছাড়া হামার আর কায় ছে কোহোদি।

জোতদার — বুঝিনু বুঝিনু মাই। কিন্তুক মোকোত জোতদারি চালাক হচেনা। তমহার লাখাযদি সগায় কহে, সেলা মোর জোতদারী খান কি হবে কোহোদি। আচ্ছা তুই যা মুই দেখেচু

চালাকিশ্বরী — গিরিদা ধনলা।

জোতদার — ওঃ ধান লাও লেগাবো। লেগা লেগা এতলা চলিয়া গিসে এই কিনিতে আর কি হবে। মড়ল দিয়াদেরে দিয়াদে।

মড়ল — লেগাগে ভোজি লেগা, মোর খালি উভায় আননত্তায় সার হোল।

চালাকিশ্বরী — মুই তাহালে গেনু গিরিদা, উত্তি হামার আলছিয়া রাতে কি করচে কায় জানে। আজি মুই ভগবানডাক আবধনা করেচু হামার গিরিদারা যেন আরহ গিরি হয়। (প্রস্থান)

মড়ল — ক্যানং তেরে, গিরিদা? লোকটা খারায় সরম খারায় গরম হচিত্। মুইত তোর মহিমালা কুনয় বুঝা পাউ না।

জোতদার — বুঝা পারনিরে মড়ল পাবনি, মোর মনডায়ে কি চাহাচে সেইরা মুইহে না বুঝু। হিত্তি আয়, আগত মোর একটা কাথা শুনেকদি।

মড়ল — (আসরের তি দেখিয়া) "আজি হামার গিরি দারার মনডা কি ভানি হইচে। ছট হাতে মানছিহনু হিনং কুনোদিন দেখুনি"। আচ্ছা গিরিদা কোহোদি কোহোদি কাথা কভা চাহাচিত।

জোতদার — তাহালে শুন। (জোতদারের গান)

ঘসা — মড়ল তোর ভোজি মরিয়া যায়া খাবার হামার নাইরে সুখ। ওরে বেটি রাক বেচেয়া খালে হবে বার সুখ।

চিতান — মড়ল মনে করিচু বড়য় আশা। রাখিস কিনা রাখিস কাথা। হা তোক সাজিবা লাগিবেরে মড়ল জোর বোজোর কারহা।।

মড়ল — হিরা আরহ ক্যানং কাথা কহচিত তে। মুইত কনয় বুঝা নাপাউ জোর বোজোর কারহা? কি ব্যাপ'রে কোহোত।

জোতদার — তোক কুন বুঝিবা নালাগে, তুই এলায় যেইঠে একা আসিলো। সেইঠে ঘুরিয়া যা।

মড়ল — সেইঠে? মানে ওই আলছিয়া ঘর কিতায়রে।

জোতদার — কি কোভো এত্তি আয় তোক মুই তামায়লায় শিখায় দেসু।

(দুইজনারে প্রস্থান)

## ষষ্ঠ দৃশ্য

চালাকিশ্বরী — কইরে আলছিয়া। ঘর-বাড়িলা ছেড়িয়া কুত্তি গিসেতে।

দয়াল — হ্যাঃ আসিলো কি কোহোলো যায়া গিরিদারাক ঝাড়ন দিসিত নাতে। ওঃ অয় গিরি হইচেতে কি হইচে। আর হিসাবে হামা এখেলে মানছিয়া নাহই।

চালকিশ্বরী — না হায় রে আলছিয়া, গিরিদারা খোপ ভাল লোক। এই দেখনা মোক ধান লা খুরায় দিল, আরহ কোহোল যদিলাগে তাহলে তুই যায়া চাহালেই করজা দিয়া দিবে।

দয়াল — হ্যা হয়নকি! ধেত তাহায় তে মুই নানান জাতি করে গালি দিবা ধরিচু। তাহলে তুই ধানলা ভুকা। মুই কনেক তাহায় দিন কাটু বেড়ায় আসু।

চালাকিশ্বরী — তোর আরকি খালি নাই কামের বেড়ানি।

দয়াল — এহে খালি যাম আর আসিম। (প্রস্থান)

চালাকিশ্বরী — এই দন বাপ বেটাক লিয়াতে আর কত কাচাল করিম ভগবান। মোর মরণও না হয়। (এমন সময় মড়ল।)

মড়ল — কিতায় মরি বা চাহাচিত গে ভোজি তোর আরহ কি দুখ পালু।

চালাকিশ্বরী — কায়রে মড়ল তুই আরো কি তায় আসিলো রে। গিরিদারা কি কুন কয়হা পেঠাই চেরে।

মড়ল — হ্যা হ্যা কয়হা পেঠাইচেরে? চালাকিশ্বরী কোহো নাতেরে মড়ল চুপকরে কি তায় রোহোলো তেরে মড়ল।

মড়ল — সেই ওগে কভাও মনায় না, নাকোহোলো হয়না।

চালাকিশ্বরী — কি কাথা তেরে মড়ল

মড়ল — আচ্ছা তোরতে খোবে দুঃখ কষ্ট না?

চালাকিশ্বরী — হ্যা ঐডাত দেখায় পাচিত কিতায়?

মড়ল — আচ্ছা তো মনডা কি চাহেনা যে ভাল ভাল খাউ, ভাল করে কনেক সাজিয়া বেড়াউ।

চালাকিশ্বরী — ভাল ভাল খাবা আরহ কার মনডা নাহেরে। চাছালেইকি পুয়া যায়। আচ্ছা তুই এই লাকাথা কি তায় পুছেচিত কোহোদি

মড়ল — মানেছে নাতে। আচ্ছা, তুই যদি সেই নং সুখ পাইস তাহলে ক্যানং হবে।

চালাকিশ্বরী — তাহালেত ভালয় হয়। আর কষ্ট করিবার আর মনায় না মন ডাকহচে কুন্ঠে গেলেতে কনেক সুখ শান্তি পাউ।

মড়ল — (আসরের তি দেখিয়া) (হ্যা এইবার আইচ্চে লাইনত) হ্যা হ্যা মুইতে ঐটা কাথায় কভা চাহাচু সাহাসে না পাতি।

চালাকি — কি কাথারে মড়ল ?

মড়ল — ঐও ঐডায়, তুই যাবো না নাই।

চালাকিশ্বরী — কুন্ঠে যামরে?

মড়ল — কিতায়, হামার গিরিদারার বাদেগে, ঐতা কাথায় শুনিবা পেঠাইচে মোক, তুই কি কহচিত?

চালাকিশ্বরী — গিরিডার মাথা খারাপ হয়নি ত রে মড়ল।

মড়ল — মাথা খারাপ আরহ কিতায় হবেগে, এলায় ক্যানং দেখিয়া আসিলো? মাথা খারাপের লাখাকি?

চালাকিশ্বরী — আঃ মোকে দেখিয়া বধায় মাথারা খারাপ হইচে নারে মড়ল?

মড়ল — মাথা খারাপ নাহায়গে ভোজি, মনডা খারাপ হইচে। জানিসকে গিথ্যা নিরা মরিবার আজি কতলা দিন হোল। তাতে ...

চালাকিশ্বরী — তাতে আজিয়া মনডা উসাংসাং হইচেনা। গিথ্যানিরা কিতায় মইচ্চে জানিস, ঐত মহার গিরিডার চলন দোস্তরে। তমহার চখুত শির নাইরে, ঐলার তানে কি তমহা গিরি হইচনরে।

কি পাইনে তমহারে তমহার করজাখাচি বাদে কি তমহা যেই কভেন হামা সেইখানি লিমরে তুই এলহায় নিকিলায়। মোর মহল একা না হলে মুই তোক ঘাড় ধাক্কা দিয়া নিকিলায় দিম এলহায়। হারামজাদা লুচ্চা কুত্তেকার।

মড়ল — ঠিকেছে বুঝন। (প্রস্থান)

চ'লাকিশ্বরী — হায় ভগবান মুইত নানাগ জাতি করি গালি দিনু এলাত কি হয়। নাঃ মুই আগত হামার আলছিয়ার'ক ডাকায় আনু। (প্রস্থান)

## সপ্তম দৃশ্য

মড়ল — গিরিদারে, গিরিদা আজি মুই অক ঝাড়িম বাপরে। তোর দিয়া মোক অপমান হবালাগে।

জোতদার — হই মড়ল আসিলো। সেলা কি খবর।

মড়ল — কি খবর। হবর ঝবর। বাপরে, মায়াডার তাও খান কি জানিস না ভাই, তোর কাথা ধরিয়া আজি মোক একটা মায়ার হাতে অপমান হবা লাগিল। তুই মোক তামান কামাত পেঠাইস, এই নং কামতা পাঠাইসনা। জানিস, মোক একেলে হারাম জাদা টারাম জাদা কয়হা জাত বংশ উটকিয়া শেষ করে দিল।

জোতদার — হয় নাকি। ঠিকেছে এর ব্যবস্থা মুই এলহায় লেসু। কারণ তোক অপমান করা মানে মোক অপমান করা। তুই যাত হামার বাড়ির ঐ দারাসিং টাক ডাকায় আনেক।

মড়ল — দারাসিংহ মানে ঐ ছেচেরা চেংরাটাক। কি তায়রে গিরিদা।

জোতদার — আচর হ্যাঁ হ্যাঁ কিতায়তে মুইজানু তুই যাত তাড়াতাড়ি।

মড়ল — ঠিকেছে মুই যাসু। (প্রস্থান)

জোতদার — এই লা লোকের এই একটা দোষ, ভালোবাসিলে তার মর্যাদা দিবা জানে না। রহিস মাই, তোর মুই মাইরের কাম ঘুসাত করেচু। এই তুচ্ছ একটা পরজা হয়া মোক অপমান।

মড়ল — লে গিরিদা ডাকায় আনিনু।

দারাসিং — তুই মোক ডাকালো গিরিদা।

জোতদার — হ্যাঁ বাউ ডাকানু মোর একটা কাম করে দিবা হবে। আর তার বাদে তো কমুই ভাল পুরস্কার দিম।

দারাসিং — কি কাম গিরিদা?

জোতদার — কামছে নাতে, মড়ল তহ এইতি আয় তো কনেক থানা যাবা হবে।

মড়ল — থানা? কিতায় গিরিদা।

জোতদার — দুই জন এইতি আস। মুই তামান বাতায় দেসু।

### অষ্টম দৃশ্য

### থানা

### কনস্টেবল এবং দারোগা বাবু মধ্যে কথাবার্তা

### এমন সময় মড়ল

মড়ল — নমস্কার দাদা কনেক ভিতরত যাম। বড় বাবু আছে।

কনস্টেবল — কায়রে মড়ল নাকি। কি তায়রে

মড়ল — আরে কনেক কামছে রে একটা ডাইরি করিবা আসিনু।

কনস্টেবল — ওঃ আচ্ছা। যা যা

মড়ল — নমস্কার (বড় বাবু) সার (স্যার)

দারোগা — আরে মড়ল নাকি? কি ব্যাপার বলুনতো আপনি হঠাত।

মড়ল — হ্যাঁ সার মালিক আমাকে পাঠায় দিলো আপনাকে লেগাইতে।

দারোগা — আমাকে নিয়ে যেতে, কেন কি হয়েছে?

মড়ল — মানে মালিকের বাড়িতে চুরি হইচে ত, ঐ চোর ধরিবার জইন্য।

দারোগা — কিঃ চুরি! জোতদার বাবুর বাড়িতে। চলো চলো কনস্টেবল, ঘর বন্ধ করে আমার সঙ্গে চলো।

কনস্টেবল — আজ্ঞে স্যার।

### নবম দৃশ্য

মড়ল — আসেন সার আসেন। গিরিদা লে ডাকায় আনিনু।

জোতদার — নমস্কার বড়বাবু।

দারোগা — নমস্কার নমস্কার, শুনলাম নাকি আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছে?

জোতদার — হ্যাঁ বড় বাবু

দারোগা — আচ্ছা কি কি নিয়ে গেছে?

জোতদার — ব্যাপারটা হচ্ছে চোর একে বারে আমাদের যে টাকা পয়সা এবং দুই মা মেয়ের সোনা দানার বাক্সটাই নিয়েগেছে।

দারোগা — আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো অনেক টাকার মাল নিয়ে গেছে। আচ্ছা জোতদার বাবু আপনার কি কারো ওপরে সন্দেহ হয়?

জোতদার — আজ্ঞে সেটা হচ্ছে আমারই এক প্রজা দয়ালসিং আপনি এখনি যান হয়তো মাল পত্র তার বাড়িতেই পেতে পারেন বমাল তাকে ধরা যেতে পারে। আপনি একবার তার বাড়িতে সার্চ করুন।

দারোগা — আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের একটু বাড়িটা দেখে দেবেন?

জোতদার — নিশ্চয়। মড়ল, যাত বাড়িডা দেখায় দেনে।

মড়ল — ঠিকেছে গিরিদা, আসেন সার আসেন। দারোগা পুলিশ ও মড়ল প্রস্থান

জোতদার — এই বারে দেখিম মাই, তুই ক্যানং চালাকি। (প্রস্থান)

## দশম দৃশ্য

### চালাকি ও দয়াল

দয়াল — তোককি আজি আরহ মোক ডাকাবো যাবা লাগে।

চালাকি — ঐ ওরে। তম্‌হা দনবাপ সেটায় দুইতি পালাচন, আর মোর উপর দিয়াতে কত দুন বাতাস বয়হা যাসে ঐডা আর কায় বুঝে।

দয়াল — লেলে আজিকালি নাই দুন বাতাসা যা আগত কনেক চাহা বেনায় আন, অমারতি মোক তুই গড় গড় দুধ চাহা খান খাবা দিল্লোনি।

চালাকি — আচ্ছা তুই বস মুই চাহা বা নাচু। (ভিতরত যায়া) হারে আলছিয়া হিরা আরহ কিসের 'বাসকে'রে। ক্যানংকরে আসিলরে।

দয়াল — বাসকো? কিসের বাসকোগে দেখু দেখু। হ্যাঃ ক্যানং করে আসিলগে। না ভাই বাউরা আনিয়া থুইচে?

চালাকি — কেই জানি ভাই। মোক কিন্তু ভাই ভয় লাগেচেরে।

দয়াল — ভয় ও ভাই মোকো লাগেচে। কি করিমতে?

চালাকি — নাকি ভাই কুনঠে নুকায় থুমো?

দয়াল — এত বড় জিনিসটা কুন্ঠে নুকায় থুবোগে? (এমন সময় দারোগা)

দারোগা — দয়ালসিং বাড়িতে আছো? দয়ালসিং।

দয়াল — হৈ বাহেরাত কায় আর্‌হ ডাকাচে। যাতোগে মোকভাই খোবে ভয় লাগেচেরে।

চালাকি — রইস মুইছে দেখচু। দারগা পুলিশ আইচ্চেরে।

দয়াল — পুলিশ এলাকি হোবে রে মুইতে আর দাড়াবার পারুনারে।

চালাকি — তুই এইত্তি রহিস, মুই যাসু। নমস্কার বাবু কি ব্যাপার আপনি হটাত আমাদের বাড়িতে।

দারোগা — এটাকি দয়াল সিংয়ের বাড়ি।

চালাকি — হ্যাঁ বাবু।

দারোগা — দয়ালসিং বাড়িতে আছে।

চালাকি — আছে বাবু।

দারোগা — আমরা তোমাদের ঘর সার্চ করবো। কনস্টেবল দেখোতো ঘরে মাল পত্র কি কি আছে।

কনস্টেবল — এই যে স্যার ঘরের মধ্যে খালি এই বাক্সটা পাওয়া গেলো।

দারোগা — আচ্ছা বলোতো এই বাক্সটা কার? তোমাদের নাকি। কি হল চুপকরে আছো কেন? বাক্সটাকি তোমাদের

চালাকি — আমাদের না বাবু।

দারোগা — তাহলে এটা তোমাদের বাড়িতে কি ভাবে এলো?

চালাকি — আমরা জানি না বাবু আমরা কিছুই জানিনা।

দারোগা — কিছুই জানে না বললেই হবে, বেটা চুরি করার আর জায়গা পাওনি শেষে জোতদার বাবুর বাড়িতে ' কনস্টেবল, বেটাকে বেঁধে নিয়ে চলো।

দয়াল — তোমার দহাই লাগে বাবু, মোক ছেড়ি দেও বাবু, মুই চুরি করুনি বাবু, মোক ছেড়ি দেও।

দারোগা — ছেড়ে দেবো। চলো থানায়, তারপর তোমাকে শায়েস্তা করব। কনস্টেবল চলো।

দয়াল — যাছু ভাই। তুই বাটরাক ধরিয়া তাড়াতাড়ি মোক আনিবার ব্যবস্থা করিস।

চালাকি — তাহলে ভাই যাবার আগত মোর একটা কাথা শুনিস। (চালাকির গান)

ঘসা — ও কি ওরে প্রাণ সওয়ামী নিদয়া।
হয়া তুই যাবো, ওরে সাধের আড়ি তুই মোক করিলো।

চিতাং — আজি যদি নারী হোম মুই সতী
তব পদে রাখিম ভকতি
ঐ চরনে পাবো গতি।

চালাকি — যাভাই যা মুই তামান বুঝা পাইচু, এইলা তামান লায় শয়তানের চক্রান্ত। মুই যে কুনো বারকারে হোক তোক তাড়াতাড়ি ছুটায় আনিবার ব্যবস্থা করিম। (দয়ালক নিয়ে দারোগা পুলিশের প্রস্থান।)

চালাকি — হায় ভগবান, এইলা কি পাকত ফেলালো। ঠিকছেরে জোতদার, তুই মোর পাছত লাগিচিস্‌ত। মহ দেখিম তুই কতদুর। (এমন সময় মড়ল)

মড়ল — হাগে ভোজি একেলায় একেলায় কি চিন্তাক রচিততে দেখদি আজি কি হয়গেল। এইলা দেখিয়া ভাই দুঃখ লাগেচে এলা কি কোহোঝে কোহোদি?

চালাকি — রে মড়ল তুই মোর কাটা ঘাওয়াত নুনের ছিটা দিবা আসিলো না?

মড়ল — নাহায় গে নাহায়। মুই তোরে খবর সবর নিবা আসিনু, মানে এলা একেলায় আর কত্‌দিন এইনং করে রোভে। তার বাদে কহিচিনু ...

চালাকি — আর কভানালা মরল। মুই তামানে বুঝা পাইচু। তে মড়ল তুই একটা কাম কর। তুই গিরিদারক হামারতি আসিবা কোহো, মোর মনের কাথালা মুই অকে খুলিয়া কোহোম

মড়ল — আচ্ছা, এইনং কোহো, তাহালে না কাথারা বসে। ঠিকেছে ভোজি, মুই এল্‌হায় যায়া গিরি দারাক কহচু।

চালাকি — পাল্ল আজিয়ে আসিবা কহিস হাঁ।

মড়ল — আচ্ছা আচ্ছা তাহালে তুই বস ভোজি মুই উঠিনু।

চালাকি — আচ্ছা। (মড়লের প্রস্থান, শক্ত সিংয়ের প্রবেশ)

শক্ত — আঈগে অ'ই, বাবুরাক বোলে পুলিশে জেহেল ধরিয়া লেগাল কিতায় আঈ

চালাকি — কিতায় অ'রহ। চুরি করিলে কাজে জেহেল যাবে।

(মুখ ভারি করিয়া)

শক্ত — কি, চুরি ক'বুরা না, না, আঈ হামার বাবুরা কুনদিন চুরি করিবা পারেনা।

চালাকি — পারেনা, ক্যানং করে ধরা পড়িলতে। তুই বেড়াবো তোর তালে বাপ মাও লাকি খাচে না খায় কুন খোজ খবর রাখেচিস। যা যা বেড়া, মহ এইবার মোর দিশা দেখিম।

শক্ত — দিশা, কিসের দিশা দেখিবো আঈ?

চালাকি — কিসের দিশা আরহ, মুই কি একেলায় ফোথোক থোক করে বসিয়া রোহম।

শক্ত — কিতায় কুন্ঠে যাবোতে?

চালাকি — কুন্ঠে যামরে, মোর কি যাবার জাগার অভাবছে, গিরিডার বাদেয় ঘর ঢুকি যাম।

শক্ত — অঃ এলাহানে বুঝা পানু ঐ তার তানে তমহা যুক্তি করিয়া বাবুরাক চুরিকেসত ফাসায় দিয়া জেহেল ঢুকালন। তোক কি কনেক অ লাগেনা আঈ, এইলা তোক বহু বেসাবালাগে আর এলাতুই এই নং কাম কবা চাহাচিত, ছে ছে ছে।

চালাকি — মুইতে এলা বহু বেসেবার চাহাচু বাবু। তুইতে লোকটা ঘরত বাওয়ে নাবান্ধি সনা।

শক্ত — তাহালে কি তায় পালাবা চাহাচিততে।

চালাকি — শুনবাবু মাও যদি চাহাচিস, তাহালে তোক বুদ্ধি ধরিয়া হবে, তাহলে মুই তোক কইনা জুড়িয়া দিম ধরিবোত?

শক্ত — কইনা জুরিয়া দিবোত? ঠিকেছে, তাহালে, কোহোদি কি করিবা লাগে মোক।

চালাকি — ঠিক করে ধরিবোত?

শক্ত — হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক করেয় ধরিম।

চালাকি — তাহালে তুই এলা যা হ্যাঁ। রাতি করে ঘরত তোক মুই তামান বুদ্ধি লা বাতায় দিম।

শক্ত — ঠিকেছে তাহালে মুই গেনু। (প্রস্থান) এমন সময় জোতদার আর মড়ল

মড়ল — ভোজি গে ভোজি, এহে দেখ কায় আইচ্চে।

চালাকি — ও গিরিদা আসিলো তমহাকতে মুই কুন্ঠে বসিবাদিম

জোতদার — না লাগে মাই নালাগে। শুনিনু তুই নাকি বোলে - মোকে আসিবা কোহিচিস। তে কোহোদি তোর কি কাথা কভারছে।

চালাকি — আচ্ছা গিরিদা, মড়লডা যেইলা কাথা কহচে, সেই লাকে তুইহে কভা কাহিচিত?

জোতদার — ও মড়লডা তাহলে তুই মোর একটা কাথা শুনিস।

জোতদার — আচ্ছা কোহোদি।

চালাকির গান

ঘসা — গিরিদাদারেহে, শুনেক মোর মনের কাথা হা ওরে তোরে উপর বড়য় করিচু আশা।

চিতান — দাদা হাতত নাই মোর হাতের চুড়ি হি
গলার মালা কানের সোনা
আজি তুই বিনা মোর কায় আর আছেরে আপন জনা।।

জোতদার — দ্যাখ মাই যেই লা কাথা কোহোলো এইলার বাদে তুই কুনয় দিনা যাবো ঐডা কোহো

চালাকি — মোর আর এলহায় কি অবলায় কি। তবে মোর কিচু শর্ত্তছে, সেইলা যদি তমহা মানিয়ালন।

মড়ল — ওগে কি লাগে, ঐলা কোহোনা, শত্ত টত্ত হুলা বাদদে।

জোতদার — এ মড়ল অমহা মায়া মানছি একঠে হাতে আর একঠে যাবে। কাজে অমার সুবিধা অসুবিধা রভায় পারে। আচ্ছা মাই কোহো তোর কি শত্ত?

চালাকি — মোর আর কি শত্ত। মানে, মোরত গাহেনা পাতি কিছুই নাই, আর এলা মুই যেহেতুক একটা গিথ্যানি হোম, কাজে মুই মহলগেত ঢুকিবার আগতে মোক চুরি, মালা, মাখিরি, ঠেংগের তরা, এইলা মোক আনিয়া দিবা হবে। নাহলে কিন্তু মুই মহলত ঢুকিমনি।

জোতদার — আচ্ছা, এইলাত ঠিকেছে, কুন চিন্তা নাই। তুই তাহালে কুন্‌দিনা যাসিত কোহোদি।

চালাকি — কুনদিনা কি, আজিয়া ভোরে ভোরে মুই ঐ হেলা কঠাল গাছটার তলত রোহোম। তমহা একঝন আসিবন। হবে?

মড়ল — হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহালে কাথা হয় গেল, আজি রাতি ভোরে ভোরে। হামাগেন তাহালে।

চালাকি — তাহালে, ঐ লা কিন্তুক মোক দিবা হোবে।

জোতদার — আচ্ছা, আচ্ছা, চল মড়ল। তাহলে এনং কাথা রোহোল। (প্রস্থান)
মড়ল তাহালে তুইহে আসিবো।

চালাকি — তুই দেখিস ভগবান। (এমন সময় শত্ত সিং।)

শক্ত — আঈ, আঈ কাহছে নাকি? আঈ।

চালাকি — কিরে বাবু আসিলো।

শক্ত — হ্যাঁ আঈ, সেলা কি হোল? কইনা দেখিলো?

চালাকি — হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিচু, তাহালে মোর কাথা ছাচায় ধরিবোত

শক্ত — ছাচায় না হায়তে কি মিছায়।

চালাকি — আচ্ছা মুইতো যেই সাজাম তুই সেই সাজিবোত?

শক্ত — মোক আরহ কি সাজাবোতে আঈ?

চালাকি — কইনা দুলা, সাজাম, কইনা দুলা। যেইডা কহচু সেইডা শুনেকদি আগত। চল তোক মুই তামান শিকায় দেসু।

শক্ত — চলদি চলদি, তোরে বুদ্ধিরা ধরু আগত। (দুইজনের প্রস্থান)
(মাওয়ের শাড়ি পিন্দিয়া শক্ত সিং একটা কনত দাড়ায়।) (এই সময় মড়ল।)

মড়ল — ওঃ ভগবান, এইলাকি আর্‌হ মনাচে। আইচ্চে না নাই আর্‌হ হ্যাঁরে, অয় আর্‌হ আগতে হাজির। হয় হয়, গিথ্যানি হবার লোভকি আর্‌হ সামুলা যায়। হাগে ভোজি চল তাড়াতাড়ি নাইতে লোক দেখিলে খারাপ কোভে।

শক্ত — এলহানের মড়ল, মুই কৎখুন হাতে বাচিয়াছু। মোক কিন্তুক পিঠি করে লেগেবা হোবে।

মড়ল — হেল্লেদি, উঃ কি জ্বালাত পন্নুরে হায়। আয় আয়, ওঃ বাপরে এত ভারি কচ্চি তগে। লে নাম ভাই। ওঃ মোক হদরায় দিলো ভাই, চল ভিতরত চ।

শক্ত — মড়ল মোর কি শক্ত ছিলো। ঐলা মোক আগত আনিয়া দে দি।

মড়ল — ওগে তামান দিবে, তুই আগত ঘরের তি চলদি।

শক্ত — না ভাই। তাহালে মুই ঘুরিয়া যাসু।

মড়ল — রইস রইস, মুই আগত গিরিদাটাক ডাকাউ।

জোতদার — হ্যারে মড়ল আসিলো। কই আইচ্চে।

মড়ল — হ্যাঁ, হ্যাঁ আইচ্চে মহলেরতি আসেনা, আগত চুরিমালালা চাহাচে। না হলে আসিবেনি বোলে।

জোতদার — আচ্ছা তুই একটা কাম কর। মাইড়াক ডাকা, গাহেনা পাতিলাতে সিন্দবাত রোহোল। আপাতত মাইরার মালা খানে পিন্ধায় দিয়া ঘরেরতি আন।

মড়ল — আচ্ছা। মাই মাই। বেটি দুলালি। কনেক উঠিকতা।

দুলালি — কি ব্যাপার কাকা আজি হটাত এত সাকাল সাকাল মোক ডাকা বা ধরিচিত।

মড়ল — চুপ চুপ, আস্তে। এই তি শুন। মানে হচে কি, তোর বাপটা কইনা আনিচে। তে অক এক খান মালা লাগে। তাড়াতাড়ি তোর মালা খান দেত অক খালি ভিতর মহলত আনি।

দুলালি — আঃ বাবারা মোর মাও আনিচে। ঠিকেছে, এইনে কাকা, যা মোর মাও ডাক ধরি আন। (মালা খুলায় দিল)

মড়ল — এইলে, তোর মালা, পিন্দেক, তাড়াতাড়ি চল।

শক্ত — মুই কি নিজে পিন্ধিম, পিন্ধিয় দেও।

মড়ল — দে, মুইহে পিন্ধায় দেসু।

শক্ত — হারে মড়ল, তুই কি মোক বেহা করচিত। তাতে তুই পিন্ধায় দেসিত? মাইরাক আসিয়া পিন্দায় দিবা কোহোনা।

জোতদার — কিরে মড়ল। কি করচিত তে।

মড়ল — আরে মায়া মানছিলাক ধরিয়া মহা কাচালরে। মালখান লেগায় দিনু। সেলা বোলে পিন্দায় দেও। মোর হাতে আর না পিন্ধে কহচে তুই কি মোক বেহা করছিত।

জোতদার — আরে মড়ল, তোরে মাথারা খারাপ হইচে, আরে মাইরাক কোহোনারে পিন্ধায় দিয়া

ভিতর মহলত আনোক।

মড়ল — মাই দুলালি। যাত, তোর নায়া মাওরাক মালাখান পিন্ধায় দিয়া ঘরেরতি লিয়া আয়।

দুলালি — ঠিকেছে কাকা, দে মোক মালা খান (দুলালি শক্ত সিং এর গালাত মালা পিন্দায় দিল) আর ঘরোতি লিয়া আসিল।

জোতদার — রে মড়ল, ঘোঙোরটা ফেলায় দেনা তেরে।

মড়ল — সেইত্তরে, এভোজি এলা ঘোঙোরটা ফেলাত। মড়ল নিজে ফেলায় দিল হে, বাউ তুই। গিরিদা সর্বনাশ। হো হো দেখ। এইকা কায় আসিচে।

শক্ত — মুই বাবা মুই। তোমার কুনয় চিন্তা নাই

জোতদার — কি বাউ, তুই যদি ভাল জানিস তে এহঠে তত করা চলিয়া যা নাহলে, মুই তোক পুলিশের হাতত দিয়া দিম।

শক্ত — যাম যাম, মুইত রভার বাদে আসুনি, তবে মোর গালাতায় মালা খান দিসে। তাক মোর সঙ্গে দিয়া দিলই মুই চলি যাসু।

জোতদার — দেখ বাউ, ফালতু রাও কাড়িসনা। যাতরে মড়ল, পধ্যান ডাকায় আন।

মড়ল — আচ্ছা, মুই যাসু আর সঙ্গে সঙ্গে লিয়া আসেচু

জোতদার — আচ্ছা বাউ। তোক কি লাগে কোহো। কিন্তুক তোক এইঠে তকা চলি যাবা হোবে।

শক্ত — মোক কিছুই নালাগে, খালি মোর মালা খানের গতি হয় গেলেই মুই চুপচাপ ঘরের পাখ পথ ধরিম। তমা ঘুঘু দেখিচন, ফান দেখননি। এইবার তমহাক মুই ফান দেখাম, (এমন সময় পধ্যানক লিয়া মড়ল।)

প্রধান — আরে হইচে কিরে মড়ল। তুই মোর সুখের নিনডা ভাঙি দিলো মড়ল। তুই আসিবোত বিরাট চুড়া লাগিচে। গিরিদা লে পধ্যানডা আসি গিসে।

জোতদার — নমস্কার দাদ।

প্রধান — নমস্কার নমস্কার, কি ব্যাপার এত সাকাল সাকাল হাটাত?

জোতদার — ব্যাপারটা হোল কি। এই চেংরাডার মাও, হামার ঘরত আসিবার কাথা। মোক কাথাও দিয়া দিসে। কিন্তু অক বোলে মহলত ঢুকিবার আগতে চুড়ি মালা লাগে। ত এলা দেখা যাসে ব্যাপারটা দসরা পাখে চলি যাসে।

প্রধান — তার মানে।

শক্ত — তার মানে এই দেখা মোর গালাত আমার বেটি মালা পিন্দায় দিসে।

জোতদার — এ বাউ। তুই চুপ করে রোভো। মড়ল আন্‌ত একখান পেন্নাঠি অক আগত ডাংঘায় নিকিলায় দিই। তারপর

শক্ত — বাঃ মোক মাইর দিবন? তাহালে একটা কাথা শুন। (শক্ত সিং এর গান।)

ঘসা — ওগে না করেন মোক মারা ডাংগা
ভগবানডা আছে শুয়াই।
ওগে ভাঙ্গিয়া কোহিলে কাথা।
হোম তমহারে জুয়াই।

চিতান — ওগে তমহা হচেন মায়া ভুতা, মায়ালা তোক।
এমন মায়া সাজায় আনিলো,
জুয়াই বেসালো মোহোক।
ওগে আসিচে পরধান দাদাডা বিচার করিয়া দোক।

শক্ত — এইবার কহ পধ্যান সাহেব বিচার টা কানং হোবে?

প্রধান — ব্যাপারটা ত গুরুতর। আচ্ছা গিরিদা তুই কি চাহাসিস?

জোতদার — মুই চাহাচু মানে ব্যাপারটা যাহাতে বেশী দূর নাযায়। অক কিছু টাকা পাইসা দিয়া দেসু, অয় যাহাতে চুপকরে চলি যায়।

প্রধান — আচ্ছা। এলা তুই কোহোদি বাউ, তুই কি কহচিস?

শক্ত — মুই, মুই মোর গালার মালা খানের গতি নাহলে আর যাসুনি। তমহা জানেন না পধ্যান সাহেব, মোর মাও ডাকলিবার তানে। অমহা মোর বাপটাক বিনাদোষে জেহেলের ভাত খিলাইচে আর অমহাক মুই ছেড়িয়া কাথা কোহোম।

প্রধান — গিরিদা আর ভাই উপাই নাই। তোক এই ব্যাপারটা মানিয়া লিবায় হচে। কারণ মকত আইন কানুন মানিয়া চলিবা হচে। আর ভাই ব্যাপারটা যত বাড়াবো ততয় খারাপের পাখে যাবে তুই এইডা মানিয়া চল।

জোতদার — দেখিলো মড়ল, ব্যাপাট্টা কুন্তি হাতে কুন্তি চলি গেল। তুই কি কনেক দেখিস কনি রে ভাল করি।

মড়ল — কায় জানে তেরে, অয় এত খান চালাকি করিবে।

শক্ত — তাহলে পধ্যান সাহেব, আর একটা কাথা। মোর বাপ টাক আজিয়ে জেহেল হাতে ছুটায় আনিবা হোবে।

প্রধান — হ্যাঁ গিরিদা এলা ভাই তমহার নিজেরে মইধ্যে। তুই ভাই এলা মড়লডার হাতে এক খান চিঠি দিয়া থানা থেকে কেসটা অঠায় লে।

জোতদার — হ্যাঁ, আর কি করা যাবে।

প্রধান — তাহালে গিরিদা মুই এলা আসু।

জোতদার — আচ্ছা পধ্যানদা তাহালে আয়। (প্রধানের প্রস্থান)

শুন বাউ, এলা যা হবার হইচে, মুই মড়লক ডাক দিয়া তোর বাপক ছটায় আনাচু। তবে, আজিকার এই ঘটনারা হামা এই চাইর জন ছাড়া আর যেন কাহ না জানে।

শক্ত — আচ্ছা বাবা, কাহ জানিবেনি জানিলে, মোরোত লাজ না হাজার হোলেও শ্বশুর বুলিয়া কাথা।

জোতদার — তাহোলে তুই বাউ এলা যা, তুই তোর মাও বাপক লিয়া অমুক দিনা হামারতি আসন, সেই দিনায় মুই মোর বেটিক তোর হাতত সম্প্রদান করিদিম।

শক্ত — আচ্ছা বাবা।

জোতদার — মড়ল এইত্তি শুন, তোর উপর মোর মন্ডা যেনং করচে না। সেইডা মুইহে জানু। যা থানা যায়া বড় বাবু ডাক কহিস যে, গিরিডা এই কেসটা অঠায় লিসে। এলা তমহা দয়ালক ছেড়ি দেও। বুঝিলো। আর অক তোর সঙ্গে লিয়া আসিস।

মড়ল — ঠিকেছে গিরিদা। মুই তাহালে গেনু।

জোতদার — যা তাড়াতাড়ি যা (উভয়ের প্রস্থান)

(শক্ত সিং এর প্রবেশ।)

শক্ত — আঈ গে আঈ, ঘরত ছিত না নাই। আঈ।

চালাকিশ্বরী — কিরে বাবু আসিলো, কি খবর যেনং কহিচু সেনং করিচিস ত ফের

শক্ত — হ্যাঁ হ্যাঁ, আই তুই যেনং কহিচিত, সেনং য়ে করিচু। এহে দেখনা অর বেটি মোক মালা চন্দন করিচে।

চালাকিশ্বরী — ধেত হয় নাকি, সেলা কি হোল।

শক্ত — আর কি হোবে, পধ্যান ডাক ডাকায় আনিল। অয় দেখিয়া শুনিয়া হামারে পাখে রায়ডা দিল। শুন আঈ, আজি মড়ল কাকাড়া বাবুরাক ছটায় আনিবে। হামা সেলা আমুক দিনা যায়া তোর বহু ডাক ধরিয়া আনিম।

চালাকিশ্বরী — দেখিলো বাবু, মুই কোহোনু না, মোর বুদ্ধি ধরলে তোক বহু বোসয় দিম।

শক্ত — হ্যাঁ আঈ, ছাচায়, ঐ তানে তোর নাম থুইচে তোর বাপটা চালাকি। তোর লাকা বেটি ছুয়া হোলেত কুন চিন্তায় নাই। চল আঈ, মড়ল কাকাডা থানা যাবে হামাও যাই।

(প্রস্থান)

(মরল ও দয়াল সিংয়ের প্রবেশ।)

দয়াল — কি ব্যাপারতেরে মড়লা তমহায় থানা ঢুকাচন, আরহ তমহায় ছুটায় লেখাচিন।

মড়ল — আরে আয়না, তোর কপাল খুলি গিসে বুঝিলো, তুই এলা গিরিডার বেহাই। কাজে, তোক আরহ থানাত রাখা যায়?

দয়াল — বেহাই? কি কহচিত তুইরে। ক্যানং করেহ।

মড়ল — আরে হামার গিরিদার বেটিরা তোর বেটাক মালা চন্দন করিচে। অহ দেখ, তোমার ভোজিরা আর বাউটাও আসিগিসে।

(চালাকি আর শক্ত সিংয়ের প্রবেশ)

চালাকিশ্বরী — কিরে মড়ল তুই ছটায় লিয়া আসিলো।

দয়াল — বাবুরে কি ব্যাপার রে মড়লডা মোক যেইলা কোহোল গিরির বেটিটা তোক বোলে মালা....।

শক্ত — হ্যাঁ বাবু। এই দেখনা মোর গালাত এলাও ছে মালাখান।

চালাকিশ্বরী — হামার বেটা বড় কাম করে দেখায় দিসেরে আলসিয়া।

দয়াল — আরে, কার বেটা ঐডা দেখিবোত। তেবাবু বউ মাডাক কতদিনে আনিবোত।

শক্ত — হামাক অমুক দিনা যাবা কহিচে বাবু। ঐ দিনা যায়া তোর বহু ডাক লিয়া আসিম। চলচল,

(প্রস্থান )

(জোতদার আর মড়লের প্রস্থান)

জোতদার — মড়ল, আজিত অমহার আসিবার কাথা না? তুই একটু খবর লিসিত?

মড়ল — হ্যাঁ গিরিদা অমহা আসিবা ধরিচে। কিন্তু মাইরাতে খোপে কান্দেচেরে। সেলা ক্যানং হবেতে।

জোতদার — কি হারেরে। মুইতেছু। অর চিন্তারা কিসের। এইলা জাগা জমিন সয় সম্পতি তামানলায় তারে হোবে।

(এমন সময় দয়াল, চালকিশ্বরী আর শক্ত সিংয়ের প্রবেশ)

শক্ত — কই বাবা ঘরত ছন না নাই।

জোতদার — আছি, বাবা, আছি। আইস, আইস বেহানু। বস মড়ল যা মাইডাক আসিবা কোহো।

মড়ল — আচ্ছা মাই, মাই দুলালি এইতি আয় মা তোর বাপটা ডাকাচে।

দুলালি — কি কাকা। আইচ্চু, চল বাবা তুই মোক ডাকালো?

জোতদার — হ্যাঁমা, তুইত তামান লায় জানিসমা, আয়মা আজিহাতে তোক মুই এই শক্ত সিংয়ের হাতত তুলি দিনু, আর তুই তোর মনডাক শক্ত করে বান্ধিয়া বাপের নাম অঠায় সংসার করিয়া খাবো। (সম্প্রদান)

দুলালি — তাহালে বাবা তুই মোর একটা কাথাত নিস।

জোতদার — কোহো মা, একটা কিতায়, তোর মুই হাজারটা কাথা শুনিতে রাজি আছু। (দুলালির গান)

ঘসা — বাবা এতয় দুঃখ দিলেনগে অন্তরে
হি বড় কেলেংকার রাখিলেন গে সংসারে।

চিতান — বাবা লাইক্ষ লাইক্ষ জুড়ি মিলে।
লাইক্ষর উপর পদীপ জ্বলে,
বাবা গো, সুখ শান্তি মোর হোবে কুন্ কালে।

জোতদার — দেখমা, আজি হাতে এইলা ঘরবাড়ি সয় সম্পতি তামানলায় তোর। তুই নিজে এইলা দেখা শুনা করিবো। আর বাবু বেহাই বেহানি তমহার ঐডা বাড়িত ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া সগায় এইঠে আসিয়া রহন, আর মড়ল, তুই আগত যেনং ছিলো তেনংয়ে এই জমি জিরাইতলা দেখা শুনা করিবো। আর মুই এলা কনেক তীর্থ ভরমন করিবা যাসু। আর সংসার ভালো লাগেনা। কয়রা দিন কনেক ঘুরিয়া আসু।

দুলালি — বাবা মুই সেলা ক্যানং করে রোহোম বাবা?

জোতদার — কিতায় ম'? বাপের বাড়িডাত বেটি ছয়ার নিজের বাড়ি নাহায়। তুই স্বামী পালো, শ্বশুর শাশুড়ি পালো, তোর কিসের অসুবিধা মা, তুই এলা স্বামী সংসার লিয়া সুখে খা, মোক আর আটকাইস না। মড়ল এইতি শুন। মুই গেনু দেই এইলা দেখিস।

।। মিলনের গান ।।

ঘসা — মিলন হইলোরে শুন দশজন।
ওরে লোভের কারণে শাস্তি দিলোরে নারায়ণ।

চিতান — ওরে দশের পায়ে পরনাম। আসিচি ভাই তমহার ধাম।

খাস পাঁচালী পালা হামার, রাণীডাঙ্গা জাগার নাম।
ওকি ওরে পরার মন্দ করিয়া সুখী হৈচে কুন্‌বা জন্‌।
ধর্ম পথে চলিলে দেখিবে নারায়ণ।

---

সংগ্রহসূত্র

এই পালাটিয়া লোকনাটকটি শিলিগুড়ি মহকুমার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড়মোহন সিং জোতের অমরচন্দ্র সিংহের সাহায্যে সংগ্রহ করেছি। অমরচন্দ্র সিংহ পালাটিয়ার অভিনেতা এবং লোকসঙ্গীত শিল্পী। তাঁদের নাট্যানুষ্ঠান থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে এই লোকনাটকটি। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন আঠারখাইয়ের রঙ্গিয়া নিবাসী লোকসংস্কৃতি বিষয়ের বিশিষ্ট লেখক নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়।

## মান পাঁচালী

## দস্যু কন্যা কালিন্দী

**চরিত্রগুলির নাম ঃ**

১। রাজা ঃ প্রেমানন্দ

২। মন্ত্রী ঃ কিষণলাল

৩। দারওয়ান ঃ সত্যয়ন

৪। রানী ঃ পূর্ণিমা

৫। যুবরাজ ঃ সতানন্দ

৬। দস্যু ঃ রঙ্গলাল

৭। সঙ্গী ঃ মোতিলাল

৮। কালিন্দী ঃ দস্যু কন্যা

৯। ভিখারী ঃ রমনাথ

১০। কন্যা ঃ বন্দনা

১১। জঙ্গলের দস্যু ঃ গাজী

বন্দনা (গান)

ঘষা — তোমায় ডাকি হে ওহে দেব নারায়ণ।

এসো এসো দেব পঞ্চানন।

চিতাং — আমি সংকটে পড়িয়া ডাকি হে দেব নিজ জ্ঞানে।

কর পার তুমি দীনের বান্ধব হে। ওহে চিনিনা তোমায়।

চিতাং — আমি তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না জানিগো দেব।

এসো গো আনন্দেরও নন্দন তুমি।

দীনের বান্ধব হে, ওহে ভলা মহেশ্বর।

(রাজা-মন্ত্রী উভয়ের প্রবেশ)

রাজা — কিষণলাল আমি জানতে চাই এ বছর এত কম খাজনা আদায়ের কারণ কি ? গত পাঁচ বৎসর হয়ে গেলো কিন্তু তার খাজনা কথায় ?

কিষণলাল — মহারাজ, এই ক্ষুধার দিনে না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে খাজনা দেবে কি করে মহারাজ, তার

উপর রমনাথ ভিখারী গত কয়েক বৎসর ধরে খরায় জমিতে ফসল ফলাতে পারছে না, খাজনা দেবে কি করে মহারাজ।

রাজা — তাহলে এমনি ভাবে রাজকর কম আদায় হলে রাজ কার্য চালাব কি করে। দাও সংবাদ যত ভিখারীগণে, সপ্তাহ দিনের মধ্যে যেন খাজনা হাজির করে রাজ দরবারে নতুবা আমি নিজেই যাইবো, যাও। চাই চাই ধনি দরিদ্র নির্বিশেষে সবারে রাজকর বুঝিয়ে চাই। জানাও রাজ্য মধ্যে আদেশ আমার (প্রস্থান)।

কিষণলাল — খাজনা খাজনা, কথায় দারওয়ান —

(সত্যয়ন - দারওয়ানের প্রবেশ)

দারওয়ান — হাজির মন্ত্রী মহাশয়।

কিষণলাল — যাও জানাও রাজ্য মধ্যে ধনী গরীব নির্বিশেষে সবাই যেন খাজনা হাজির করে রাজ দরবারে নতুবা মহারাজ নিজেই যাইবেন, যাও।

দারওয়ান — যথা আজ্ঞা মন্ত্রি মহাশয় (প্রস্থান)

কিষণলাল — খাজনা খাজনা এই ক্ষুধার দিনে মানুষ মারা যাচ্ছে খাজনা দেবে কি করে তার উপর রমনাথ ভিখারী কিছুতেই খাজনা প্রদান করিতে পারিবে না, না তার কন্যাকে না হয়, না দেখা যাবে (প্রস্থান)।

(রাজা ও মন্ত্রি প্রবেশ)

রাজা — কিষণলাল আর কতদূর সেই রমনাথ ভিখারীর বাড়ি।

কিষণলাল — এই যমুনা পার হলে, তারপর আসুন মহারাজ।

রাজা — চল তবে (উভয়ের প্রস্থান) (কাখে কলসী নিয়ে রমনাথ ভিখারীর কন্যা, বন্দনার প্রবেশ)

বন্দনা — একি হায় বেলা যে, অনেক হয়ে গেল এখনত এল না আমার বান্ধব, না যাই যমুনায় স্নান করে আসি রান্না করে দিই বাবা হয়ত ভিক্ষায় যাবে।

(গান) — আশার দেহারে হে
ভাসিবে কি আশার সাগরে
ঐ ফোটা ফুল রবে কি চিরতরে।

চিতাং — আজি নারীর জীবন ফলের সমান। দুই দিন পরে ঝরি যাবে, কালারে - এসো এসো ওরে কালা ও মোর এসো ঐনা ফলে। প্রাণ কালা রে - ওরে আমার।

বন্দনা — না, না, কিষণলাল দাদার তো আসার কথা, না সে হয়ত চলে গেছে ভুলে, যাই ফিরে আপন ঘরে।

(এমন সময় রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা — কে, কে তুমি কাহার কন্যা করে ছিলে কি গান সুমধুর কণ্ঠে।

বন্দনা — নাম আমার বন্দনা। রমানাথ ভিখারীর কন্যা, করে ছিলাম বটে গান মনের দুঃখেতে - একি কিষণলাল দা।

মন্ত্রী — এই আমাদের রাজা, বন্দনা।

বন্দনা — প্রণাম ভাই, মহারাজ আসি - এখন।

রাজা — না, না যাওয়া তোমার হবে না, আচ্ছা পার কি ঐ ছন্দের একটা গান শোনাতে?

বন্দনা — না, মহারাজ আমি তা পারব না।

রাজা — পারবে না - হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা বন্দনা এখনও সময় আছে বল পারবে কি না ঐ ছন্দে একখানা গান শোনাতে।

বন্দনা — (হাটু গেরে হাত জোড় করে) না মহারাজ পারব না আমি গান করিতে। আর করে ছিলাম সেই গান মনের দুঃখতে আমায় ক্ষমা করে দিন মহারাজ।

রাজা — ক্ষমা - হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা কিষণলাল, বন্দনাকে বন্দী করে লয়ে এসো রাজ প্রাসাদে সেথায় করিবে গান শুনিব আমি প্রাণ ভরে। (প্রস্থান)

কিষণলাল — (বন্দনাকে বন্দী করে) বন্দনা, তবে চল, আমি রাজার দাস। তবুও রাখিও হৃদয় মাঝে, আমি থাকিতে তোমার সতীর সতিত্ব হরণ করিতে পারিবে না কেহো। আমি আছি পশ্চাদে তোমার। (উভয়ের প্রস্থান)

(সত্যয়নের প্রবেশ)

সত্যয়ন — আহা হা, এইবার লাগিল ল্যাঠা, এক শিকারে দুই বাঘা বাঘ। শুধু অভাগা মুই দারওয়ান টা আ-হা। (প্রস্থান)

এদিকে যথা সময়ে বন্দনা বাড়ি না ফেরাতে তার বাবা যমুনার দিকে বন্দনার খোঁজে রওনা দেন।

(রমনাথ ভিখারীর প্রবেশ)

রমনাথ — বন্দনা - বন্দনা - ওরে মা বন্দনা আজ তুই কোথায়

(এমন সময় সত্যয়নের প্রবেশ)

সত্যয়ন — ঐ পাগোল তোর কহানা আজি ভালই হইচে তোর বন্দনা নাই, রাজার নিকট গেছে বোধয় কোপাল ফুলিল রাজ রাণী বুঝি হইল। (প্রস্থান)

রমনাথ — কি - কি, আমার বন্দনা রাজ রাণী এযে কিছুতেই হতে পারে না - মা বন্দনা - মা বন্দনা।

(প্রস্থান)

(রাণী পূর্ণিমা ও বন্দনা উভয়ের প্রবেশ)

পূর্ণিমা — বল - বল মা তুমি কাহার কন্যা।

বন্দনা — আমি রমনাথ ভিখারীর কন্যা, মা মাগো দেহ মুক্তি আমায়, ঘরে রয়েছে বৃদ্ধ পিতা আমি, এমাত্র কন্যা, তার আমি বিহনে বাচিবেনা জীবনে, আমায় মুক্তি দাও মা, তুমিত নারী), বুঝ কি না নারীর ব্যাথা আর কি বলিব মাগো আমি।

গান

ঘষা — ওকি ওগো নারী তুমি বল বল আমারে ওগো নারীর ব্যাথা কেবা গো বুঝে।

চিতাং — ওগো জননী ওগো কেমনে রাখিব ও ধর্ম আমি, ওগো পরেছি দুস্যুর কবলে হে, তুমি নারী বল গো মোরে হে বুঝিবেনা ব্যাথা নারী নাহলে।

পুর্ণিমা — কেঁদনা কেঁদনা মা, থাকিতে পূর্ণিমার জীবন কেহ না পারিবে সতীত্ব তব করিতে হরণ, চল রাজার নিকটে গিয়ে দেখি।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা — না, না পূর্ণিমা যেতে তব ঐ মম পাশে, এসেছি আমি তব বাক্য শুনিতে বল তুমি কি বলিতে চাও।

পুর্ণিমা — বল, বল মোর রাজা বল মোর আরধ্য দেবতা কেন রাজ্যের রাজা হয়ে নারীর লাঞ্ছনায় হয়েছ উন্মুক্ত, জান না কি স্বামী, যেথায় এক বিন্দু নারীর চোখের জল ঝরিয়ে পরিবে, সেথায় ধ্বংসের আগুন জ্বলে উঠবে, ওগো স্বামী আমি করি মিনতি মুক্তি দাও অনাথ ভিখারীর কন্যায়।

রাজা — ধ্বংসের আগুন হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা এই কে - কে আছিস (সত্যয়নের প্রবেশ)

সত্যয়ণ — হাজির মহারাজ।

রাজা — নিয়ে যাও বন্দনাকে পাষাণ কারাগারে কর আবদ্ধ। আগে করি রাণীর বিচার তারপর বন্দনা।

(সত্যয়ন বন্দনা কে বন্দী করে নিয়ে উভয়ের প্রস্থান)

রাজা — শুনো পূর্ণিমা তুমি স্বামী বিদ্রোহিনী নারী, তোমার মত নারী কে রাখিলে বংশ ধ্বংস মোর

হবে অচিরে যাও, আজি হতে তরে করিলাম বিসর্জন, কে - কে আছিস।

(সত্যয়ন-এর প্রবেশ)

সত্যয়ন — প্রণাম মহরাজ।

রাজা — যাও রাণী পূর্ণিমাকে দিয়ে এসো জনহীন কাননে নির্বাসন।

রাণী — আমার নির্বাসন, উঃ স্বামী কি কথা বলিলেন আমায়, আমার নির্বাসন সামান্য এক ভিখারীর মেয়ের জনা আপন নারীকে দিবেন বনবাসে ওগো স্বামী আজি করি মিনতি। আমায় ক্ষমা করে দিন মহারাজ কেমনে থাকিব রাজার দুলালী হয়ে।

গান

ঘষা — ঐ তোমায় ছাড়া হয়ে - এ - হে কেমনে থাকিব ঐনা বিদেশে ক্ষমা কর স্বামী আমার রে।

চিতাং — আজি রাজার দুলালী আমি কেমনে থাকিব ঐনা বিদেশে কোন প্রাণে দিবেন বনবাসে।

রাজা — সেই প্রাণে পূর্ণিমা করেছিস ইচ্ছার বিরোধিতা, সেই প্রাণে তকে যেতে হবে চিরনির্বাসনে।

(যুবরাজ সতানন্দের প্রবেশ)

সতানন্দ — একি একি মা কেন কান্দে বাবা।

রাজা — ওরে বাবা সতনন্দ তোর মা করেছে তোর বাবারা ইচ্ছার বিরোধিতা। জীবন প্রতিজ্ঞা আমার তাঁর দণ্ড আজ চির নির্বাসন।

সতানন্দ — মায়ের নির্বাসন একি, একি বাবা দিয়োনা বনে কেমনে থাকিবে রাজার দুলালী হয়ে।

রাজা — হ্যা — হ্যা — হ্যা — রাজ আজ্ঞা কভু না হবে অন্যথা।

সতানন্দ — বাবা তবে দাও বিদায় আমারে আমিও যাব মায়ের সনে আমিও হব বনবাসী।

রাজা — যাও, যাও তবে, কাহারো চাহি না আমি, তবু রাজ আজ্ঞা না হবে অন্যথা কে - কে আছিস।

( কিষণলালের প্রবেশ )

কিষণলাল — প্রণাম মহারাজ।

রাজা — যাও মাতা পুত্রে দিয়ে এসো জনহীন কাননে, চির নির্বাসনে পাষাণ পাষাণ আজ আমি রাজা প্রেমানন্দ পাষাণ (প্রস্থান)

পূর্ণিমা — উঃ চলে গেলে, চলে গেলে মোর প্রাণের দেবতা, বাবা সতানন্দ কেন তুই হলি পাগল।

সতানন্দ — মা-মাগো কেমনে থাকিব তোমায় ছাড়া গোরিয়সী, যাব মাতা যা হয় হবে কপালে।

পূর্ণিমা — তবে চল বাবা, বাবা কিষণলাল আর দেরি নয় বাবা, আমাদের নিয়ে চল বাবা।

কিষণলাল — হ্যা চল মা, আমার অপরাধ নেবে না মা, সত্যই বুঝিলাম এ রাজ্যে আর মঙ্গল নেই, মঙ্গল

নেই রাজলক্ষ্মী আজ হইল বিদাই (সকলের প্রস্থান)।

রঙ্গলাল ডাকাতের প্রবেশ

রঙ্গলাল — হাঃ হাঃ হাঃ, আমার নাম রঙ্গলাল ডাকাত এই কৌশলে বাড়ী বাড়ী দস্যুবৃত্তি করি আমি অর্থ উপার্জন করি। আমি কাহাকেও ভয় নাহি করি কিন্তু বেশ কিছুদিন হয়ে গেল কথাও একখানান ডাকাতি করতে পারছিনা কথাও কোনখানে পাইনা মা-কি আমার প্রতি হয়েছে নির্দয়। না-না-না কথায় কথায় মোতিলাল।

(মোতিলাল ডাকাতের প্রবেশ)

মোতিলাল — প্রণাম সদরি কি জন্য ডেকেছেন আমায়।

রঙ্গলাল — হে ডেকেছি এক সপ্তাহের মধ্যে যেন যে কোন এক জায়গায় আমার ডাকাতি করা চাই।

মোতিলাল — ডাকাতি ... হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা (দস্যু কন্যা কালিন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী — বাবা বাবা আমি স্বপ্ন দেখিলাম ঐ সীমান্ত পথে রাজ কুমার আর রাজরানী এসেছে বাবা।

উভয় ডাকাত —রাজ কুমার আর রাজরানী হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা

কালিন্দী — কিন্তু বাবা আমার মানসা মায়ের।

রঙ্গলাল — হে মা, মনে পরেছে মা মনে পরেছে মায়ের দ্বারে দিতে চেয়েছিলাম নরবলি তাই বুঝি মা মোর প্রতি হয়েছে নির্দয় ছুটে যাও মোতিলাল ঐ সীমান্ত পথে রাজ কুমারও রাজ রানীর সন্ধানে সত্যি যদি হয় নিয়ে এসো তবে মায়ের চরণে তারে করিব বলিদান।

মোতিলাল —প্রণাম সর্দার চললাম আমি ঐ সীমান্ত পথে রাজকুমার আর রাজরানীর সন্ধানে (প্রস্থান)

রঙ্গলাল — তুই ঘরে থাকিস মা আমিও চললাম ঐ বালক ও রাজরানীর সন্ধানে (প্রস্থান)

কালিন্দী — চাই, চাই, পিতা ঐ রাজকুমার কে চাই —

গান।

ঘষা — আমার জীবন রে - হে আশায় আশায় যায় দিন আমারে কি হবে - আমার কপালে।

চিতাং — আজি প্রেম রসে মানব জীবন ভাসে ভব সাগরে ঐ বিধিরে — এ ময়হা মানব জন্ম নারীর জীবন রে ওরে হায়-হায় রে (প্রস্থান)।

(গাজী দস্যুর প্রবেশ মদের বতল হাতে নিয়ে ও পান করতে করতে)

গাজী — হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা হামি এ জঙ্গল মে গাজী আছি, হামি এই জঙ্গলমে গাজী আছি - হামারা পিতাজি এক রেজাকা সাথ যুদ্ধ করতে করতে হেরে যায় আর হামি গোপনে পালায়ন করে চলে আসি আর গাজী দস্যু নাম ধারণ করে এই জঙ্গলমে বাস করি হামি কাহাকেউ ভয় নাহি

করি আর হামারী আসলি নাম গান্ত্রা নারায়ণ আছেরে। (প্রস্থান)

(কিষণলাল, রাণী পূর্ণিমা ও সতানন্দের প্রবেশ)

রাণী — বাবা কিষণলাল, আর কতদূর যাবে বাবা ফিরে যাও রাজ্যে জানাইয়ো প্রণাম স্বামীরে মোর।

কিষণলাল — যথা আজ্ঞা রাণী মা, মা আমার অপরাধ নেবেনা মা আমি চলে যাচ্ছি স্বরাজ্যে ফিরে। (প্রস্থান)

রাণী — বাবা সতানন্দ চল আর একটু এগিয়ে যাই বাবা।

সদানন্দ — মা আমি যে, আর চলতে পারছিনা মা, এই ক্ষুধার জ্বালায় চারিদিকে যে, অন্ধকার হয়ে আসছে, মা আমায় অন্ন দাও মা।

রাণী — বাবা সতানন্দ এই নির্জন বনে কথায় পাব ক্ষুধার অন্ন।

গান

ঘষা — একি বল রে বাছো তোর মায়ের সামনে মা হয়ে ধৈর্য্য ধরিবরে কে মনে।

চিতাং — বাচ্চা রাজধন কি ছাড়িলাম দেশে তোমায় হারা কি হব বনে।

সতানন্দ — মা, মা, আমি যে, আর পারছি মা আমায় একটু জল দাও মা (লুটিয়ে পরে)

রাণী — সতানন্দ ওরে, ওরে বাবা সতানন্দ জল-জল তুই একটু দারা বাবা দেখি লোকালয়ে কোথাও পুকুর টুকুর পাই কি না? (রাণীর প্রস্থান)

(মোতিলাল ডাকাতের প্রবেশ)

মোতিলাল — কথায়, কথায় সেই রাজকুমার কই (চারি দিকে তাকিয়ে) ঐ যে শিমল ভূমির উপরে বসে আছে সেই বুঝি হবে যাই, যাই তারে লয়ে — এই বালক চল আমার সঙ্গে।

সতানন্দ — কোথায় - কোথায় বাবা?

মোতিলাল — রঙ্গলাল ডাকাতের আশ্রমে।

সতানন্দ — না মাকে একা ফেলে আমি কেথাও যাব না।

মোতিলাল — যাবে না হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব (হাত দুটি বেঁধে) তবে এইবার চলে আয় বালক সেই রঙ্গলাল ডাকাতের আশ্রমে।

সতানন্দ — না - না আমি যাব না, কে কে তুমি, মা - মা আমায় রক্ষা কর, মা - আমায় রক্ষা কর।

(উভয়ের প্রস্থান ও রঙ্গলাল ডাকাতের প্রবেশ)

রঙ্গলাল — নিয়ে যা ও মোতিলাল তারে নিয়ে যাও।

(রাণীর প্রবেশ জল নিয়ে)

রাণী — কি - কি কারে নিয়ে যাচ্ছে সতানন্দ, সতানন্দ তুই বাবা কথায় - ওরে বাবা সতানন্দ।

রঙ্গলাল — হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা সে এখন রঙ্গলাল ডাকাতের আশ্রমে এবার তুমি ও চলে এসো রাণী তুমি ও চলে এসো রাণী তাই এসেছি আমি। (রাণীর হাত ধরে, জোড় করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে।)

রাণী — না - না আমি যাব ছেড়ে দেব ছেড়ে দে শয়তান তুই আমায় ছেরে দে ওগো কে কথায় আছ আমায় রক্ষা কর।

রঙ্গলাল — রক্ষা, হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা এই রঙ্গলাল ডাকাতের হাত থেকে তোমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

(গাজী দস্যুর প্রবেশ)

রঙ্গলাল — কে- কে তুমি।

গাজী — হামি তুহার বাবা জঙ্গলী সর্দার গাজী দস্যু আছি।

রঙ্গলাল — গাজী দস্যু যদি তুমি ভাল এখান থেকে চলে যা ও না হলে তোমার মুণ্ড মিশে যাবে এই ধরণীর ধূলায়।

গাজী — চুপ শয়তান হারামিকা বাচ্চা পরার নারী সে তু করেছিস লালসা তুহার লালসার সাথ মিটিয়ে দেব রে ায়তান তুহার অস্ত্র ধর।

রঙ্গলাল — তবে লেগে জা শয়তান (উভয়ের যুদ্ধ)

রঙ্গলাল — (হেরে গিয়ে) আচ্ছা এর হবে পূর্ণ প্রতিশোধ (প্রস্থান ডাকাতের)

গাজী — যা পালিয়ে বেচে গেলি শয়তান তবে চলে আয়রে বেটিরা হামারী আড্ডা পর।

রাণী — কিন্তু বাবা, আমার সতানন্দের কি হবে উপায় সে যে এখন ডাকাত রঙ্গলালের আশ্রমে।

গাজী — কি কি কাহার আশ্রমে।

রাণী — ডাকাত রঙ্গলালের আশ্রমে।

গাজী — হামি আছি বেটি হামি আছি এখন চাল আওরে বেটিরা হামারা আড্ডা পর আও (উভয়ের প্রস্থান)

(রঙ্গলাল ডাকাতের প্রবেশ)

রঙ্গলাল — মোতিলাল ওরে কোথায় আছিস, বাদ্য বাজীদের সংবাদ দে আজ নিশীপ্রভাতে মায়ের পূজা দিতে হবে নরবলি ওরে মায়ের পূজার জোগার কর।

(কালীন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী — বাবা, কোথায় সেই পূজার নর, কোথায় বাবা।

রঙ্গলাল — ঐ যে মা তাকে লৌহ কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছি মা।

কালিন্দী — আমি একবার দেখব বাবা আদেশ দাও।

রঙ্গলাল — এই যে, মা নেও চাবী দেখ খুব সাবধান যেন পালিয়ে যেতে না পারে খুব হুশিয়ার হুশিয়ার (প্রস্থান)

কালিন্দী — না, যাই দেখি সেই মোর স্বপ্নের দেবতাকে, যদি হয় সত্যি সেই স্বপ্নের মত সুন্দর তবে করিব মাল্য (প্রস্থান)

(সতানন্দের প্রবেশ; বন্দি অবস্থায়)

সতানন্দ — হায় ভগবান ছিলাম রাজকুমার আজ সামান্য এক ডাকাতের কাগারারে বন্দী আরও শুনেছি নাকি মোর হবে অবসান - উঃ আর হবেনা আর হবে না মোর বাচা, আর হবে না মোর মায়ের সঙ্গে দেখা, মোর শোকে মোরিবে জননীরে একি ছিল মোর ওরে, দারুণ বিধি।

গান

ঘষা — দারুণ বিধিরে এ বিধি একি লেখেছ আমার কপালে মৃত্যু কালে এ হে দেখা না হইল জননীরে।

চিতাং — ঐ মা গো মা আ - ওগো জননী কথায় আমি কথায় তুমি ... হি ... কেঁদনা কেঁদনা তুমি জননী হি আমি অধম হব আজি হি মারে বলি।

(কালিন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী — ওগো যুবক কথায় বাড়ী? কে তোর পিতা মাতা ? দিবে কি পরিচয় আমায় ?

সতানন্দ — কেন দেব না, নাম মোর সতানন্দ পিতা মোর প্রেমানন্দ প্রেমাগিরি রাজ্য মোর আজ ভাগ্য দোষে হয়েছি রাজ্যহারা, মাতা পিতা ছাড়া, জানিনা কি হবে অদৃষ্টে আমার।

কালিন্দ — তবে ঐ যে শোন চারিদিকে ধূম পরে গেছে অদ্য নিশিতে মায়ের পূজা, তাতে বলি হবে তুমি।

সতানন্দ — কি হবে কি হবে ওগো ডাকাত কন্যা কেমনে প্রাণ রক্ষিব আমি।

কালিন্দী — যদি সত্য কর মোর সঙ্গে, যা চাইব দিবে, তাহা রক্ষিলে প্রাণ তোমায়।

সতানন্দ — সত্যি সত্যি যদি পার মোর প্রাণ রক্ষা করিতে নিশ্চয় সত্য তব করিব পূরণ।

কালিন্দী — তবে এই কণ্ঠহার লহ গলে তোমার যখন করিবে বলি তখন বলিবে আমায় কর বলি ক্ষতি

নাহি, কিন্তু দস্যু গলে যে রহেছে মালা এই মালার কি হবে উপায়, তার পর আমি আছি — যাই এখন আমি মোর প্রাণের দেবতা। (প্রস্থান কালিন্দীর)

মোতিলাল ডাকাতের প্রবেশ

মোতিলাল — এই বালক চল স্নান করতে খানিক পরে মায়ের পূজা হবে তোকে প্রণাম করতে হবে।

(বালককে বন্দি করে উভয়ের প্রস্থান)

(এবার পূজা মন্ডবে ডাকাত রঙ্গলালের প্রবেশ সঙ্গে মোতিলাল, ও বালককে বন্দি করে প্রবেশ)

রঙ্গলাল — বাজাও বাজিগণ ঢং ঢং রবে, তবেই তো মায়ের মানস পূর্ণ হবে (হাটুগেরে রসে) মা, মা, ওগো নর মুন্ড ধারিণী আজ বার বৎসর পরে তব পদে পুষ্পাঞ্জলি মা। কর আশীর্বাদ পূর্ণ যেন হয় মানস কামনা আমার — এই বালক প্রণাম কর মায়ের চরণে।

সতানন্দ — হ্যাঁ, প্রণাম করিতে পারি, মা যদি নিজেই চায় আমার প্রণাম, তবে আমি নিশ্চয় দেব। কিন্তু দস্যু গলে যে রয়েছে মালা, এই মালার কি হবে উপায়।

রঙ্গলাল — দেখি, দেখি কার মালা (বালকের, গলের মালা হাত দিয়ে ছুয়ে দেখে) একি এ যে, মোর কন্যার কণ্ঠহার কথায় কথায় কালিন্দী।

কালিন্দীর প্রবেশ

কালিন্দী — বাবা বাবা এই যে আমি,

রঙ্গলাল — বালকের গলে ও কার মালা?

কালিন্দী — ও আমার মালা,

রঙ্গলাল — খুলে নে, খুলে নে মালা, মোর আদেশ পালন কর আর বার বছরের মায়ের মানস পুন্ন কর।

কালিন্দী — না, না বাবা যে মালা দিয়েছি এক গলে পারিব না খুলে নিতে।

রঙ্গলাল — কি? কি আমার আদেশ মানবে না শয়তানি খুলে নে মালা (চাবুক দিয়ে প্রহার)

কালিন্দী — উঃ আমার সিঁতির সিন্দুর মুছাইওনা বাবা।

রঙ্গলাল — ওরে, ওরে শয়তানি চতুরের সঙ্গে চতুরালী করেই আগে করিব সেই মায়ের চরণে বলি।

(অস্ত্রবের করে মেয়েকে কোপাতে যাবে এমন সময় গাজি দস্যুর প্রবেশ)

গাজি — হুশিয়ার হুশিয়ার রে শয়তান হারামজাদা তু কাহার সর্বনাশ করতে চলেছিল ?

রঙ্গলাল — কে, কে তুমি ?

গাজি — হামি তুহার বাবা আছি রে শয়তান, বোল বেটা কাহা হামারা মাই কা লেরকা সতানন্দ নাম আছে রে ?

রঙ্গলাল — না, না আমি তাকে দেব না।

গাজী — দেবে না তুহার বাবা দেবে বোল বেটা কাঁহা হায় হামারা মাইকা লেরকা, সতানন্দ কাঁহা হায় বোল।

সতানন্দ — এই যে, এই যে, আমি আমার আমার নাম সতানন্দ।

গাজী — তবে চলে আয়রে সতানন্দ হামারা সাত আর কই মাইকা বেটা আছে হামারা হাত সে ছেনিয়া লেবে।

(গাজীর সাথে সতানন্দ মিলে চলে যাবে এমন সময় রঙ্গলাল ডাকাত)

রঙ্গলাল — হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা ডাকাত সর্দার রঙ্গলালের হাতে থাকিতে তরবারী কে কাহারে কথায় নিয়ে যাচ্ছ, হুশিয়ার হুশিয়ার (তরবারি বার করে গাজীর দিকে এগিয়ে যাবে)

গাজী — হাম ভি ত্যায়ার হায়রে শয়তান তুহার অস্ত্র ধর, তোমার যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেবরে শয়তান হারামী কা বাচ্চা।

(দুই জনে তুমুল যুদ্ধ এবং যুদ্ধে রঙ্গলাল ডাকাত হেরে যায়)

রঙ্গলাল — উঃ আর যে, পারছি না।

গাজী — হুঁ, হুঁ, হ্যা হ্যা হ্যা, এবার চলে আয়রে সতানন্দ হামারী সাথ (গাজী সতানন্দকে নিয়ে যেতে থাকে এমন সময় কালিন্দী বলে)

কালিন্দী — ওগো আমার কি হবে উপায়।

গাজী — তু কোন আছিসরে লেরকী

কালিন্দী — আমি ঐ ডাকাত সর্দার রঙ্গলালের কন্যা।

গাজী — চুপ, হামি জানি রঙ্গলাল ভি সাধী নাই কিয়া হায় তু বেটি কোন আছিসরে।

রঙ্গলাল — শুন দস্যু সে আমার আশ্রিত কন্যা, সে সাগর দীপের গন্ধরাজের কন্যা, এক যুদ্ধে গন্ধরাজ রাজবংশ হয় ধ্বংস সেই সময় কৌশলে এনে দিলে তারেই পালন করে আমি নিজ কন্যা বলি।

গাজী — ওরে, ওরে আমিওতো সেই গন্ধরাজের পুত্র আমার নাম গান্ত্রানারায়ণ।

কালন্দী — দাদা, দাদা

(গাজী দস্যুকে জড়িয়ে ধরে কালিন্দী ও দাদার মিলন হয়)

গাজী — তবে শুন হে ডাকাত, তুহার দায় মুক্ত কর ও সম্পাদন কর তব কন্যা ঐ বালকের তরে।

রঙ্গলাল — আয়, আয় তো মা, আয়, আয় তো বাবা অদ্য হইতে দায় মুক্ত হই আমি।

(রাজকুমার সতানন্দ ও দস্যু কন্যা কালিন্দীর দুইজনের বিয়ে হয়)

গাজী — তবে, শুন হে ডাকাত হামিও শুনিয়াছি তোমার জামাই না কি ঐ প্রেমাগড়ের যুবরাজ সতানন্দের পিতা প্রেমানন্দ এক ভিখারীর মেয়েকে জোর করে করিবে বিবাহ, সেই সুযোগে আক্রমণ করে ঐ রাজধানী তারপর বসাতে হবে সতানন্দের সিংহাসনে তাহা কি পারবে ?

রঙ্গলাল — নিশ্চয় পারব ঐ প্রেমাগড়ের আক্রমণ। বল সবে সতানন্দের জয়, জয় সতানন্দের জয়।

(সকলের প্রস্থান)

(রাজা প্রেমানন্দ, মন্ত্রী কিষণলাল বন্দনাকে বন্দি করে নিয়ে ও
তাদের পিছনে পিছনে দারওয়ান সতায়নের প্রবেশ)

রাজা — বল বল বন্দনা, এখন হল না কি তোমার জ্ঞানের উদার। হবে তুমি রাজরানী তা কি তুমি বুঝো না। তোমায় পাবার আশায় আপন রানীকে দিলাম নির্বাসনে, বল বন্দনা হবে কি না রাজি বিয়ের প্রস্তাবে আমার।

বন্দনা — না, না বন্দনার এককথা ভিন্ন দুই হবে না মহারাজ।

রাজা — ভিন্ন হবে না — হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা (চাবুকের প্রহার) বন্দনা এখনো সময় আছে বল আছ কি না রাজী বিয়ের প্রস্তাবে আমার।

বন্দনা — না, না, মহারাজ আমি তা পারব না।

রাজা — পারবে না হ্যা - হ্যা - হ্যা - হ্যা (আবার চাবুকের প্রহার)

কিষণলাল — না, না মহারাজ একটা নিরীহ মেয়ের উপর বারবার এইভাবে অত্যাচার করা আপনার উচিত না মহারাজ।

রাজা — কিষণলাল মম প্রতি যদি হও অন্তরায়, তোমার মুণ্ড মিশে যাবে ধরণীর ধুলায়।

কিষণলাল — মহারাজ বন্দনার পিছনে যদি যায় প্রাণ, আমি প্রস্তুত মহারাজ কিষণলাল ধরিবে অস্ত্র।

রাজা — তবে চলে আয়রে শয়তান তোর ঐ যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দি।

(মহারাজ ও কিষণলালের তুমুল যুদ্ধ)

কিষণলাল — উঃ আর যে পারছি না।

(এমন সময় মতিলাল ডাকাতের প্রবেশ)

মতিলাল — হুশিয়ার হুশিয়ার শয়তান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (রাজা ও মতিলাল ডাকাতের যুদ্ধ)

মতিলাল — সর্দার, আমি যে আর পারিছ না সর্দার।

(রঙ্গলাল ডাকাতের প্রবেশ)

রঙ্গলাল — সামাল, সামাল, সামালরে শয়তান যদি তুমি ভাল চাও বন্দনাকে মুক্তি দাও না হলে জ্বালাব সারা রাজ্যে ধ্বংসের আগুন।

রাজা — ধ্বংসের আগুন, হ্যা - হ্যা - হ্যা আমিও নিরস্ত্র নই।

রঙ্গলাল — তবে প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য।

রাজা — তবে চলে আয়রে শয়তান।

(রঙ্গলাল ডাকাত ও রাজার যুদ্ধ)

রঙ্গলাল — কে কোথায় আছ উঃ আমি যে আর পারছি না।

রাজা — সত্যয়ন বন্দি কর সবাইকে ।

সত্যয়ন — যথা আজ্ঞা মহারাজ।

(কিষণ, মতিলাল ও রঙ্গলাল সবাইকে বন্দি করে —)

(ঠিক এমন সময় গাজী দস্যুর প্রবেশ)

গাজী — হুশিয়ার, হুশিয়ার শয়তান তু কাহার সর্বনাশ করতে চলেছিস্ হামি তুহার জানভি খতম করব-রে শয়তান।

রাজা — কে - কে তুমি ?

গাজী — হামি তুহার বাবা, বোল বেটা বন্দনাকে মুক্তি দেবে কি না আর যদি মুক্তি নাহি দেবে এই অস্ত্রাঘাতে তুহার জানভি খতম করব শয়তান, হারামজাদা বোল।

রাজা — রাজা প্রেমানন্দের হাতে অস্ত্র থাকতে কে কাকে খতম করে শয়তান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

গাজী — তবে আয়রে হারামজাদা তুহার যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দি।

রাজা — (যুদ্ধ করতে করতে) উঃ আর পারি না (অস্ত্র মাটিতে ফেলে দেয়)

(গাজী দস্যু রাজাকে বন্দি করে আর পূর্বেকার বন্দিদের মুক্তি দেয়। এমন সময় রানী পূর্ণিমা যুবরাজ সতানন্দ ও দস্যু কন্যা কালিন্দী সকলের প্রবেশ)

গাজী — এ রাজা বোল বেটা এ ভি তোর রানি আছে, এ ভি তোর পুত্র আছে আর এ ভি তোর পুত্রবধূ আছে বেশ তুতারে রাখবে কি না আর যদি নাহি রাখবে, তাহলে এহি অস্ত্রাঘাতে তুহার জানভি খতম করববে বেটা বোল।

রাজা — হে, হে, আমি নিশ্চয় রাখব, আয় আয় বাবা সতানন্দ বস্ সিংহাসনে, লহ সমস্ত রাজ্যের ভার, দেখ সুখে যেন থাকে প্রজাগণে।

(রাজা প্রেমানন্দ, যুবরাজকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজমুকুট পরিয়ে দেন)

সতানন্দ — আশীর্বাদ কর বাবা।

রানী পূর্ণিমা — আয় আয়তো মা আজ হইতে তুই এই রাজ্যের রানী, দেখ শুনে যেন থাকে প্রজাগণ। রানী পূর্ণিমা, দস্যু কন্যা কালিন্দীকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজমুকুট পরিয়ে দেয়।

কালিন্দী — আশীর্বাদ কর মাতা আশীর্বাদ কর বাবা।

প্রেমানন্দ — এমন সময় রমনাথ ভিক্ষারীর প্রবেশ।

ভিখারী — মা বন্দনা, মা বন্দনা।

রাজা — ফিরিয়ে নিয়ে যাও রমনাথ তব কন্যা আপন গৃহে।

ভিক্ষারী — না, না আমার বন্দনাকে আমি আর ফিরিয়ে নিয়ে যাব না, আমার মেয়েকে আমি কিষনলালের হাতে সমাপন করিলাম।

রাজা — সত্যি বুঝিলাম, ধর্ম এখন আছো নারীর লাঞ্ছনাকারীর কভু জয় না হবে, ধর্মের জয় হবে অধর্মের হবে ক্ষয়, আজ সবাই বল, রাজা সতানন্দের জয়, জয় রাজা সতানন্দের জয় । চল সবে আপন আপন গৃহে করি সবে গমন।

---

সংগ্রহসূত্র

দার্জিলিং জেলার ফাঁসীদাওয়া ব্লকের লেউসিপাকুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রুইধাসা গ্রামের দীনেশচন্দ্র সিংহের কাছ থেকে মান পাঁচালী দস্যু কন্যা কালিন্দী লোকনাটকটি সংগ্রহ করেছি। পালাটিয়া দলের মূল অভিনেতা দীনেশচন্দ্র সিংহ-এর অভিনয় দেখি ঘোষপুকুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে।

# বিষহরি

বন্দনা

ও নারায়ণী চরণ বন্দিয়া লব হে মাথে।
তবে আইস আইস সরস্বতী মা শিরে কর ভর।
জয় শব্দে বইস আমার মা মস্তকের উপর।
পূর্বে রাজ্যে বন্দে গাব
উত্তরে কালীকা বন্দি দক্ষিণে সাগর।
তব পশ্চিমে বন্দিয়া গাবো আশি হাজার পীর।
হাসেনের চাহিতে রে হুসেন বড় বীর।
তবে চৌপাকে চৌকোন বন্দি মধ্যে নিরন্তর।
তলে ধরতী বন্দী উপরে আসমান।
চন্দ্র সূর্য্য বন্দী গাবো স্বরগের তারা।
কৌশলা সুমিত্রা বন্দী পাতালের বালা।
পিতামাতা চরণ বন্দী যাহার যুগল কেশ।
যার জন্য দেখিয়াছি উজান ভাটি দেশ।
মায়ের দুই স্তন বন্দি অমূল্য ভান্ডার।
গয়াতে পিন্ড দিলে শুধা নায় যায় ধার।
বন্দনা করিলাম আমি কেহ নাই আর বাকি।
প্রণাম করে বন্দি গাব মা ভগতী।

পদ্মার গীত — আরে ও কত মায়া, কত মায়া ধরে বিষহরি রে। কত মায়া ধরে।

চিতান — তবে তরাও গো তারণী মাতা বারে এহি বার। তুমি না তরালে ভবে কে আছে আমার।

নেতা — এই চাঁদ বাণিয়ার কি কি কাজ করেছ।

চিতান — তবে কি বুদ্ধি করিব দিদি পাত্র নেতাই। কেমনে বানিয়ার হস্তে ফুল জল পাই।

উঃ চিঃ — তবে ধনে জনে চৌদ্দ ডিংগা সাধুর ডুবাইলাম সাগরে। তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ পূজা নাহি করে।

উঃ চিঃ — মস্তক মুড়াইয়া সাধুর করিলাম যন্ত্রণা তত্রাচ না পূজে সাধু কি করি মন্ত্রণা।

উঃ চিঃ — ছয় পুত্র মারি সাধুর মূলে করিলাম হানি। তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ না দেয় ফুল পানি।

পদ্মা — ও গো দিদি আমি এই চাম্পলাপুরীর চাঁদ বানিয়ার হস্তে কি বুদ্ধিতে পূজা পাব দিদি। তখন মায়া পদ্মা এই চাঁদের হস্তে ফুল জল না পাওয়াতে নেতার কাছে কি পরামর্শ করিতেছে।

নেতা — পদ্মাবতী আমাক কর সুত। অষ্ট না প্রহরে তোকে জোগাইয়া দেছ বুধ। আমার বচনে পদ্মা শীঘ্র করে যাও। ধন্বনতরিরূপে যাও চাম্পলা নগর। উনি উন্দ্র উষা কন্যা আন ইন্দ্রের ঠাঁই সনেকার গর্ভে দাও দুর্লভ লখাই মেনকার গর্ভে দেও বেহুলা সুন্দরী তবে হলে সাধিবা বাদ শুন বিষহরি।

সনকা — সনা বলে ধনমতরি তোকে করি অবদান। এই দেব সেরিলে পাব কোন বর দান।

ধন্বনতরী — দেবের কর্ম অদভুত। আন্ধেলায় পারে আঁখি দান হাপুত্রে পাড়ে পুত।

সনকা — ও ঠাকুর তাহলে আমাকে বর দাও।

ধন্বনতরী — সনা পুত্র বর নেও মনসা সুন্দরী আগে ফুল জল দাও। না করিবে মনসার পূজা মা তোমার স্বামী মনের অভিমানে। কিন্তু বিবাহ রাত্রিতে পুত্রকে তোমার রাখিবে সাবধানে।

সনা — সনা বলে না দিব পুত্র বিবাহ রমণী রাখিব। একশত বালিয়ার নারী দাসী করে দিব।

ধন্বনতরী — বর নিয়া সনা তখন নিজে গৃহে যায়। আনন্দে মনসা দেবী দুম দুমী বাজায়।

গায়ক — বাপু বর দিয়া বিষহরি, পরম আনন্দ করি। হিংগুলিয়া রথে পদ্মা সাজে, পদ্মার পাট বস্ত্র পরিধন সুখ নারে আবরণ। সাক্ষাতে সাজিল দেবরাজ, পদ্মা চেরুয়া সপের তার। খেউটিয়া গলার হার, রঞ্জনীয়া নয়নের কাজল। পদ্মার ডারাইস হস্তের লাঠি, বারাইস বসিবার পাটি। ধমনা সর্পে করিলে জলের ঝারি।

বলানি — হংস রথে ভর করি। পদ্মা বিষহরী যায়া পাইল ইন্দ্রের ভুবন।

ইন্দ্রসভা

ইন্দ্ররাজ — ইন্দ্র বলে অবগতি কেন আইলি শিঘ্রগতি, হেতায় তোমার কিবা প্রয়োজন।

পদ্মা — পদ্মা বলে মর্ত দেশে এক চাঁদ সদাগর আছে। তাহার হস্তে পূজার হইল সাধ। ইন্দ্র ঊষা যাবে। পুত্র বধূ করাবে তারে। তবে সে আমি সাধিতে পারি বাদ।

ইন্দ্ররাজ — ইন্দ্র আর উষা তারা অপরাধি নয় দুইজনে। তারা নাই করে দোষ। কেমন করিব রোষ। কেমনে পাঠাবো মত্য ভুবন।

পদ্মা — ঊষা কন্যাক ডাক দাও নৃত্য স্থলে। নৃত্য স্থলে নৃত্য করুক দেবতার আগে। তাল ভংগ পায়া শীঘ্র আভিশাপ দাও ইন্দ্র জনম করাও মত্য স্থলে।

বলানি — ইন্দ্রের বচনে পদ্মা করিল গমন। ঊষা কন্যার মাঝে দিল দরশন।

ইন্দ্র — দেখ মা পদ্মাপতী সেই উষা কন্যাকে তোমাকে ডাকি আনতে হবে।

পদ্মা — চল চল ঊষা কন্যাহে উষা বিনোদিনী। তোমায় তলব করে দেবশূলপানি।

উষাকন্যা — নৃত্য করে আইলাম পুর্নবার। ফিরিয়া করেছে তলব এ কোন বিচার। ফিরিয়া বসিলেন ঊষা শয়নের ঘরে শুভক্ষেণে যাত্রা করে নাশিকার স্বরে।

ইন্দ্রের দেবসভা- উষার নৃত্যের তাল ভঙ্গ

অভিসার

ঊষাকন্যা — ক্ষমা অপরাধ প্রভু ক্ষমা অপরাধ। আমরা তো প্রভু সেবক তোমার। এমন অভিশাপ দাও রহি তব ঠাঁই। সদায় শ্রী চরণে তোমায় দেখিবার পাই।

ইন্দ্র — মত্য দেশে গেলাম বার তিনেক। গর্ভের যন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি।

পদ্মা — ও মা ঊষা কন্যা তুমি না গেলে যে বাদ সাধন হবে না মা।

ঊষা — তাহলে আমার সঙ্গে সত্য করতে হবে।

পদ্মা — পদ্মা বলে সত্য সত্য না বলিও মন। সংকট কালে তোমার আমি দিব দরশন। চাঁদের বাদ না রাখিব আর রথে করে পুনর্বার আনিব তোমার।

(ধুয়া)

হে মনরে হরি গেল মধুপুরে
গুন গুন জ্বালায় সদায় নারীর অন্তর ঝুরে
ঊষা বলে এইখানে মা রহ পদ্মাবতী।
তিলেক সেবা করি আমি হরের যুবতী
পূজা পূজে বিদ্যাধরী সুবর্ণের মট বাটি।
এক মনে পূজে শুধু নম নারায়ণী।
তবে চালের কুমরা কাটে খুপের কৌতর।
তুষ্ট হয়া অভয়া মঙ্গলা দিলেক বড় বর।
পতঙ্গ হইয়া ঊষা চাম্পলা তে যায়।
অনু জন্মে চাঁদ বাণিয়ার গর্ভেতে সম্ভায়।।
সেই দিবসে সনার তখন ছিল ঋতুমতি।
রজনী সম্ভাসে সম্ভাইল নিজ পতি।

পতঙ্গ হইয়া উনি উজানীতে যায়।
অনু জম্মের বাশ্যো বানিয়ার গর্ভেতে সম্ভায়।।
সেই দিবশে মেনকার তখন ছিল ঋতুমতি।
রজনী সম্ভাসে সম্ভাইল নিজ পতি।।
দুই জনে দুই ঠাঁই ডোবে নিল বাস।
আজি আজি কালি করিয়া হইল পঞ্চ মাস।
পঞ্চ মাসে পঞ্চমৃত খায় বাণিয়ানী।
দশ মাশ দিবশে জন্মিল নন্দন খানি।
তিন দিন অন্তরে বালার এ ধূলি বাড়ায়।
পাঁচ দিন অন্তরে বালার পাস টি কামায়।
ছয় মাসে মহা সুখে অন্ন প্রাসাই,
বাছিয়া রাখিল নাম তার দুল্লব নখাই
তখন ক, খ, গ, ঘ, পড়ে বালা গুরুর মন্দিরে।
পনার হইল বৎসর হইল বয়স ষোল নাহি পুরে।
পনার হইল বয়স ষোলাদিলে পাও।
বিবাদে কারণে বিবাহ নাদে বাপও মাও।
গুরু ঘড়ে বালা শিষ্য সংঘ করি।
পদ্মাবতী ব্রাহ্মণী রূপ ধরিল ততখানি।
কটাক্ষ বালার প্রাণ চাহে ঘন ঘন।
হ্যাস কর হ্যাস কর তুমি বণিকের নন্দন।
আভাই থুবুরা বালা প্রাণে কেন ধর।
পরার নারীকে দেখে রূপে হ্যাস কর।
ধনে জনে তোর পিতা বান্দিতে পারে সেতু।
বাছিয়া সুন্দরী দিয়া বিবাহ নাই দেয়ে তারে কিবা হেতু।
বলানি — তাহার বচনে বালার হইল অভিমান।
আপনার মন্দিরে মায়া দিল দরশন
কপাট মারিয়া রহিল দুর্লভ লক্ষিন্দর

পড়িল সনেকার মনে বেলা দুই প্রহর।

সনার ধুয়া — ও মোর বাচ্ছা নাইরে ও মোক মা বলিবে কে।

ও মোর যাদু নাইরে মস্তকের উপরে

সনার বেলারে সকাল,

এখন না আসে বাচ্ছা মোর দুধের দুলাল।

সকালে গিয়াছে বাচ্ছা মোর ক্ষির ননি খায়া।

আর কত ক্ষণ থাকব আমি পন্থের দিকে চায়া

অন্ন হইল ঝড়ঝড়, বেঞ্জন হইল বাসি

আটুয়া দুধের উপর পড়ি গেল মাছি।

পানের রসিয়া বাচ্ছা মোর দুল্লব নখাই।

কি যানি কি মায়া থাকে বারেয়ানী ঠাঁই।

কান্দিতে কান্দিতে সোনা করিল গমন

বারেয়ানী গৃহে যায়া দিল দরশন।

সনা বলে শুন আমার বারেয়ানী সখী

আজি কি দেখেছ আমার অন্ধেলার আঁখি।

বারেয়ানী বলে শুন আমার প্রাণের সই।

আজি তো তোমার পুত্র দুর্লভ আসে নাই।

বাটা ভরা পান ও মোর বাটা ভরা আছে।

আজি তো তোমার পুত্র দুর্লভ নাহি আসে।

তখন কান্দিতে কান্দিতে সনা করিল গমন।

পন্ডিতে সাক্ষাতে যায়া দিল দরশন।

সনা বলে শুন আমার পন্ডিত মশাই।

কোথায় গেল আমার পুত্র দুর্লভ নখাই।

পন্ডিত বলে ঘড়ে গেল তোমার পুত্র খানি।

বেকুল হয়ে কাঁদ কেন সনা বানিয়ানী।

তেলী হাটি মালি হাটি ভ্রমিল সবার বাড়ি,

খসিয়া পড়িল সনার তখন পরিধনের শাড়ি।

সনা বলে শুন আমার যত ছেড়ীগণ।

কোথায় গেল আমার পুত্র দুর্লভ লখিন্দর।

তল্লাশিয়া যায় তখন শয়নের ঘরে।

কপাট মারিয়া আছে দুর্লভ লখিন্দরে।

সনা — ও বাবা লখিন্দর ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করে কেন আছ বাবা।

বালা — জননী আগে কর সত্য বাণী। তার পরে জননী মা ঘুচাব কপাটখানি।

সনা — সত্য সত্য সত্য রে বাপ বলি লাম তিন বার। ছিনান করিয়া বাচ্ছা খাও উপাচার।

ধুয়া — তখন মায়ের বচনে বালার তুষ্ট হইল মন।

ছিনান করিতে যায় বণিকের নন্দন।

স্নান করিয়া বালা করিল গমন।

আপনার মন্দিরে যায়া দিল দরশন।

অন্ন জল খায়া বালা তুষ্ট হইল মন।

পুষ্পের পালংকে বালা করিল শয়ন।

পদ্মা — নেতা দিদি আমি কি করি উপায়। কেমনে বানিয়ার হস্তে ফুল জল পাই।

নেতা — ও বোন এই চাঁদসদাগরে কি কি কাজ করেছ।

পদ্মা — এই চাঁদ সদাগরের আমি অনেক কাজ করেছি। ছয় পুত্র মারি সাধুর আমি মূলে করিলাম হানি। তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ না দে ফুল পানি। মস্তক মুড়াইয়া সাধুর করিলাম যন্ত্রণা। তত্রাচ না পূজে সাধু কি করি মন্ত্রণা। ধনে জনে চৌদ্দ ডিংগা সাধুর ডুবাই লাম সাগরে। তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ পূজা নাহি করে।

নেতা — পদ্মাবতী আমায় কর, সুত।

অষ্ট না প্রহরে তোকে জোগাই দেছ বুধ।

আমার বচনে তুমি শীঘ্র করে ধর।

কৌশলার মূরতী ধরি যাও লখিন্দর।

মামি ভাগিনা দুয়ে করাও দরশন

গলা ধরে ভাগিনার করিবে আলিঙ্গন।

শুনিবে চাম্পলার পতি গণিবে পরমাদ।

বিবাহ দিবে পুত্র কে তুমি সাধিবে বাদ।

গীত— নেতার বচন শুনি কৌশল্যার মূরতী ধরি শীঘ্র গেল বালার বাসর। স্বপ্নে বালার সঙ্গে রতি করে মহারঙ্গে। নিজ পতি যুবতী সাক্ষাত। উড়ে উড়ে চন্দন দুয়ে করিল বন্দন দুয়ে করালে দন্ড ঘাত। বালা বলে কন্যা রূপবতী। আজ্ঞা কর নিজ পতি। কাল গৃহে করিব গমন। কাল প্রভাত কালে স্বরবর বটের তলে, তুমি আমি যেন হই দরশন। — স্বপ্নে দেখে পদ্মাবতী হইল অন্তর্ধান। নিশি প্রভাতে কৌশল্যা পাইল চৈতন। কাম সোনা চলিয়া যায় নখাই চৈতন্য পায়। বালার হৃদয় করে হায় রে হায়। কাল রাত্রি মোর এলাও না পহায়।

কৌশল্যার স্বপ্ন — কৌশল্যা শুয়ে নিদ্রা যায়। শিহরে বশিয়া পদ্মা স্বপ্ন জানায়। উঠ উঠ কৌশল্যা ছয় ঘাটিতে যাও। তথায় করিলে স্নান স্বামীর পুণ্য পাও। আজি যদি কর তুমি ছয়ঘটিতে স্নান। স্বামীর যে হবে সৌভাগ্য পুণ্যবাণ। স্বপ্ন দেখে পদ্মাবতী হইল অন্তর্ধান। নিশি প্রভাতে কৌশল্যা পাইল চৈতন। শাশুড়ী চরণে কৌশল্যা নমস্কার করে। আজ্ঞা কর যাব মা দিঘি সরবরে। শাশুড়ী বলেছেন বধূ মোর কথা শুন। শুনিলে যে তোর স্বামী জ্বলন্ত আগুন। আগে আমারে মা করিবে অপমান। তার পরে তোর বেটি কাটিবে নাক কান।

কৌশল্যা — কৌশল্যা বলেছে মা আমার স্বামীক নাহি ডর। তুমি আদেশ দিলে যাব দীঘি সরবর।

শাশুড়ী — তব রাজা হয়ে না করে মা রাজ্যের বিচার। পুত্র হয়া না করে পিতার উদ্ধার। স্ত্রী হয়ে না করে স্বামীর ভক্তি। এই তিন জনার জিভ মা গো যাবে অধগতি।

শাশুড়ী — বধূ যদি যেতে চাও। তোমার যত সখী সঙ্গে নিয়ে নেও।

কৌশল্যা— শাশুড়ী মা সখি না নিগাব সরবরে স্নান আমি একায় করিব।

গীত— খার খৈইলা লইয়া কৈশল্যা করিল গমন। ছিনান করিতে গেল বণিকের নন্দন। কাখতে করিয়া লইল জলের কলসী। ও জোর নয়নে কৈশল্যা করিল গমন। মধ্য পথে বালার সঙ্গে হইল দরশন।

বালা — মামী স্বপ্নে তুমি দিয়াছ আলিংগন। আলিংগন দিয়া তুমি রাখহ জীবন। সুখে যদি সুন্দরী না দিব আলিংগন। করিব তোর লন্ড ভন্ড রাখে কোন জন। টানিয়া ছিড়াব তোর গজ মতি হার। ধরিয়া করিব বল ভয় আছে কার।

(কৌশল্যার নাচারী)

আমি বাপু বলি তোরে। ওরে না বল কুবোল মোরে। ওরে না বল কুবোল অনাচার। বাপু বলিব তোর বাবার আগে। কেন মরো মনস্তাপে ওরে বিবাহ দিবে তোক একশত বানিয়ার নারী। বাপু পর না হয় ভিন্ন আমি। সাক্ষাত তোরে হই মামি। ওরে এখে আমি রাজ কুলের নারী।

(বলানি)

তখন ক্রোধিত হইল দুর্লভ নখিন্দর। কাচুলি শিরিয়া, করিল কুচের উপর। কুচের উপর তখন হস্ত দিল এক। ঘুচিল মদন জ্বালা তুষ্ট হইল মন। স্নান করে ঘরে যায় বণিকের নন্দন।

(কৌশল্যার অভিশাপ)

তবে মররে নিরাংশর বেটা। কন্ধ তোরে যাক কাটা। দংশিবে তোক পদ্মার নাগিনী।

(কৌশল্যার সনকার গৃহে প্রবেশ)

কৌশল্যা — ও দিদি আমি ভাই তোমার কাছে আসলাম। তোমার ছেলে লখিন্দরের খবর নিয়ে।

(ধুয়া কৌশল্যার)

গীত — ওকি ও গে ননদ দিদিভাই। কুল গেল মোর ভাগিনার হাতে। হে মোরে দিদি গেলাম আমি ভাই সরবরে। কলসা ভাঙ্গিল উদরে ভাই করিল লন্ড ভন্ড। ও দিদি তোর বেটা লখিন্দর। ধরিয়া করিসে বল, টানিয়া ছিড়াইছে গলার হার।

সনকা — পুত্র আমার না বল এমন। গন্ধ বানিয়ার বালা টেন টন নহায় আল্লা ভালা। নাই ছাড়ে তার দুগ্ধ মুখের গন।

কৌশল্যা — দিদি বিশ্বাস যদি না করিশ তুই বস্ত্র খুলিয়া দেখাচ মুই। রক্ত পরে মোর একান্তর সিন্দুর

সনকা — মাও, চুপে চুপে ঘর যাও। বলিওনা আর কারো আগে।

বলানি — হস্ত ধরে কৌশল্যার করিল বিদায়। শিঘ্র করে সনা তখন স্বামীর আগে যায়। স্বামীর আগে বলে বিবরণ কথা। শুনিয়া চাম্পলার পতি হেট করে মাথা।

চাঁদ — ওরে সনা ওরে লেংগা সত্য কি আমার ছেলে লখিন্দর। ওরে লেংগা, পুত্র হয়া করে যদি ভাই এত অত্যাচার। বিবাহ দিব পুত্র কে আমি করিলাম অঙ্গীকার। দুধের দুলাল বাচ্ছা মদন বিপরীত। মনে মনে কুকর্ম বাছা করিল বিপরিত। চাঁদ বলে লেংগা পাত্র শুন মোরে ভাই। কন্যাখানি জুড়িতে গেলে পরীক্ষা দিতে যাই। ওরে লেংগা তুমি শীঘ্র করে এই লৌহ কালাই নিয়ে আসো।

(বলানী)

চাঁদের বচনে লেংগা করিল গমন। কর্মকারের গৃহে যাইয়া দিল দরশন। কালাই লইয়া লেংগা তখন করিল গমন। সাধুরো সাক্ষাতে যায়া দিল দরশন। ডাকেয়া আনিল সাধু এক শত ভারি। ভারি কন্ধে ভারদিয়া চলে অধিকারী।

তখন যাত্রা ছাড়িল সাধু তখন না শিকার করে। উত্তরিল পূর্ব শহরে। পূর্ব্ব শহরে সাধু করিল গমন। শঙ্খ সাধুর ঘরে যায়া দিল দরশন। শঙ্খ সাধুর কন্যা আছে ভাল জানি, সর্ব অংগ ভাল তার বাম চোখটা কানী। গন্ধ বানিয়া ভাই আমি লক্ষ সদাগর। কানী কন্যা দিয়া বিবাহ না দিব লক্ষিন্দর। উত্তররিল গিয়া তখন সাধু উত্তর শহরে। উত্তর শহরে আছে মধু বানিয়ার ঘর। তার ঘরে বাপে আর বেটিতে আছে কন্যা পরম সুন্দর। তাহার কন্যার কথা কি বলিব আর। অকুমারীতে কলঙ্ক ইহা সাতবার। প্রথমে হইল কলঙ্ক তারপরে হইল কলঙ ভাই আর বোহিনী। গন্ধ বানিয়া ভাই আমি লক্ষের সদাগর। কলঙ্কিনী কন্যা দিয়া বিবাহ না দিব লখিন্দর। যদি বিবাহ দেই তাহলে লোকে বলবে চাঁদের বধূ মা কলঙ্কিনী। তখন আবার যাত্রা ছাড়িল সাধু নাশিকার স্বরে। উত্তরিল গিয়া তখন পশ্চিম শহরে। পশ্চিম শহরে সাধু বানিয়ার ঘর। তাহার ঘরে আছে কন্যা পরম সুন্দর। তাহার ঘরে কন্যার কথা কহন না যায়। আছে এক গোদ কন্যাখানির পায়।

চাঁদ — ওরে লেংগা একন্যা জোড়া হবেনা, আরে লেংগা প্রথমে গেলাম পূর্ব দেশে। তার পরে গেলাম পশ্চিম দেশে। তার পরে গেলাম আমি ভাই উত্তর দেশে, সেখানে হল না, বুঝা গেল আমার যাত্রা শুভ হয় নাই। দক্ষিণ দেশে আমার বাড়ি। আর আমি পুত্রকে বিবাহ দিব না।

পদ্মা — কন্যা না পায়া সাধু ফিরিয়া যায় ঘর। ওরে না হবে তো আমার পূজা পৃথিবীর ভিতর।

(বলানি)

বৃদ্ধা রূপে পদ্মাবতী বানিয়ার গেল ঠাঁই। কি কারণে বিচ্ছেদ ভাব বানিয়া গঁসাই। ঘটি বাটি লইয়া বালি সেখানে খেলায় মায়া করে পদ্মাপতি সে খানে যায়। কাহার ঝিয়ারীর বেটি কাহার প্রহরী। ঘর মধ্যে ডাক পারে শ্বশুর শাশুড়ী।

মায়া পদ্মা — তোর ছোটবেলার মাইয়ের চার ছেলের মাও; এখন তোর না হয় বিয়াও।

বেহুলা — মাগো আমার কর গতি। কি প্রকাশে হবে আমার কোলার নিজ পতি। ছাড়িল খেলা বালি ভাঙ্গিল পুতুলী। মায়ের চরণ ধরে বেহুলা সুন্দরী। মায়ের চরণে বালি নমস্কার করে, আজ্ঞা কর যাব মাতা দিঘী সরবরে।

মেনকা — সরোবরে আছে মাগো জোঁক, হাতী শূর।

বেহুলা — আমার কাছে মাগো বুদ্ধি আছে ভাল, আগতে নামাইয়া দিব যত সখীর পাল। সখীগণকে জোঁক না ধরিবে দেখিব নয়নে। তার পরে নামিব মা দিঘী সরোবরে।

মেনকা — চোর চট্টোর ভয় মাগো সরবরে থানা। ধরিয়া করিবে বল তোক রাখে কোন জনা?

বেহুলা — আমার বাপের নামে ত্রিভুবন কাঁপে, কার বাপের সাধ্য আছে আমার হাত ধরে।

মেনকা — ওহো মা বেহুলা, তুমি তোমার বাপের গর্ব কর। তবে যদি যেতে চাও তোমার যতেক সখী সংগে নিয়ে যাও। তখন ডাকেয়া আনিল বালি এক শত সখীগণ। সরবরে তীরে যায়া দিল দরশন।

বলানি

পূর্বনা ঘাটতে গেল বেহুলা সুন্দরী, সেই ঘাটের পদ্মা হল বিধবার ব্রাহ্মণী, কপটে বসিয়া পদ্মা তপজপ করে। ও ঘাট ছেড়ে দিয়ে গেল উত্তর ঘাটে। উত্তর ঘাটেতে গেল বেহুলা সুন্দরী। সেই ঘাটে পদ্মা হল বিধবা ব্রাহ্মণী। কপটে বসিয়া পদ্মা তপ জপ করে। ও ঘাট ছেড়ে গেল পশ্চিম ঘাটে। পশ্চিম ঘাটে গেল বেহুলা সুন্দরী। সেই ঘাটে পদ্মা হল বিধবা ব্রাহ্মণী। কপটে বসিয়া পদ্মা তপ জপ করে আর ও ঘাট ছেড়ে গেল দক্ষিণ ঘাটে। দক্ষিণ ঘাটেতে গেল বেহুলা সুন্দরী, সেইনা ঘাটে পদ্মা হল বিধবা ব্রাহ্মণী। কোন ঘাটে করিব স্নান বল প্রাণের সখী। তখন এক সখী বলে, নামো এই পাশ দিয়া। (তখন বেহুলা পায়ের জল বিধুবার ভরে অঙ্গে, লক্ষ লক্ষ অভিশাপ দ্যায় বেহুলার শরীলে।) (বেহুলার নাচারী) ও বিধবা মা বিনা দোষে কেন পার গালি? মাগো, আমি শিশু নাহি জানি অজ্ঞানে ভরিলাম পানি। বিনা দোষে কেন পার গালি? হে মা তুমি যদি হও সতী; কেনে বা মরেছে পতি? সতী নারীর পতি কেন মরে। হেমা এখনে বুঝিব বল, মিছে কর গোন্ডগোল, কার বা ভাগ্যে কিবা ফল ফলে — তবে বিধবা বেহুলা হর। দুয়ে করো বানেশ্বর। তারা ডুব দিল সাগরের জলে। বিধবা ডুবিল জলে। শামুক শেওয়াল তুলে। সিন্দুর তুলে বানিয়ানী।

ব্যাশ্যো — কোথা হইতে কথা যাও আমার প্রাণের ভাই। কোন সমন্ধে আজি তুই কহেচিত বেহাই।

চাঁদ — তোমার ঘরের কন্যা বেহাই আমার ঘরে বড়। দুই জনে বিবাহ দিব দুর্লভ লখিন্দর।

ব্যাশ্যো — আমার ঘরের কন্যা বেহাই আছে এতকেনা। কাঁটাতে নিব টাকা ঢালিয়া নিব সোনা। পাত্র শুন মোরে বানী। ওরে অবাক কান্ড করিল শিশু কন্যাখানি। শঙ্খ সিন্দুর তুলে কন্যা সে জলে দিয়া ডুব। ইহার স্বামী হবে সর্ব কালের সুখ। ওরে লেংগা তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কার ঘরের মেয়ে, তখন চাঁদের বচনে লেংগা

ডাকেয়া সদায়। কাহার ঝিয়ারীর বেটী পন্থ দিয়া যায়।

(বলানি)

মোরা ব্যাশ্যের ঝিয়ারী। শুনিয়া সন্তুষ্ট হয় চাঁদ অধিকারী। কন্যা যায় আগে আগে চাঁদ যায় পিছে, যায়া পাইল ব্যাশ্যে বানিয়ার ঘর।

(ধুয়া)

ওরে কেবা কার কার লাগিয়া ভাব ও রে দীন নাথ। মন রে গুরু ভজ গুরু চিন। গুরুই কর সার। গুরু না ভজিলে জীবের গতি নাইরে আর ।

চিতান — তবে যাত্রা ছাড়িল সাধু নাশিকার স্বরে। উত্তরিল গিয়া তখন চাম্পলা নগরে। মন রে মিছা ঘর মিছা বাড়ি রহিবে পড়িয়া। আসিবে যমের পাটনি নিগাবে বান্ধিয়া।

(বলানি)

চাঁদ বলে লেংগা প্রাত্র শুন আমার ভাই। আসিয়াছি উজানী নগর চল চাম্পলাতে যাই। যাত্রা ছাড়িল সাধু নাশিকার স্বরে উত্তরিল গিয়া তখন চাম্পলা নগরে।

সনকা — শুন আমার হে সাহেব সদাগর। কেমন বহু বসাইলেন প্রভু উজানী নগর।

চাঁদ — শুন আমার হে সোনা বানিয়ানী। মনোহরিনী কন্যা পেলাম ব্যাশ্যের ঝিয়ারী। যে কন্যা সিজাইয়া দিলো সোনা লৌহের কলাই। ইহার সমান রূপ ত্রিভুবনে নাই। শঙ্খ সিন্দুর তুলে কন্যা জলে দিয়া ডুব। ইহার স্বামী হবে সর্ব কালের সুখ ।

সনা — প্রভু তোকে করি জোড় হাত। নিরন্তরে আছে তোমার পদ্মার সঙ্গে বাদ। ঠাওয়াই আনিয়া বান্ধো পাথরের ঘর। তার তলে রহিলে পুত্রের সর্পের নাই ডর।

চাঁদ — লেংগা প্রাণী শুন মোরে ভাই। শিঘ্র করে নিয়ে এসো মেন্ডের ঠাহই। চাঁদের বচনে লেংগা করিল গমন ঠাহই নিকট যাত্রা দিল দরশন। ঠাহই লইয়া লেংগা করিল গমন সাবুর সাক্ষাতে দিল যাত্রা দরশন।

(ঘরে তৈয়ারী)

(বলানি)

চাঁদের বচনে ঠাহই কর্ম জানে ভাল। পাথরের থোর কাটে এ চারি দেয়াল। মাঝিয়া পাথর বাটিয়া করিল সাইঞ্চ ঢাল। রথ বয়য়া যায় তখন যায় পদ্মাবতী। ঠাহই নিকট গেল আপন মূরতি।

পদ্মা — ঠাহইগন বচন শুন ছাড়। মেন্ডেতে রাখিবে পথ সূতার সঞ্চার। যদি করিস প্রতিকার। বংশ ধ্বংস করিব তোমার । কথা

বলানি — কথা কয়া মনসা তখন উঠিল আকাশে। পথ খানি রাখিয়া দিল মনসার ডরে। চারিদিকে না দেখিল ধুয়ার সঞ্চার। রঙে নাচে সাধু তার মহিমা অপার। বিবাহ দিয়া পুত্রকে আমি রাখিব খ্যাতি এক রত্রি কি করিতে পারে জয় পদ্মাবতী।

চাঁদ — ওরে লেংগা আমার ছেলে লখিন্দরকে বল, তার মায়ের কাছে বিদাই নিতে।

লখিন্দর — ও মাগো জননী। আশীর্বাদ কর বিবাহে যাব আমি।

সনা — ওরে বাবা লখিন্দর আমি তোকে বিবাহে যেতে দিব না বাবা।

(ধুয়া)

তুই মোর বিবাহে না যাই য়ো বাচ্ছারে। শ্যাষে ও তোর জ্বালা হবে। বিবাহে না যাইস রে বাচ্ছা দুর্লভ লখাই। বিবাহে গেলে তোর না দেখ ভালাই। পিতা তোর দুরাচার, মনসার অঙ্গিকার, একে রাতি ছয় ভাইকে মারিসে তোমার। বর দিয়া তখনে বলেছে ধন্বনতরী। বিবাহ রাত্রিতে তোর পুত্র বধিবে বিষহরী।

বালা — জননী মা না করি স ভয়। কপালের লিখন মা মোর খণ্ডন না হয়। আগে মরণ পিছে মরণ মরণ এক দিন হবে। জন্মিলে যমের ধার সুজিবার হবে। আগে মরণ পিছে মরণ মরণ একবার। জন্মিয়া যমের ধার নাগে সুজিবার।

সনা — ওরে বাবা লখিন্দর তোমার বিবাহে আছে সাধ। বিবাহে যাও বাচ্ছা করিলাম আশীর্বাদ।

চাঁদ — পাইকগণ নেও গুয়া পান, বরকে রাখিতে তোরা হও সাবধান। এক বস্ত্র পরিধান তোরা পর সর্বজন। চিনিতে না পারে বর কোন জন।

বলানি — চাঁদের সাক্ষাতে পাইকগণ ডম্ফ ডম্ফ করে। আমরা থাকিতে মশাই কী করিতে পারে।

একায় পদ্মাবতি যদি করে রণ। তরালে কাটিয়া তারে করিব খান্ডখান। তখন তীরনদাড়ি গল্প করে যায়া বালার কাছে। নাগৎ পাইলে মনসা দেবীক হানিব আকাশে। হস্তীর হল দুলা দুলা ঘোড়ার হেনহেনী, হস্তীর পিঠে চরে সাধু মুখে পাকা দাড়ি, এক রকম পদলা শহর উজানী নগর হইল পার। হরসাধু মন্ডলের দেশে হইল চমৎকার। ভাট পালায় ভাটিয়া পালায় চন্ডাল পালায় হাড়ি। ঘরের ভিতর যুক্তি কবে, গাভুর গাভুর আড়ি। এক আড়ি বলে তোমরা পালাও কিসের ডরে। বিবাহে যায় সাধু উজানী নগরে। যেই না পাইকে নিয়ে যাবে তারে। সঙ্গে যাব আন্ধিয়া বাড়িয়া পাইকের বুকত বসি খাব। নগর পালেয়া তখন, নগর হইল খোলা। হেন কালে পালেয়া যায় তাতী আর জোলা। কিছু দূর যাইতে তখন জোলাক ধরে ভূতে। জোলানী উঠিয়া তখন জোলার মুখত মুতে। জোলা বলে থির থির জোলানী বলে কি। ওরে নহায় নহায় গরম পানি, আমি মুতেছি।

(বালার বিবাহ ধুয়া)

ও বেহাই সময় চলিয়া যায় কন্যাদান কর বেহাই রে। কথাশুনিয়া ব্যাশ্যো বানিয়া সমন দিল বলে। পূর্ববতী বসিলেন দুহিতা লইয়া কোলে। তখন ঘটের উপর দিল বালার করতল। আমের পল্লব দিয়া ছিটাইল জল। প্রথমে কন্যার বাপ ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া করিল আশীর্বাদ। তার পরে দান করে কন্যার মাও। ধামালী খেলাইতে দিল লক্ষ টাকার নাও। তার পরে দান করে কন্যার খুড়া। সোনা, রূপা দিয়া রে বান্দিয়া দিল পুরা। তার পরে দান করে কন্যার কাকী। হেট কানে সোনা দিল উপর কানের কাটি। তার পরে দান করে কন্যার জ্যাঠো।

গরুকেনা দিল সবার থেকে ছোট। তার পরে দান করে কন্যার আবো, উঠিয়া না যাস রে ভারুয়া আর কিছু পাবো। তার পরে দান করে কন্যার মাসী। হাতের খারু খিল খসাইতে চোখের পড়ে পানি। তার পরে দান করে কন্যার মামী, দান নাই দক্ষিণা নাই খালি হাশি খুশি।

চাঁদ — চাঁদ বলে বেহাই তুমি কত করিবে দান। শিবের প্রসাদে আমি বড় ধনবান। আমার ঘরের হীরা মানিক গড়া গড়ি যায়। ঘুচাও বালার বিবাহ ক্ষুধায় দুঃখ পায়।

(জামাই ভজন ধুয়া)

মেনকা সুন্দরী রূপে বিদ্যাধরি জামতা আদর করে। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করিল রন্ধন সময় রন্ধন ঘরে। আগে আন্ধে রানী। সাহেব বানিয়ানী শাগশুগ বরার ভাজা। সনকাই সাধুর নারী বলে হাস্য করি, খাবার পরম মিঠা। তখন কাঁচা সরিষার তেল হস্তে মাখিয়া বালার চোখে মারে ছিটা। নয়ন ভরিয়া পরে চোক্ষের জল মুকুতাবরন পানি।

(বালার ধুয়া)

আরে মোর মন, নিলাজি বঁধু ও হে, মোর নিলাজি বঁধু। বালী কারবালাতে করে আও রঙ্গে ঢালে পানি। আগিনা ঘড় সামটিয়া বৌ পাথারে লইয়া যায়। পর পুরুষের মন বৌদি ওখানে ভুলায়। আমার লাগিয়া বৌদি তোমার আছে মন। বেহুলা বালীর সতীন হয়য়া যাও ছয় জন। তখন কথা শুনিয়া ছয় বঁধু পালায় আসে পাশে। মুখত কাপেড়া দিয়া বেহুলা বালি হাসে।

বালা— ওরে লেংগা দাদা আমার শ্বশুর মশায়কে বল যে তোমার জামতা এখন বিদাই হইতে চায়। আজি বল গিয়ে জানাও লেংগা হে। ও মোর শ্বশুরের পায়। তোমার জামতা বাবু বিদায় হইতে চায়। — কথা শুনিয়া বাহির হইল সাহেব সদাগর। আজিকার রাত্রি রহ দুল্লব লখিন্দর। আজিকার রাত্রি রহ,প্রভাতে যাবেন কালী, বেহুলা ছাড়িয়া গেলে কোলা হবে খালি। তবে বালা বলে শ্বশুর বাবা না হন অসন্তুষ্ট। তোমার গৃহতে রইলে নাই কোন দোষ। আমার উপরে বাবা পদ্মার অঙ্গীকার। বিবাহ রাত্রিতে বাবা করিবে সংহার। তখন নৌকায় বান্ধিল বাহান্ন বাজার। একে একে সমস্ত নদী হইল পার। তেলী হাটি দিয়া রে চৌডলা বয়হা যায়। গলা ধরে বালি তখন স্বামীকে শুধায় -বল বল ওগো প্রভু বলি তব ঠাঁই। কোন রাজার দেশ তোমাকে শুধাই। বালা বলে, শুন কন্যা শিশু বুদ্ধি তোর, এই তো বাপের দেশ চাম্পলা নগর। আপনার ঘাটে যায়া হইল উপস্থিত। বিরচিয়া করি গান মধুর সঙ্গীত।

(বধূ বরণ ধুয়া)

আজি শুভ দিন মোর ভাল রে পুত্র বধূ আইল ঘরে। আগে আগে ঢালে সনা, ঝিঙ্গারের পানি, পুত্র বধূ বরে নেগায় সনা বানিয়ানি, তবে সনার চাইলন সনা আনিলেন ধরেয়া। পুত্র বধু বরে নেগায় জয় জোগার দিয়া। হা

হা কার করে সনা মেন্ডে দিল হাত। এ তো সতীর মেন্ড সারিল কপাট। হা হা কার করে সনা মেন্ডতে সন্দায়। দেখিয়া মেন্ডের রূপ করে হায়রে হায়। চৌদিকে চৌকিয়া যেন জাগে সারি সারি। দুয়ারে জাগিয়া রহে রোজা ধন্বনতরি। মন্ত্রর প্রকাশে নাম ধন্বনতরি রায়। ছয় মাসিয়া মৃতা জিযায় যদি ভাগ্য পায়। নিরন্তরে জাগিয়া রহে মাও আর বাপ। কোন পথে আসিতে পারে পদ্মার কালো সাপ।

(বিবাহ খন্ড সমাপ্ত) (ভাসান যাত্রা)

চাঁদ — ওরে লেংগা তুমি তাড়াতাড়ি ধন্বনতরিকে ডেকে নিয়ে আস।

(ধন্বনতরি কে নিয়ে প্রবেশ)

ধন্বনতরি — নমস্কার সদাগর মহাশয়।

চাঁদ — ওরে ধন্বনতরি আমার পুত্র বধূ মেন্ড ঘরে প্রবেশ করেছে। তোমাকে ভাল করে পাহারা দিতে হবে যন ঐ পদ্মার কালসাপ প্রবেশ করতে না পারে। বর দিয়া তখনে বলেছে ধন্বনতরি। বিবাহ রাত্রিতে বধিবে বিষহরী। যদি আমার পুত্র লখিন্দর মারা যায়। তাহলে তোমাকে আমি বলি দান দিব শিবের দুয়ারে।

সনা — ওরে বাবা লখিন্দর তোমার শ্বশুর বাড়িতে কী কী দান পাইয়াছ বাবা?

লখিন্দর — তবে ভুমি দান পেয়েছি মাতা গো লখিয়ার কান্দর। তার সঙ্গে পেয়েছি মাতা, বেহুলা সুন্দর। আর অনেক দান পেয়েছি মাতা, লেখা জখা নাই দুধু খাইতে পেয়েছি মাতা সমন্ধের গাই।

লখিন্দর — বলি গো সুন্দরী, আজ তুমি আর আমি এই ফুল শয্যার রাত্রিতে পাশা খেলব ভাই। এই আমার মনের বাসনা।

(গীদালের ভাঙ্গন)

(আরে ঐ তো কদম তলে বসিল বলাই, প্রসারে হারিয়া গেল শ্রীনন্দের কানাই।)

বালা — আর আমি বলি ওগো কন্যা সাহেব ঝিয়ারী। তুমি আমি দুই জনে আজ খেলিব প্রসারী।

বালি — আমি বলি ওগো প্রভু না খেলিব খেলা। খেলাতে হারিয়া গেলে কি দিব অবলা।

বালা — আর আমি হারিলে দিব তোমায় অষ্ট অলংকার। তুমি হারিলে দিবে আমায় সুরতি শৃংগার।

বালি — হাতে ধর ওগো প্রভু পাও বা ধর তোর, আজিকার রাত্রি প্রভু ক্ষমা কর মোর। আর জাঙ্গি দিয়া পালে যেমন চালের ঢেমনা পুঁই। ওই রকম পালিয়া নেও মোর আর বছর দুই।

বালা — আমি বলি ও গো কন্যা খেলায় দেহ চিত। বিবাহ রাত্রিতে খেলা খেলাইতে উচিত। তখন তেঁতিয়া মালঞ্চ পাশা সোয়া দশ চারি। আনিয়া প্রসারের দ্রব্য রচিলেন শাড়ি। সাত বার জিনিয়া লইল বালা হইল হারি। তখন কাড়াকাড়ি করে পরশে গেল মন। হইল বালার মদন

তরল।

বালা — ওগো কন্যা ছাড় খেলা তুমি কিসের ধামালী। দেখিয়া তোমার স্থান আকুল মদন প্রান। প্রাণ রাখ মরে বানিয়ার বালি।

বলানি — তখন বালার বচনে বালি না করে উত্তর। ফিরিয়া করে উত্তর দুল্লভ লখিন্দর।

বালি — ও গো প্রভু, তবে হলে আমার একটি কথা শুন প্রভু, বলি গো প্রাণনাথ পন্ডিত দেখিয়া তোরে। বাপ মায়ে দিয়াছে মোরে। আমি দেখি অতি বড় চাষা। কে বা শুনে কে বা কয়। পন্ডিতের কী কার্য হয়। জীবন মাগিয়া যে বা খেলায় পাশা। তার মত দেখি নাই অতি বড় চাষা। ওগো কন্যা আমার উপরে ভাই পদ্মার অঙ্গীকার। বিবাহ রাত্রিতে আমায় করিবে সংহার। বলি গো কন্যা বাক্য মোরে ধর। রন্ধন কর তুমি মেন্ডের ভিতর। ওগো কন্যা তোর বাপের বাড়িতে ভোজন নাই কর মুই ডরে। বিবাহ রাত্রিতে আমায় কি বা যাদু করে।

বালি — ও গো প্রভু তবে হলে আমি তাই করব হায় ভগবান আমি কি করি কোথায় কি পাই।

পদ্মা — ও গো বেহুলা ভান্ডারতে চাল আচে, ভিঙ্গারতে পানি। তাকে দিয়ে রন্ধনকর তুমি বেহুলা সুন্দরী।

বালি — ঐযে কে যেন আমায় অভয় দিয়ে বলছে,তবে আমি তাই করব।

(গীত)

আরে রন্ধন করিতে গেল বেহুলা সুন্দরী, আরে হায়। তবে চন্দন চিড়িয়া বালি করিলেন খড়ি। তিনটা নারিকেল লইল করিয়া টিহরী। প্রথমতে আন্ধে বালি শাক-সুগ বরা ভাজা। চুচুরা মৎস আন্ধে বালি দিয়া বাঁশের গাজা। রন্ধন আন্ধে সুন্দরী রন্ধনের জানে ভাও। ঘৃততে ভাজিয়া তুলে কৌতরের ছাও। রন্ধন আন্ধে সুন্দরী তার কানেঃ নড়ে সোনা। তৈলতে ভাজিয়া তুলে শোল মাছের পহনা। নদীর খাটিয়া মৎস বেছে হালী হালী। তাক দিয়া আন্ধে বালি কোয়াশের জালী। বোয়ালী মৎস আন্ধে তার নিকিলায় কোল। অধ্যেক করে খাটা অধ্যেক করে ঝোল। বানিয়ার বৌ বানিয়ার বৌ রন্ধন ভাল যানে। চেং মাছ পুরিয়া বালী জামুরী দিয়া সানে। রন্ধন আন্ধে সুন্দরী তার পিষ্টে পরে ছাই। তাক দেখে হাস্য করে দুর্লভ নখাই। এক ভাত পঞ্চাশ বেঞ্জন করিলে রন্ধন। নিদ্রাতে পড়িল বণিকের নন্দন।

বালি — একি স্বামী আমাকে রন্ধন করিতে বলে তিনি যে ঘুমে বিভোর হইয়াছো। এখন স্বামিকে কি ভাবে জাগাবো?

(বালির গীত)

প্রভু জাগরে ও প্রভু উঠরে গবিন। পুষ্পের পালঙ পাইয়া কত পার নিন। প্রভু জাগরে। আর বিবাহ করে এনাছ প্রভু নাই পচে কলার পাত। কেমনে ডাকিব প্রভু উঠ প্রাণ নাথ। আর এখনে আনিলেন প্রভু বিবাহ করিয়া। কেমনে ডাকিব তোমায় এ নাম ধরিয়া। তবে আমি বেহুলা বালি এ নাম রাখিব। চন্দন ঘসিয়া আমি প্রভুকে জাগাবো।

বলানি — চন্দন ঘসিয়া বালি কটুরায় ভরায়। সর্বাঙ্গে ছিটিয়া দিল বণিকের গায়। সর্বাঙ্গে ছিটিয়া দিল কস্তুরী চন্দন। তত্রাচ না পাইল ছাড়ি বণিকের নন্দন। বালা নিদ্রা যায়। বালি ঘনে ঘনে ডাকে অন্ন ব্যঞ্জন বেহুলা তখন পাতিলে ভরে রাখে। হস্ত ধুইয়া সুন্দরী তার হস্তের তুলে কালি। পালঙ্কে শুইল বেহুলা সুন্দরী। একে তো তুলার বালিশ সুখ স্বামীর কোল। নিদ্রাতে পড়িল বালি হইয়া বিভোর।

পদ্মা — ও দিদি দিদি গো আমি তোমার কাছে আসলাম, দিদি।

নেতা — ও বোন পদ্মা তুমি আমার কাছে কেন আসলে বোন।

পদ্মার গীত — কি বুঝ করিব দিদি গো ও দিদি নেতাই। কি বুঝ করিব দিদি গো। আজি বড় মনে করে দিদি আসিলাম তোরে ঠাঁই। কেমনে বানিয়ার হস্তে ফুল জল পাই। এই যে মস্তক মুড়াইয়া সাধুর করিলাম-যন্ত্রণা। তত্রাচ না পূজে সাধু কি করি মন্ত্রণা।

চিতান — এই এমন কঠোর হিয়া চান্দ অধিকারী। বারে বারে বলে আমায় ঢেমনা ভাতারী, ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙা ডুবাইলাম সাগরে। তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ পূজা নাহি করে।

নেতা — নেতা বলে পদ্মাবতী বাক্য মোর ধর। সত্বরে চলে যাও সূর্যের বরাবর। সুর্য সম্ভাসিয়া পদ্মা কর গমন। নিদ্রালী বলিয়া করহ গমন। নিদ্রা দিয়া বানিয়ার পুরী কর অচেতন। পশ্চাতে ডাকিয়া আন তোমার যত নাগগণ।

পদ্মা — ও দিদি এই কাজ করিলে সত্যে আমার বাদ সাধন হবে দিদি।

নেতা — হ্যা পদ্মা সত্য সত্য হবে পদ্মা।

(উভয় প্রস্থান)

নেতার বচনে পদ্মা সেই কর্ম করে। সত্বরে চলে যায়সূর্যের বরাবরে। সুর্য সম্ভাসিয়া পদ্মা কর গমন। নিদ্রালী বলিয়া ডাক ঘন ঘন।

পদ্মা — ও মাসি মা নিদ্রা তুমি কোথায়?

নিদ্রা — কেন মা পদ্মা কি জন্য আমার কাছে মা গো।

পদ্মা — শুন মা নিদ্রা আমি বড় সংকটে পড়েছি। তাই তোমার কাছে আছি মা। তুমি নিদ্রা দিয়ে সমস্ত বানিয়ার পুরী অচেতন কর।

নিদ্রা — তবে হলে আমি তাই করব মা

(প্রস্থান)

নিন লইয়া নিদ্রার প্রবেশ (পরে প্রস্থান)

পদ্মা — যাই এখন আমার যত সর্প আছে আমার দুঃখের বেদনা জানাই ওরে সর্পগণ তোরা কোথায়

(গীত)

ওকি, কে মোরে সাধিয়া দিবে অভাগিনীর বেদনা হে। আগুসান হয়া বাপু নেও এ প্রাণ প্রসাদ। কে মোরে সাধিয়া দিবে অভাগিনীর বাদ শুনিয়া চমকিত সর্পের সমাজ। আকাশে ভাঙ্গিয়া পরে স্বরগের বাজ, বড় বড় সর্প গোলার ধোন্দল ধোন্দল পেট। দংশনের কথা শুনিয়া মাথা করে হেঁট। ডারাইশ ধামাইয়া বলে আর যে ঘেউটিয়া। আমার যে বিশ নাই মা ডংশিব কি দিয়া। মাস পক্ষে এক দিন মা মৃত্যু করি যার। ভাল মত রোঝা পেলে করে প্রতিকার

পদ্মা — যত সর্প পুষিলাম আমি আইলের কেচুয়া কেহ তো না দিলে আমায় এবাদ সাজিয়া। (ঢোঁড়া) প্রবেশ ওরে ঢোঁরা তুমি কি লখিন্দরকে দংশন করতে পারবে বাবা?

ঢোঁড়া — হে মা মোর যে রাগ আমি পারবো কিন্তু আমার যে বিষ নাই মা

পদ্মা — যারে যারে ঢোঁরা তোকে দেছ বর আড়াই তোলা বিষ দেছ তোক শরীলের ভিতর ওরে ঢোঁড়া তোকে দেছ বর। সারা জীবন থাক তুমি জলের ভিতর।

(ঢোঁড়ার প্রস্থান)

ওরে সর্পগণ পুষিলাম অকারণ। কেহ না আসিলে মোর কাজে। যত সর্প পুষিলাম আমি আইলের কেচুয়া। ওরে কেহ তো না দিলে আমায় এ বাদ সাজিয়া।

(ধামাই প্রবেশ)

ধামাই — মা গো দাও অনুমতি। যাইব কালীদহ সাগর বলিলাম নিশ্চয় করি।

পদ্মা — ওরে ধামাই তুমি কি কালীদহ সাগর লঙ্গন করতে পারবে?

ধামাই — হ্যা মাগো, যদি তুমি আদেশ কর তাহা হলে আমি সত্য কালীদহ সাগর লঙ্গন করিতে পারব।

পদ্মা — ওরে ধামাই তোকে দেছ বর সত্তরে চলে যাও কালীদহ সাগর।

(বলানি)

প্রণাম করিয়া ধামাই তখন করিল গমন। যায়া পাইল নাগিনীর চরণ।

ধামাই — ওরে নাগিনী মিনতি করিছে পদ্মা তোকে যাইবার কারণ।

নাগিনী — ওরে ধামাই কি জন্য আমাকে যেতে বলেছে?

ধামাই — চাঁন্দে না দে ফুল জল। হের দেখ নাগিনী পদ্মার খারা চুল।

নাগিনী — তবে চল চল ধামাই।

(প্রস্থান)

(বলানি)

তখন ধামাই সহিত চলে একাল নাগিনী। যাইয়া পাইল তখন যথায় ব্রহ্মানী। প্রণাম করিল নাগিনী পদ্মাব চরণ। কি জন্য ডাকিলে মা বল বিবরণ।

নাগিনী — প্রণাম হই জননী, বল মাগো আমাকে কি জন্য ডেকেছ।

পদ্মা — ওরে নাগিনী কি হইল পরমাত কেমনে সাধিব বাদ। ঘরিক হইলে পহাবে রজনী। এই আমি সর্পগণ পুষিলাম অকারণ। কেহ না আসে মোর কাজে। যত সর্প পুষিলাম আমি আইলের কেচুয়া কেহ তো না দেয় এবাদ সাধিয়া।

নাগিনী — মা জননী আমি যদি মেন্ড ঘরে প্রবেশ করিতে পারি তবে সত্য লখিন্দর কে দংশন করব। তখন শুনিয়া নাগিনীর কথা। আনন্দে আস্তিক মাতা নাগিনী কুতুলিয়া লইল কোলে। চুম্বন করিয়া মুখ। মন মধ্যে মন সুখ। নাগিনীক তুলিয়া লইল রথের উপর। রথ বয়ে যায় তখন যথা মেন্ড ঘর।

পদ্মা — ওরে নাগিনী এই যে মেন্ডঘর, এই ঘরে প্রবেশ কর।

নাগিনী — জননী তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনে লখিন্দরকে দংশন করে আসি।

বলানি — ঘুরিয়া মেন্ডোর দ্বারে চৌতুর দিকে না পাইল পথ। ফিরে আসি নাগিনী করে দন্ডবত।

নাগিনী — মা গো আমি পারলাম না কারণ চৌতুর দিকে দেখিলাম কোথাও কোন ছিদ্র নাই এক জাগায় একটি সামন্য ছিদ্র সেই ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে পারলাম না মা।

পদ্মা — ওরে নাগিনী যাও যাও তোকে দিব বর। তোর তনু হবে সুতার সঞ্চার।

(গীদালের বলানি)

বলানি — তখন ডান হস্তে নাগিনী ঢুলায় শতবার। নাগিনির তনু হইল সুতার সঞ্চার। নাগিনি প্রবেশ কর মেন্ডের ভিতর। দেবগণ জানিল মরিল লখিন্দর।

(নাগিনীর মেন্ডঘরে প্রবেশ)

গীত — আর দেখিয়া বালার রূপ বিদরিয়া আমার বুক। হায় রে, কেমনে দংশিব লখিন্দর। যেমন বালার পালঙ খান। তেমন হয়েছে কাম। হায়রে তেমনি সুন্দরী আছে কোলে।

উপ চিতান — উঠহে বানিয়ার ঝি নিদ্রা সুখে কর কি। হায় রে উঠিয়া তোর পতি রক্ষা কর। আর চাঁন্দে না দেয় ফুল পানি। ধনের পুত্র করিব হানি। ওকি হায় রে মরিবে তোর প্রাণের ঈশ্বর।

নাগিনী — শত চেষ্টা করার ফলেও বেহুলা কে জাগাইতে পারলাম না। কিন্তু তারা তো নিষ্পাপ। আমি কেমন করে লখিন্দর কে দংশন করব।

পদ্মা — ওরে নাগিনী তুমি এখনও লখিন্দর কে দংশন করনি। ওরে নাগিনী যত কথা কহিলে মাগো মিথ্যা হইল সকল। এখন না শুনি তোমার ক্রন্দনের রোল। বালা কে দংশিতে যদি তোমার লাগে দুখ। কেমনে কাল সর্পের আগে দেখাইবে মুখ।

বলানি — পদ্মার বচনে নাগিনী ক্রোধে হেন জ্বলে। ভিরিয়া বসিল নাগিনী বালার বাম পদ তলে। অঙ্গ মোরা দিল বালা দুর্জনের বল। নাগিনীর মস্তকে ঠেকিল পদ তল। হিত বুঝাইতে লাত্থি মারিল মোর শিরে। এই ছিদ্রে করিব ঘা বালার শরীলে। তখন ধর্ম কর্ম সাক্ষী রাখে নাগিনী। চাঁদের বেটা বিবাদিয়া হিতে মারিল লাথি। বালার বাম আংগুলে তখন মারিল কামর। সহিতে না পারে বিষ করে ধর পর।

পদ্মা — ওরে নাগিনী পূর্ণ হইল মোর মন সাধ। নেও বাপু প্রাণ প্রসাদ চল যাই আপন ভবন।

নাগিনী — মা গো আমার আশা ছাড় নিজ দেশে যাও। ভাগ্যে থাকিলে দেখিব দুই পাও। মনুষের পরশে আমার তনু হইল ভারি, সুতার সঞ্চার পথ যাইতে না পারি।

লখিন্দর — একি হঠাৎ আমারর পায়ে কে দংশন করিল। উঃ আমি যে আর দংশনের জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছিনা সুন্দরী।

লখিন্দরের গীত — ওরে এমন সময় আমার প্রাণ যায়। ওকি সুন্দরী তোমাকে পালিবে কে। আর উঠ সুন্দরী তুল গাও। ডাকেয়া দে মোর বাপ ও মাও। ও কি সুন্দরী আসিয়া ভাই করুক প্রতিকার।

চিতান — ও সুন্দরী তোর বাপের বাড়ি গেনু, বাটি ভরা মুই দান পানু, ও কি সুন্দরী তাতে আসিল ভাই আগুন চেওয়ারী।

উপচিতান — আগুন চেওয়ারী রিমি ঝিমি মোর করে গাও। সুন্দরী আজি বুঝি মোর না বাঁচিবে প্রাণ।

উপচিতান — আজি কাঁন্দে সুন্দর নখাই,আজি দুঃখিয়ার দুঃখ যেমন গে সুন্দরী পথে বাজায় বেনা। তার চাহিতে অধিক দুঃখ গে সুন্দরী বাপে বেটায় ঢেনা।

চিতান — হাঁড়ি উবুর পাইলা উবুর গে সুন্দরী। আড়ির বড় সুখ ভাঙা ঘড়ে বৃষ্টি পড়ে গে। সুন্দরী আড়ির বড় দুঃখ।

চি তান — দুঃখিয়ার দুঃখ যেমন গে সুন্দরী যার ঘাটে ভাঙা নাও। তার চাহিতে অধিক দুঃখে সুন্দরী যার ছাইলার মরে মাও।

(বলানি)

হাটুয়ায় উঠিল বিষ পাইল চৈতন। কমরে উঠিল বিষ বলিল বচন। বুকতে উঠিল বিষ চক্ষু হইল ঘোল। মস্তকে উঠিল বিষ ছাড়িলেন বোল। প্রাণ ছাড়িল গন্ধ বানিয়ার পুত। তার জীবকে নিতে যায় যত যম দুত

যম রাজ — ওরে দূত গণ শুন সমাচার প্রাণ ছাড়িল গন্ধ বানিয়ার পুত তার জীব কে আনিতে যাও তোরা সকল দূত।

দূত — আপনার আদেশ আমার শিরধার্য মহারাজ।

(প্রস্থান)

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা — ওরে দূতগন এই লখিন্দর প্রাণ নিয়ে তোমরা কোথায় যাবে।

দূত — কেন যম রাজার কাছে। সাপে বাঘে সংহারিয়া ডুবিয়া মরে জলে সবাকার বান্ধিয়া লয়ে যায় জমের বিদ্যমানে। পাপ পুণ্য বিচার যমে তার পতি। হেন মৃতা রাখিতে পার তোমার কি শকতি।

পদ্মা — ওরে দূতগণ তোমরা শুন এক বার। এই জীবের উপর নাই অধিকার। বিবাদিয়া মিথ্যা আমার যমে কি না মানে। হেন মিথ্যা লয়ে যাও যমের বিদ্যমানে। শুন দূত্যগণ গর্ব না কর। যম রাজা হয় আমারর ঘরের নফর। বল গিয়ে দূত। সাজিয়া আসুক মরদের পুত।

দূত — শুন পদ্মা আমার বচন। বিনা যুদ্ধে না দিব লখিন্দের প্রাণ।

(উভয় যুদ্ধ) (প্রস্থান)

(যমের প্রবেশ)

যম — দূতগণ তোমরা কি বালার জীবন নিয়ে এসেছ?

দূত — পাই নাই মহরাজ।

যম — কেন পার পার নাই দূত?

দূত — শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন। তোমার কার্যে গেলে এত অপমান। যাহার তোমার নাই অধিকার। কি জন্য আমাকে পাঠাইলেন গঁসাই। জীব লইয়া আসি বানিয়ার জীব খানি। মধ্য পথে কারিয়া লইল শংকর নন্দিনী। তোমাকে অনেক বচন বলে দূত। আরো বলে যম রাজা আমার ঘড়ের নফর।

যমরাজ — সাজরে সাজরে দূতগণ সাজরে সমরে। কোন মতে জীব কে না দিব যেতে ময়না নগরে।

দূত — চলুন চলুন মহরাজ (জয় যম রাজার যয়)।

(প্রস্থান )

(বলানি)

কাড়িয়া লইল জীব আর বলে মন্দ। সেই কারণে যমে পদ্মায় বাজি গেল দ্বন্দ্ব। যমে পদ্মায় বিবাদ করে শঙ্কর জানিল মনে। নারদ কে ডাকিয়া কথা কয়।

শিব — শিব বলে নারদ তুমি বাক্য মোরে ধর। তুমি যায়া যম কে বুঝাও। হরের নন্দিনীর সাথে। বিবাদ করে কি কারণে। তখন শিবের আদেশ পায়। নারদ শীঘ্র গতি যায়। (যম ও দূতগণ প্রবেশ পরে নারদ)

নারদ — শুন শুন যম রাজ শুন বচন। কি জন্যে সাজিয়াছ এতক সাজন।

যম — প্রাণ ছাড়িল গন্ধ বানিয়ার পুত। তাহার জীব আনিতে যায় আমার যত দূত। কাড়িয়া লইল জীব আর বলে মন্দ। সেই কারণে পদ্মার সঙ্গে বাজে গেল দ্বন্দ্ব।

নারদ — শুন শুন যম রাজ অবলার সঙ্গে যেবা করে রণ। জিতিলে পৌরষ নাই হারিলে মরণ। ইহার বার্তা তুমি শিব কে জানাও।

যম — তাই করব নারদ।

(প্রস্থান)

বলানি — তখন কন্দল ভাঙ্গিয়া মুনি করিল গমন। পদ্মার সাক্ষাতে দিল দরশন।

পদ্মা — আজকে দেখিব যমের মদ্দানী হরের নন্দিনী সনে বিবাদ করে কি কারণে।

নারদ — শুন মা পদ্মাবতী। এত গুলো সর্প নিয়ে কোথায় বসতী। তোমার সাজন দেখে ফিরিল দন্ডধর। তুমি চলে যাও ময়না নগর।

বলানি — তখন ক্রন্দন ভাঙ্গিয়া মুনি করিল গমন, শিবের সাক্ষাতে দিল দরশন।

(শিবের প্রবেশ)

শিব — কৈ নারদ এখন ও যমকে নিয়ে না আসে আমার সাক্ষাতে।

যম — প্রণাম হই দেব রাজ। এই লও তোমার ঢাল তলোয়ার। যমের অধিকার প্রভু আমার নাই কোন কাম। কৃষ্ণ ভক্ত যত জীব বৈকুণ্ঠতে রয়। তোমার যত জীব কৈলাশতে রয়, কিছু গুটিক জীব লইয়া অধিকার করি। ইহার জন্য দ্বন্দ্ব করে তোমার বিষহরি।

বলানি — পদ্মা পদ্মা বলে শিব করে সমবন। হংস রথে ভর করে গেল ততখন।

শিব — শুন পদ্মা লখিন্দরের জীবটি তুমি যম রাজার হাতে তুলে দাও। আর চাওয়া মাত্র যম রাজ দিবে দিবে ততখন।

পদ্মা — পিতঃ সত্য সত্য পাব লখিন্দরের প্রাণ।

শিব — হেমা আমি বলছি তুমি লখিন্দরের জীব পাবে।

বলানি — তখন বাপের আদেশ মানে শংকরের ঝি। যমের হস্তে দিল বানিয়ার জি। জীব লইয়া যম রাজ গেল যম পুরী। বাসরে চৈতন্য পাইল বেহুলা সুন্দরী।

বালি — একি স্বামী আমার ধূলায় লটিয়ে পড়েছে। আর সর্বাঙ্গ তার কালো হইয়াছে।

গীত — ওরে আমার কপালে দুঃখ লেখাছে গঁসাই। এ দুঃখিনীর আরত কেহ নাই।

স্বামীর শরীরে বালি হস্ত দিয়া চায়। দেখিল অচেতন তনু পাথর পরিচয়। স্বামী স্বামী বলে বালি হে বালিশে দিল কোল। আর তুলার বালিশ না ছাড়িল বোল। ঘুড়িয়া মেন্ডের দ্বারে বালি চৌদিকে চায়। জীব জন্তুর বেহুলা বালি কোথায় নাহি পায়। তুলিয়া পাটের মোড়া ঝাড়ে বেহুলা বালি। ভুমিতে পরিল দুষ্ট একাল নাগিনী। নাগিনী দেখিয়া বালা ক্রোধে কম্পবান। পদ্মার নাগিনী তোক করিম খান্ড খান। স্বামি কে মারিয়া তুই ফিরিয়া যাব ঘড়। অবশ্য করিম তোক স্বামীর দোশোর। সাপিনী মারিলে হব সাপিনী পাপিনী। সপুরাতে বন্ধ করি একাল নাগিনী। পানের সপুরা বালি আনে টান দি। সপুরাতে বদ্ধ করিব পদ্মার নাগিনী।

(এইখানে ধন্বন্তরি বাঙ্গ অভিনয় করে পালিয়ে যায়)

বলানি — বেহুলা করুণা করে স্বামীর মরণে, বাসরের চৈতন্য পায় সনেকা সুন্দরী।

সনা — স্বামী স্বামী ওগো স্বামী তুমি কোথায়। তুমি ঘুমের ঘোরে বিভোর হয়েছ। আমি মেন্ডঘরে ক্রন্দন শুনিতেছি।

চাঁদ — ছিঃছিঃ সোনা তোমার নাই কোন জ্ঞান। পুত্র বধু রঙ করে তাতেও দিস তুই কান।

সনা — না, না স্বামী সেই ক্রন্দন নয়। এ মৃত্যুর ক্রন্দন।

বলানি — তখন স্বামীর কথা সনাতন প্রত্যয় নাহি পায়। মেন্ডার দ্বারেতে গিয়া কর্ণ পাতে শোনে।

বেহুলা করুণ করে স্বামীর মরণে।

গীত — ভাই সখী বান্ধব সখী কপাট ঘুচাও। খাইল সুন্দর পুত্র কার মুখ চাও।

(উঠিয়া বেহুলা তখন কপাট ঘুচায়। হাহাকার করিয়া সনা মেন্ডতে সোন্দায়। পুত্রের দেখেন সোনা উপস্থিত কাল। মরা পুত্র কোলে লইয়া ধাকুরে কপাল।)

ধূলাতে পড়িয়া সোনা যায় গড়াগড়ি মস্তকের উপর সোনা তুলিয়া মারে বারি।

চাঁদ — ওগো বধূ মা তোমার কি হয়েছে।

গীত — আজি কেন কান্দো বধূ মা গো ও বধু মা প্রাণে কত শয়। সহিতে সহিতে প্রাণ মোর সহন না যায়।

চিতান — আর অন্যের ঝিয়ারী আনিয়া হাঁড়িত পারে কালী। আনিলাম বাশ্যের বেটি সাজোয় হইল আড়ি। আর সন্ধ্যা বেলা ডাক বধূ মা আমায় হাসিয়া খেলিয়া। নিশি প্রভাতে ডাক বধূ মা কান্দিয়া কটিয়া।

বেহুলা — ও গো শ্বশুর বাপ তবে হলে আমার একটি কথা শুন বাবা।

গীত — আর আজি পুত্র মরিল বাবা আমায় না দিয়ো দোষ। কাটা ঘায়ে কত দিবেন জামুরীর রস।

চিতান — আর আজি পুত্র মরিল বাবা আমার কুলক্ষণে। অগ্রে তোমার ছয় পুত্র মরিল কেমনে।

চাঁদ — ওরে লেঙ্গা শুন মোরে ভাই এই কুল বধূ কি বলিছে বলাই।

লেঙ্গা — তাই তো সদাগর মহাশয় এই ছয় পুত্র মরণের খবর জানিল কেমনে।

চাঁদ — আর বানিয়া টেন টনির বেটি বানিয়া টেন টেনী। ছয় পুত্র মরণের খবর যানিল কেমনি।

বলানি — তখন হস্তে লাঠি লইয়া সাধু ছাড়িলে বাড়ি। তাহাকে দেখে পালায় তখন রঝা ধনমতরি।

ধন্বনতরি — আর বুঝি এই চাম্পলা পুরীতে থাকিতে পারলাম না।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ — ওরে ধন্বনতরী শুন মোরে ভাই তুমি থাকিতে কেন মোর মরিল নখাই।

রঝা — নিদ্রা দিয়া সাধু করিল অচৈতন। চুলিয়া পরিলাম সবে জানিব কেমন।

চাঁদ — ওরে ধন্বনতরি শিবের ভরশা করি। না পূজিলাম বিষহরী। সেও শিব না ধরে কান্ডার।

রঝা — তবে সদাগর মহাশয় ঐ সাওতালী পর্বত হইতে আনো মহা ঔষধখানি। এখনো জিয়াইতে পারি তোমার মরা পুত্রখানি।

চাঁদ — ওরে ধন্বনতরি আজ যদি দাও তুমি মরা পুত্র দান। সত্য চাম্পলা পুরী তোমায় অর্দ্ধেক করিব দান।

রঝা — হ্যা সদাগর তাহলে একটু চেষ্টা করি।

(রঝার গমন)

বলানি — ঐ কথা শুনিয়া রঝা চাঁদের অনুমতি পায়। শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া ঔষধ আনিতে যায়। ঔষধ আনিতে চলে মহা কাল গুণী মধ্যে পথে দাঁড়িয়ে রয় চেংমুড়ি কানি।

(কমিক) (রঝার)

বলানি — বিবাদে ঈশ্বরী পদ্মা নানা মায়া জানে রঝার গৃহিনীর ভগ্নী রূপ ধরিল ততক্ষনে।

(মায়া বোন) — ও গো দিদি বলতো বৈনা রঝা ধন্বনতরি কোথায় গিয়াছে।

কমলা — বিবাদে মেরেছে পদ্মা চাঁদের পুত্রখানি। তাকে জিয়াইতে গেছে তোমার বৈনা ধন্বনতরি।

মায়া বোন — ওগো দিদি পদ্মা তো সামান্য নয় শুনি। কি কারনে গেল বৈনা রঝা ধন্বনতরি। বিবাদে ঈশ্বরী পদ্মা নানা মায়া জানে। এক তিলে রঝাক তোমার বধিবে পরাণে।

কমলা — ও গো বোন তুই ভালয় কহিল মাও। কার শক্তি আছে আমার রঝাক চড়াবে।

মায়া বোন — ও দিদি তা হইলে তোমার রঝার মৃত্যু নাই।

কমলা — মৃতুর কথা আমি বলব না বোন।

মায়া — ও গো দিদি বাক্য মোর লও। রঝার মৃতুর কথা আমায় বলে দাও।

কমলা — দেখিতে না পায় রঝা যে সকল স্থান। মূল স্কন্ধে দংশিলে হয় রঝার মরণ।

বলানি — কথা শুনিয়া পদ্মা তখন মনে আনন্দিত। কাকরূপে পদ্মাবতী উঠিল আকাশে। আনন্দে তক্ষ নাগ চড়াইল গাছে। হেঁট মুন্ডে ধনমতরি চলে সেই পথে। মূল স্কন্ধে দংশিল রঝার আয়ু হইল শেষ।

রঝা — ওরে শিষ্যগণ তোরা বাক্য মোরে ধর। ঔষধ আনিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।

শিষ্যগণ — ও গো গুরু আমরা ঔষধ নাহি চিনি। কেমনে আনিব মোরা মহা ঔষধখানি।

রঝা — ওরে শিষ্যগণ শুন ইহার হেতু। ধরিবে কপুরা পাখী করাইবে মৃত্যু।

শিষ্য — তারপর তারপর গুরু।

রঝা — মৃতকপুরা বেড়াইবে প্রতি গাছের তলে। কুপুরা জীব দান পাবে সেই ঔষধের গন্ধে। সেই গাছ আন তোরা আমার বিদ্যমানে।

বলানি — তখন ঔষধ আনিতে শিষ্যগণ করিল গমন। বিবাদে ঈশ্বরী পদ্মা বিবাদে দিয়েছে মন। বিবাদে ঈশ্বরী পদ্মা নানা মায়া জানে। রঝার গৃহিনী রূপ ধরিল ততখনে।

(কমলা সুন্দরী প্রবেশ)

কমলা — ওরে শিষ্যগণ অভাগিনীর প্রাণ মোর প্রত্যয় নাহি পায়। কেমনি ঔষধ খানি দেখিবার চায়।

শিষ্যগণ — ও মা কেমন করে এত রাস্তা এসেছ মা।

কমলা — ওরে শিষ্যগণ আমার কথা কি বলব বাবা।

শিষ্য — এই লও মা মহা ঔষধ।

বলানি — ঔষধ দিল শিষ্যগণ পদ্মাবতীর হাতে। কাকরুপে পদ্মাবতী উঠিল আকাশে। ঔষধ হারাই শিষ্যগণ মনে মনে ভাবে। কেহ বলে ঔষধ আনিতে যাই। কেহ বলে গুরুকে জানাই। গুরুকে জানাইতে গেল যত শিষ্যগণ। সাক্ষাত মাত্র ধন্বনতরি তেজিল জীবন।

(এই গুরুর গতি করা হয়)

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ — আর বিষম বিবাদ করি। মরিল রঝা ধন্বনতরি। শুনে সাধু করে হায় হায় আরে লেংগা শিবের ভরশা করি। না পূজিলাম বিসহরি। সেও শিব ভাই না ধরে কান্ডার। ওরে লেংগা শুন মোরে ভাই। নেহ মরা পুত্র চল গড় গড়িয়া যাই। যে পুত্র মরিছে ভাই তারে কি বা দয়া। বাহির কর মরা পুত্র নিদারুন হয়া। গড় গড়িয়া ঘাটে গিয়ে অনলে পোড়াই। পদ্মাবতীর মুখে দিব মাটি আর ছাই।

বালি — ওগো শ্বশুর বাপ আমার একটি কথা শুন বাবা।

গীত — ও কি ও হে শ্বশুর বাপ। স্বামীকে না মারো পুড়িয়া শ্বশুর বাপ হে। বাবা তোমার পুত্রের সনে অনুমতি দাও যাবো ভেসে। বাবা সাজিয়া দাও মোর কদলীর ভুরা শ্বশুর বাবা হে। বাবা পাঁচ গাছি কেলা ছয় অধিক কাটিবে যায়, বাগানে তার ছিড়াইবো গলা।

চাঁদের গীত — আমি বলি বধূ মা তোকে কেলা দিব না। কেলা বেচাম আনা আনা মচকা দেড় বুড়ি। তাক খায়া বাচিম হামরা দুই বুড়া বুড়ি। বুড়া হমো বৃদ্ধ হমো লবন কোথায় পামো। পুড়িয়া কেলার মুড়া তাকে খার খাম।

বেহুলা — বাবা তোমার পুত্রের সনে। অনুমতি দাও যামরে ভেসে। সাজাই দাও মোক কদলীর ভুরা।

চাঁদ — ওরে জ্ঞাতি বন্ধু শুন মোরে ভাই শুভক্ষনি বধূ কি বলে বলাই।

জ্ঞাতি — জ্ঞাতি বন্ধু বলে চাঁদের কেলায় বড় মন। পুত্র বধূর চেয়ে চাদের কেলায় বড় ধন।

চাঁদ — আমি বলি লেঙ্গা প্রাণ বাক্য মোরে ধর। পাঁচগাছি কেলা কাটে ভুরা তৈরী কর।

বলানি — চাঁদের বচনে তখন লেঙ্গা চলে ঘাটে। বাগিচায় যাইয়া তখন বাছিয়া কেলা কাটে। এক ঝাড় কাটিতে শএক ঝাড় পড়ে। চাঁদের সৈন্যগন তখন উবাইতে না পারে। ধুপ করিয়া ফেলায়

কলার ভার। শুনিয়া চাম্পলা পতি হইল চমৎকার। কেহ বলে ভাই ভুমি কম্প যায়। কেহ বলে বেহুলার কলা লেংগায় উবায়। যত কলা কাটিয়া কলার করিল ধাপ। স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায় গড় গড়িয়ার ঘাট। যত কাল উবিয়া কলার করিল হালি। চিড়িয়া মাকেলা বাঁশ করাইল ডিঘালি। দৈর্ঘ্যে দিল দশ হাত। প্রস্তে হাত দশ। ভিরিয়া ভুরাক তখন করিল চৌরাশ। সমান করিয়া ভুরার কাটে চারি কোন। সেই ভুরা জলে ভাসে এক শত জোয়ান।

চাঁদ — ওরে লেঙ্গা আর দেরী নয়, তুমি অতি সত্তর মরা পুত্র ঘর থেকে বাহির কর।

সদাগরের গীত — বাচ্ছা মোরে বাইর কর রে ওরে সনার পুতুলা মানিক বাচ্ছা বাইর কর রে। বালাকে যে বাহির কর পালঙ্ক হইতে।

(বলানি)

(বেহুলাকে বাহির করে চৌডলা হইতে। ঘর হইতে বালাক তখন আঙ্গিনায় সোয়াইল। সিতানে পৈথানে তখন তুলসি গাড়িল। রাম নাম হরির নাম কপালে লেখে দিল।)

বেহুলা — ও গো শাশুড়ী মা তবে হলে আমার একটা কথা শুন মা।

গীত — ও শাশুড়ী মা এই বেলায় মোক ছাড়ো ভাগ্যে থাকিলে ও মা ফিরি আসি দেখা হবে আর।

চিতান — আর না কান্দ ও মোর শাশুড়ী সোনা মাও। না কান্দ ও মোর আড়ি ছয় জাও।

চিতান — আর না কান্দ আমার শ্বশুর সদাগর। সুখে যেন থাকে বাবা চাম্পলা নগর।

চিতান — আর রাম গেল বন বাসে সঙ্গে লইয়া সীতা। পুত্র শোকে কেন্দে মরে দশরথ তার পিতা।

বেহুলা — ও গো শ্বশুর বাবা আর একটু অপেক্ষা কর বাবা।

গীত — আর থাক রে থাক রে অন্ন ব্যাঞ্জন পাতিলের ভিতর। বাসি না হবু তুই এই সতীর বর। আর পুস্পের পালঙ্ক খানি না হব মৌলান। অবশ্য স্বামী আমার করিবে শয়ন। আর তিন তলা তৈলো দিয়া জ্বালেয়া দেছ বাতী মোর সতীর ঘরে তুই জ্বলিবো দিবা রাতি। আর থাক রে সতীর মেণ্ড মাকেরায় জড়েয়া। শেকুনে শিয়ালে হাগুক তোর মস্তকে বসিয়া। থাকরে থাকরে সতীর মেণ্ড তোকে দেছ চিন। মোর সতীর ঘরে লাগিব বজ্রখিল।

বলানি — তখন যত গাভুরিয়াগণ হরিগুণ গায়। স্কন্ধে করিয়া গড় গড়িয়া যায়। স্বামীর সমন্ধে বালি খই কড়ি ছিটায়। গড় গড়িয়া ঘাটে হইল উপস্থিত। বিরচিয়া করি গান মুধর সঙ্গীত

বেহুলা — বালি বলে শ্বশুর বাবা বাক্য মোরে ধর। কুপুরা পক্ষী আমায় একটি দাও।

চাঁদ — সোনার নয় বুড়ি কড়ি লইল কমরে বান্ধিয়া। নব কোচের গৃহে চলিল হাটিয়া। চাঁদ বলে নব কোচ বাক্য মোর লও। আবল কুপুরা পক্ষী আমায় একটি দাও। তাহার হস্তে করি তখন

দিলেন ঢালিয়া। আবল কুপুরা পক্ষী লইল কিনিয়া। সাধু বলে আমরা বানিয়া জাতি। কুপুরা পক্ষী নারিলে ধরিবে জ্ঞাতি। কুপুরা পক্ষী দিলেন তখন নব কোচের হাতে। হাটিয়া চলিল তখন গড় গরিয়ার ঘাটে। গড় গড়িয়া ঘাটে যাইয়া হইল উপস্থিত। বিরচিয়া করিগান মধুর সঙ্গীত।

বালি — ও গো শ্বশুর বাবা বাক্য মোর লও। সোলার মঞ্জুশ একখানা তৈরী করে দাও। সোনার নয় বুড়ি কড়ি লইল আঁচলে বাধিয়া। নবশান মালাকরের বাড়ি চলিল হাটিয়া। সাধু বলে নবশান বাক্য মোর ধর। সোলার মঞ্জুস একখানি তৈরী করে দাও।

বলানি — তখন মুঞ্জশ নিরমান করে মালি হাতে লইয়া কাতি। তার পরে লেখে মালি দেবী ত্রিশাল কৌটি। করিলেন তিন থর বান্ধিলেন মেণ্ড ঘর। আর কাটে মুঞ্জশের জালি। চাম্পলা নগরে লেখে চান্দ অধিকারী। কৈলাশতে লেখে মালি শিবের ঘর বাড়ি। উজানী নগরে লেখে বাশ্যো বানিয়ার ঘড়। তার পরে লেখে মালি হংসের জোড়। আর কত লেখে মালী লেখা যখা নাই। মুঞ্জশ লয়ে গেল সমুদ্রের ঠাঁই।

চাঁদ — ও গো বধূ মা এই লও তোমার সোলার মুঞ্জশ।

ধুয়া — ও কি ভুরা বালি ভাসিল রে ওরে সমুদ্রে সাগরেও কি ভুরা বালি ভাসিল রে। তবে ছিনান করিয়া বালাক পরাইল বসন। বিচিত্র বিছানা করে ভুরার উপর। সঙ্গেতে করিয়া লইল সর্পের সপুরা, সিতানে বান্ধিয়া লইল আবল কুপুরা। সুবর্ণের কাঠারী বালি হস্ত দিয়া ধরে। ভিরিয়া বসিল স্বামীর শিহরে। সোলার মুঞ্জশ দিয়া ভুরাক করিল ঘোর। হরি হরি বলিয়া কাটিয়া দিল ডোর। পূর্বে যেন ছিল বালার মামীহরা পাপ। সেই কারণে ভুরা খানি ঘুরে সাত পাক। স্বামীর জ্ঞাতি বন্ধু তোমরা যাও গো ঘর। তোমার মায়া বন্দি হয়ে ভুরা না ভাসে সাগর। তখন যত গাবুরিয়াগণ ধরিয়া মারে ঠেলা। তর স্রোতে ভাসে সুন্দরীর ভেলা।

বলানি — রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর। টল মল করে ভুরা জলের উপর। কয়েক দিনে পাইল দেশদানীর নগর। দানি বলে বিবাদে মেরেছে চাঁদের পুত্রখানি। বেহুলা ভাসিল সাগরের পানি। তবে আমার নারী কৌশল্যা একদিন গিয়াছিল সরবরে। তাহার স্বামী লখিন্দর বল করেছে ধরে। জানিয়া হরিছে মামী নাই কোন দোষ। সেই কেনা ধার আজি করিম প্রতিশোধ।

দানী — এ দাদা .....

বেহুলা — ও রে দানি সংকটে মিলিল এত দূর। স্বামীর সমন্ধে তুমি হও মামা শ্বশুর। ওরে দানি তুমি যে আমার মামা শ্বশুর হবে।

বলানি — সেইক্ষনে বেহুলা কোন কর্ম করে। পদ্মাবতী ডাকিয়া কথা বলিল সত্তরে। নামিল পদ্মাবতী সন্ধান জুড়িয়া। ভুরা ছুইতে দানির চক্ষু হল কানা।

(কমিক)

দানী — মা বলিয়া ডাকি মা গো গণিয়া প্রমাদ। চক্ষু দান দাও মাগো কর আশীর্বাদ। না জানি আমি মা তুমি মহাসতী। সেই কারণে হইল আমার এতক দুর্গতি।

বেহুলা — আমি বলি বেটা তুমি ঘাটে উঠে যাও। ঘাটে উঠে গেলে তুমি চক্ষু দান পাও।

বলানি — তখন রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর। টল মল করে ভুরা জলের উপর। বিবাদে ঈশ্বরী পদ্মা নানা মায়া জানে। পাটুনি হইয়া পদ্মা ডাকে ঘনে ঘনে। পাটুনি বলেছে মা বেহুলা সুন্দরী দহাই লাগে রাজার ঘাটে দাও কড়ি।

(পাটুনি শুকোর নিয়ে প্রবেশ)

পাটুনি — তুমি মাগো বড় সতী। দহাই লাগে রাজার তোমার ঘাটে দাও কড়ি।

বালি — ওরে পাটুনি মৃতা লইয়া জলে ভাসি আমি মৃত্যুর সমান। আমার নিকট পয়সা চাও তোমার নাই জ্ঞান।

পাটুনি — না পয়সা না হলে তোমাকে যেতে দিবনা।

বালি — হায় ভগবান এখন আমি কি করি কোথায় কড়ি পাই। ও গো স্বামী তুমি কয়া দাও। কি করে এই পাটুনি ঘাট থেকে পার হয়া যাবো।

পাটুনি — না না আমি তোমার কোন কথা শুনব না।

গীত — আর ভিক্ষা দাও নগরবাসী স্বামী লয়ে জলে ভাসি ও কি হায় রে। ঘাটের পাটুনি করেছে আটক।

চিতান — আর যে জনার দয়া হবে কিছু ভিক্ষা আমায় দিবে। হায় রে তারে আমি হব দাসের দাসী।

চিতান — পূর্ব জনমের ফলে। স্বামীক মোর খেয়েছে সর্পে। মিথ্যা লইয়া ভাই জল মধ্যে ভাসি।

চিতান — আর কে আছে এমন জন। জিয়া দিবে মোর স্বামী ধন। তারে আমি হব দাসের দাসী।

চিতান — আর দিনা চারি আগ আর পাঁচ। কার বা ডেরো কার বা মাছ। হায় রে জল শুকালে মাছের কি বা গতি।

বালি — ওরে পাটনি। এই লাও তোমার ঘাটের কড়ি। আর আশা দাও বড় সুখে যেন যাই কৈলাশ নগর।

পাটুনি — জয় হোক জয় হোক।

বলানি — তবে রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর। টল মল করে ভুরা জলের উপর। বিবাদে ঈশ্বরী পদ্মা বিবাদে দিয়াছে মন। বিবাদে ঈশ্বরী পদ্মা নানা মায়া যানে। মেনকা রূপ পদ্মা ধরিল ততখনে। মেনকা বৈলাছে মা বেহুলা সুন্দরী। ছাড়িয়া না যাইস মা তুই কোলা করিয়া খালি। বড় দুঃখে পুছিনু মা কোঠোর তব মন মৃতা লইয়া জলে ভাস কি কারণ।

বালি — সত্য হইস যদি মোর সোহাগিনী মাও। এক ধার ক্ষীর আমায় দিয়ে যে পাঠাও।

বলানি — ঐ কথা শুনিয়া পদ্মা আনন্দিত মন। ছেতেনেতে তখন বান্ধিল দুই স্তন। ধরিয়া পদ্মা তখন মারিল হুঙ্কার। মুখে না পরে ক্ষীর। পরে ভুরার উপর।

বালি — ও গো মা তুমি আমার সোহাগীনী মাও নও।

বলানি — তবে ও মতে পদ্মাবতী না পারে ছলিবার। ফিরিয়া গেল পদ্মা মায়া ধরিবার। রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর। টল মল করে ভুরা জলের উপর। সাত দিনে পাইল দেশ আলসিয়া নগর। আলসিয়া নগরে হইল গোদার বাস বাড়ি। নগরেতে ধার দেয় দেড় বুড়ি কড়ি। ন কাহন ছিপ গোদার ছালা খানেক সুতা আর ন কাহন ফলিতা। গোদার বড় ঠাট রে গোদার বড় ঠাট। মাওগের পাটানী গোদা টেরিয়া বান্ধে পাক। হাড়িয়া খলই লইল গোদা কমরে বান্ধিয়া। মৎস মারিতে চলে গোদা ত্রিপানী লাগিয়া। প্রথমে গাথিয়া দিল ডাং বোল্লার টোপ। সাগরে চান্দা মাছ খায় গোটা গোটা। শাল শোল মারে গোদা ডাঙাতে ফেলায়। আহেলা ডারিকা মারে গোদা খলইতে ভরায়। শাল শোল মৎস খাইতে বড় মজা। আহেলা ডারিকা বেচয়া হাতের কিনে শাঁকা তার পরে গাথিয়া দিল ডাং বেল্লার টোপ। কন্যা কে দেখিয়া গোদা মোচরায় পাকা গোপ। কন্যা কে দেখিয়া গোদা আনন্দিত মন। দুই হাতে তালি দিয়া জুড়িল নাচন।

গোদার গীত — ওরে অবলা নারী পরম সুন্দরী হে। (ডাকে গোদা ঘাটের উপর।)

চিতান — ও কন্যা কার বা ঘরের বিদ্যাধরী। জলে ভাস একেশ্বরী। কন্যা প্রাণে কি তোর নাই কোন ভয়।

বেহুলার গীত — ও গোদা ঘাটে বসে মৎস মার, কেন গোদা ডাক পার হে ও গোদা আমি নারী ভাই বড় অভাগিনী

চিতান — ও গোদা পূর্ব জনমের ফলে। স্বামী কে খেয়াছে সাপে মৃত লইয়া ভাই জল মধ্যে ভাসি।

উপচিতান — ও গোদা কে আছে মোর এমন জন, জিয়া দিবে মোর স্বামী ধন, তারে আমি ভাই হব দাসের দাসী।

গোদা — ও কন্যা করো পাচা পরিহর। কস্তুরী চন্দন পর। মৃত্যুকে ফেলিয়ে চল ঘর।

গীদাল — তবে শুনিয়া গোদার বানী মনে মনে হাসে বেহুলা সুন্দরী। হাসে বালি ভুরার উপরে বসি।

বালি — বুঝিলাম তোমার গুণ হে। ও গোদা ঘরে তোমার কয় জনা নারীরে ও গোদা কয় নারী করে কি। ঘরের আছে কি ও গোদা আর তোমার কয় কেনা পুতরে।

গোদা — ও কন্যা আমি বলি বিদ্যাধরী ঘরে আমার দুই নারী ও কন্যা ছোট মাইগ ঘরের গৃহিনী। ও কন্যা বড় মাইগ আছে আর বেচি-কিনি কর্ম তার ও কন্যা আমি তারে বড় দয়া করি।

বেহুলা — ও গোদা তোমার ছোট বউয়ের আকৃতি কেমন।

গোদা — ও কন্যা ধামনা বসন্তের বেলা দুই চক্ষু হইয়াছে। ও কন্যা কানী বলিয়া ডাকে পাড়ার লোক।

বেহুলা — ও গোদা বল তো বড় বউয়ের আকৃতি কেমন।

গোদা — ও কন্যা ছোটতে হইয়াছে ঘা। খোরা হইছে দুই পা হে। ও কন্যা খুরি বলিয়া ডাকে পাড়ার লোক।

বেহুলা — ও গোদা আর তোমার কে কে আছে।

গোদা — কন্যা বিধু মাতা আছে আর ভরসা না কর তার। ও কন্যা আর আছে দুই কেনা পুত রে।

বেহুলা — ও গোদা বল তো ছেলে দুইটির নাম কি।

গোদা — ও কন্যা পাড়ার লোকের কাম বাছিয়া রাখিসে নাম। পোড়া মুখা হনুমান আর ভূত।

বেহুলা — ও গোদা বলতো তোমার বাড়িটি কেমন।

গোদা — ও কন্যা চার পাকে নাই চাটি মাঝিয়াত নাই মাটি। ও কন্যা থাকিয়া মুই দেখঙ স্বর্গের তারা হে।

বেহুলা — ও গোদা বলতো তোমার ঘরে তোমার কি কি সম্পদ আছে।

গোদা — ও কন্যা ঘর মধ্যে সরবর। ভাঙ্গের গুরা গড়া গড়া। মৎসের শুকটা দোন চারি।

বেহুলা — ও গোদা আমি পাইলাম বড় ডর। কেমনে বঞ্চিব আমি দুই সতিনের ঘর। যাও যাও গোদা তুমি ফিরিয়া যাও ঘর। কানী খুঁড়ী দুই মাইগাক পিটিয়া বাহির কর।

বলানি — কন্যার বচনে গোদা ফিরিয়া গেল ঘর। যাইয়া ওখরাইল গোদা দুয়ারের গোঁজ। কানী খুঁড়ী দুই মাইগক বেরাবেরি কোপ।

বলানি — তরাসে পালাইয়া যায় কানী আর খুঁড়ী। পাছা বেড়া ভাঙ্গিয়া পালায় গোদার মাও বুড়ি। দুই মাইগাক বলে তোরা অন্য দেশে যাও। দুই পুত্র লইয়া তোরা ভিক্ষা করে খাও। ঘর দুয়ার

পুড়িয়া গোদা করিল ছার খার। কন্যার আদেশে গোদা চলে পূণর্বার।

গোদা — গোদা বলে নিকটে দেখিলাম তোমার কদলির ভুর। আমাকে ছাড়ি পালাবে কত দূর। মনের হরসে গদা সাঁতার কাটায়, গোদা পায়ে ঠেলা মারে বাঁকে বাঁকে যায়।

বেহুলা — ও গো মা পদ্মা আমি ঠেকিলাম দুষ্ট বেটার ঠাঁই। তুমি বিনে আমার মাগো আর রক্ষা নাই। কৃপা করে তাকি মাগো আস্তিকের জননী। পড়িলাম দুষ্টের হাতে কি না হবে গতি।

বলানি — তখন বালির মিনতি পদ্মা জানিল অন্তরে। সেই খানে পদ্মাবতী কোন কর্ম করে। ঠ্যাং ধরি গোদার তখন মারিলেন পাক। উঠু ডুবু করে গোদা ঢোকে পানি খায়। হলদিয়া বেঙের মত চোখ দুইটা হয়।

বেহুলা — গোদা তুমি ফিরিয়া যাও ঘর। পাইবে অমূল্য নিধি সতী কন্যার বর।

বলানি — গোদা গেল মন্দিরে বেহুলার ভুরা ভাসে। হেন কালে দিবাকর ডুবিল আকাশে। দিবাকর অস্ত গেল মহাভয়ঙ্কর। ভয় পেয়ে বেহুলা তখন স্বামীক কলে কর। তখন রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর। টল মল করে ভুরা জলে উপর। জলের উপর বালির পহরেক হইল বেলা। উজে আইশে শঙ্খ সাধুর ভেলা।

(বেহুলার গীত)

ও কপালে লেখাই ছে দুঃখ। প্রাণ স্বামী বিনে আমার এই হল।

চিতান — কোন বা সাধু ভাসে আইসে হে কোন্ বা লংকেশ্বর। নৌকাতে তুলিয়া দিছে সাধু লাল ডুমুর সত্তর।

চিতান — তবে সত্য জনা হলে আমি হে মাগিয়া লব বর। দুষ্ট জনা হলে আমায় লয়ে যাবে ঘর। জলের উপরে ভুরা টল মল করে। দুর হইতে শঙ্খ সাধু ভুরা দৃষ্টি করে।

শঙ্খ সাধু — ওরে কাণ্ডারীগণ বাক্য মোরে ধর। কি বা নিধি ভেসে আসে জলের উপর।

কাণ্ডারী — তাই তো সদাগর মহাশয়। এ কে বারে পরিপুষ্ট জোছনার ন্যায়।

বলানি — তখন মঞ্জুশ দেখিয়া সাধু বলে রাম রাম। কোন মালীর কাম নয় নবশান মালীর কাম।

শঙ্খ সাধু — কাণ্ডারীগণ বাক্য মোর ধর। চৌদ্দ ডিংগা দিয়া তাহার ভুরা বন্দি কর।

বলানী — এ মতে দুলাল কাণ্ডারী সাধুর বোল ধরে। চৌদ্দ ডিংগা দিয়া তাহার ভুরা বন্দী করে।

শঙ্খ সাধু — ওগো কন্যা তোমার সমান রূপ কন্যাহে ত্রিভুনে নাই। কি কারণে জননী তোমায় গর্ভে দিছে ঠাঁই। আমার আগে বল কন্যা যত বিবরণ। জল মধ্যে একা তুমি ভাস কি কারণ।

বালি — নই আমি সুন্দরী সাধু হে নই আমি ভুপতি। নর কুলে আমার বসতী। ও সাধু পূর্ব জনমের

ফলে স্বামীকে কে খাইয়াছে সাপে। মৃতা লইয়া ভাই জল মধ্যে ভাসি। সাধু কে আছে মোর এমন জন। ফিরিয়া দিবে মোর স্বামী ধন। তারে আমি হব দাসের দাসী।

শঙ্খ — কন্যা বাক্য মোরে ধর। মৃত্যুকে ফেলাও জলে.চল কন্যা আমার ঘর। পিতা আমার সদাগর। শিবের বরে ধনেশ্বর। রূপে গুনে কুলে আছি ভাল।

বালি — সাধু ধনের জোড়ে গর্ব না কর। ধনের না দেখাও চিন। যে জন ধনি হয় দূর দেশে কেন ভিন।

শঙ্খ — কন্যা বচন না শুনিব তোর। লাথিয়া ভাঙ্গিব তোর কদলীর ভুর। মৃত্যু কে ফেলিব জলে। টানিয়া তুলিব বলে পালাইয়া যাবে কত দূর।

বালি — আমাকে দেখিয়া সাধু না কর উপহাস। তবে ধনের জোড়ে গর্ব না কর সাধু আমার বিদ্যমান। মৃত্যু স্বামীর যোগ্য নও মৃত্যুর সমান।

শঙ্খ — কন্যা বচন না শুনিব তোর। লাথিয়া ভাঙ্গিব তোর কদলীর ভুর। মৃত্যু কে ফেলিব জলে কন্যা হে পালাইয়া যাবে কত দূর।

বেহুলা পদ্মাকে স্মরণ — ও গো মা পদ্মা তুমি মোরে মাতা। তুমি মোরে পিতা স্মরণ করিলাম পদে অধম দুহিতা। স্মরণ করিলে বাঘ না করে আহার। লইলাম স্মরণ তোমার পদে করি নমস্কার।

শঙ্খ — হাঃ হাঃ কন্যা হে বাণিজ্যে এসেছি। আমরা ছয় ভাই, বাপ ছেড়ে জেঠো বলিলে তবু রেহাই নাই।

বলানি — তখন বালির মিনতি পদ্মা জানিল অন্তরে। অনলকে ডাকিয়া কথা বলিল সত্তরে। পদ্মা বলে অনল তুমি বাক্য মোরে ধর। তুমি গিয়ে সতী কন্যার সত্য রক্ষা কর। তখন পদ্মার বচনে অনল করিল গমন। সতী কন্যার কাছে গিয়ে দিল দরশন। গরম হইয়া রহিল ভুরার চারি পাশ। হস্ত বাড়াইতে অগ্নি হইল উজ্জ্বল সর্বাঙ্গে দহিল সাধুর দারুণ অনল। সহিতে না পারে তখন অনলের তাপ। নৌকা ছাড়িয়া তখন জলে দিল ঝাপ। নিভাইতে নিভাইতে তখন বসন গেলো পোড়া। বন কাণ্ডারীগণ ধরিয়া তুলে নৌকার উপর।

কাণ্ডারী — শুন সাধু চন্দ্রপতি অন্য কেন কর মত দেখে পরার নারী।

শঙ্খ — ওরে কাণ্ডারী আমি খুব ভুল করেছি তোমরা জিজ্ঞাসা কর। তার বাড়ি কোথায় তার বংশের পরিচয় কী।

শঙ্খের গীত — পরিচয় দাও মোর কন্যা হে তবো পরিচয় দাও। কন্যা আমি বলি সদাগর। কেন ভাস বিদ্যাধরি জলের উপর। (পরিচয়)

চিতান — কেবা তোরে জন্মপিতা সহদর ভাই। কাহার ঘরে অধপতি তোমায় দিয়েছে ঠাঁই।

বালি — উজানীর লক্ষ পতি আমার জন্মদাতা পিতা। পতিব্রতা সুন্দরী মেনকা হয় মোর মাতা।

শঙ্খ — আরে বনকাই এ তো আমার মায়ের নাম। তোমারা জিজ্ঞাসা কর তারা কয় ভাই, ভাইগুলোর নাম কি।

বালি — তবে সনকাই বনকাই দাদা আমার আর হল ধর। সাধু মধু শুক্র বরেশু ছয় সহোদর।

শঙ্খ সাধু — ওরে বনকাই ওরে হলধর ওরে সাধু ওরে মধু আমি যতই শুনছি ততই আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে জিজ্ঞাসা কর ভাই তার ভাইদের বিবাহ হয়েছে কি না। যদি হয়ে থাকে তবে বৌ গুলোর নাম কি।

বনকাই — আমি তাই করছি।

বালি — তবে শুন সাধু মাধবী, মালতী, সারথি, চতুরভোমা, রোহিনী, যোগিনী — বধূ ছয় অনুপমা।

শঙ্খ — ওরে ভাই তোমরা বল তার ভাই বাড়িতে আছে না কোথাও গিয়াছে।

বেহুলা — তবে বাণিজ্যে গিয়াছে দাদা হইল অনেক দিন। দেখা যে না হইল আমার দয়াল বহিন।

শঙ্খ — ওরে বোন বল বল তুমি কি জন্য জলের মধ্যে ভাসিতেছ।

বলানি — তখন পরিচয় পায়া সাধু করে ধর পর। কি হইল কি হইল বলে কপালে মারে চর।

বেহুলা — একে লইয়া যাব দাদা আমি আগম দেবপুর। জিয়াইব প্রান পতি আর ছয় ভাশুর।

শঙ্খ — ও রে ভগ্নী মরিছে তোর প্রাণ পতি না বাচিবে আর। আনিছু শাড়ী কিনিয়া ভগ্নী পরিবার তোমার।

বেহুলা — না যাব না যাব দাদা বলিলাম নিশ্চয়। স্বামীর অভাবে দাদা কার কেহ নয়।

শঙ্খ — ওরে বোন তোমার জন্য যে আমি অনেক সোনার অলংকার নিয়ে এসেছি।

বালি — সোনা রুপা যত দিবেন পরিবারে সুখ। কে মোরে খন্ডাবে দাদা স্বামী মরা দুঃখ।

শঙ্খ — অরে বোন তুমি আমার একটি মাত্র বোন তোমাকে যে তোমার বৌদি গুলো তোমাকে কত যত্ন করিবে।

বালি — দাদা নয় নয় হব দাদা আমি ছয় ভাউজের দুলালী। নিরন্তের সবাই দাদা পিছে দিবে গালি। যাও যাও দাদা তোমরা যাও উজানী, গঙার জলে ভেসে যাব অধম দুঃখিনী।

শঙ্খ — ওরে বোন বাড়িতে গেলেই আমাকে মা বলবে। ওরে সনকাই, ওরে বনকাই বেহুলা সাথে তোমার দেখা হয় নাই। তখন আমরা কি বলব বোন?

বালি — ও গো দাদা তোমরা মা কে বলবে যে বেহুলা আর দেশে ফিরে যাবে না। তবে শুন দাদা বিবাহ রাত্রিতে পেয়েছি দাদা সুবর্ণের আংগুরী দান। এই আংগুরী নিয়ে যাও দাদা আমার

জীবনের প্রমান। ও দাদা নিশ্চিন্ত করিয়া দাদা বহিবে ছয় মাস। সাতমাস হইলে দাদা বেহুলার ছাড়িবেন আশ।

শঙ্খ — ওরে বোন তুমি কি বলছ।

বেহুলা — কান্দো না কান্দো না দাদা তোর না কান্দিয়া আর। তোমরা কান্দিলো দাদা হবে সর্বনাশ। তবে শুন দাদা এই আংগুরী মাকে কিন্তু যাওয়া মাত্র দিবে না।

শঙ্খ — বোন, তবে কখন দিব বোন।

বেহুলার গীত — দাদা যখন মা মোর অন্ন খাবে আংগুরী দিওনা মায়ের হস্তে। ও দাদা মরিবে মা মোর গরল বিষ খায়া।

শঙ্খ — বল বোন তাহলে কখন দিব।

গীত — দাদা যখন মা মোর গুয়া খাবে আংগুরী দিওনা মায়ের হস্তে ও দাদা মরিবে মা মোর গলায় কাঠারী দিয়া।

গীত — দাদা যখন মা মোর স্নান করে আংগুরী দিয়োনা মায়ের হস্তে, ও দাদা মরিবে মা মোর জলে ঝাঁপ দিয়া।

শঙ্খ — তবে কোন সময় দিব বোন।

গীত — ও দাদা যখন মা মোর শয়ন করে আংগুরী দিও না মায়ের হস্তে দাদা কাঁদিবে মা মোর বালিশ বুকে দিয়া।

শঙ্খ — ওরে বোন তুমি যা বললে আমি তাই করব। কিন্তু আমি যে নিজের ভাই হয়ে তোকে নিতে চাইলাম। এতে যে আমার বিরাট পাপ হইল। ইহার জন্য আমি এখন এ প্রাণ ত্যাগ করব বোন।

বেহুলা — দাদা ইহার জন্য দাদা না কর মনস্তাপ। তুমি কি জান না দাদা যার যত পাপ। তবে শুন দাদা উঁচু জাগা সরবর নীচু জাগা পানি। ব্রাহ্মণকে করিবে দান উত্তম দুধালী।

শঙ্খ — আর কি করিতে হবে বোন।

বেহুলা — কু ঘাটে ডুবিয়া দাদা সু ঘাটে উঠিবে। ভাই বোনের পাপ দাদা সেই খানে ভঞ্জিবে।

শঙ্খ — শুন মোর ভাই। ভাসাই বেহুলা ভুরা চল নিজ দেশে যাই।

বলানি — যত কাণ্ডারীগণ ধরিয়া মারে ঠেলা। খরতর স্রোতে ভাসে সুন্দরীর ভেলা।

বলানি — তখন রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর। টল মল করে ভুরা জলের উপর। কিছু দিনে পাইল দেশ ত্রিপানী নগর। ত্রিপানীর তিন ধার বহিছে পানি। কোন ধারে যাব নিশ্চয় নাহি জানি।

(বেহুলার গীত)

ও বিধিরে কত দিনে যাব দেবপুররে হায়। বিধিরে হে ত্রিপানীর তিন ধার। কোন ঘাটতে হব পার হায় রে — আজি বুঝি মোর না বাঁচিবে প্রাণ। স্বামীরে তোমার শরীরের গন্ধে মাছি পরে ঝাঁকে ঝাঁকে হায় রে ...

উপ চিতান — তোমার সরার গন্ধে শেগনি উড়ায় ঝাঁকেঝাঁকে ওরে উড়ায় শেগিনি মোর মৃত্যু খাবার আসে রে হায়।

বেহুলা — ও গো স্বামী ও গো মা পদ্মা বল বল এখন আমি কোন ধারে যাব। না না এ প্রাণ আর রাখব না।

বলানি — তখন কি করে উঠিল বালি মনের অভিমানে। নদীর পারে শুকনা কাষ্ঠ জড়েয়া যে আনে। প্রথমে করিবে সংহার প্রাণের ঈশ্বর তার পরে ঝাঁপ দিয়া মরিবে বেহুলা বালি। ত্রি জগতে জানিবে বেহুলা বড় সতী। তখন ত্রিবন্ধু নামে পদ্মা পাইলো ভয়। বিধুরূপে পদ্মাবতী সেই খানে যায়।

বিধবা (পদ্মার ছদ্মবেশ) — ও মা কে তুমি। আগুনে কেন ঝাঁপ দিয়ে মরবে মা।

বেহুলা — ও গো মা বিধবা। আমি দেবপুরে যাব। আমাকে বলে দিতে পারবে মা।

বিধবা — আমি বলেছি মা বেহুলা সুন্দরী, যাবে যখন দেবপুরে যাও পূর্ব দিকে।

(দেবপুরীর দিকে যাত্রা)

(কাপড় নিয়ে নেতার প্রবেশ দুই ছেলে সাথে)

নেতা — যাই আমি ও এই দেবতাগণের কাপর গুলো ধুয়ে আসি।

ছেলে — মা মা আমার খুব ক্ষিদা পাইছে ও রে বাবা চনাই মনাই আমাকে বিরক্ত কর না বাবা।

বলানি — বিধবার আদেশে বালি পূর্ব ধারে যায়। পূর্ব ধারে লোনা জল চাখিয়া যায়। নেতা কাপড়া ধয় সুবন্দেরঘাটে চনাই মনাই দুই ছেলে ঘন ঘন কাঁদে। মারিয়া ছেলেকে রাখে অষ্ট মেঘের তল। জিয়াইয়া ছেলে কে খাওয়াইল স্তন। দূর হইতে বেহুলা তখন তাতে দিয়াছে মন। মারিয়া ছেলে জিয়াইল পুর্ণবার। ঐ রকম জিয়া দিবে স্বামী আমার।

বেহুলা — ও গো মাসি তুমি আমার মাসি হবে।

নেতা — সাত জন্মের নাই মোর বোহিনির ছাও। আর তুই কহেচিত মোক মাসি মাও। তোক দেখছ মুই মানুষের বেটি। কেমনে আইলি তুমি দেবতার পুরী।

বেহুলা — ও গো মাসি দূর দেশান্তরে মাসি নাই পরিচয়। মায়ে বৈলাছে আমার নেতা মাসি হয়।

নেতা — সত্য হইস যদি তুই মোর ভগ্নীর ছাও। খান চারি কাপরা আমায় ধৌত করে দাও।

বেহুলা — তবে দাও দাও মাসি আমি তাই করছি।

বলানি — তখন ময়লা কাপেড়া নেতা দিলেন বাছিয়া। সেই কাপেড়া নেয় বালি গাধিরী করিয়া। নেতা কাপেরা ধয় সুবন্ধের ঘাটে বেহুলা কাপেরা ধয় উত্তম গঙার জলে। কাপেরা শুকিয়া বালি কাপেরা করে গাঠিরী। তার ারে লেখে দিল দেবী ত্রিশাল কোটি।

বেহুলা — মাসি এই কাপেরা গুলো নাও মাসি। তুমি তো দেবপুরে যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

নেতা — ও গো মা বেহুলা দেব পুরে যাওয়ার কার অধিকার নাই মা।

বেহুলা — ও গো মাসি মাও নর্তকী বলিয়া আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।

নেতা — কি তুমি আবার নৃত্য জানো।

বেহুলা — হ্যা মা আমি নিত্য জানি।

বলানি — তখন এক নৃত্য করে বালি এছিয়া বেছিয়া। কাঁচা বৃক্ষের পাতা যেন পড়িল খসিয়া। এক নৃত্য করে বালি কোকিলার ধেনু। তাহার নৃত্য দেখে নেতার খসে গর্ভ ভানু। নেতা বলে ভাল নাচ নৃত্য ক্ষমা কর। তোমার বার্তা জানাই শিবের গোচরে। মস্তকে তুলিয়া লইল কাপেড়ার গাঠি। নেতা চলিয়া যায় ঘাটে রয় নটি। ধীরে ধীরে নেতা তখন করিল গমন। শিবের সাক্ষাতে যায়া দিল দরশন। তেল ঘাটে বসে আছে ত্রি জগতে নাথ। নেতা চরণ বন্দে করে জোড় হাত।

(শিব, নারদ ইন্দ্র রাজের প্রবেশ দেব সভায়, ধীরে ধীরে নেতা)

নেতা — প্রণাম হই দেবরাজ প্রণাম হই ইন্দ্র রাজ প্রণাম নারদ।

শিব — নেতা অন্য দিন এসেছ তুমি বেলা রে সকাল। আজি কেন তোমার হইল বৈকাল।

নেতা — দেব রাজ ঘাটে এসেছে আমার রোহিনির বেটি তার নৃত্য দেখে আমার বেলা হইল ভাটি।

শিব — নেতা কি বলছ সে কি নৃত্য জানে।

নেতা — হ্যা দেবরাজ সে ভাল নৃত্য জানে।

শিব — নেতা তুমি কার মুখ চাও কেমন নৃত্য জানে আনিয়া দেখাও।

নেতা — তবে তাই করিতেছি দেবরাজ।

(প্রস্থান)

নেতা — ও গো মা বেহুলা তোমাকে মহেশ্বর যেতে বলছে।

বেহুলা — মাসি আমি দেবপুরে যাব না।

গীত — মাসি নাই যাম নাই যাম দেবপুর। মাসি নাই যাম। মাসি করিলেম দারুন আশ। জলে ভাসি ছয় মাস। সরা পচা মোর কদলীর ভুরা।

চিতান — ও মাসি তোমার সঙ্গে যাব, ভুরা খানি হারাব। কে রইবে মোর মুঞ্জুশের পাহারা।

উঃ চিঃ — মাসি ভুরা খানি মোর হাত আর পাত। ভুরা খানি মোর বাপ আর মাও। ভুরা খানি মোর সিতের সিন্দুর।

উঃ চিঃ — মাসি তোমার সঙ্গে যাব ভুরা খানি হারাইব শেষে যদি মোর ভুরা করে চোর।

নেতা — তাতে রয় যে তারা চ্যাং। ঘাটে রয় যে হলা ব্যাঙ। তায় দিবে তোর মুঞ্জুসের পহরা।

বলানি — তখন স্বামীর হার লইল বালি বান্দিয়া বকুনী, নেতার সহিত চলে বেহুলা সুন্দরী (তৌল ঘাটে বসে আছে ত্রি জগতের নাথ। বেহুলা বালি প্রণাম করে করিয়া জোড় হাত।

বেহুলা — ভোলা নাথ হস্ত জোড় করি। কেমনে করিব নৃত্য আমি একেশ্বরী

বলানি — ডাকেয়া আনিল শিব ইন্দ্রের বিদ্যাধরীগণ। সবাই মিলে তখন জুড়িল নাচন। এক নৃত্য করে বালি এছিয়া বেছিয়া। কাঁচা বৃক্ষের পাতা যেন পড়িল খসিয়া। আর এক নৃত্য করে বালি করিল ধেনু। তার নিত্য দেখে নেতার খসে গর্ভ ভানু। শিব বলে ভালই নাচ বিদ্যাধরি নৃত্য ক্ষমা কর। তুমি আমি চলিয়া যাই ময়না নগর।

শিব — ও গো সুন্দরী তুমি নৃত্য ক্ষমা কর। তুমি আমি চলে যাই ময়না নগর।

বেহুলা — দেবগণ কার জোড় হাত। আমার হয়ে তোমার শিবকে বুঝাও।

ইন্দ্র — ও গো মহেশ্বর করি জোড় হাত। নটিনী হরিলে তোমার হবে সর্বনাশ।

শিব — হাঃ হাঃ আমি সংসারে সার। কে করিবে আমার পাপ পূর্ণে বিচার। আমি বলি বেহুলা তুমি বাক্য মোরে ধর। তুমি আমি চলে যাই ময়না নগর।

ইন্দ্র — ও গো মহেশ্বর করি জোড় হাত নটিনী হরিলে তোমার হবে সর্বনাশ তবে তাকে জিজ্ঞাসা কর কি জন্য আসিয়াছে আমার গোচর।

শিব — বেহুলা বালি বাক্য মোরে ধর। কি জন্য আসিয়াছ আমার বরাবর।

বেহুলা — ও গো প্রভু তোমার পদ্মার নিদারুণ হিয়া। বিবাহ রাত্রিতে স্বামি আমার ফেলাইছে মারিয়া।

শিব — কি আমার পদ্মা। কোথায় পদ্মা, শীঘ্র এসো।

বলানি — স্মরণ করে শিব পদ্মার জাগিল মনে। হংস রথে ভর করে গেল সেইখানে। প্রণাম করিল পদ্মা পিতার চরণ। কি জন্য ডাকিলে বাবা বল বিবরণ।

পদ্মা — প্রণাম হই পিতো আমাকে কি জন্য স্মরণ করেছ।

শিব — বল পদ্মা তুমি কি বেহুলার স্বামীর প্রাণ নিয়েছ।

পদ্মা — হ্যা পিতো, এটা আমার বিবাদিয়া মৃত্যু, তুমি সব জান পিতো।

শিব — না পদ্মা যতই তোমার বিবাদিয়া থাক না কেন বেহুলার স্বামীকে ফিরে দিতে হবে।

পদ্মা — ও গো পিতা সত্য করুক বেহুলা দেবগণের আগে দেয়াইব ফুল জল শ্বশুরের হাতে। যাবত না করিবে চাঁদ পুজার বিধান। তাবৎ না দিব তার পুত্র বর দান।

শিব — শুন বেহুলা তুমি অঙ্গীকা কর পদ্মার আগে। দেওয়াইব ফুল জল শ্বশুরের হাতে।

বেহুলা — হ্যা মহেশ্বর। সত্য করিলাম দেবগণের আগে। দেওয়াইব ফুল জল শ্বশুরের হাতে। যাবত পূজা না করিবে শ্বশুর সদাগর। তাবৎ ফিরিয়া না যাইব ঘর।

বলানি — তখন স্বামীর হার লইল বালি বান্দিয়া বকুনী। ত্রিপানি ঘাটে গেল বেহুলা সুন্দরী। অস্থি ধুইয়া সুন্দরী রাখে স্থানে স্থানে। আগো হয়য়া গিলিলো অস্থি বালি নাহি জানে। সেই খানে বেহুলা কোন কর্ম করে। ও জালিয়া ডাকেয়া কথা বলিল সত্তরে। আর যত আগো বোয়ালী দিলেনো ছাড়িয়া। আগোটাক ফেলালে ধরিয়া। পেট চিরিয়া আগোটার নিকিলায় আস্থিগিলা। মহা মন্ত্রে পদ্মা তখন দিলে জীব দান।

পদ্মা — মা বেহুলা তুমি তোমার শ্বশুরের ধন জন চৌদ্দ ডিংগা উদ্ধার করবে। অতএব তুমি এই শতছিদ্র চাইলন নিয়ে যাও। সমুদ্রের থেকে জল নিয়ে এসো।

বেহুলা — তবে হলে আমি তাই করছি।

গীত — তবে কোন সতী জিয়াবে বালা কহে ধর্ম না শুনিয়া। ডুবাইল চালন সমস্ত উশুরিয়া। এবার পদ্মা ডুবাইল চালন। চান্নিতে আসিয়া পড়িল উত্তম গঙার জল।

পদ্মা — মা বেহুলা এবার তোমার শত ছিদ্র চাইলনে জল আসিয়াছে।

বেহুলা — হ্যা মা এইবার আসিয়াছে।

(ধুয়া)

ও প্রাণের হরিহর হরি সে আইল রে বালাকে জিয়াইতে
আজি মস্ত গোটা সিরজিল রে বালার ঝড়া নারিকেল।
কপাল গোটা সিরজিল বালার পূর্ণিমার চাঁদ।
চক্ষু গোটা সিরজিল বালার স্বর্গের তারা।
আর দুই কর্ণ সিরজিল বালার শুনিবার কারণ।

আর নাক গোটা সিরজিল বালার মেলাং করের ডটা।

আর মুখ খানি সিরজিলরে বালার খাইবার কারণ।

আর জিব্বা খানি সিরজিল বালার সরস্বতী ধার।

টুটি গোটা সিরজিলরে বালার ঝারিং কোলের নালা।

পিট গোটা সিরজিল রে বালার অমূল্য ভান্ডার।

কমরখানি সিরজিল রে বালার নট্টয়া নগর।

দুই পদ সিরজিল রে বালার বেরেবার করিন।

হারে হারে সিরজিল রে বালার এ সাত চামেরা।

এবার উঠ বালা বানিয়ার দুলালা তোক জিয়াও সকাল।

আর প্রথমতে দিলেন বালি কাপেড়ার ঘরণী।

শিহরে বশিল পদ্মা হয়া ধন্বনতরী।

যম যম বলে পদ্মা ডাকে ঘন ঘন

হায়রে ডাকে ঘন ঘন।

যম রাজ্যের যম রাজার নড়িল আসন।

যম যম বলে পদ্মা ডাকে অন্ন ভূত।

ঘট মধ্যে জীব দিয়া পালায় যম দূত।

আর সাওতালীর সাত ডাল আনিল ভাঙ্গিয়া।

শিহরে বসিল পদ্মা ধন্বনতরী হইয়া।

এবার - এক ঝারণ দুই ঝারণ তিন ঝারণ হইল।

তিন না ঝারণের বেলা নিশ্বাস ছাড়িল।

এবার-চার ঝারণ পঞ্চ ঝারণ ছয় ঝারণ হইল।

ছয় না ঝারণে বেলা অঙ্গ মোড়া দিল।

এবার ছয় ঝারণ সাত ঝারণ অষ্ট ঝারণ হইল।

অষ্ট না ঝারণের বেলা উঠিয়া বসিলো।

এবার অষ্ট ঝারণ নয় ঝারণ দশ ঝারণ হইল।

দশ না ঝারণে বেলা ঢুলিয়া পড়িল।

বলানি — মা বেহুলা তোমার স্বামী যে ঢুলে পড়িল। আমি কিছুই বুঝতে পারিলাম না। তবে আমি বলছি তুমি নগর হইতে একজন রঝা নিয়ে আসো।

বেহুলা — তবে আমি তাই করব।

(মাহান নিয়ে প্রবেশ)

(পরে ভূত পেত্নী বিদায়)

পদ্মার গীত — ঝার বিষ নাই বালার অঙ্গের বিষ ঝার পদ মাই। এবার এক ঝারণ দুই ঝারণ তিন ঝারণ হইল। তিন না ঝারণের নিঃশ্বাস ছাড়িল। এবার তিন ঝারণ চার ঝারণ পঞ্চ ঝারণ হইল। পঞ্চ ঝারণের বেলা অঙ্গ মোড়া দিল। এবার পঞ্চ ঝারণ ছয় ঝারণ সপ্ত ঝারণ হইল। সপ্ত ঝারণের বেল উঠিয়া বসিল। তবে রাম বল হরি বল মুকুন্দ মুরারী। পদ্মাবতী-বালাক জিয়ায় বল হরি হরি।

পদ্মা — মা বেহুলা যেই চাইলে সেই পালে বাকি নাহি আর। করিবে তো আমার পূজা সত্য হবে পার।

বেহুলা — ওগো মা পদ্মাবতী। আমার আর ছয় ভাশুর আছে। তাদের জীব দান দিতে হবে। না হলে আমার ছয় জাও দঃখ করবে।

পদ্মা — তবে আমি তাই করব মা কিন্তু আমার পূজা তোমার শ্বশুরের হাতে দেওয়াইবে তো।

বেহুলা — হ্যা মা সত্য সত্য দেওয়াইব।

গীত — তখন তারকা তারকা বলিয়া ডাকে ঘনে ঘন। ডাকা মাত্র তারকা দিল দরশন। মহা মন্ত্রে পদ্মা পড়িয়া দিলে জল। বিষ গেল রসাতল বর্তিয়া উঠিল জনে জন।

বেহুলা — ওগো মা পদ্মাবতী আমার শ্বশুরের ধন জন চৌদ্দ ডিংগা তুলে দাও।

পদ্মা — হ্যা মা বেহুলা আমি তাই করব মা।

(ডিংগা তুলা)

গীত — দৈত্য ডুবিল জলে ডিঙ্গা তুলে বাহু বলে। তুলে ডিঙ্গা বাহুর বলে হে। দৈত্য ডুবিল জলে ডিংগা তলে বাহুর বলে হে। তুলে ডিংগা নামে যারে মধুকর ওরে হে। দৈত্য ডুবিল জলে ডিংগা তুলে বাহু বলে। তুলে ডিংগা নামে যারে হাজারি। দৈত্য ডুবিল জলে তুলে ডিংগা বাহু বলে। তুলে ডিংগা নামে যারে হেকা। দৈত্য ডুবিল জলে তুলে ডিংগা বাহুর বলে। তুলে ডিংগা নামে যারে হিরা। দৈত্য ডুবিল জলে, তুলে ডিংগা বাহু বলে নামে যারে হুরা।

পদ্মা — ওগো মা বেহুলা যা চাইলে তা পাইলে বাকি নাহি আর। করিবে তো আমার পূজা সত্য হবে

পার।

বেহুলা — হ্যা মা আমি সত্য করিলাম দেবগণের আগে দেওয়াইবো ফুল জল শ্বশুরের হাতে। শুন শুন দেবগণ বলি তব ঠাঁই। আদেশ কর দেবগণ নিজে দেশে যাই।

বলানি — বালি বলে তোমরা শুন কান্ডারীগণ ছাড় নৌকা সবাই চম্পক নগর। বেহুলা প্রণাম করে দেবগণের পায়। বালা প্রণাম করে গাভুর সভায়। ছয় নৌকা ছয় ভাই চলিলেন ঠাঁই ঠাঁই। মধুকরে চড়িল দুর্লভ নখাই। কত দূর যাইতে নৌকা বত পন্থ পাইল। বাহু বলে নৌকা বাহিতে লাগিল ঠাটারী কাঠারী বাহান্ন বাজার। একে একে সমস্ত নগর হইল পার তখন চাঁদের ঘরের নারীগণ ঘাটে ভরে পানি। ছয় ভাইর নৌকা দেখি করে ঠারাঠারী। জল ভরিয়া নারীগণ করিল গমন। আপনার গৃহে যায়া দিল দরশন। শুন শুন শ্বশুর বাপ বলি তোর ঠাঁই। ঘাটেতে আইস'ছে তোমার দুর্লভলখাই। তখন হস্তে লাঠি লইয়া সাধু করিল গমন। আপনার ঘাটে যাইয়া দিল দরশন।

চাঁদ — চল চল পুত্র বধূ চল যাই বাড়ী, দেখুক স্বামীর মুখ ছয় বধূ আড়ি।

বেহুলা — শুন শুন শ্বশুর বাপ কথা শুন মোরে। দিতে হবে ফুল জল পদ্মার গোচরে।

চাঁদ — হ্যা মা বেহুলা সত্য করিলাম তোমার সাক্ষাতে দেওয়াইবো ফুল জল পদ্মার গোচরে। কিন্তু যে হস্তে পূজা করি দেব শূলপানি। সেই হস্তে না পূজিব কানি বিষহরী। তাতে কি তুমি হবে রাজি?

পদ্মা — হ্যা দাদা আমি তাতে রাজি।

বলানি — তখন ছয় পুত্র লইয়া সাধু করিল গমন। আপনার মন্দিরে যায়া দিল দরশন। পূজার শেষে চাড়'ইল রন্ধন। সাত পুত্র লইয়া করিল ভজন। ভগবতীর চরণে মজিয়া রহুক মন সদায় আনন্দ হোক এই নিবেদন।

চালান

(পদ্মার আর্শিবাদ) (পদ্মার বিদায়)

ও কি মা মনসা যাবার বেলা ওরে যাবার বেলা না ধরিস ছিদর শিবের বিবাহ গীত, গাইতে না পারিনু ঠিক, হে মা জানিয়াও গীত ছাড়িনু বিস্তর।

১। উজানী খন্ডের গীত গাইতে না পারিনু ঠিক

২। বসানী খন্ডের গীত গাইতে না পারিনু ঠিক

৩। বালার বিবাহ গীত গাইতে না পারিনু ঠিক

৪। বালার মরণের গীত

৫। ভাসানী খন্ডের গীত গাইতে না পারিনু ঠিক

৬। বালার জিয়নের গীত

হে মা জানিয়াও মা মুই ছারিনু বিস্তর।

যাবার বেলা ব্রহ্মানী মা দিয়া যাবু বর। পুত্রখানি হয় মারেয়ার মনসার বর। যেই রকম করিছুত দয়া ঝালু মালুর ঘরে। ঐ রমক করিব দয়া মারেয়ার উপরে।

যাবার বেলা ব্রহ্মানী মা মারেয়াক দিব বর। ধনে জনে করিব দয়া মারেয়ার উপর। যেই রকম করিছিত দয়া চাঁদ সদাগরের ঘরে ঐ রকম করিব দয়া মারেয়ার উপরে।

যাবার বেলা ব্রহ্মানী মা মারেয়াক দিব বর কোন ছিদ্র না ধরিস তোর মারেয়ার উপর।

কোন ছিদ্র না ধরিস তুই গীদালের উপর।

কোন ছিদ্র না ধরিস তুই বাইন তালীর উপরে

কোন ছিদ্র না ধরিস তুই সোদরের উপর।

কোন ছিদ্র না ধরিস মারেয়ার উপর

কোন ছিদ্র না ধরিস তুই ছকরার উপর

ভগ পবতীর চরণে মজিয়া রহুক মন ওরে হে সদায় আনন্দ এই নিবেদন মনসা হে মা করার কল্যান (ধুয়া)

চালানী

১। পুরুবের দেবতা পুরুবে লাগিয়া যা

২। উত্তরের দেবতা উত্তরে লাগিয়া যা

৩। পশ্চিমের দেবতা পশ্চিমে লাগিয়া যা

৪। দক্ষিণের দেবতা দক্ষিণে লাগিয়া যা

৫। আকাশের দেবতা আকাশে লাগিয়া যা

৬। পাতালের দেবতা পাতালে লাগিয়া যা

৭। রাজ্যে চলিয়া গেল রাজ্যের তিস্তাবুড়ি

৮। ময়নায় চলিয়া গেল ময়না বিষহরী

৯। কৌলাশ ধামক লাগিয়া গেল ধামের কৈলাশপতি

১০। ভদ্রকালী থানের লাগিয়া গেল থানের থানছিরি

ভগবতী চরণে মজিয়া থাকুক মন সদায় আনন্দ হোক এই নিবেদন

বিষহরী - (জাগানী খন্ড)

১। ও মায়ের বিন্দু বিলাশিনী। ভৈরব ভবানী। ওরে হে। ও মায়ের বাজায়ে দুম দুমি বাদ্য হে আইস মানিক মা হে। মায়ের জল স্থল। চরণ যুগল ওরে হে মায়ের গৌরী করায় আদিবাস হে আইস মানিক মাহে মায়ের কইরে রিনি ঝিনি। বাজে কিনি কিনি ও রে হে। মায়ের শিরে শিকি কলা তারকের মালা সীতে তে চন্দন বিন্দুহে আইস মানিক মা হে।

২। ওকি ওরে জলময়। সকলি সংসার হে ওরে জলময়। জলময় সকলি সংসারে জলময় সংসার ওজোর সোজর জল সংসার রে প্রলয়। রে জলময় সকলি সংসার হে ওরে জলময়। দিবসে রজনী নাই ভাই রবি নিশাচর।

পর্বতে গৃহিনী নাই সর্প অজাংকার
হাট ঘাট নাহি ছিল এ রত্ন প্রসার।
বেচি কিনি নাহি ছিল দালাল খরিদদার।
নাহি ছিল গাভি গরু নাহি ছিল ঘি।
সকল ঘটের মধ্যে সিরজিল জী।

তবে মন মধ্যে মন্ত্র নাই বন মধ্যে গাছ। নাছিল জলিয়ার জাতি জল মধ্যে মাছ। তবে পাথার মধ্যে নাহি ছিল বেয়াল্লিশ ফুল। চান্নীগছা নাহি ছিল একাম্বর সিন্দুর। তবে জয় জয় ব্রহ্মা মা জনম তোমার কমলিনী বরে। ময়নামতী গ্রাম খানি শিবক করিল দান। পূজা খাও তুমি এই মর্ত্ত ভুবন। স্বপ্ন দেখে শিব শংকর হইল অর্ন্তধান। নিশি প্রভাতে পদ্মা পাইল চৈতন। এক দিবশে মারেয়ার ব্রহ্মনী পুজিবার মন। নমশান মালা কর করে নিমন্ত্রন। আসনে বসিল মালি হস্তে নিয়ে কাতী। সুন্দর করে তুলে মুঞ্জুশের পাতি। সোনার নয় বুড়ি করি লইল আচলে বাঁধিয়া উদ্র। পাল কুমার বাড়ী চলিল হাটিয়া। দুয়ারে আগে করি দিলেন ঢালিয়া। উত্তম সুন্দর ঘট নিলে তো বাছিয়া। ঘট পায়া মারেয়ার আনন্দিত মন। ব্রাহ্মনের হাতে ঘট করিল সম্পাদন। আই মিতা বাইশ মিতা কেমনে হবে সুত। আলয়া আতপ নাগে আর কাচা দুধ। যত দেবতার নামে ঘৃতকরে দান পূজা খাও তুমি এই মর্ত্তভুবন।

(পৃথিবী সৃজন)

৪। সৃজিল পৃথিবী খান হে।
সৃজিল পৃথিবী বাপু ধর্ম রাজেশ্বর।
ধরণী তুলিয়া দিল ডংন্ডের উপর।
তবে মন মধ্যে মন্ত্র সৃজিল বন মধ্যে গাছ।

ওরে হে সৃজিল জালিয়ার জাতি জলের মধ্যে মাছ।
পাথার মধ্যে সৃজিল মায়ের বেয়াল্লিশ ফুল।
চান্নি গছা সৃজিল মায়ের একাম্বর সিন্দুর।
তবে হাট ঘাট সিরজিল এ রত্ন প্রসার।
বেচি কিনি সৃজিল দালাল খরিদার
গাভী গরু সজিল সজিল ঘি
সকল ঘটের উপর সিরজিল জী
ভগবতীর চরণে মজিয়া থাকুক মন
সদায় আনন্দ হোক এই নিবেদন

(সোলার জন্ম)

৫। জলে উপজিল সোলা ও রে হে
চৈত্র মাস ছাড়িয়া রে বৈশাখ মাস পড়িল।
কৃষানের চাষেতে সোলা গাজিয়া উঠিল।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গাঙে বহে জল।
কৃষানের চাষে সোলা করে হল ফল।
আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সোলার তিন ডালি।
সেই সোলা কাটিয়া নিগায় নমশূদ্র মালী।
যত্নে করিয়া সোলা রৌদ্রে শুকায়
বান্দিয়া ছান্দিয়া সোলা মাই চালে উঠায়।
এক দিবসে মারেয়ানী ব্রহ্মানী পূজিবার মন।
নমশান মালাকরক করে নিমন্ত্রণ
আসনে বসিল মালি হস্তে লইয়া কাতী।
সুন্দর করিয়া তুলে মুঞ্জুশের পাতি
যত সোলা চিড়িয়া সোলার করিল হালি।
তার পরে কাটে মালী মুঞ্জুশের জালি।
যত সোলা চিড়িয়া সোলার করিল ধাপ।
প্রথম কালে পাতি জোড়া নাগালে কপাট।

প্রথমতে লেখে মালী দেবী ত্রিশাল কোটি।
তার পরে লেখে মালি লক্ষ্মী সরস্বতী।
কৈলাশতে লেখে দিল শিবের ঘড় বাড়ি।
মধ্য স্থানে লেখে দিল ময়না বিষহারী।
দুই বগলে লেখে দিলো গঙ্গা ভাগীরথী
আলসিয়া নগরে লেখে গদার বাসবাড়ি
একে একে লিখিলে মা হবে অনেকক্ষন।
একে সঙ্গে লিখে দিলাম ত্রিশাল দেবগণ।
(ঘরশুদ্ধ)

৬। তবে শুদ্ধ হইল বাইশমতী হে।
প্রথমে শুদ্ধ মায়ের মাঝিয়ার মাটি।
তার পরে শুদ্ধ মায়ের মেন্ডের চারি চাটি।
তার পরে শুদ্ধ মায়ের মুলিম শাড়ি পোয়া।
তার পরে শুদ্ধ মায়ের সারক জোড়া জোড়া।
ঘটের উপরে শুদ্ধ উত্তম গঙার জল।
তার পরে শুদ্ধ মায়ের সুরক্ষার ফল।
গীদালের হস্তে শুদ্ধ এ তাল চেহর।
মারেয়ানী কাপর শুদ্ধ হরফের ভিতর।
ভগবতীর চরণে মজিয়া রহুক মন।
সদয় আনন্দ হোক এই নিবেদন।

৭। (লাচারি)
ধুয়া — তোরা নাম আসিয়া হে সেবক দুলাল।
স্বর্গের দেবতী পদ্মা নাম আসিয়া হে।
পূর্ব হইতে নামি আয় মোর ধর্ম নিরঞ্জন।
উত্তর হইতে নামি আয় রাজা জল্লেশ্বর।
পশ্চিম হইতে নামি আয় আশি হাজার পীর।
দক্ষিণ হইতে নামি আয় গঙ্গা ভাগীরথী।

আকাশ হইতে নামি আয় আকাশের কামিনী।
পাতাল হইতে উঠে আয় পাতাল বাসুকি।
ময়না হইতে নামি আয় ময়না বিষহরী।
থান কালী, বন কালী, নামবো আর রক্ষা কালী।
থান হইতে উঠে আয় থানের থানশ্রী।
রাজ্য হইতে চলে আয় রাজ্যের তিস্তা বুড়ি।
গীদাল — তবে ময়না বিষহরী মা তুই পূজা নেও আসিয়া।
মারেয়ায় পূজে তোমার একান্ত করিয়া।
তবে কৈলাশ পতি রাজা বাপু পূজা নেও আসিয়া।
ভুটিয়া সন্যাসী বাপু পূজা নেও আসিয়া।
গয়ের ভদ্র কালী মা তুই পূজা নেও আসিয়া।
রাজ্যের তিস্তা বুড়ি মা তুই পূজা নেও আসিয়া
গয়ের গ্রাম বাপু পূজা নেও আসিয়া
পাটের বল রাম বাপু পূজা নেও আসিয়া।
যতেক দেবতার নাম জানি বা না জানি।
তেত্রিশ কোটি দেবতা বাপু বসো বসো সারি সারি।
যতেক দেবতার নাম গেল উত্তরিয়া।
সর্প খন্ডের কথা এখন পড়িল আসিয়া
তবে সর্প রাজ বাসুকী তুই পূজা নেও আসিয়া।
কাল নাগিনী সর্পমা পূজা নেও আসিয়া।
মারেয়ায় পূজে তোমায় একান্ত করিয়া।
তবে ডারাইশ বাছার বাপু পূজা নেও আসিয়া।
তবে চরা বরা বাপু পূজা নেও আসিয়া।
আর যত সাপের নাম জানি বা না জানি
বেয়াল্লিশ কোটি সর্প বাপু বস সারি সারি।
সর্প খন্ডের কথা হইল সমাপন।
নদী খন্ডের কথা পড়িল এখন।

যত নদীর নাম — মহনন্দা নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া। বালাসন নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া। ব্রহ্মপুত্র নদী বাপু পূজা নেও আসিয়া। করতোয় নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া। যত নদীর নাম জানি বা না জানি। সহস্র কোটি নদী তোমরা বস সারি সারি।

তার পর গুয়া খাওয়া — পরে সমাপ্ত।

---

## সংগ্রহসূত্র

শিলিগুড়ি মহকুমার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মেথিবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা প্রিয়নাথ অধিকারী। তিনি বিষহরি পালার মূল গীদাল। তাঁর অনুষ্ঠানে একাধিকবার থাকার সুযোগ হয়েছে। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতায় এবং দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় বিষহরি পালাটিকে লিখিত আকারে আনা সম্ভব হয়েছে।

# নটুয়া

**বন্দনা**

মূল গায়ক — যবেরে মৃদিঙ্গারে মৃদিঙ্গা মারে শান
বামে বসিলো কালী মা ডাহিনে হনুমান
হে রাম
পুরুবে বন্দিনু মুই ধর্ম নিরঞ্জন
হনুকে চহড়ায় নমস্কার
হে রাম যুগুনি সঙ্গে
এ ভাব লাগায়
উত্তরে বন্দিলু মুই কালীমার চরণ
পশ্চিমে বন্দিনু মুই পীর পয়গম্বর
দক্ষিণে বন্দিনু মুই গঙ্গাসাগর

গীদাল — আইসো আইসো কালীমা
সভা রঙ্গায়ে যা
সভা ভঙ্গ হলে
লইজ্জা হবে তোর কালীমা।
দেবী সাজে কালী সাজে
সাজে পঞ্চ বহিন
শ্রীমতী রাধিকা সাজে
উধব মাধব দনো ভাই
ও দেবের মহামায়া
পূজার কারণে নামিল্ ভবানী
হে দেবের মহামায়া

(এই গান চলাকালীন সবাই এক সঙ্গে গান করে - সেই সঙ্গে উধব-মাধব, রাধিকা নৃত্য করে)

(নৃত্য থেমে গেলে মূল গীদাল গান শুরু করেন)

গীদাল — হাতে লিনু বাটারে মুই

মিঠা পান

কন্তে আসিলো রাধাগে

দশমুনিক করিস পরনাম

*(গানের শেষে দো২ার গানের ধুয়া ধরবে)*

গীদাল — (উধব-মাধবকে উদ্দেশ্য করে বলবে রাধিকার বিরহকে কেন্দ্র করে)

উধব, তোর মাসিটা কান্দিছে

তোর মামাতো আসে না

খাটোখুটো বিন্দাবনে

ফুল তুলিনু হামা তিনজনে

হামী গেইসে মোর বৃন্দাবনে

শুনো শুনো দশমুনি

এঠে হারালো মোর সোয়ামী

সোয়ামী হারা হইছি মুই।

উধব — (ইচ্ছা করে এই গানে অর্থ বুঝতে চাইবে না। এবং এই না চাওয়াটা সব-সময় একটা

ধাঁধার (শ্লোক) মধ্য দিয়ে)

উধবের শ্লোক — ক্ষুদ্র বর্ণ বিত্তা (জিনিস) নাল বর্ণ দেহ

ছেলিবা ছেলিবা সর্ব অঙ্গ ধরে

অধিক করি খাইলে

তোর মুখখান গন্ধ করে।

গীদাল — হে - তুই পিয়াজীটার কাথা কহিলো

তুই ঠিক কাথা কহিলো

উধব-মাধব — উত্তমপুরুষে কহচু হয়

যেমন মুই কহচু।

গীদাল — ও ব্রজের ভাবুনী গে

রসাল সোয়ামী তোর

গেইছে বিদেশ

ধরিছে রাজার বেশ
সেজা গুছাইতে পারিস গানি
ঘুরে আয়রে ব্রজের রাখাল
ও তুই ব্রজের বনমালী

উধবের শ্লোক — সাগর হাতে জন্ম নগরতে ঘোরে
মায়ে ছুইলে পুত্র মরে
হায়রে পুত
জন্মিয়' নি খায়
গতরের দুধ

গীদাল — তুই নুন-টার কাথা কহিলো।

উধব-মাধব — তুই ঠিক কাথা কহিলো।

গীদাল (রাধাভাব) — হাতের শাংখা করিম্ চুর
গায়ের বস্ত্র করিম্ দূর
দূর করিম্ নয়নের কাজল
সীতার সেন্দুর।

ধুয়া — তোর মামাটা গেইছে পালায়েরে মাধব।

উধব-মাধব — মামা ভাত শাকত নুন নি পায়
তাতে রাগ করি পালাইচে।

গীদাল — আরে এটা একটা ঝগড়া হইল।
তোর মামাতো গেইচে ১৬শ গোপী
নিয়া লীলা করিবা। আর সামাইন্য
নুন নিয়া এই ঝগড়াটা হবি নি।
আরে তোমার মামীটা যে
কান্দেচে. তোর মামাক অনষেবার
যাবা হবে। তোমরা ছাড়া আর
কায় আছে। যাও ওংসের যাও।

গীদালের রাধাভাবের গান - এখেতো আন্ধার রাতি
একাশরে রহালনি যায়
ও হো পরভুজি
হায়, দেখি মোর কপাল লেখারে
জ'র গেল মোর কাপড়া বিনে
বয়স গেল স্বামী বিনে
একাশরে রহালনী যায়
গোকুলা নগরে, ওহে পরভুজী।

উধব-মাধব — মামী তোমরা কান্দেন না। আমরা দুই ভাই
যাছি অনসেবার।

উধব-মাধবের শ্লোক - দুই বীরের ছয় কোন, দন্ত আছে মইধ্যে
যুদ্ধ করবার যাছে বীরলা, বৃন্দাবনের মাঝে।
বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়া তবে, ভাঙ্গিল তরুবর
দন্তত করি আনে বীরলাক, নামারে জীবন।
শোনো শোনো দশ নারায়নলা, চলালে সে চলে
তাল পুরীর ততলোক পুরীত যায়া মরে।

গায়ক — হারে এটা তো নুকুনের কথা কহছেন।

উধব-মাধব — মামীর মাথার নুকুন মামা ভাতোত পাইছেন।
মামা সেইজন্য পালান দিচে।

গায়ক — এই তোমরা এটা কুনঠে দেখিছেন
তোমর খালি ব্যানা কহছেন।
তোর মামী হইল সতী নারী।
উয়ার মাথাত নকুন নাই।
তোর মামা গেইচে ষোলশো গোপিনী
নিয়া লিলা করবার।

গায়ক — বৃক্ষ মধ্যে শিমুল পলাসরে খুঁটা
গাছে পাতে রাঙ্গা

গাভুর বয়সে যৌবনরে
জ্বলে কাইঞ্চ সোনা

উধরের শ্লোক — কহ নামো নারী
হইছে ফুলবতী
বিনা পুরুষে
হইছে গর্ভবতী
মাথার মুটুকে লিয়া
সিংহাসনে বসে
তাক খায়া দেবতা তুষ্টি হয়।

গায়ক — আরে এটার উত্তরটা হইল
'কলার গাছ'

উধব — ঠিক কহচু।

গায়ক — বড় ঘর বড় বাড়ীরে
বদলিকা ছায়া
সেই না ঘর পাশুরিয়া ত্যাজি
গেলোরে সায়া

উধবের শ্লোক — উপরেতে আং সাং
ভিতরে জাবরা
তলপাখে পাছাটা
উপরপাখে ডিমাটা

গায়ক — উত্তরটা হইল - 'কলার মোচা'

উধব — ঠিক কহচু।

গায়ক — মুছিয়া পড়ে ধনি
মনে মনে সমঝে
ভুইয়' লুটালনী কেশ
দুঃখ মেরি দৈব
সঙ্কট হামারে

উধবের শ্লোক — লাল টকটক

শামলা চরণ

দুইডা মাথা

চারটা চক্ষু

যাইতে এক

আইসতে দুই

বুঝিলে গে স্বামী

তুই আর মুই।

গায়ক — এটা মুই বুঝি পাহচু। উত্তরটা হইল

'কাঁকড়া আর শিয়াল'

উধব — তোর মাথাত বুদ্ধি আছে রে, ঠিক কহচিস।

গায়ক — ধূপ না লাগি লাগি

মুই গেনু বৃক্ষ লাগি

সেই পত্র ঝড়ে পড়েরে

ওহোরে বিধাতা

উধবের ফাকরি বা শ্লোক —

জন্মিলে শ্বেত বর্ণ

পরে হয় কালো

লাফে লাফে আহার ধরে

সেইতো বিড়াল নয়

আহার ধরিয়া না করে ভইক্ষণ

বলতো গীদাল

এটা কোন জন

গীদাল — এটা কি কথা কহচু

একেবারে সোজা উত্তর —

ফিকা ভাল।

উধব-মাধব — ঠিক কহচু। খালি হামার

মামিটাক নিয়াই তোর গান।

ওর দুঃখটাই তুই ভাবিচু।

গীদালের গান — মাথায় বন্ধিসু জনটা বেবুত লাগায়

রসমকো দড়িহে কানু

হরিকে বান্ধায়

উধব — আরে এটা বুঝির না পাই।

গীদালের গান — মনের আগুন তলে জ্বলেরে

নিকটের আগুন ধায়

জ্বলেছে মনের আগুন

সখিরে কি খাইলে জুড়ায়।

উধব (বতেয়া) — টাকরখানি চ্যাপটা

একটা আছে ডেঠা

ভিতরোত ঢুকিবার কাইর্য নাই

উপরত লটপটালে ঠা'।

গীদাল — সোজাসুজি কয়া দিম?

উধব-মাধব — দে কয়া।

গীদাল — বিচন পাখা।

গাওত হাওয়া নাগানি পাখা।

উধব-মাধব — ঠিক কইচে।

গীদালের গান — ঘুচাইম সাংখা মুঠি চুড়িয়া

মুছাইম সিতার সিন্দুর

আংগুঠি বিছুয়া

কিছু নাহি রাখবো

হে-এ ভাব রঙ্গিয়া না বলান

সারাঙ্গী

চিৎ মেরা উধাসী।

গীদাল বলে — এই উধব তোর মামীটা

কান্দিছে। শুনবু তোর

মামীর কান্দন।

গীদালের গান — পিয়া পিয়া করিকে

পিয়া নাইকে হিত

পিয়া গেল মোক পন্থবা

পেরেমোক ফাঁসি দিয়া

মেরে গেল লাগায়।

উধবের শ্লোক — আবরান্তি জাবরান্তি

ভিজান্তি গাও

ধাঁপোত বসিয়া আঁছো মুই

মূলের মাও।

গীদালের উত্তর — কুকুর আর বিলাই-এর ঝগড়াঝাটি।

উধব-মাধব — ঠিক কহচু।

গীদালের গান — পিয়াস লাগি লারি

মুই গেনু যমুনা নদী

সেই যমুনা হয়ে গেল বালুচরীরে

ওহোরে বিধুতা।

উধবের ফাবরি বা শ্লোক —

যে হবার হলগে মাতা

সেই বুরুক হল

হরমুরিয়া শাখ যান

আনিয়া দে ঝোল।

গীদাল — গুজরি শাক।

উধব-মাধব — ঠিক কহচু।

গীদাল — কুহেলি তেজেলা ওহোরে

হায়রে মোর আম বাগিচা

হাংগেস তেজেলা সরোবর

পাহুর তেজেলা হায়রে কুঞ্জবন।

উধব-মাধব-এর শ্লোক- ঠাকুরঝি ভিটিস করইলো কি
আঘাত ছবা দিছু কাঁঠালের বিঁচি
দুই একটা মাথা হামার ভিতি
এই জুয়াই বেটা
ওখ'ন মোর বাও
তোমার যদি ওখান বাও
তাহলে তোমরা খাও।

গীদাল — উধব তোর চালাকি মুই বুঝির
পাহচু। জামাই খাবার বসিছে
আর শাউড়িটা দিছে পাদ।
আর কয়কি কাঁঠালের বিঁচিটা
ভিটিস করিছে।

উধব — তুই ঠিক বুঝির পাছিস।

গীদালের গান — মথুরা যাইবো যদি
অভাগিনী রাধে
বা পদ বাড়াই দে
ওহো রে মোর
চইড় আমার কাঁধে।

উধব-মাধব — কুহু কুহু বলে গেলা
কেকিলা নন্দন
বিধির বিপাকে
পেঁচাটার গলায় বন্ধন
ডাঙ্গায় ঠাটায়
পেঁচাটার মাথাত কনু খাও
তাহো না ছেড়ে ক্যাচের ক্যাচের
রাও।

গীদালের গান — জীব কান্দে কুরণীর বাদে
ও তোর পেঞ্চেরা কান্দে গে
দুই নয়ান ঝরে
কান্দিস নারে সোনার পেঞ্চেরা
ও তোর সঙ্গে না কুল
যাবে গে রাধে
এ ত্রিবেনীর ঘাটে।

উধব-মাধব — ধইন্য তোর মাতা পিতা
ধইন্য তোর বাপ
কে শিখাইছে ভক্তি আর ভাব
ভক্তি দিতে কটিখান
কইরছে তোর ট্যারেক ট্যারোত।

গীদাল — তোর কথার বুঝিবার পাহচু।

উধব — তুই কি কহবু কও।

গীদাল — আষাঢ় শাওন মাসে
নদী বহেরে ঘোথ
উলুটি পুলুটি দেখুরে
সোয়ামী নাই মোর ঘর।

উধবের ফাকারি — চাংড়াগুলাক উঠায়ে দ্যাও
আর বুড়াগুলাক ভুকায়ে দ্যাও।

গীদাল — এটার উত্তর হইল পানের বাটা

উধব — ঠিক কহচু।

গীদালের গান — উড়াইলো মিরিঙ্গা পক্ষী
উড়াইলো
তিতিরা পক্ষী
ওই মতন উড়াইচে গে
তোর সোয়ামী গে রাধে

উধব — শালবাড়িত ছিলো বীরটা

য্যালা ধরিল বীরটা

বেটি ছাওয়ার পাছ

স্যালা বীরটা ফুকুরদুম ফাকাশ।

গীদাল — 'ছাম', তুই ছামের কথা কহচু।

উধব — ঠিক কহছিস।

গীদাল — আরে, ঐ কানা-মেঘা

বরসালে রে সখি

পড়ি গেল বড় বড় টোপ

আরে মই নারীটা ভিজেচো

মন্দির ঘরেরে সখি

মোর সায়া গেছে পর দেশ।

উধব — লাল টুপিয়া ভাই

চল নামাজ পড়তে যাই

মুই না পড়ো নামাজ

পড়েছে কুতু ভাই।

গীদাল — আরে, উধব তোর মামীটার কথা

কহচু, আর তুই ফাকরি কহচু।

উধব — এটার উত্তর কহ দেখি।

গীদাল — 'মুরগা'

উধব — ঠিক কহচু।

গীদাল — ওহরে দহ বিচি কমলা উপর করিয়া

মধু লোভে ঘুরেচে, রে সখি

কেইসে রহাবো একেলা।

উধব — কুন ফুলের বীজ নাই কহ দেখি ভাই

ফলের ভিতর জল আছে ভাঙ্গিলে দেখিতে পাই

গীদাল — নারিকেল।

উধব — ঠিক কহচু।

গীদাল — সুশাগ সুভাত

বিধি না পরালো আশ

না পুরালো মধুরস

হে ভাবুনি গে কিয়ারে ভেল

না করিনু গয়া সিনান

না করিনু তিরি বেদ

না করিনু সায়া সেবা

ইহ জনম যাবে এই কারণ।

উধব — কথাটা হামরা নি বুঝি।

গীদাল — তোর মামীটার জীবন বিফল হলো

উধব — ওটা কথা না হয়, মামার

অন্ত নীলা। ফিরি আসিবে।

গীদাল — লদী বহে হিরবা হে জিরবা

লদীর চারি ঘাট

ও হোরে, ইহপন্থে দেখালা হো ভাইয়া

সায়া রুযী যায়।

উধবের ফাকরী — ঠনা বোলায় ব্যানা,

টাংনা গিদায় গীত

দরই মাছের নাচন দেখি

ওংগি না পায় থির

শোল মাছের গিবির গাবার

শোল মাছের হুরা

মাথা সটকায় দিচে

পানির তলের দুরা।

গীদাল — চন্দ্রকা বেয়েরী হায়রে মোর বেদেনী

মাছের বেয়েরী মহাজাল

তিরিয়ার বেয়েরী হায়রে যৌবন

উধবের শ্লোক — আট ঠেংগা ষোলো হাঁটু
জাল পাতাছে মুখ টুটু
মাছনি কান্দে, কান্দিছে পানি
বেহান সকালে উঠিয়া
করেছে টানাটানি।

গীদাল — এটার উত্তর হল 'মাকড়সা'

উধব — ঠিক কহচু

গীদালের গান — খুত খবর পিয়া কিছু নাই ভেজালা
আরে হো ভেয় গেলো নিকটে কঠুর
গেইলে সব তেয়াগ করিয়ে
দয়া তেনিক লাগায়।

উধব — শূন্যে আসিল শূন্যে গেইল
শূন্যে বান্ধিল ঘর
কোনোকালে মুই দেখনি
পিটিত কমোর।

গীদাল — আরে হিটাও না 'মাকড়শা'

উধব — তুই ঠিক কহচু।

গীদালের গান — রাজা বিনে রাজ্য শূন
পুত্র বিনে কোলা শূন
স্বামী বিনে মোর
বাংলা আধার চর
দৈবে হরিয়া রে নিলে।

উধবের শ্লোক — আরোয়ার ব্যাটা জারোয়া
কিবা আনলো ঘরে
খরবর খরবর করে
ছোয়া পালাল ডরে

মোর আইছে জ্বরে।

গীদাল — 'দুরা' মাছটার কথা কহচিস?

উধব — ঠিক কহচিস।

গীদালের গান — তেল জ্বলিয়া গেল
রহে গেল বাতি
রাই ধনি পড়ে রলা
চলে গেলা পতি,
সখীরে নয়নেকা জ্বলে
হাম ভিজালনী ছাতি।

উধব-মাধব — কাহ্ন আহ্ন ছাড়া ধাছাড়া পা
লবঙ্গ-এর বঙ্গ ছাড়া তিনটি অক্ষরের
একটা জিনিসের নাক কিনে আন তাহা

গীদাল — এটার উত্তর কাঁঠাল।

উধব-মাধব — ঠিক কহচু।

গীদালের গান — সখী স্বপন দেখিনু হাম
আসিয়াছে কানু শ্যাম
আসিবে, আসিবে সখী
মনের না বাহুর ভেল

রাধাভাব গীদালেরগান - কি কথা কহল
চিত ভরল
ও মোর সখীরে
রাখ চিত মোর মনকে বুঝায়ে।

উধব — ফুল কষ্ঠং ফল কষ্ঠং গাবুর কষ্ঠং বিজলা
বুড়া কষ্ঠং খাইতে মিষ্ঠং, খাইতে খাইতে যায় ভিতরা।

গীদাল — এটার উত্তর 'আম'

উধব — ঠিক কহচু

গীদালের গান — আরে জঙ্গলখানি ছবা যাছে

সর্ব্বলোকে জানে

জ্বলেছে মনের আগুন

কেহ নাহি জানে।

উধব — মুই বুঝির পাঁওনি।

গীদাল — তোর মামীর মনের আগুন জ্বলেছে।

উধব — মামীটার মনের আগুন মুই নিবাইয়া দিম্।

গীদালের গান — ক্ষন রস মুরালী

মন রস লাগে

তেরা বাঁশীর শবদে

হিয়া মেরা হালে

সখী, ওই না সায়ার বাদে

সুখ গেল মোর দুঃখ গেল

সখী মোর গেলো মুখের হাসি

ওহোরে সখী, কায় আর দেখিবে রে

ও মোর চাঁদ মুখের হাসি।

উধবের শ্লোক — দাড়ি ছলবুল মুখ ভাকুরা

কাহাসে যাবোরে

বন ঠাকুরা, বনমে রহি

বনফুলো খাই, হরিণ খায়ো পঞ্চাশ

বারোটা বাঘ, বারোটা বাঘানী

না পাই, দিনটার উপাস।

গীদাল — মোক উত্তরটা চিন্তা করায় যাবে।

বুঝির পাহচু — এটা হইল —

বাঘ আর ভোঁকরা পাঠা।

উধব — তোর মাথাত বুদ্ধি ছেরে, ঠিক কহচু।

গীদালের গান — এখেত আধার রাতি

কেহ নাই মোর সঙ্গ সাথী

বিজলি চিটকিচে মেরা দেহা

রৈ দৈব

দুই নারী রোহচুরে একলা।

ডুবিয়া মরালা রে জয়লাথ

ডুবে মরান।

এহিনা যমুনার জলে

ডুবে মরালারে ডুবে মরালা।

উধব — মামার অন্তনীলা। কুনঠে মরে।

আসিবে ফিরি।

গীদালের গান — পর্বতের কুলে কুলে বাঘ ভালুক চড়ে

আজি সোয়ামিক মোর

যাইবে ধরিয়ারে অরুনার জঙ্গলে।

শঙ্খ করিমু চূড় বস্ত্র করিবে দূর

মুছিয়া ফেলাম সীতার সেন্দুর

নয়নের কাজল

ছবা যারে কোলার বালিশ

স্বর্গে উঠুক ধুয়া

কতদিনে আসিবে মোর অভাগীর সায়া।

চন্দন বুলিয়া এ বৃক্ষ লাগাইয়াছিনু

সেই বৃক্ষ মোর শিমূল-পলাশ

- রে সখি।

উধব-মাধব — কুনঠি হাতে আসিলোরে কাক চরিত্র

রাঙ্গা দেখি তোর ঠোঁট

কুঠে পালো মাছ মাংস

কহয়া দেনা মোক

ঐঠে পাছি মাছ মাংস

খেপিচু বাইসো রাতি

আশা দিয়া পুরুষটাক মালু
ফুলবতী নারী।

গীদালের গান — রাধিকার কান্দনে বিরীক্ষের পত্র
সখি মোর ঝরিয়া পড়ে,
ও মোর সখীরে, তুই হেনা ছেড়ালে'
ওহো মোর ভাইয়ার দেশরে।
যেদিন হাতে সায়া গেল
কপাট লাগাইয়া গে ননন
ও মোর ননন গে রাখ চিত মোর
মনকে বুঝায়ে।

উধব-মাধব — সারারাত কাটে দেনু
মুই খানু ঘেরা
অয় আসিল কি কলে নি কলে
অয় খাছে দই চিড়া

গীদালের গান — সখি বেহার কুসুম ধুতি
মলিন্দ না ভেল
হরীনা বয়সে সায়া
মোকে ত্যাজি হুনা গেল।
বনের হরিংগের জরা
তার আছে জুরি
হাম নারী অভাগিনী
করলে বেজুরী।

উধব — মোর মামীটার জন্য চিতখান মোর
ফাটি যাছে।

গীদালের গান — একদিনকার তানে গেল
বরষ বিতিয়া গেল
আরি হো সখি, আর না

আসিবে প্রভু মোর।
এ হাটু পালংকি শেজা
দুনো মিলি শুতি সেলা
নিন্দেরে আলিসেরে সায়া
মেরে তেজি গেলো।

উধব — শুন শুন দশ নারায়নলা আমি বলি বানী
দুইখান দুই পাখে লোহার বাড়া
মইধ্যে সিলানী, তার দেহা নাবিলে
ছিরিৎ নিকলে পানি।
চড়াও ঘড়াও করে পানির তলত বাড়ী
মুখখান থেই থেইয়া, বিত্তার দুইখানি
আছে দাড়ি, তিনডা আছে পাক

গীদাল — তুই যতই কহ কিতায়, মুই বুঝি পাহচু।
এইটা হল শামুক।

উধব — ঠিক কহচু।

গীদালের গান — শিংনি শিয়ালে খাউকরে উধো
ও মুই ঘাটের রে মরা
কাটো কেলা বান্ধ ভুড়া
মোক দেও ভাসায়া
যাই মুই মথুরা।

উধব — মামী তোমরা বুঝির পাহনি।
বাঁচি থাকতে ভুড়াত করি
ভাসায়ে না দিম। হামরাতো
ওংসাবার ধরছি।

গীদালের গান — ঘরের আগাতে টুটুয়ারে সারাথী জরা
বুক লেহেলায়
হাম নারী জল ভরাই

চৌদিকে নজর চালাই।

উধব — মামীটা মোর কান্দিছে

মোর মামাতো আসে না।

গীদালের গান — এ খাট পালাঙ্কী সেজা

মাকড়া জলেনি ভেলা

নিন্দ মেরা হয়া গেল ওর

ও হোরে দৈব মুই নারী একেলায়।

উধবের শ্লোক — হে কুঁজা, খালে যায় বুঝা

এ কুঁজা তুই ছোড়, তুই কহেছিস হে ছোড়

তোর কারণে কোটিত লাগিছে ডোর।

গীদাল — এটা হল ছিপ, আরে বনশি

উধব — ঠিক কহচিস।

গীদালের গান — এনে খড়ি না কাটি কাটি

এ বংগালা বান্ধামু রে সখি

সেই বাংগালারত রাখিমু চারি দুয়ার

চারি দুয়ারে জুড়িয়া দিমুরে বাতি

পাশুরিমু মুই স্বামীর শোকে

উধব — তোর বাত্তা মুই বুঝির না পানু

*(গীদাল গানের অর্থ করে দেয় এবং আরেকটি গান ধরে।)*

গীদালের গান — লেহ গে বান্দীদাসী

এ খাট পলাঙ্কী সেজা

লয়ে চল কদমের তলে

কদম ফুল হেরি

হৃদয় জুরাব হরি

সখি পাশুরিমু মুই

সায়ার শোক।

*উধব কৃষ্ণের ভাব নিয়ে রাধিকার সঙ্গে মিলিত হয়।*

গীদাল মিলনের গান গায় —

ঝেচু করে ছলবল
কুংকিলা ছাড়ে রাও
রাধাকৃষ্ণের মিলন হলো
ঘর চলি যাও।

---

সংগ্রহসূত্র

লোকনাটকটির নাট্যানুষ্ঠান বর্তমানে খুবই কম। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এটিকে লিখিত আকারে আনতে পারি। দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদাওয়া ব্লকের রাঙ্গাপানী রেল স্টেশনের দক্ষিণ দিকের গ্রামের নাম বানিজোত। এই গ্রামের বাস করেন 'নটুয়া' পালার মূল গীদাল বালিমোহন সিংহ। অতিবৃদ্ধ মানুষ তিনি। এই মূল গীদালের 'নটুয়া' লোকনাট্যানুষ্ঠানটি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের কাছেই পেল্লুজোতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পুরো সময় উপস্থিত থেকে 'নটুয়া'র নাট্যানুষ্ঠানটি দেখেছি।

## 'শাস্তরী'

## ''জ্ঞানবালা পুটপুটিয়া গোঁসাই''

বন্দনা ঃ

ওই আমি বন্দনা করি
সতী নারীক পরনাম করি
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দু মাগো
গঙ্গা ভাগীরথী।
পাপের হবে মুক্তি
সতীর মধ্যে সতীরে ভাই
নামটি তাহার সীতা
সেও সতীটাক হরণ করিছে
লঙ্কার রাবণ রাজা
আরেক সতীক বন্দি নেবো
নামে রাধা সতী
সেও সতীটা হইছে ভাইরে
ভাগিনা ভাতারী।
আরেক সতীক বন্দি নেবো
নামে দ্রোপদী
সেও সতীটা হইছে ভাই
পঞ্চ ভাতারী।
আরেক সতীক বন্দি নেবো
নামে অহল্যা
সেও সতীটাক হরণ করিছে
স্বর্গের ইন্দ্র রাজা।
আরেক সতীক বন্দি নেবো
নামে তার রঞ্জনা
সেও সতীটার হইছে বেটা

জারজ কলংকিয়া

আরেক সতীক বন্দি নেবো

নামে পদ্মাবতী

হাউসে রঙ্গে দিন কাটাছে

নামটা বিষহরি।

আরেক সতীক বন্দি নেবো

বেহুলা সুন্দরী

ছয় ভাসুর সোয়ামিক জিয়াল

যায়া দেবপুরী

ওই আমি বন্দনা করি

সতী নারিক পরনাম করি।

অনেক অনেক সতী আছে

সতী আছে মেলা

মন দিয়া সবাই শুনবেন

জ্ঞানবালার পালা।

গীদালের গান ঃ ওই শোনরে সবাই

মন দিয়া

শুনিলেক জ্ঞান হবে

শুনে যেই জনা।

(এই গান গীদাল শুরু করে দিলে

অন্যান্য বাদ্যকররাও তার সঙ্গে গানের

সুর ধরে গান করতে থাকবেন।)

আবার গান শুরু ঃ শুন শুন দশমনি

শুন শুন মন দিয়া

নবীন বয়সে হইছে বৈষ্টম

নামটা পটপুটিয়া।

গীদাল পটপুটিয়া নামের ব্যাখা দেয়।

পটপুটিয়া নামের কারণ ও ব্যাখা দর্শাবার

পর গীদাল নিজেই পটপুটিয়া

সেজে দীক্ষা নেওয়ার জন্য এবং

ভেক ধারণের জন্য গোঁসাই

গোঁসই করে ডাক ছাড়েন।

সেই সময় পটপটিয়ার সঙ্গে

বগুলা গোঁসাই এর দেখা হয়।

বগুলা গোঁসাইঃ বাউ তুই কায়?

পটপুটিয়া ঃ মুই ক্যাছরার ব্যাটা।

ছেরাদ্দের সময় গেসিলেন।

বগুলা ঃ শুনেক শুনেক পটপুটিয়া

যাবেন তোমরা কুন্তি

পটপুটিয়া ঃ বড়ই দুঃখে গোঁসাই

আসিলাম তোমার বাড়ী

বগুলা ঃ কি তায় আসিলে বা?

পটপুটিয়া ঃ বড়ই দুঃখে অসিচু।

গান ঃ গোঁসাই দিনু গুরু দায়

ধন সম্পত্তি ফুরায়ে যায়া

মুই মানষের ভিতর নাই

দেও মোকে ঝোলা মালা

দেও গোপাল ডাং

দ্যাশ বিদেশে মুই ভিক্ষা করিয়া খাম।

বগুলা ঃ বা তোর বেহা হছে, না নাই?

পটপুটিয়া ঃ হয় নাই।

বগুলা ঃ চেংড়া বয়সে বৈষ্টম হইলে

লোক কি কহিবে

কুকর্ম করিলে বাপু

নরকে পড়িবে।

কাম ক্রোধ লোভ রিপু

আছে তিন জন।

এই তিনটা রিপু তোর

নাই হয় দমন।

কাম ক্রোধ লোভ রিপু

তিনটা হারাম খোর

তিনটা রিপু দমন না হইলে

সাধুটাই হবে চোর।

পটপুটিয়া ঃ কাম ক্রোধ লোভ রিপু

করিছু দমন

দ্যাও মোকে ঝোলা মালা

সাজাও বোষ্টম।

বগুলা ঃ (দর্শকের দিকে তাকিয়া বলেন)

দ্যাখো মন্ত্র দেওয়া কিন্তু চলে না

তোমরা যদি দশজনে কহেন

বৈরাগী সাজায় দে

তাহলে মুই দেছু।

দর্শক ঃ দে বৈরাগী সাজায়ে দে

বগুলা ঃ দিলাম তোকে গোপাল ডাং

দিলাম ঝোলা মালা।

হাঁস পারো কাটা ছিড়া

এইল' খাতে মানা

পটপুটিয়া ঃ সেবা বাড়ীত যায়া

মোর পাটাভাত খাওয়া শ্যাষ।

বগুলা ঃ আড়ি লোকের হাতে বাপু

খাইতে আছে মানা

গুরুর কথা না রাখিলে

নরকে হবে বাসা।

(ব্যাখা করে বলে) যত অসুবিধা থাকুক

নিয়ম মানায় খাবে।

ঠ্যাকা চালাবার জন্য একটা

মন্ত্র নিয়া যা।

বওলা ঃ মন সিনান টন সিনান

টাবালং টুবুলং সিনান

মুই না সিনাউ

মনটা সিনাছে

পিঠে পাকে জলখাস

দুলদুলায় পালাছে।

গীদালের গান ঃ গুরুকে পরনাম করিয়া

শুরু দক্ষিনা দিয়া

পটপুটিয়া বিদায় হইয়া গেল

দেশে বিদেশে পটপুটিয়া

ভিক্ষা করিতে লাগিলো।

গীদাল (কথা) ঃ একটা বেটি ছাওয়া

কান্দিছে কিতায়

কান্দিছে। অর নাম কি?

গীত ঃ ঐ কান্দেরে ওরে কান্দেছে

জ্ঞানবালা

কাক দেখিয়া জুরাম মুই

নারীর দেহা।

ওই কান্দেরে -

(গান শেষে জ্ঞান বালা

আসরে প্রবেশ করে

ঠাকুরকে বলছেন)

জ্ঞানবালা- (গীত) ঃ কিনা কইছু দুশিরে
বিধি কিনা কইছু হানি,
চিতল বয়সে দারুণ বিধি
মোকে কলে আড়ি
ঐ কান্দেরে -

জ্ঞানবালা ঃ হে ঠাকুর মোর কপালে
এই লেখিছি। এই বয়স
কি করিয়া কাটিম।

পদ্যের আকারে বলা ঃ কান্দিতে ভাবিতে
দিন মোর যাছে
একা ঘড়ে দারুণ বিধি থাকিবো
কেমন করে। ঐ কান্দেরে

কথা ঃ তোমার অন্তলীলা
কে জানে হরি
কাকে হাসাও কাকে কান্দাও
কাকে কর বনবাসী।
ঠাকুরের কোনো দোষ নাই
আমার কপালের লেখা
কপালে থাকিলে দুঃখ
খন্ডায় কুনবা জনা।
হে স্বামী, তোর মনে এই ছিলো।
বেহা করিয়া ছাড়িয়া গেলো।

গীত ঃ হায়গো দারুন বিধি বুঝিতে নাহি পারে।
মোর দোষে না স্বামীর দোষে,
মোকে কলো আড়ি।
ঐ কান্দেরে।

কথা ঃ এই জন্মের পাপ না হয়
আর জন্মের পাপ নইলে দেবতার
অভিশাপ।

গীত ঃ ছোটয় ছিনু ভালো ছিনু
বাপ মায়ের কোলে
বেহা হয়য়া হনু আড়ি
নিজ কর্মের দোষে।
ঐ কান্দেরে -

কথা ঃ হে ঠাকুর কত কান্দাবে
কতয় বা কান্দিম
যতয় দুঃখ পরোখ নিজের জন্যে
রান্না করিবা হবে মুই রান্না করুত। (প্রস্থান)

পটপুটিয়া ঃ (বৈরাগীর বেশে
পটপুটিয় প্রবেশ করেন)

গান ঃ ওই মন মাতঙ্গ বান্ধব
সদায় মন মোর আনন্দ
গুরু বলিয়া ডাকরে মন
এ দেহটা নিশির স্বপন

পয়ার ঃ ছয় রিপুটা পাষন্ড
তারায় করে ভন্ড
তাকে তুমি করো বশ
এ দেহটা নিশির স্বপন।

কথা ঃ কাহতে দেখা যায় না।
বাড়ী দেখা যাছে - ঐ বাড়িটাত
আজি রাতি কাটাইম

মূল গীদাল ঃ কান্দিয়া কাটিয়া জ্ঞানবালা
ভাতো না নন্দিলো।

বাবা বাবা বলিয়া

পটপুটিয়া গোঁসাইক ডাকিতে লাগিলো।

জ্ঞানবালা (গীত) ঃ বাতি হাতে নিয়া

জ্ঞানবালা বাহির হয়া গেলো।

দাড়ায়েছে বোষ্টম গোঁসাই

নজরে পড়িলো।

কথা ঃ সন্ধা বেলায় মোর দুয়ারে

বৈরাগীটা কিতায় আসিল।

মুই জিজ্ঞাসা করু।

পদ্য ঃ শুনো শুনো ঠাকুর বাবা

যাবেন তোমা কুনতি

পটপুটিয়া ঃ বড়ই দুঃখে ওগো মা

আসিলাম তোমার বাড়ি।

জ্ঞানবালা ঃ কি তায় আসিলেন ঠাকুর?

পটপুটিয়া ঃ আমিতো বৈষ্ণব মাগো

আছে বহুত দূরে

সন্ধ্যা হয়া গেল মা

থাকিবো তোমায় ঘরে।

গীদাল ঃ আদর করি পটপুটিয়াক

নিয়া গেল ঘর

হাত পাও ধুবার বাদে

আনিয়া দিলে জল।

ঐ কান্দেরে -

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর, তোমরা সন্ধ্যা আহ্নিক করবেন।

পটপুটিয়া ঃ হ্যা মা করিবার লাগে।

পটপুটিয়া ঃ (বাহুতে, কপালে তিলক

কাটা শুরু করে এবং জ্ঞানবালার

চাল চলন দেখে দেখে

তিলক কাটেন। সেই সময়

দর্শকদের দিকে নজর দিয়ে

পট পুটিয়া কথা বলেন।)

দেখলেন, দেখলেন, জ্ঞানবালা মাই বাহা দুখান ঝোকলায় ব্যারাছে।

(জ্ঞানবালার শারিরীক বর্ণনা

তিলক কাটার মধ্য দিয়ে পটপুটিয়া হাসিচ্ছলে দেখাতে থাকেন।)

গীদাল ঃ হাত পাও ধুইয়া ঠাকুর

বসিলো বিছানাত

থালায় করি জ্ঞানবালা

আনিয়া দিলো ভাত।

ভাত নিবেদন করার সময় পটপুটিয়ার

গুরুর কথা মনে পড়লো -

গীদাল ঃ গুরুর কথা পটপুটিয়ার পড়ে

গেলো মনে

আড়ি না কুমারী

শাঁখা নাই হাতে।

পটপুটিয়া ঃ ও মা ও মা

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর হামায় ডাকালেন।

পটপুটিয়া ঃ মাই তোর নাম কি?

জ্ঞানবালা ঃ হামার নাম জ্ঞানবালা।

পটপুটিয়া ঃ হ্যা মাই তোর নামটাও

ভাল। য্যামন তোর

নাম স্যানম তোর কাম।

মাই, তোক একটা মুই

কথা জিজ্ঞাসা করবার চাহাছু।

জ্ঞানবালা ঃ তা করো।

পটপুটিয়া ঃ মনে দুঃখ করবো কি?

জ্ঞানবালা ঃ তা কি খারাপ কথা কহবেন?

পটপুটিয়া ঃ না না খারাপ কথা নি কহিম।

পটপুটিয়ার গান ঃ শুনেক মাইগে জ্ঞানবালা
শুনেব মন দিয়া
আড়ি না কুমারী মাই
হাতত নাই শাঁখা

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর, এ্যামন কথা কহলেন
নিন্দের ছোয়া জাগায়ে দিলে
মিছা মোর নারী জনম
মিছা ঘরবাড়ী।
চিতল বয়সে দারুন বিধি
মোকে কইলেন আড়ি
ঐ কান্দেরে -
গোঁসাই হামা বিধুয়া।

পটপুটিয়া ঃ মই তোর হাতে
মোর সেবা চলে না।
একটা কথা শুনেক।

পটপুটিয়া ঃ ওই শুনেক মাই জ্ঞানবালা
মোর উপর তুই না হস গোসা
বিধবার হাতে মা মোর
কিছুই চলে না।

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর কিতায় চলে না।

পট পুটিয় ঃ গুরু যে করিছে মানা
শুনেক জ্ঞানবালা
আর তোর হাতে খালে মোর
নরকে হবে বাসা।

জ্ঞানবালা কথাঃ নরকে বাসা হবে

তুই জানিস?

পটপুটিয়া ঃ মুই না জানং মোর

গুরু জানে। গুরুটা

মোর ঐটা বনের বাঘ।

জ্ঞানবালা ঃ তোর গুরুটা মোর

দরকার ছিলো।

পটপুটিয়া ঃ পারবিনি পারবিনি।

কত সাধুর দাড়ি ওকারাইয়া দিছে।

জ্ঞানবালা ঃ যে জঙ্গলে বাঘ থাকে না

ঐ জঙ্গলে শিয়ালটায় রাজা।

ঠাকুর, তুই তালে কি ভাত না খাস?

পটপুটিয়া ঃ মাই না খাউ, মোর

চলিবার না হয়।

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর কত দিন কার বৈরাগী?

পটপুটিয়া ঃ যখন ছিল না চন্দ্র সূর্য

আগুন আরো পানি

ধানের ভিতর চাউল ছিল না

স্যালকার বৈরাগী আমি।

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর চুপ করি থাকো।

কথার নাই মাথা।

কথার জানিস জোড়া।

ভালো কথা কহিতে

তুই মোক কহচিস জান জুলা কথা

জার শীত তারে ভার

এইল্যা কথা শুনবার মোর

কিসের দরকার।

পটপুটিয়া ঃ তুই বোলে শুনবো শুনবো

তাতে মুই কহিম।

জ্ঞানবালা ঃ তুই যদি উত্তর না

জানিস মোরঠে শুন।

মায়ের গর্ভে যখন ছিলে আপনি

তখনে নাহি ছিলো চন্দ্র সূর্য আগুন

আরো পানি।

সপ্তম মাসে গুরু যখন মহামন্ত্র

দিয়া ছিলো -

তার সেই মহামন্ত্র পাইয়া

দশমাস দশদিন পরে

ভূমিষ্ঠ হইলে।

(জ্ঞানবালা এই কথা ব্যাখা করে)

তোমরা ঝোলা কোন

বেলা নিছেন মোর বোঝা

হয়য়া গেছে।

আশ্বিনের তুই ঠাকুর

কার্ত্তিকত নিছিস ঝোলা

আশ্বিন কার্ত্তিকের ধানডার ভিতর

চাউল হইছে, ক্ষেত বাড়ীত

দেখেন যায়য়া।

পট পুটিয়া ঃ মুই তামাল কথালা তো

ভালোয় ভালোয় কহল

মুই আশ্বিন কার্তিকের বৈরাগী?

পেটের ভোকে বৈরাগী হছু?

জ্ঞানবালা ঃ চুপ করিয়া থাকো।

আগের বড়াবুড়িগুলা কয়

আলসিয়া গধেয়া কাম কুড়িয়া
ওগলা নোক ঠাকুর বৈরাগী হয়।

কথা ঃ ঠাকুর তোর সঙ্গে কিন্তু নাগিল ধাই

গান ঃ তোর কথাতে ওরে ঠাকুর
নাগিয়া যাছে ধাই
তোর হিসাবে বিধবা
গেইসে হামা যাই।

পটপুটিয়া ঃ মাই, তোকতো মুই
যাই' পাঠাও নাই

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর, ভাতগিলা খারে ঠাকুর
আগোত খা তুই ভাত
সালিস করে কহছু কথা
না ওঠাস মোর রাগ।

পটপুটিয়া ঃ এটা সালিস হৈল।
নাই খাম তোর ভাতগে মাই
নিজে করিম পাক
মোর হিসাবে বিধবা
হচিত ছোয়া পাত।

জ্ঞানবালা ঃ তোর কথাত ওরে ঠাকুর
উঠিবা ধইছু রাগ
তোর হিসাবে আড়িগিলা
হচিত ছোয়া পাত।
এমন কথা কলেন ঠাকুর
মানজাত দিলেন কোপ
হছেন বোষ্টম গোসাই
ভালো না হস লোক।

জ্ঞানবালার গান ঃ ওই শোনেক ঠাকুর শোনেক

মন দিয়া

আড়ি নিছে তোর বড় দাদা

শোনেক ঠাকুর মন দিয়া

আড়ি নিন্দা কথাগুলো

মোর গাওখান সয় না।

আড়ি হল তোর আদি মাতা

আড়ি গলার মালা

দোভাতারী নারীটা হইছে

ভেকখানের গোরা

পটপুটিয়া ঃ মোর বড় দাদা কায় ?

মোর কাহ নাই।

জ্ঞানবালা ঃ তোর বড় দাদা আছে।

তুই যে সাধন পথে গেছিস,

নারায়ন তোর বড় দাদা।

তুলসীর বরের নাম হল

শঙ্খচূড়।

নারায়ন যুদ্ধ করি শঙ্খচূড়

বধ করিল। তুলসী দেবী

বিধবা হয়া গেইল।

তখন তুলসী দেবীক

নারায়ন নিয়া ফেলাল।

আচ্ছা, তোমার গলাটাত ওখান

কি ঝুলাছে ?

পটপুটিয়া ঃ মাই এখান হামার

বৈরাগীর পরিচয়।

জ্ঞানবালা ঃ গলাত তোর

তুলসি মালা

অহে আড়ি মাইয়া।
রাধা হছে দুই ভাতারী
বোষ্টমের গোড়া।
ওই শুনেক ঠাকুর
মন দিয়া।
আড়ি মাইয়া মহাশুদ্ধি
দেখো বর্তমানে
তুলসী হছে আড়ি মাইয়া
সকল কাজে লাগে।
বিবাহিতা নারী একজন
নাম তার সীতা
কোনো কাজে নাহি লাগে
কায় করে পূজা।

কথা ঃ ঠাকুর একটা আচাংচা কথা
দ্রোপদীর পাঞ্চ স্বামী
তাহো নাংগত মন
স্বামী থাকিতে নাং করিলেক
জীব থাকে বৈকুণ্ঠ ভবন।
দীক্ষা গুরুটা বেহাতী স্বামী
শিক্ষা গুরুটা নাং
দীক্ষার পর শিক্ষা নিলে
ঐ জীবটা যাবে বৈকুণ্ঠ ধাম
শুনেক ঠাকুর
এক ভাতারী একেশ্বরী
নাই ভাতারী সাই।
পাঁচ ভাতারী হছে
ভগবানের পিসাই।

পটপুটিয়া ঃ পাঁচ ভাতারী কায়গে মাই?

বাতায়ে দিবা হোবে।

নিশুনিম তোর মুখের কথা

কোন শাস্ত্রত আছে।

জ্ঞানবালা ঃ পাঁচ ভাতারী কুন্তী দেবী

শ্রী কৃষ্ণের পিসাই

এই কথাটা মিথ্যা না হয়

মহাভারতে পাই।

আরেকটা যে সাত ভাতারী

আছে ঘরে ঘরে

আর সাত ভাতারীর আসল চিস

দিয়া গুরু পূজা করে.

পটপুটিয়া ঃ সাত ভাতারী কায়।

তাই বেশ্যার থাকি অধম।

জ্ঞানবালা ঃ গাই গরুটা সাত ভাতারী

আছে ঘরে ঘরে

সাত ভাতারীর দুধ দিয়া গুরু

পূজা করে

ওই শুনেক ঠাকুর মন দিয়া

পটপুটিয়া ঃ শুনেক মাইগে জ্ঞানবালা

শুনেক মন দিয়া

মোর হিসাবে বিধবা হচিত

হইচিত সিঞ্জার বেড়া।

সিঞ্জার বেড়া ভাঙ্গিয়া গেইলে

হয়য়া যাবে গুড়া

ঐ মতন বিধবা কোনো কাজত লাগেনা।

শুনেক জ্ঞানবালা।

জ্ঞানবালা ঃ তোর হিসাবে বিধবালা
হইচিত সিঞ্জার বেড়া
তোর পাছাত ঢালিয়া দিম ছেকা।
তোর মতন বোষ্টম গুলা
আছে ফোতার তলত
বাড়ী যায়য়া দেখিস পুরান
আছে তোর ঘরত
শিবটা হইচে আদি গুরু
দেখিস যায়া ঘরত
আদিগুরু হয়য়া আছে
মায়ার পায়ের তলত।

কথা ঃ মায়ার পায়ের আদি গুরুটা
যদি বহবার পারে, তুই কিতা
ঠাকুর ফোতার তলত
হবার পাবনি।

জ্ঞানবালা ঃ শুনেক শুনেক ওরে ঠাকুর
শুনেক মন দিয়া
কোন গুরুঠে নিছিস
এইল্যা ঝোলা মালা।

পদ্য ঃ দীক্ষা গুরু শিক্ষা গুরু কর্ণধারি
কোন গুরুঠে মন্ত্র নিয়া
সাজিছিত বৈরাগী।

পটপুটিয়া ঃ শুনেক মাইগে জ্ঞানবালা
শুনেক মন দিয়া
কর্ণধারী গুরুঠে নিছু
এইল্যা ঝোলা মালা।

জ্ঞানবালা ঃ ছোয়াগুলা যেমন ঠাকুর

ওয়ানেতে পড়ে

কর্ণধারী গুরুটা ওয়ান ক্লাস বলে।

ওই শুনেক মন দিয়া

পদ্য ঃ কর্ণধারি গুরুটা ঘর মুছা লেথানি

দীক্ষা গুরুটা হছে মায়ের পাটানি

পটপুটিয়া ঃ শুনেক মাইগে জ্ঞানবালা শুনেক জ্ঞানী

কর্ণধারী গুরুটাক বানালু লেথানি।

জ্ঞানবালা ঃ দীক্ষা গুরুটা মায়ের পাটানি

মন্ত্র দিয়া গেছে

তা ছাড়া দীক্ষার কাছে

কি বস্তু আছে।

জ্ঞানবালার শ্লোক ঃ ঠাকুর মন না গোবাইচিত

গোবাইচিত কাপড়া

বাড়ী বাড়ী বেরাইচিত

বিধুয়ার বকরা।

পটপুটিয়া ঃ নারী জাতি অবিশ্বাসী যেন সলাফুলা

পর পুরুষের ধন দিয়া বান্দিবার চাহচিত গোলা

নারী জাতি অবিশ্বাস কি বা মন্ত্র জানে

নাগইয়া প্রেমের দড়ি আস্তে আস্তে টানে

জ্ঞানবালার গীত ঃ ওই তোকে কি আর

বোষ্টম কহেরে

বোষ্টম তত্ব না জানিলে

পদ্য ঃ বোষ্টম হয়য়া যেবা নিন্দা

করিছে আড়ি,

না জানে বোষ্টম তত্ব

পেটের বৈরাগী।

পদ্য ঃ আড়ি নিন্দা করেচিস
এইটা তোর ভুল
আড়ি মেয়েটা হছে
ভব নদীর কুল।

পটপুটিয়া ঃ মোর কথালাত ওগে মাই
গোটলায় ধরেছিস ভুল
কেমন করে আড়ি মায়াটা
ভব নদীর পুল।
ওই তোকে বোষ্টম কহরে।

জ্ঞানবালা পদ্য ঃ লোক যখন মরে ঠাকুর
ক্রিয়া কর্মের দিন কি কি কর্ম করে।

পটপুটিয়া ঃ মোর অটে আচাংচা কথা শুনেক

পদ্য ঃ দহি দিছে চুড়া দিছে
রাঙ্গাখান মাই কি
আর খাবার পাতত
খায়া যাও - পুছাপুছি কি?

জ্ঞানবালা পদ্য ঃ গবর দেছে কড়ি দেছে
একখান আরো সুতা
সুতাখানে ওরে ঠাকুর
অহে আড়ি মায়য়া

পদ্য ঃ লোক যখন মরে ঠাকুর
লোক যখন মরে
মরার মুখত তুলসী জল
দিবা কিতায় লাগে
ওই তোকে বোষ্টম কহেরে।
আড়ি নিন্দা করেছিত
বোষ্টম গোসাই

আড়ি মায়ার জল না হইলে
ভাইন্ডের শুদ্ধি নাই
জীব তো চলিয়া গেছে
ভাইন্ড আছি পড়ি
তুলসী জল দিলে
ভাইন্ডের হবে শুদ্ধি
হুজুগেতে মাতিয়া সাজিছেন বৈরাগী
অল্প বয়সে ডোর কাটিয়া
হইছেন বৈরাগী
ধর্ম কথা ঐল্যা সাধু
বেড়ায় আরো বলিয়া
দ্যাশ বিদেশে বেরাইছে
ভন্ডামী করিয়া।
মুখে বলে হরি হরি
নিছেন কপিন মালা
সারা দেহে মাখিয়া দেছেন
তিলকের ফোঁটা।

পদ্য ঃ গায়ে তার নামাবলী
করিম গুরু সাধনা
ছয় রিপু তোর নাই হয় দমন
মনের বাসনা।

পদ্য ঃ ঠাকুর বাড়ীত ঐল্যা সাধু
করেছে গীতা পাঠ
সকাল বেলায় পিঁয়াজ দিয়া
খাছেন পান্তা ভাত

পদ্য ঃ গায়ে তোর নামাবলি
গেউরিয়া পোষাক

ভন্ড সাধু দেখো কত

হচ্ছে ছাওয়ার বাপ।

পদ্য ঃ শুনেক শুনেক ওরে ঠাকুর

শুনেক মন দিয়া

সৈত্য করে কহ

হৈছে না নাই হয় তোর বেহা

জ্ঞানবালার গীত ঃ ঐ নবীন বয়সে

বোষ্টম হলো

কোন অনুরাগে।

পদ্য ঃ বেহা না করিলে

না হবে শুদ্ধি

মোর হিসাবে ওরে ঠাকুর

হচিত মহাপাপী

ঐ নবীন বয়সে।

পদ্য ঃ হাঁড়ি ভাঙ্গিলে খোলা শুদ্ধ

জমিন শুদ্ধ চাষে

নারী শুদ্ধ হামার চান্দে মাসে

পুরুষ শুদ্ধ কিসে।

পটপুটিয়া ঃ হাঁড়ি ভাঙ্গিলে খোলা শুদ্ধ

জমিন শুদ্ধ চাষে

নারী শুদ্ধ চান্দে মাসে

পুরুষ শুদ্ধ গুরুর মহামন্ত্রে।

কথা ঃ মাই তুই যদি মোর মত শুদ্ধ

হতে চাস, তুই মোরঠে মন্ত্র নে।

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর তালে মন্ত্র দিবেন তো

পদ্য ঃ চন্দ্র গেলো সূর্য্যে কাছে

মিতিংগা গেলো জলে ভাসি

আমাকে মন্ত্র দিবেন কোনখানে বসি।

পটপুটিয়া ঃ চন্দ্র গেলো সূর্য্যের কাছে
মিতিংগা গেলো জলে ভাসি
তোমাকে মন্ত্র দেবো
হৃদয়ে বসি।

পদ্য ঃ লহ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ
লহ কৃষ্ণের নাম
কৃষ্ণ কৃপা হলে
পাবে বৃন্দাবনে ধাম
শুচি লোকে মুচি হয়
যদি কৃষ্ণা ত্যাজে
মুচি লোকে শুচি হয়
যদি কৃষ্ণা ভজে

জ্ঞানবালা-কথা-ঃ ঠাকুর মন্ত্র যে দিবেন
মন্ত্রটা কোন স্বরূপ?

পটপুটিয়া ঃ মন্ত্রটা শ্রী মতি রাধা স্বরূপ

জ্ঞানবালা ঃ শ্রী মতিটা কায়

পটপুটিয়া ঃ বৃন্দাবনের রাধারানী।

জ্ঞানবালা ঃ বৃন্দাবনত যে রাধা আছে
তায় ব্যাটা ছাওয়া না বেটিছাওয়া?

পটপুটিয়া ঃ বেটি ছাওয়া

জ্ঞানবালা ঃ মোক যে মন্ত্র দিবু তুই
ব্যাটা ছাওয়া না বেটি ছাওয়া?

পটপুটিয়া ঃ তহ বেটিছাওয়া

জ্ঞানবালা ঃ রাধা বেটি ছাওয়া মহ
বেটি ছাওয়া।
তাহলে তুই মোক

কেন মন্ত্র দিবু? তুই বাকি
আছিস। তুই মোরঠে মন্ত্র নে
মুই মন্ত্র দিম।

পটপুটিয়া ঃ মই তুই একটা ডাহা শংকুনী।

জ্ঞানবালা ঃ কেমন করিয়া

পাপের ফলে মরে স্বামী
মরে গাবুর বেটা
অধিক পাপ করিলে
মরে কোলার মাইয়া।

পটপুটিয়ার কথা ঃ তুই যদি সতী
কানে নাই পতি।
সতী নারীর পতি পর্বতের চূড়া
অসতী নারীর গতি দেখো
ভাঙ্গা নায়ের গুড়া যেমন
নড়বর যরবর করে
এ মতন অসতী নারীর পতি
অকলতে মরে।
মোকে যে কহচিত পাপী
এইটা অনুমানে
তুই যে পাপী হইচিত
মহাপাপের ফলে

জ্ঞানবালা ঃ মোকে যে কহলু পাপী
তাতে আচ্ছা খুশী
নারী লোকটা কি তায় তোর
হইছে বিরুচি।

পটপুটিয়া ঃ বেহা করা ওগে মাই
মহা পাপের ঘোর

নারী লোকগুলা হছেন তোমহা

নরকের দ্বার।

জ্ঞানবালা ঃ নারী নিন্দা ওরে ঠাকুর

করেছিত কিতায়

নারী ছাড়া দেখগে ঠাকুর

আছে আরো কায়।

পটপুটিয়া ঃ মাইয়' হন ওগে মাই

মাকড়ার জাল

নারী লোকগুলা

হছেন তোমহা পুরুষের মহাকাল।

জ্ঞানবালা ঃ নারী নিন্দা কহছিস

বোষ্টম গোঁসাই

নারী হইতে সৃষ্টি

হইছে দুনিয়ায়।

পদ্য ঃ তোহর কথা শুনিয়া জুলেছে আগুনি

নারী ছাড়া দেখতো ঠাকুর

আছে কোন বা মুনি।

পটপুটিয়া ঃ দ্যাখ, নারী ছাড়া আছে।

জ্ঞানবালা ঃ কায়?

পটপুটিয়া ঃ নারদ

জ্ঞানবালা ঃ রামকৃষ্ণ মুনি ঋষি

নারী ছাড়া নাই

নারী ছাড়ি পালাইছে,

কাঠুয়া নিমাই

পদ্য ঃ নিমাইর মত সন্ন্যাস হবা

মানুষের সাধ্য নাই

ডোর কপিন কাটিলে

হবা নাগে নিমাই।

পদ্য ঃ কাদোর ভিতর থাকে
চিলকে গছি মাছ
নারীর কাছে করিবার নাগিবে
সাধুগিরি পাশ।

কথা ঃ ঠাকুর, আগে সাধন কর নারী
নারী সাধন না করিলে
না হও বোষ্টম বৈরাগী।
না জানিলে নারী তত্ব
নারীতে যদি হস মত্ত
পুরুষের যে পরমাত্মা
সবে নিবে কাড়ি
তার আগে না হও বোষ্টম বৈরাগী।

কথা ঃ ইরা পিঙ্গলা সুষমা নারী
থাকে যেন আজ্ঞাকারী
হও হুশিয়ারী
আগে সাধন কর নারী
তার আগে না হও বৈষ্টম বৈরাগী।

জ্ঞানবালা ঃ কম রিপুটা মহাপাপী
সাধুজনা কয়
নারী ছাড়া ঐ রিপু
দমন নাহি হয়।
কোরোধো (ক্রোধ) রিপুটা
মহা রাগি
রাগ যাকে বলে
ঐ রি পুটা দমন করেছে
কয়জনে

লোভ রিপুটা মহালোভী
উদয় যখন হয়
না বুঝিবে পাপ পুন
অকে ভীষন ভয়।

পটপুটিয়া ঃ কাম ক্রোধ লোভ
রিপু দমন করিয়াছি
এই জন্য সাত্বিক
বৈরাগী হইয়াছি।

জ্ঞানবালা ঃ নারী লোকটা লোভিছিস
যেমন তেঁতুলের ফল
কত সাধুর মন ঝুরাছে
পড়েছে জিবার জল।

পদ্য ঃ বোষ্টম হয়া
যেবা নারীরে করিবে ফম
লোহার পুকদুর দিয়া
মাথাম মারিবে যম

জ্ঞানবালা ঃ বেটিকে বেচায়া
যেবা বেটির খাবে পন
মরিয়া গেলে ঐ মানুষটা
ওকুন্ডে পতন।
বেটাক বেহাইতে যেবা
দাবী আরো চাবে
মরিয়া গেলে ঐ মানুষটা
নরকে পড়িবে।
সীমানা ধরিয়া
যেবা করিবে বলবান
করাদে কাটিয়া যমদূত

করিচে খানে খান।

বেটা হয়া পিতা মাতাক

করিবে অপমান

পাঠা ছাগলের মত তার

কাটিবে গর্দান।

বোষ্টম হয়া যেবা

বলে মিথ্যা কথা

জ্বলন্ত সানাশী

দিয়া কাটিয়া নিবে জিবা।

বোষ্টম হয়া চুরি ডাকাতি

করে যেবা জনা

জ্বলন্ত সানাশী দিয়া

চক্ষু করিবে কানা।

চৈত্রে বৈশাখে যেবা করিবে

জলদান

সেই হলো মহা ধার্মিক

বড়ো পুন্যবান

ঠাকুর রাত অনেকটা

হয়া গেইল আগোত

ভাতগিলা খারে ঠাকুর

পদ ঃ ভাতগিলা খারে ঠাকুর

আগোত খা দুই ভাত

সালিশ করে কহুচু কথা

না ওঠাস মোর রাগ

পটপুটিয়া ঃ মোর উপর যদি

খুবে হবু রাগ

তবুতো নিখাম

মুই বিধুয়ার রান্ধা ভাত।

জ্ঞানবালা ঃ মোক দেখিয়া ওরে ঠাকুরে
করেছিত নিন্দা
ভাত যদি না খাম
নাগিল হারা জিতা

গীত ঃ ওহো নাগিল ঠাকুর হারাজিতা
তুই কেমন ঢ্যানা বোষ্টম
মুই কেমন মাইয়া
তোর সঙ্গে ওরে ঠাকুর
নাগিছে হারাজিতা।

পটপুটিয়া ঃ মোকে যে হারাবু
মাইগে তুইয়ে বাপের বেটা
কি জানিস বোষ্টম তত্ত্ব
সামাইন্য নারী।

জ্ঞানবালা ঃ মোক যদি হারাবো
দিম দুইশ টাকা
তুই হারিয়া গেলেরে ঠাকুর
রাখিম ডাঙ্গুয়া।
কথায় কথায় হারাজিত
কথায় পোশ্ন দিম
উত্তর দিবা হোবে।

পদ্য ঃ আগুনের চাহিতে গরম
আরো কেবা
দুধের চাহিতে কেবা আরো সাদা।

পটপুটিয়া ঃ এইল্যা তো সামাইন্য কথা
শুনেক জ্ঞানবালা
দুধের চাহিতে মাইগে

মনটা নাগে সাদা

আগুনের চাহিতে মাই

মনের বেশী গরম

কাটকাটি সারাসারি

নাগাছে যখন।

আগুনখান জ্বলিলে

জল ঢালিয়া দিলে নেভে

মনের গরম নেভেনা

মরদের রাগ বারো বছর

আর মায়ার রাগ বারো পহর

বাধনি তারত।

জ্ঞানবালা পদ্যঃ চৈতন্যে বান্ধিছিস ফুল

নাল নীল সাদা

কোন ফুলে কৃষ্ণ বসে

কোন ফুলে রাধা।

পট পুটিয়া ঃ চৈতন্যে বান্ধিছু ফুল

নাল নীল সাদা

নীল ফুলে কৃষ্ণ বসে

সাদা ফুলে রাধা।

জ্ঞানবালা-পদ্যঃ কায় তোরে চৌধুরী

কায় তোরে কোতোয়াল

কোন গুরু করেছে

জীবেরে উদ্ধার।

পটপুটিয়া ঃ চক্ষু চৌধুরী

আমার কর্ম কোতোয়াল

তিন গুরু করেছে

জীবেরে উদ্ধার

পদ্য ঃ দীক্ষা গুরু শিক্ষা গুরু
গুরু কর্ণধারী
তিন গুরু হবে ভবপারের কান্ডারী

জ্ঞানবালা-পদ্য ঃ কপালে মারিছুস ফোঁটা
হাতে গোপাল লড়ি
গোপালত কায় কায়
করিছে বসতি।

পটপুটিয়া ঃ কপালে মারিচু ফোঁটা
হাতে গোপাল লড়ি
গোপালত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
করিছে বসতি।

জ্ঞানবালা-কথা ঃ কয় হাতা দেহা তোমার
কয় হাত নারী
জননী উদরে ছিলে
কোন শিয়র করি
ভব সিন্ধু নদী কেমনে হব পার
কয় মাসা কয় রতি
ঠাকুর জন্ম তোমার।

পটপুটিয়া-কথা ঃ চৌদ্দ পোহা দেহা আমার
বত্রিস হাত নারী
জননী উদরে ছিলাম
উত্তর শিয়র করি
ভব সিন্ধু নদী সাধনে হব পার
ছয় মাসা নয় রতী
জন্ম আমার।

জ্ঞানবালা ঃ কথা হতে আসিলেন
কথায় চলিয়া যাও

কার দুয়ারে তুমি

ভিক্ষা মাগি খাও

কার দুয়ারে তুমি

কার করো আশা

কোন ফুলে তোমার জন্ম

আর কোন গেরামে

তোমার বাসা।

পটপুটিয়া ঃ উত্তর হইতে আসিলাম

দক্ষিনে চলিয়া যাই

সগার দুয়ারে

ভিক্ষা মাগি খাই

সগার দুয়ারে

সগার করি আশা

ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম

একটিয়াশালত বাসা।

জ্ঞানবালা ঃ এর আগে কোনঠে ছিলু।

পটপুটিয়া ঃ মাই, জন্ম নিয়া আসিচি

এর আগে কায় কহবা পায়।

জ্ঞানবালা ঃ প্রশ্নের উত্তর দিবায় হবে।

পটপুটিয়া ঃ অতি পূর্বে ছিলাম

পর্বতে বসিয়া

পাহাড়খান ভাঙ্গিছে মাই

পাঁঠা-ছাগল টিসিয়া

পাহাড় ভাঙ্গিয়া মাই পড়িতে

নাগিনু।

অন্ধ কুপে যায়া বন্দি হইয়া গেনু।

অন্ধকূপে যায়া হয়া গেনু কারু

ঐঠে ডাকাইচু 'রক্ষা করো
দয়ার প্রভু'।

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর, এইটার উত্তর পানু
তার আগে কোনঠে ছিলু।

পটপুটিয়া ঃ তার আগে ছিলাম
চৌরাশিতে।
চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমন করিয়া
এই মানুষের জন্ম।

জ্ঞানবালা ঃ গুরু গুরু সবে বলে
গুরু কাকে কয়
চাইর যুগের গুরু
কোন যুগে রয়।

পটপুটিয়া ঃ সত্য যুগে ছিলো
নরসিংহ অবতার
গোলকের হরি
হিরণ্যকশপুক সাংহার করি
প্রহ্লাদকে উদ্ধারি
ক্রেতা যুগে ছিলো রাম অবতার
গোলকের হরি
হাতে ধনুকধারী।
রাবনক সংহার করি
সীতাক উদ্ধারি।
দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার
গোলকের হরি
হাতে মোহন বাঁশি
কদমডালে বসিয়া
ফাকারফুকুর হাসি

কলিযুগে গৌরাঙ্গ অবতার

গোলকের হরি

কলির জীব উদ্ধারক লাগিয়া

নবীন সন্ন্যাসী।

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর বলি তোমারে

রাতের গুরু কে ঠাকুর

দিনের গুরু কে?

পটপুটিয়া ঃ দিনের গুরু সূর্যগে মাই

রাতের গুরু চান্দ

দুই গুরুর কথা

জ্ঞানবালা শোনেক দিয়া মন।

জ্ঞানবালা ঃ দুই শিক্ষার দুইটা গুরু

লোকে যেন কয়

নারী লোকের কয়জন গুরু

দিবেন পরিচয়।

পটপুটিয়া ঃ নারী লোকের দুই গুরু

এক গুরু গৃহ স্বামী

আর এক গুরু জগতের স্বামী।

জ্ঞানবালা ঃ দুই আক্ষরের নামটা সর্বলোকে জানি

নিচোত পুরুষ

উপরোত কামিনী।

শূন্যতে করিয়া গ্রাস উদরে চেবায়

তাহাকে ধরিয়া সর্বলোকে খায়।

সেইটা কি ঠাকুর?

আমরু গাছের কুমরু তং

তার তুলে ভিরা তং

তার তলে ইদুর তং

কুমরা তংশিপিতং টুকি তং

গঠাতং পচিতং পবিতং ভ্যাঃ

ঠাকুর এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর দে।

পটপুটিয়া ঃ দুই আক্ষরে নামটা হৈল যাতা আমের গাছোত কুমরা গাছ উঠিছে। তার তলোত নোদুর আসিয়া গাছের শিপা কাটি দিছে। কুমরা গাছ মরি গেইল। নীচোত ছিলো একটা ছাগল। কুমড়া ফল ধপ করি পড়িয়া গেলে ছাগলটা ভ্যা করি দিলো পালান। এই হলো তোর উত্তর।

জ্ঞানবালা ঃ ঠাকুর তোর নগদ পারিন নাই।

আর দুইটা প্রশ্ন আছে।

প্রশ্ন ঃ যম রাজাটার আছে বাপ

তাহার কিবা নাম

যমপুরীটা কোন পাকে

আছে গোলক ধাম।

প্রশ্ন ঃ যমরাজাটার বিচার কর্তা

হছে কোন ঠাকুর

আর ব্রহ্মান্ড হাতে যমপুরীটা

আছে কদ্দর।

ঠাকুর নাগিল হারা জিতা।

পটপুটিয়া ঃ মাই, মুই এগুলার

উত্তর দিবার না পারু।

গান ঃ ঐ যেই কথালা শুনালেক মাই

এইলা কথা মোর বাপো

শোনে নাই

তোর হিসাবে ওগে মাই গেনুতো

হারিয়া

নাই পারিনু তোর সঙ্গে

দিনু হারি নামা

জ্ঞানবালা ঃ মোর সঙ্গে ওরে ঠাকুর
দিলো হারি নামা
মোর বাদে ডাংগুয়া রবু
মোকে করেক নিকা।

পটপুটিয়া ঃ মাই, তোক মুই
নিকা করিবার পারু
মোর একটা বেকায়দা
তুইতো হলু আড়ি মাইয়া
মুই হনু ঢেনা
তোক নিকা করিলে
হাতিটা নিখাবে চারা।

জ্ঞানবালা ঃ কায় কহচে হাতি চারা
খাবার নয়?
হাতি চারা খাবে।
হাতিটা যে চারা না খায়
ইহার মানে আছে
কহিলে মানের কথা
অনেক দেরী হবে।
ঠাকুর তোর কপাল ভালো
ভাইগ্যে নারী, ভাইগ্যে বাড়ী
ভাইগ্যে পায় দাড়ি
যায় ভাইগ্যে অতিরিক্ত
তাহে পাইছে আড়ি
ঠাকুর, আড়ি নেওয়া ভাইগ্যের কথা
যার কপালে থাকে
আড়ি মাইয়া নিলে
যাবে স্বর্গপুরে

ঠাকুর, তুইতো তুলসীর কথা
জানিস। তুলসীটা আড়ি
ছিলো পরে নারায়ণ উয়াক
বৌ বানাইছে।
নারায়ণ আর তুলসী নরকে
আছে না স্বর্গত গেইছে?

পটপুটিয়া ঃ স্বর্গত গেইছে।

জ্ঞানবালা ঃ তদরূপে, তহো স্বর্গত যাবু।

মিলন - গান ঃ যুগল সাধনের মতো
আরতো সাধন নাই
শাস্তর খুলিয়া দেখো
বোষ্টম গোঁসাই
ঐ রামকৃষ্ণ বল ভাই হরি
তোমার জীবের হবে মুক্তি
রামকৃষ্ণ বল ভাই হরি।
যেবা গায় যেবা শুনে
জ্ঞানবালার পালা
শুনিলে জ্ঞান হবে
শোনে যেই জনা।
রাম বলো কৃষ্ণ বলো মুকুন্দ মুরারী
পালা যে শেষ হইলো বলো হরি হরি।

---

সংগ্রহসূত্র

শিলিগুড়ি শহরসংলগ্ন একটিয়াশাল গ্রামের নগেন্দ্রনাথ রায়ে সাহায্যে এই লোকনাটকটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তিনি শাস্তরী পালগানের মূল ওস্তাদ শিলিগুড়ির রথখোলার প্রয়াত পরমলালের কাছে গান শেখেন। একটিয়াশালের নগেনবাবু মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন 'রঙ্গিয়া' গ্রামের নিরোধ রায়ের বাড়ীতে এই পালাটির অনুষ্ঠান করেন। সেখানে এই নাট্যানুষ্ঠানটি দেখার সুযোগ মেলে। বহু চেষ্টা করে এই মৌখিক পালাটিকে লেখা হয়।

# রাজধারী

সমবেত গান

গৌরচান একবার দয়া করে আয় হে।

একবার কৌশল্যার নন্দন হে প্রভু রাম আয় হে।

একবার সুমিত্রার নন্দন হে লক্ষ্মণ বীর আয় হে।

একবার কৈকেয়ীর নন্দন হে ভরত শত্রুঘন আয় হে।

একবার ব্রহ্মার নন্দন হে জাম্বুবান আয় হে।

একবার পবনের নন্দন হে হনুমান আয় হে।

একবার কিচকিন্দা নগরে হে বালি সুগ্রীব আয় হে।

একবার বালির নন্দন হে অঙ্গদ বীর আয় হে।

একবার দয়া করে আয় হে গৌর,

ঐ যে দয়া করে আয় হে গরা,

কৃপা করে আয়।

সনার বরন গৌর চান

কথায় গেলে পাব রে গৌর।

ওই আমি আর না হেরিবো রে গৌর।

ঐ যে পূরবতে এইকনা গরা গৌরবরণ ছিল।

হরি নাম সংকীর্তন প্রচার করিল

গৌর ওই আমি আর না হেরিবো রে গৌর।

ওইযে পট্ট বস্ত্র পরিধন মুকুট ঝলমল করে

গরা নানা অবতারে রে

গৌর ওই আমি আর না হেরিবো রে গৌর।

ওইযে চারি যুগের চারি ধর্ম থুইয়া খেতির তলে।

নিজ ধর্ম লয়া গরা গেলো নিজর থলেরে গৌর।

ওই আমি আর গৌর না হেরিবো রে গৌর।।

ঐ যে বাউল কইরোরে মন ওই দিবারে নিশি।

ওইযে গৌর আমার কান্দে হয়া আকুল,

ওহে হে হে বাউল কইরোরে মন ওই দিবারে নিশি।

ওইযে কথায় গেলো কইরোরে মন ওই দিবারে নিশি।

ওইযে আরে গিয়ান আইদ্য আরে গিয়ান বাইদ্য,

হে-রাম-হে সবদরে গিয়ান প্রেম ওরে ধারা।

ঐ যে বাউল কইরোরে মন ওই দিবারে নিশি।

**বন্দনা**

ওহে রাম বন্দু বন্দু রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওইযে প্রথমে বন্দিনু রামের অতুল

চরণ হে রাম বন্দু।

বন্দু রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওইযে ভক্তি করে যে বন্দি মাতা কৌশল্যার চরণ হে রাম বন্দু বন্দু।

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওইযে শিরাম লক্ষ্মণ বন্দু ভরত শত্রুগণ, হে রাম বন্দু।

ওই এক অংশে চারি অংশ জনমিল নারায়ণ, হে রাম বন্দু বন্দু।

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ব্রহ্মারে পুত্র বন্দু ওরে বুরা জাম্বুবান, রাম বন্দু।

ওই যে পবনের যে পুত্র বন্দু ঐনা বীর হনুমান, হে রাম বন্দু বন্দু।

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওই আইস বাছা হনুমান চেয়রে লেহ বাস, হে রাম বন্দু।

ওই গাইন বাইনের কণ্ঠে যে ও তুই হোইরো হুলাস, হে রাম বন্দু বন্দু।

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওই যে নলনাল বন্দু লইনু ও মুই বালি আর শ্রী হে রাম বন্দু।

ওইযে বালির যে পুত্র বন্দু অঙ্গদ মহাবীর হে রাম বন্দু।

বন্দু রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওইযে পূরবে ধরম বন্দু, ঐনা পশ্চিমে পাইকামবর।

উত্তরে গিরিনাথ বন্দু, ঐনা দক্ষিণে সাগর।

হে রাম বন্দু বন্দু রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওইযে আইদ্য গুরুর চরণ বন্দু শিরে ছত্র ধর।

শিক্ষা গুরুর চরণ বন্দু জননী বাপ মাও, হে রাম বন্দু বন্দু।

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওইযে সভামধ্যে বন্দি লইনু ছটো বড় পাও।

ডাহেনি বন্দু তুই মোর ধরমের মাও, হে রাম বন্দু বন্দু।

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ঐ যে আইস মাগো সরস্বতী চেয়রে লেহ বাস।

গাইন বাইনের কণ্ঠে মাগো ও তুই হোইবো হুলাস হে রাম বন্দু বন্দু

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওইযে বাপ মোরে যে গুরু হোবে তাহার আমি শিষ।

তাহারে কৃপায় গিদাল হামেরা রামায়ণের গীত হে রাম বন্দু বন্দু

রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ওই যে এতেলা বন্দনা করিতে যেবা মারে ভানজি।

তাহার বাপযে গাধা হোবে মোর গুরু সেওয়ারি।

হে রাম বন্দু বন্দু রামের যুগল চরণ হে রাম বন্দু।

ডাক - অযুতা কান্ডতে হইলো শ্রীরামের বন। অরণ কান্ডতে সীতাক হরিচে রাবণ।

ডাক - কিচকিন্দা কান্ডতে হইলো সুগ্রীব মিলন। সুন্দরা কান্ডতে রাম বান্ধিলো সাগর।

ডাক - সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য কলে পার। দিনে দিনে রাবণ রাজার টুটে অহংকার।

ডাক - অগস্ত্য মুনির ভাই বিবর্ণ মুনি ছিলো। মুনি মুনি যুক্তি করি তপস্যায় চলিলো ।

(সানজিয়াকালীর প্রবেশ - ও সন্ধ্যা দিয়া প্রস্থান)।

গান - ওইযে দেখ দেখ পাইয়ারে কালন্তির বন, আইলো মুনি দুই জন, আরে ও-ও পাইয়ারে কালন্তির বন, আরে ওহোরে আইলো মুনি দুই জন।

**(প্রথম ও দ্বিতীয় মুনির প্রবেশ)**

মুনির পাট - ওরে মুনিহে তুমি কুন মুনিহে।

দ্বিতীয় মুনি- আমি অগস্ত্য মুনি হে। আরে তুমি কুন মুনি হে।

প্রথম - ওরে মুনি হে আমি বিবর্ণ মুনি হে।

দ্বিতীয় - ওরে মুনি হে দনো মুনি মিলি বিডলয়া তপস্যা করি মুনিহে।

(দুই মুনি যুক্তি করে তপস্যায় বসিলো হেন সময় বির্বণ মুনি প্রবেশ করিলো)

বিবর্ণ মুনির প্রবেশ - রাম রাম, জয় রাম, জয় সীতা রাম। (তপস্যায় বসিলো হেন সময় ইন্দ্ররাজা প্রবেশ করিলো)।

ইন্দ্ররাজা - ওগো মুনি ঠাকুর আপুনার শ্রীচরণে প্রণাম।

বিবর্ণ মুনি - ওরে বাপু ইন্দ্ররাজ শুনহ বচন, এখানে আসিলে বাপু কিসের কারণ।

ইন্দ্ররাজ - শুন মুনি রাম রূপ ত্রিজগতের নাথ। আসিবে তব স্থানে করিতে সাক্ষাত। এই লেহ ইন্দ্রদিব্য ধনুক বাণ, রাখ তব স্থান। আসিলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ, তাদের তুমি করহ প্রদান।

(রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

গান - ও ভাইরে লক্ষ্মণ রাইজ্য নাশি বনরে বাসী হে সঙ্গে সীতা রে ভাই। ও ভাইরে লক্ষ্মণ গাছের বাকুল পাইরিরে পরি। দেশে দেশে ভ্রমন করিরে ভাই।

(রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বিবর্ণ মুনির আশ্রমে প্রবেশ ও গান।)

গান - ওকি ও মুনি ঠাকুর শুন মুনি ঠাকুর আপুনার শ্রীচরণে প্রণাম করি আমাকে আশীর্বাদ দাও গো মুনি ঠাকুর।

বিবর্ণ মুনি - ওরে বাপু ছাইলারে তিনজন। তোমরা আনন্দে থাক বাপুরে।

(রাম লক্ষ্মণ ও সীতার গান)

গান - ওকি ও মুনি ঠাকুর আপুনার শ্রীচরণে প্রণাম করি, আমাকে আশীর্বাদ দাওগো মুনি ঠাকুর।

মুনি - ওরে বাপু ছাইলারে তিনজন কথাকার বসন্তি, কাহারে নন্দন, কিসের জন্যে ফির বাপু পঞ্চবটীর বনেরে।

গান - ওকি ও মুনি ঠাকুর শুন মুনি ঠাকুর ওহে অযুতার বসন্তি হামেরা। দশরথ নন্দন পিতার সত্য পালিতে দুইভাই ফিরি বনে বন। ওহে ঝটা বাকুল পইরিধন তপসিয়ার ভেশ তোমার চরণে প্রণাম করি আমাকে আশুরবাদ দাও গো মুনি ঠাকুর।

মুনি - ওরে বাপফু ছাইলারে তিন জন। সে তোমরা আনন্দে থাক বাপফুরে। (দ্বিতীয় মুনিকে ডাক দিয়ে কথা বলা) মুনি-মুনিঠাকুর সে তুমি কি বুঝলে মুনি হে?

মুনি প্রথম - আমি আমি বুঝলাম সমভোগ ওরে মুনি ঠাকুর, তুমি-কি বুঝলে মুনি হে।

দ্বিতীয় মুনি - আমি, আমি বুঝালাম গটেডায় মুনিহে

মুনি প্রথম - ওরে মুনিহে তুমি বুঝলে বাপের ঘরের পাকা ফেরসি মুনিহে।

মুনি দ্বিতীয় - ওরে মুনিহে তুমি বুঝলে বাপের ঘরের পাকা পেননেত মুনি হে।

মুনি প্রথম - ওরে মুনি হে শ্রীরামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি। ও দেবগন নাচে সারি সারি রামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি দেবগণ করিবে বিনাশ। জনমিলো নারায়ণ বধিবেক দশানন করিবে বিনাশ। রাম রূপধরি, সংসারে আইলো হরি বৈরীগণ করিবে বিনাশ। ওরে মুনিহে ভাল জাগা ভাল স্থান তাদের দেখায় দিতে হয় মুনি হে।

রামের কাছে মুনি - ওরে বাপু ছাইলারে দুইজন, সে তোমরা সাবধানে থাক বাপপুরে, রাবণের বইণী সর্বনাখা ময়া করে লয়ে যায়, রক্ত মাংস সকলে চুষে খায় বাপপুরে। ওরে বাপু ছাইলারে দুইজন গদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীর বন। সেইখানে কর বাপুরে ঘোট নিরীক্ষণ। আম না কঠুয়াল ফল ফলে দুয়ারে বসে কর বাপুরে ঘোট নিরীক্ষণ। ওরে বাপপু ছাইলারে দুইজন সে তোমরা সাবধানে থাক বাপুরে

দুই মুনির কথা - ওরে মুনিহে কুন মুনি তপ করে গঙ্গার কিনারে। তাহনি পায়হে রাম দরশনে কুন মুনি তপ করে উর্ধ্ব বাহু হাত তাহনি পায়হে রাম দরশনে। ইন্দ্রজিত তপ করে লঙ্কার শিহরে। তাহনি পায় রাম দরশনে। আমি মুনি তপ করি কালন্তির বনে। আমি পাইলামহে রাম দরশনে। সে আমার তপ জপ সকলে পূর্ণ হইলো মুনিহে।

গায়কদের গান - বাপু ভক্তরে লোক ওই'যে মুনির তপ ভঙ্গ হইলো সর্ব লোকে হরি বলরে।

(বিরাটের প্রবেশ ওসীতা হরণ)।

রাম - ওকি ও ভাইরে লক্ষ্মণ হের আসে দেখ আমার সীতার দুরগতিরে ভাই।

লক্ষ্মণ - ওরে বেটা রাইক্কস দুরাচার, শিরাম মানুষ নাহায় ত্রিজগতের নাথ। রাইকসক বধিবা হেতু হয়েছে প্রকাশ। যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি ধর। আজিকার রণে বেটা তোক পাঠাম যমের ঘর

বিরাট - আমার নাম থাকি যথাতথা কালনেমি মম পিতা বিধুতা। কত মুনি বধিয়াছি বিধুতার বরে ভয়কি করি কারে অভেদ্য শরীরে।

লক্ষ্মণ - কত বাণ জান বেটা কত আছে শিক্ষা। আজিকার বাণতে বেটা তোর মৃত্যু আছে লেখা। দশরথের পুত্র আমি বড়য় দুর্বল। হেটে আয় দেখু তোর কতয় আছে বল।

বিরাট - তবে ধর অস্ত্র।

গায়কদের গান - ও বিরাট যুদ্ধ করে রে। লক্ষ্মণের সহিতে ও বিরাট যুদ্ধ করেরে। প্রথমে যে গালাগালি হইলো বীরের মুখ ওবীর যুদ্ধ করেরে। ঐ দুই ঝনকার ভরে যেন মোর কাপেচে মেদিনী,

ওবীর যুদ্ধ করে রে। তার পাছে যে হইলে বীরের বাহু ধরাধরি, ও বিরাট যুদ্ধ করেরে, ধনুকে জুড়িয়া লক্ষ্মণ ব্রহ্ম অস্ত্রবাণ ও বীর যুদ্ধ করেরে। বিরাট বীরের মুন্ড কাটিয়া করেরে খান খান, ও বীর যুদ্ধ করেরে। রণ ভঙ্গ দিয়া বিরাট মোর জমিনে পড়িলো ও বীর যুদ্ধ করেরে।

বিরাট - ওগো প্রভু রঘুনাথ,ধইন্য ধইন্য সীতা দেবী, শ্রীরাম যাহার পতি, তোমার দরশনে মম পাই অব্যাহতি। চরণ তুলে দেহ মাথে, আমি যাই বৌকুন্ঠ ভুবন গো প্রভু রঘুনাথ। প্রস্থান।

ডাক - বিরাট বীর মারা পইরে অরণ শব্দ হইলো। গৃহ হইতে উরমিলা বীর সাজনি করেরে।

গায়কদের গান - ও বীর সাজিলোরে। নামেদে উরমিলা ও বীর সাজিলোরে। শবল শুল মুষল বীরের মোর হস্তেরে লয়া বাণ, ওবীর সাজিলোরে।

লক্ষ্মণ - ওরে বেটা রাইকস দুরাচার, শ্রীরাম মানুষ নাহায় ত্রিজগতের নাথ। রাইকস বধিবার হেতু হইয়াছি প্রকাশ। যতশক্তি আছে বেটা তত শক্তি ধর, আজিকার রণে বেটা তোক পাঠাম যমের ঘর।

বিরাট - বিরাট আমার নাম থাকি যথাতথা। কালনেমি মম পিতা বিধুতা। কত মুনি বধিয়াছি বিধুতার বরে। ভয়কি করি কারে অভেদা শরীরে।

লক্ষ্মণ - কত বাণ জান বেটা কত আছে শিক্ষা। আজিকার বাণতে বেটা তোর মৃত্যু আছে লেখা। দশরথের পুত্র আমি বড়য় দুর্বল। হেটে আয় দেখু তোর কতয় আছে বল।

বিরাট - তবে ধর অস্ত্র।

গান - ও বিরাট যুদ্ধ করেরে। লক্ষ্মণের সহিতে ও বিরাট যুদ্ধ করেরে। প্রথমে যে হইলো বীরের মুখ গালাগালি, ও বীর যুদ্ধ করেরে দুইঝনে যুদ্ধ করে দুই মহাবলী। ঐ দুই ঝনকার ভরে যেন মোর কাপেচে মোদিনী, ওবীর যুদ্ধ করেরে। তার পাছে যে হইলে বীরের বাহু ধরাধরি, ও বিরাট যুদ্ধ করেরে। ধনুকে জুড়িয়া লক্ষ্মণ ব্রহ্ম অস্ত্রবাণ, ও বীর যুদ্ধ করেরে। বিরাট বীরের মুণ্ড কাটিয়া কলেরে খান খান ও বীর যুদ্ধ করেরে। রণ ভঙ্গ দিয়া বিরাট মোর জমিতে পড়িলো ও বীর যুদ্ধ করেরে

বিরাট - ওগো প্রভু রঘুনাথ ধইন্য ধইন্য সীতাদেবী শ্রীরাম যাহার পতি তোমার দরশনে মম পাই অব্যাহতি। চরণ তুলে দেহ মাথে আমি যাই বৌকুণ্ঠ ভুবনগো প্রভু রঘুনাথ। প্রস্থান।

ডাক - বিরাট বীর মারা পইড়ে অরণ শব্দ হইলো। গৃহ হইতে উরমিলা বীর সাজনি করেরে।

গান - ও বীর সাজিলোরে। শাল শুল মুষল হস্তেতে লয়া বাণ ও বীর সাজিলোরে।

ঊর্মিলা - এই বনে বাস করি ঊরমিলা আমার নাম। পাইয়া মানুষ বেটা করিবো ভক্ষণ।

লক্ষ্মণ - ওরে বেটা রাইকস দুরাচার শ্রীরাম মানুষ নাহয় ত্রিজগতের নাথ। রাইকস বধিবার হেতু হইয়াছি প্রকাশ। যতশক্তি আছে বেটা তত শক্তি ধরা আজিকার রণে বেটা তোক পাঠাম যমের ঘর।

ঊর্মিলা - তবে ধর অস্ত্র।

গান - ওবীর যুদ্ধ করেরে। প্রথমে যে হইলো বীরের মোর মুখতে গালাগালি, ওবীর যুদ্ধ করেরে দুইঝনকার ভরে যেন মোর কাপেচে মেদিনী, ওবীর যুদ্ধ করেরে। দুইঝনে যুদ্ধ করে দোহে মহা বলী ওবীর যুদ্ধ করেরে। তার পাছে হইলো বীরের মোর বাহুরে ধরা ধরি ওবীর যুদ্ধ করেরে। ধনুকে জুড়িলো লক্ষ্মণ ব্রহ্ম অস্ত্র বাণ ও বীর যুদ্ধ করেরে। ঊর্মিলার মুন্ড কাটিয়া কলে খান খান ও বীর যুদ্ধ করেরে। রণভঙ্গদিয়া বীর মোর জমিনে পড়িলো ও বীর যুদ্ধ করেরে। (প্রস্থান)।

ডাক - ঊর্মিলাক মারিয়া প্রভু আনন্দ হইলো। ঘোটনা বান্ধিতে প্রভু নিজে আইগা দিলো।

রাম - ও কি ও ভাইরে লক্ষ্মণ ঘোট না বান্ধ তুমি, ঘোট নিরীক্ষণ করবো আমি।

গান - আহার হার প্রভুরে বচনে লক্ষ্মণ আনন্দ হইলো ওহে। ঘোট না বান্ধিতে লক্ষ্মণ গমন করিলো ওহে। আ হার প্রভুরে না ঘোট বান্ধে পর্বতের কুলে ওহে। আপুনার ঘোট বান্ধে ওইকনা রাজ্য পছে ওহে।

লক্ষ্মণ - ওকি ও দাদা রঘুনাথ শুন দাদা রঘুনাথ ঘোট না বান্ধিলাম আমি ঘোট না নিরীক্ষণ কর তুমিরে দাদা রঘুনাথ।

ডাক - ঘোট না বান্ধিয়া প্রভু ঘোটে প্রবেশিলো। মানব মানব বসন তবে সৌরভ ছুটিলো

গান - ওরে মানব সৌর ভ পায়া রাইক্কসনী আইলো ধায়েরে। সর্বনাখার মায়া রূপ ধারণ

সর্বনাখা - এবাই বাইগেহে লোকলা এখে সঙ্গে আসল ভাউজিডা মোর কুন লাংগে মুখ দেখফা গেল সনা। মঞ্চে সংগতকারী

ব্যক্তিগণ - ভাউজি তুই লাঙ্গের মুখ দেখফা গিসলো। ভাউজি, এইতি দেখফোতে আয়।

সর্বনাখা - এ ভাউজি দেখধি, বাঁশের আগালিটাত ঘুঘুর ডিমাডা। ভাউজি, দেখাফা কোহোচু ডিমাডা ধরচিত মোর আঙ্গুলডা। ভাউজি এইতি শুন। ভাউজি দেখলো লগত যাছিতে দৈড়ে পালাচে ইডাকাথা না হয়, চল, এইডা রূপ ছাড়ে দিম আর সুন্দর রূপ ধরে আসম। সুন্দর রূপ দেখলে বগলত আসলে ফট করে কলাত করে লেয়া চলে যাম লংকা। লংকাত

লেগায় নুন মরচি দিয়া সানা করে খপকায় খপকায় খাম। ভাউজি চল। (প্রস্থান)

ডাক - সর্বনাখার ময়া নিয়া কে চিনিতে পারে রাইকস মূর্তি ছাড়িয়া যেন সুন্দর মূর্তি ধরে

গান - ওরে রাইকস মূরতি গেলো রাইকস মূরতি গেলো রে হে সুন্দর মূরতী ধরি আইলো। ধায়েরে। ওরে রাইক্কস মূরতি গেলো রে হে সুন্দর মূরতি আইলো ধায়ে রে।

(সর্বনাখার সুন্দর রূপ ধারণ)

সর্বনাখার গান - ওই মন মানে নাগো সোই দিন মানে না ওই আমি করি কি উপাইগো সেহোই মন মানে না। এ হন সুন্দর দেহা বন মাঝে কেন থাক একা কথায় ঘর কথায় বাড়ি

রামের কাছে কথা - ওকি ও তপসির গসাই, শুন তপসির গসাই, ওহে কথাকার বসন্তি তমরা কাহারে নন্দন। কি জন্যে ফির তমরা পঞ্চবটির বন। ওহে ঝটা বাকুল পইরিরে ধন তপসিয়ার বেশ আমি তোমার পুতুলী হোবো আমায় বিয়ে করহে তপসির গসাই।

রাম - ওহে অযুতার বসন্তি হামেরা দশরথ নন্দন। পিতার সত্য পালিতে দুইভাই ফিরি বনে বন। ওহে ঝটা বাকুল পইরি ধন তপসিয়ার বেশ। আমার কাছে নারী আছে নারীর কিনা কাজ। বনের নারী বিহা করিলে লোকের উপহাস। আমার ভাই লক্ষ্মণ আছে নামে ধনুক ধর। তাহার কাছে যাও তুমি নিশ্চয় করিবে ঘরহে সুন্দর যুবতী।

সর্বনাখার গান - ওই আমি লক্ষ্মণের বামে বসি কহিরে কথা আর হাসি। লক্ষণের কাছে কথা ও গান - ওকি ও তপসির গসাই শুন তপসির গসাই। আমি তোমার পুতুলী হোবো আমা বিহা কর হে তপসির গসাই

লক্ষ্মণ - ওকি ও সুন্দর যুবতী শুন সুন্দর যুবতী। আমার কাছে নারী নাহি নারীর কিনা কাজ। বনের নারী বিহা করিলে লোকের উপহাস। আমার ভাই মনুরাম আছে নামে ধনুক ধর তাহার কাছে গেলে তোমায় নিশ্চয় করিবে ঘর হে সুন্দর যুবতি।

সর্বনাখা - ওহে তপসির গসাই শুন তপসির গসাই, একটি কথা কহিতে প্রভু মনে লাগে ভয়। আর একটি কথা কহিতে প্রভু চিতে লাগে ডর। রাম সীতাকে কাটে ফেলা ওই জংগলের মাঝে। তুমি আমি রোবো এক সাথে হে তপসির গসাই।

লক্ষ্মণের গান - আমি রাম আমি সীতা আমিও লক্ষ্মণ। রাম সীতার মরণ হইলে আমার মরণ।

ডাক - সর্বনখার ময়া নিল কে চিনিতে পারে সুন্দর মূরতি ছাড়িয়া যেন রাইকস মূরতি ধরে

গান - ওহোরে সুন্দর মূরতি গেলো - সুন্দর মূরতি গেলো। রে হে রাইকসনী আইলো ধায়েরে। ও মরি রে আরে ও-ওরে ওই আহারে হে আরে ও - ওরে ওহোরে সুন্দর মূরতি গেলো

সুন্দর মূরতি গেলো রে হে।

রাম - ওকি ও ভাইরে লক্ষ্মণ আগে দেখ আমার সীতার দুরগতিরে ভাইরে লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ - গে রাইকসনী গে রাইকসনি কুন মুখে খাবো সীতাক দেখু তোর জিভার পুতুনীগে রাইকসনি. (গান ও যুদ্ধ)

গান - আহাহার মুখ মেলি রাইক্কসি সীতাক খাইতে চায়। প্রভুরে না আশে পাশে সীতা লুকাইয়া বেরায়। আ আ হার আগে আগে রাইক্কসনী দেখিয়া পলায় পাছে পাছে লক্ষ্মণ যেন লয় যাছে পিটায় ওহে। আ হা - হার ধনুকে জুড়িলো লক্ষ্মণ বাণ ওহে। বাণ দেখে রাইক্কসনীর উড়িলো পরাণ ওহে। আহা হার আগে কাটে চুলির মুন্ডা পাছে নাক কান। ধরিয়া না রাইকসনীক কোলে অপমান ওহে। ( সর্বনাখার কান্দন ও পাঠ)

সর্বনাখা - ওমোর খড়তুসন দাদারে হে। ও মোর বার দশা কোলে রে হে।

(পেটবীর অঝার প্রবেশ )

অঝা - গে সর্বনাখা তুই কান্দেচিস না গান গিদাচিস গে সর্বনাখা।

সর্বনাখা - কায় উডারে তুই কায়।

অঝা - কায় উডা আর পেটবীর অঝাডা। কান্দেচিস লোকটা আর সল সল করি থাকিচিস, উঠ উঠ উঠ দেখু কি হইচে তোর সর্বনাখা (উঠিলো কপালে হাত দিয়া।) এ সর্বনাখা কপালখানত হাত দিছিস কেনে।

সর্বনাখা - কুনঠে আর দিছু হাতখান কপালখানত।

অঝা - এ সর্বনাখা তোর নাকটা কই।

সর্বনাখা - এইতডারে তুই কানা হইচিস।

অঝা - ধের উড' ন' হায় হাত খান ছেড়বি (হাত ছেড়িলো) হে তোর ধাই ধাই করে দিছে নাকটা কাটে

সর্বনাখা - উডা কাহ' শুনবো, দুইডা ছুয়ার সঙ্গে খেল খেলাইতে ওমহা কুন পাকায় দে কুচ করে নাকটা কাটে কুনতি পালাল ধরতে ধরতে ধরবানি পানু।

অঝা - এ সর্বনাখা তোরযে নাকটা কাটা গেল এনোংকরি। রোভো না আউসত লাগাবো।

সর্বনাখা - আউসত ছেনা কিতেরে ছেতে দে।

অঝা - ছে, একখান কাটা ঘাউয়ার ঔষদ জামরির রস বাঘ মরচি ও নুন এখেটে বেনালছে যেদি এইখান ল'প্পদেবি আলায় খর খরা হয় যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

সর্বনাখা - দেদে ল'প্পয় আউসতখান।

সারথি - গে সর্বনাখা তোর নাকটা কেনং করি কাটাগেল গে।

সর্বনাখা - এহে সারথি তহ শুনবো এ সারথি ভাই ঘুরতে ঘুরতে দুইডা ছুয়ার লাগান পানু উমহা কুন পাকায় যে নাকটা কাটে লিলে যে ধরতে ধরতে ধর বায়নি পানু।

সারথি - এ সর্বনাখা তোর যে নাকটা কাটা গেল তোর ফের কাহ ছেনাতে না কাহ নাই।

সর্বনাখা - এ সারথি তোর যে কাথা লা ভাই। কায় কহচে মোর কাহ নাই। মুই যদি ডাকদু সগায় আসলে ধোর মচকায় খতম করে দিবে।

সারথি - এ সর্বনাখা লেদি ডাক দেখি আসচে না কি করচে, হামাও কনেক দেখি।

সর্বনাখা - ধেত এ সারথি তুহে ডাক দেনাতে।

সারথি - এ সর্বনাখা মোর ডাকত ফের আসেতে। তোক ডাকপা লাগে। ডাক দে হামাও দেখি

সর্বনাখা - এ খর-ঢুসন দাদাগে, তুই হের আসে দেখ গে মোর নাকটা কাটে লিছেগে হে খরঢুসন দাদাগে হে।

(খর ও ঢুসন এর প্রবেশ)

গান - ও বীর সাজিলোরে। ওইযে খর আর ঢুসন ও বীর মাজিলোরে। ওইযে মুষল বীরের মোর হস্তেরে লয়া বাণ ও বীর সাজিলো রে।

খরঢুসন - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ -

খর - অঃ ভাইরে ঢুসন তুমি এর পূর্বে এবনে কোনো দিন এসেছিলে ভাই।

ঢুসন - নাঃ দাদা এবনে আমি কোনদিন আসিনি দাদা

খর - অঃ ভাইরে ঢুসন এই দেখ ভাই চিত্রকটির বন এই দেখ ভাই পঞ্চবটির বন কত শাল শিমল যথা জামন খেজুর বকুল প্রভিতি কেমন কেমন শোভা করছে ভাই ওঃ ভাই ঢুসন এসে এবন তোমাকে ভাল করে ঘুরিয়ে দেখিয়েদি। এই হোলো চিত্র কটির বন এই হোলো পঞ্চ বটির বন আর ওই হোলো বাল্মীকি মুনির তপ বন। কত শালে শিমল যথা জামন প্রভিতি কেমন শোভা করতেছে ভাই।

ঢুসন - ওঃ দাদা খর এই কি বলে চিত্রকটির বন, একি বলে পঞ্চবটির বন, কত শাল শিমল যথা জাম কেমন সুন্দর সভা করতেছে দাদা।

খর - ওঃ ভাই ঢুসন ইতিপূর্বে এই বনে তপ করে ছিলো যত মুনিগণ মোদের প্রতাপে এবন ছাড়িয়া পলাইলো কত শত যোজন দূরে। ভয়ে দেখা না দেয় তারা মোদের সনমুখে। ধন্য মোর রাক্ষস কুল বীর চূড়ামনি। শত ধন্যবাদ মো দাদা দশানন। ভেবে দেখ দেইক

ভাই বীর আছে কি কেহো মোদের সমান এ ত্রিভুবনে।

ঢুসন - সত্য তব বাণী দাদা যাহার দম্ভে ত্রিভুবন হয়ে কম্পমান। কেন না করিবে ভয় দেখিয়া তাহার। তবে দুই ভাই গিয়াছিলাম স্বর্গলোক জিনিবার তরে, কত শত দেব তার দর্প চূর্ণ করেছি এই বাহুর বলে। ধন্য মোর রাক্ষস কুল বীরচূড়ামনি, শত ধন্যবাদ মোর দাদা দশানন । ভেবে দেখ দেখি দাদা বীর আছে কেহ মোদের সমান এই ত্রিভুবনে।

(সর্বনখার কান্দন শুনিয়া ঢুসনের পাঠ)

ঢুসন - অঃ দাদা খর শুনতে কি পারলে দাদা । ওই সুন্দর বন হইতে ভেসে আসছে, কুন রমনীর ক্রন্দন সুর। নিশ্চই হবে আমার ভগ্নি সর্বনাখা, কুন দস্যু যদি করে থাকে হেন কুকর্ম । বীর হয়ে ধরিব ধনুকবাণ। খণ্ড খণ্ড করিব মস্তক করিবো ছেদন। তবে চল দাদা প্রকাশ করে দেখি

খর - অঃ ভাই ঢুসন শুনিয়া হাসি পায় বচন তোমার। অমার ভগ্নী সর্বনাখা এখানে আসবে কেন ভাই !

ঢুসন - অঃ দাদা খর নিশ্চই হইবে আমার ভগ্নী সর্বনাখা। তা না হলে অমন করে খর ঢুসন বলে কাঁদবে কেন দাদা। চল অতি শীঘ্র আর প্রাণে সহ্য হয় না।

খর - তবে চল ভাই, কিন্তু খুব সাবধান। পূর্বে শুনেছিলাম এই বনে ভূত পিচাস আছে। তারা মায়াবি নানা রূপ ধারণ করে মোদের কুন ক্ষতি করতে পারে ভাই।

ঢুসন - আঃ দাদা খর, আমি অতি সাবধানে আছি। (সর্বনাখার ক্রন্দন)

খর - আরে তুই কে পরিচয় দে।

সর্বনাখা - দাদা তমহা মোকে চিনভা না পারেন?

খর - আঃ ভগ্নী সর্বনাখা। বল বল ভগ্নী এ দুঃখদশা তোরে করলো কে?

সর্বনাখা - ফুল তুলিবা গিসনু দাদা পঞ্চবটির বন ধরিয়া নাক চুল কাটিচে শ্রীরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।

খর - কথা কার বসন্তি তারা কাহার নন্দন। কি জন্যে ফিরে তারা পঞ্চবটির বন।

সর্বনাখা - দাদা এহডা শুনবা চাহাচিত। অযুতা নগরে ঘর দশরথ নাম। চারি পুত্র জনমিলো জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। ভারতকে রাজ্য দিয়া না দিছে রামকে, সত্য করি কৌকেয়ি মাতা পাঠাইলো বনে। তাহার সঙ্গে ঘুরে এক পরমা সুন্দরী। খাইবার ছলে লিয়াছিনু কোলে। ধরিয়া নাক কাটিছে শ্রীরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে।

খর - আঃ ভাই চুসন একি প্রাণে সইহ্য হয়, আমার নাম খর সর্ব জীবে আছে গৈচর। যাহার জ্যেষ্ঠ ভাই জগৎ বিজয়ী দশানন। যাহার নামে দেবকুল আকুল চন্দ্র মস্তকে করে বিরাজিত তাহার ভগ্নীর হেন অপমান তুমি যাও, নিজালয়ে গমন কর, আমি অবিলম্বে রণ করি আসি জয়।

চুসন - আঃ দাদা খর তুমি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ, এক ভাই চুসন জীবিত থাকতে তোমার রণক্ষেত্রে যাওয়া করতব্য নহে দাদা। তবে তুমি নিজালয়ে গমন কর আমি অতি শীঘ্রে রণ করে আসি জয়। যাওয়ার আগে শুধু চাই তোমার আশীর্বাদ। আশির্বাদ করহ তুমি রণ বিজয়ী হই যেন আমি।

(খরের প্রস্থান)

চুসন - আঃ ভগ্নি সর্বনখা আর ক্রন্দন করতে হবে না। আর যে আমার প্রাণে সহ্য হয় না। তবে চল শীঘ্রে দেখিয়ে দে ওই ভণ্ড জটাধারীকে। মনের মনস্তপ দূর করে তার মাথা কেটে উপহার প্রদান করব। তবে চল শীঘ্রে দেখিয়েদে।

সর্বনাখা - দাদা এই দুইডায় হয় দাদা।

চুসন - (রামের প্রতি ) আরে শিশুদয় বালক। তোরা কুন সাহসে আমার ভগ্নীর সুন্দর নাসাকর্ণ ছেদন করেছিস রে পাপাত্মা। বল বল শীঘ্র প্রকাশ করে খুলে বল।

রাম - তোর ভগ্নী এসোছ লো রমণের সাধে। নাক কান কাটা গেছে সেই অপরাধে। যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি ধর। আজিকার রণে বেটা পাঠাম যমের ঘর।

চুসন - রে কাপুরুষ তুই জানিসনা যে লংকার রাবণ ত্রিলোক বিজয়ী দশানন। তার ভগ্নির কি হেন অপমান

রাম - কতবাণ জন বেটা কত আছে শিক্ষা। আজিকার বাণে বেটা মৃত্যু আছে লেখা

চুসন - রে ভূত ভেক হয়ে করিস কি ভ্রিংগের মস্তকে পদাঘাত। বামুন হয়ে করকি চান্দের অপ বিলাস, মুসিক হয়ে করিস কি বিড়ালের অপমান যেমন দেব দর্প গর্বিত সর্প সহসা ডংসিত পারে। আমি ও তেমনি ভ্রাতৃ আদেশ পালিবার জন্যে আগমন হয়েছি রে কাপুরুষ। তবে ধর অস্ত্র কর রণ বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। কথায় সৈন্যগন, তোমরা শাল শুল জটা বাকুল অস্ত্রশস্ত্র লয়ে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হও

১নং সৈন্য - কইরে তমহা সগায় আসচেন, চল রাজাডাতে ডাকাচে।

২নং সৈন্য - হা -হা - যাছিত।

সৈন্যগণ - কেনে মহারাজ।

ঢুসন - আঃ ভাই সৈন্যগণ আমরা খর ঢুসন দুই ভাই জীবিত থাকতে আমার ভগ্নীর সুন্দর নাসাকর্ণ হয়েছে ছেদন। তোমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।

(যুদ্ধ) (ঢুসনে মৃত্যু) (খরের প্রবেশ)

খর - ওরে সৈন্যগণ আমার ভ্রাতা কথায়?

সৈন্যগণ - মহারাজ রণ স্থলের পশ্চিম পাকায় গাড়ী উলটায় দিছে।

খর - আ ভাই ঢুসন তোমার কেন ধুলা আসন। আগে রণ করে আসি জয় তবে হোবে মোর বিশ্রামের সময়। একি ভাই তুমি আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না। তোমার শরীর যে অবশ হয়ে গেছে। অঃ ভাই ঢুসন তুমি একবার আমায় দাদা বলে ডাক।

গান - ও ভাই পরে আছ একাশরে। একবার দাদা দা-দা বইলে ডাকরে মোরে। ওকি ওই মরি''রে আহারে ওই মরি''রে। হা- দা -দা -হা -দা বইলে কে ডাকিরেরে ভাই ওকি ওই মরি''রে আরে ও -ও ওই মরি''রে।

খর - ও সৈন্যগণ আমার ভাই আমায় ছেড়ে চলে গেছে। তার জন্য শোক করে লাভ নাই। ভাইকে নিয়ে চল সতকার করি।

(ঢুসনের প্রস্থান)

খর - ওরে সৈন্যগণ আমার ভগ্নী সর্বনখা কথায়।

সৈন্যগণ - ওইত মহারাজ।

খর - ওহোঃ ভগ্নী সর্বনখা কুলক্ষ্মী তুই কুলটা। ভ্রাতা ঢুসনকে বধ করিবার তরে আগমন হয়েছিস কুলক্ষ্মী।

সর্বনাখা - তমহাক কি মুই আসপা কহিচু দাদা।

খর - আঃ সর্বনখা আর যে আমার প্রাণে সইহ্য হয় না। তোমার সাক্ষাতে বিনাশি দুখ নাশি জুলেছে মম অন্তর কাঁপে কলেবর, করিব সমর, কথায় সে সন্ন্যাসী?

সর্বনাখা - এহি এইলায় দাদা এইলায়।

খর - ওরে দুষ্ট ভন্ড জটাধারী। আমার নাম খর সর্ব জীবে আছে গৈচর। যাহার জ্যেষ্ঠ ভাই জগৎ বিজয়ী দশানন। তাহার ভগ্নীর হেন অপমান, আয় তবে যুদ্ধে প্রস্তুত। তবে ধর যুদ্ধ।

(খরের প্রস্থান তিরসীরার প্রবেশ)

সারথি - এগে সর্বনখা তোর যে খর ঢুসন দাদালা মারা গেল। এলা কি উপায় করবো।

সর্বনাখা - সেইত নাতেরে ভাই সারথি। এলা তিরসিরা দাদাডাক ডাকাও। এ তিরসিরা দাদাগে হে তুই মোর হের আইসে দেখগে হে তিরসিরা দাদা হা।

গান - ওই দিমদিম তিরসিরা বীর সাজিলোরে। ওরে সাজিলে। তিরসিরা বীর মোর টেপাগুলির নাতি। ধুতির গুনজাত বান্ধিয়া লিছে গান্ডা চারি হাতি। আরে দিম দিম তিরসিরা বীর সাজিলোরে। ওরে বীরের মধ্যে বীর সাজিলো নামে হেদেং ধেং। আকাশতে ঠেং বেটার মোর পাতালে সিতান। আরে দিম দিম তিরসিরা বীর সাজি লোরে। ওরে এমন বীর সাজিলো ভাইরে আগো পাছনা ভারিয়া। বীরের মধ্যে বীর সাজিলো কাংখে বন্দুক লয়া। আরে দিম দিম তিরসিরা বীর সাজিলোরে।

সর্বনাখা - কায়গে ও তিরসিরা দাদা। এ তিরসিরা দাদাহা ওমোর নাকটা কাটে লিছেগে হে।

তিরসিরা - ইহি ভগ্নী সর্বনখা এ দুঃখদশা তোর কে করেছে, সে তুমি প্রকাশ করে বলরে।

সর্বনাখা - ফুল তুলি বা গিসনু দাদা পঞ্চবটীর বনে ধরিয়া নাক কান কাটিচে শ্রীরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে গে হে দাদা হা।

তিরসিরা - ইহি ভগ্নী সর্বনখা। কথাকার বসন্তি তারা কাহারে নন্দন। কি জন্যে ফিরে তারা পঞ্চবটির বনেরে।

সর্বনাখা - অযুতা নগরে ঘর দশরত নাম। চারি পুত্র জনমিলো জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। ভারতকে রাজ্য দিয়া নাদিছে রামকে। সত্য করি কৈকই মাতা পাঠায় দিছে বনে। জঠা বাকুল পইরি ধন তপসিয়া ভেশ। তাহার সঙ্গে ফিরে দাদা পরম সুন্দরী। খাইবার ছলে দাদা লিয়াছিনু কোলে। ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণেগে হে দাদা হা।

তিরসিরা - ইহি ভগ্নী সর্বনখা তবে শীঘ্র দেখাও কথায় সন্ন্যাসী (রামের সহিত)

তিরসিরা - ওরে বেটা দুষ্ট রাম ভন্ড জটাধারী। রাবণ আমার ভাই তিরসিরা নাম ধরি। সর্বখন্ড পঞ্চবটী আমি রক্ষা করি। তিরসিরা আমার নাম খর ও ঢুসন। সবে মিলে করি আমরা ইহার রক্ষণ।

রাম - ওরে বেটা রাইকস দুরাচার। তোর ভগ্নী এসেছিলো রমণের সাধে। নাক কান কাটা গেছে সেই অপরাধে। বাও নাই বাতাস নাই চন্দ্র ধরিবারে ক্ষুদ্র বীর হয়া বেটা বলিস বারে বারে। যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি ধর। আজিকার রণে বেটা পাঠাম যমের ঘর।

তিরসিরা - ওরে বেটা দুষ্ট রাম ভন্ড জটাধারী। বহুদিন থেকে এই বনে আমি ঘুরি ফিরি। রাক্ষসের কাছে তোর না খাটিবে চাতুরী। এখে চাপড়ে পাঠাম তোক যমের যমপুরী। তবে ধর যুদ্ধ।

গান - ওই আরে দিম দিম তিরসিরা। বীর যুদ্ধ করেরে। প্রথমেতে হইলো বীরের মোর মুখতে গালা গালি ওবীর যুদ্ধ করেরে। ওরে দুইঝনকার ভরে যেন মোর কাপেচে মেদেনী। দুই ঝনে যুদ্ধ করে দোহেরে মহা বলী ওবীর যুদ্ধ করেরে। তার পাছেতে হইলো বীরের মোর বাহুরে ধরা ধরি, ও বীর যুদ্ধ করেরে। ধনুকে জুরিলো প্রভু বহ্ম অস্ত্র বাণ ওবীর যুদ্ধ করেরে। তিরসিরার মুণ্ড কাটে হইলো খান খান। তিরসিরা জমিনে পড়িলো ও বীর যুদ্ধ করেরে।

(তিরসিরার প্রস্থান)

সারথি - এগে সর্বনখা শুনলো তোর যে তিরসিরা ভাইডা মারা গেল। এলা কি উপাই করবো।

সর্বনাখা - সেইতা, ভই সারথি যাহে আসেচে তাহে মরেচে। এলা ওহি মোর বড় দাদডা ছেতে। ওইডা মোর রাবণ দাদাডা। গে রাবণ দাদা হা ওমোর নাকটা কাটে লিছেগে হে রাবণ দাদাহা

ডাক - খর ঢুসন মারা পইরে অরণ শব্দ হইলো, ভগ্নদূতে রাবণ রাজাকে যেন বারতা জাগাইলো। ভগ্নদূতের বাক্যে রাজা অগ্নিহেন জ্বলে। সারথিক ডাকাইয়া রথ শীঘ্রগতি আনে।

গান - ও বীর সাজিলোরে। ওইযে লংকারে রাবণ ও বীর সাজিলোরে। ওইযে সাজিলোরে লংকার রাবণ মোর হস্তেরে লয়া বাণ ও বীর সাজিলো রে। ওইযে শাল মুষল বীরের মোর হস্তেরে লয়া বাণ ও বীর সাজিলোরে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ - ইহি সাহারথি আমার স্বর্ণ লংকাপুরী কেন শব্দ করেরে।

সারথি - আইগা মহারাজা আপুনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হবেনা? আপুনার ভগ্নি সর্বনখার নাক কর্ন কর্তন হয়াছে আর খর ঢুসন ভাই তাহা মারা পড়িয়াছে। সেই জন্য আপুনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ করে মুহারাজ।

রাবণ - ইহি সাহারথি সে আমার ভগ্নী সর্বনখাকে নিয়ে এসো আমার গৈচররে।

সারথি - আইগা মুহারাজা আপুনার যদি আইগা পাই। আপুনার ভগ্নী সর্বনখাকে সত্তরে আনি মুহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্তরে আন বাপুফুরে।

সারথি - এই সর্বনখা তুইযে তোর রাবন দাদাডাক ডাকদিলো। আসিল না, কি কহলে? ওহো তোর রাবণ দাদডা আসি তোক ডাকাচে। তোর মুলাকাত চাহাল।

সর্বনাখা - আইচে না কি তেরে ভাই সারথি। তে মুই যাউ মুলাকাত করু।

(রাবণের কাছে কথা)

সর্বনাখা - গে রাবণ দাদা হা মোর নাকটা কাটিয়া লিছে গে হে রাবণ দাদা হা।

রাবণ - ইহি ভগ্নী সর্বনখা এ দুঃখ-দশা তোর কে করেছে, সে তুমি প্রকাশ করে বলরে হে ভগ্নী সর্বনাখা।

সর্বনাখা - ফুল তুলিতে গিসনু দাদা পঞ্চবটীর বনে ধরিয়া নাক কান কাটিতে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে গে হে রাবণ দাদাহা।

রাবণ - ইহি ভগ্নী সর্বনখা কথাকার বসন্তি তারা কাহারে নন্দন। কি জন্যে ফিরে তার পঞ্চ বটীর বন। ইহি ভগ্নি সর্বনখা সে তুমি প্রকাশ করে বলরে।

সর্বনাখা - অযুতা নগরে ঘর দশরথ নাম। চারি পুত্র জনমি গে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। ভারতকে রাইজ্য দিলো না দিলো রামকে সত্য করে কৈকয়ি মাতা পাঠাইলো বনে। ঝটা বাকুল পইরি ধন তপসিয়ার ভেশ। পিতার সত্য পালিতে দুই ভাই ফিরে দেশে দেশ। পিতার সত পালিতে দুই ভাই হয়েছে বনচারী। তাহা সঙ্গে ফিরে একটি সুন্দর নারী। খাইবার ছলে দাদা লিয়ছিনু কোলে। ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ হে রাবণ দাদাহা।

রাবণ - ইহি ভগ্নী সর্বনখা কাটিচে কাটিচে ভগ্নীতোর চামর নাক কান। প্রচুর বেহানে দিমু তোক সনার নাক কান গেহে ভগ্নী সর্বনখা।

সর্বনাখা - এ সারথি শুনলো নাতে দাদাডা কি কোহোল।

সারথি - শুননু নাতে খোপ ঢক ধোরবে। চামরার নাকত তোক সলার নাক দিবে।

সর্বনাখা - এ সারথি সলার নাহায়রে সনার দিবা চাহাল।

সারথি - ধেত ভাল করে পুছারী করেকধি সলার নাক দিবে না সনার নাক দিবে।

সর্বনাখা - গে রাবণ দাদা সলার নাক দিবা চাহালো না সনার নাক দিবা চাহালোগে দাদা।

রাবণ - ইহি ভগ্নী সর্বনখা কাটিচে কাটিচে তোর চামর নাক কান। প্রচুর বেহানে দিমু তোক সনার নাক কানগে ভগ্নী সর্বনখা।

সর্বনাখা - কেনে শুনলো নাতেরে ভাই সারথি।

সারথি - হে শুননু এইভাবে তাহ ঢক ধরবো চামরার নাকত সনার নাক।

সর্বনাখা - এ সারথি মোকে যখন দাদাডা সনার নাক দিবে। তাহলে একটা মোক ভারী দিস মুই দাদার ঘরত সোদোর খাবা যাম।

সারথি - এ সর্বনখ যা মুই ঠিক করে রাখিম ভারীডাক।

রাবণ - ইহি সাহ'রথি।

সারথি - আইগা মহারাজা।

রাবণ - ইহি সাহারথি কান্দে কান্দে ভগ্নী মোর পরে গোলো পায়। সরবাংগ জ্বলে গেলো মোর অগ্নি দিলে গায়। কান্দে কান্দে ভগ্নীমোর কান্দে মনদুখে। সরবাংগ জলে গেলো মোর কাটা নাকটা দেখে। উমামহি রথ খানি করহ সাজনি রথে চরে যাম আজি মারীচ মুনির বাড়ী।

সারথি - আইগা মহ'রাজা আপুনার যদি আইগা পাই। আপনার উমামহি রথখানি সত্তরে সাজনি করতে যই মহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্তরে সাজনি করিতে যাও বাপফুরে।

গান - আহা -হার উমামহি রথখানি করহ সাজনি, ওহে রথে চড়ে যায় হায় রাবণ মারীচের বাড়ী ওহে

রাবণ - ইহি মারীচ মোরে মামু সে তুমি গৃহে আছ কিনা বাপফুরে।

মারীচ - এত রাত্রি কে আইলে বাপফু আমার গৈচরে।

রাবণ - ইহি মারীচ মামু সে তোমার ভাগিনাদশানন আইলাম বাপফুরে।

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন চৈদিগে নাগর চৈদিগে সাগর তাহার মধ্যে মোর ঘর কেমন কইরে অইলে বাপফু আমার গৈচরে।

রাবণ - ইহি মারীচ মোরে মামু চৈদিগে নাগর চৈদিগে সাগর তাহার মধ্যে তোর ঘর। রথে চইরে আইলাম বাপফু তোমার গৈচরে

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন আইস, আসি ভাগিনা বৈইস রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণরে।

রাবণ - ইহি মারীচ মোরে মামু বা বসিবো না বসিবো তোর রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু তোর বা করিবো ভক্ষণে। আগে যদি আমার সঙ্গে কর সতবন্দি। তবে না বসিবো তোর রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু তোর করিবো ভক্ষণেরে।

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন। না বসিবো না বসিবো মোর রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু মোর না করিবো ভক্ষণে। যদি তোর সঙ্গে মুই করু সতবন্দি তবে না বসিবো মোর রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু মোর করিবো ভক্ষণে। আজ কেন এত ক্রুধ্য কেন বাপফুরে। আমি রাইক্কস জাতির সঙ্গে সত্য করবোনা বাপফুরে।

রাবণ - ইহি মারিচ মোরে মামু, লক্ষ্মী সরস্বতী নান্ধন নান্ধে পবন দিয়া ধারা। সত্যের খনেক বিলম্ব হইলে তোর লাথিয়ায় ভাংগিম দন্তের বারারে।

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন লক্ষ্মী সরস্বতী নান্ধন নান্ধে পবন দিয়া ধারা। সত্যের খনেক বিলম্ব হইলে লাথিয়ায় ভাংগেবো মোর দন্তের বারারে।

গান - ওইযে দেখ দেখ রাবণের কথা শুনি সত্য কোলে মারিচ মুনি আরে ও

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন, সত্য না করালো ভাগিনা সত্যের কিনা কাজ। কি আগেই করিয়াছে বাপফু, আমি এমনি কুলায় দিবো কাছরে।

রাবণ - ইহি মারিচ মোরে মামু, ফুল তুলিতে ভগ্নী মোর গিয়াছিলো পঞ্চবটীর বনে। ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে। সেই কোপে রামের সীতাক করিচু হরণ। তোমাক যাইতে হোবে তপসিয়ার বনেরে। মারিচ মামুরে তুই মোর ময়ার চরিত্র নানা বুদ্ধি নানা ময়া আছে তোর শরীলের ভিতর। সনার মৃংগি হইবো তুই রুপার দৈবকী। তাহা দেখে ভুলিবেযে সীতা জানকী। ভণ্ডাইয়া রামেরে তুই লইয়া যাবে দূরে সীতাক হরিমু আজি পেয়ে শূন্য ঘরেরে।

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন মারীচ মামু যে তোর ময়ার চরিত্র। নানা বুদ্ধি নানা ময়া আছে মোর শারীলের ভিতর। সনার মৃগি হইমু মুই রুপার দৈবকী তাহা দেখিয়া ভুলিবে যে সীতা জানকী। ভণ্ডাইয়া রামেরে মুই লইয়া যামু দূরে, সাতাক হরিবে তুই পেয়ে শূন্য ঘরেরে, ওরে ভাগিনারে দশানন কথাকার বসন্তি তারা কাহারে নন্দন। কি জন্যে ফিরে তারা পঞ্চবটীর বনেরে।

রাবণ - ইহি মারীচ মোরে মামু অযোদ্ধা নগরে ঘর দশরথ নাম। চারি পুত্র জনমিলো জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। ভারতকে রাজ্য দিয়া না দিলো রামকে। সত্য করি কৈকয়ি মাতা পাঠাইলো বনে। ঝটা বাকুল পইরি ধন তপসিয়ার ভেশ। পিতার সত্য পালিতে দুই ভাই ফিরে দেশে দেশ। পিতার মত পালিতে দুই ভাই হইচে বনচারী। তাহার সঙ্গে কিরে একটি সুন্দর নারী। খাইবার ছলে ভগ্নী লিয়া ছিলো কোলে ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরামের ভাই

অনুজ লক্ষ্মণে। সেই কোপে রামের সীতাক করিমু হরণ। তোমাক যাইতে হোবে তপসিয়ার বনেরে।

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন, ফুল তুলিতে ভগ্নী তোর গিয়াছিলো পঞ্চবটী বনে। ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে। অবোধ রাবণ তোমার এই কি যুক্তি। কে দিলো কুমন্ত্রণা বাপফু তোমায় সম্প্রতি। প্রাণাধিক রামেরে যে জানকী সুন্দরী। তাহাকে হরিলে কি তোর রহিবে লংকাপুরী। যেমন ছুটিলে হস্তি না রহে আংকুশে। লংকা পুরী তেমন মজিবে তব দেষে। শিরামের যত গুন জানে সর্বলোকে। রাজা দশরথ প্রাণ দিলো পুত্র শোকে। যে ঘরে থাকে বীর সুমিত্রা নন্দন সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কুনজন। পায়ে পরি লংকানাথ করিহে মিনতি ক্ষমা কর রক্ষা কর লংকার বসতী।

রাবণ - ইহি মারীচ মোরে মামু অযুত হস্তির বল তোমার শরীলে। দেবতা গনধরব সদা হিত তব ডরে। বড় দুখে আইনু মামু তোমার গৈচর স'গর লংঘিয়া আমি বনের ভিতর। দন্ডক কাননে ছিল যত নিশাচর। সকলেরে সংহারিল রাম একেশ্বর। খর চুষণ ত্রিসিরা আর যত ভাই। সবাকে মারিচে রাম আর কেহ নাই।

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন আমি যদি যাই মৃগ ভেশে, আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পিছে। কার্য্য সিদ্ধি না হইবে পরিবে সংকটে। অপরাধ না কর বাপফু শিরামের নিকটে। পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণে জানে। জিগগাসা কর গিয়া ধার্মিক বিভীষণে। ধার্মিক তোমার ভাই বুদ্ধিতে পণ্ডিত, যদি আনিতে বলে তবে আন সীতা। শিরাম মানুষ নাহায় স্বয়ং নারায়ণ। সীতাকে হরিলে তোর হোবে সবংশে মরণ। হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার। না দেখি নিস্তার রাজ' হরিলে এইবার।

রাবণ - ইহি মারীচ মোরে মামু, নরের গৈরব বল মন্দ বল মোরে। আমি তোরে মারিলে কে কি করিতে প'রে। আমার প্রতাপে সদা কাপেচে মেদিনী। মানুষের কিবা কথা দেব দৈত্য জিনি। নিষেধ করে যদি দেব পঞ্চানন। তথাপি আনিব সীতা না হইবে খণ্ডন।

মারীচ - ইহি ভাগিনারে দশানন হরিতে গেলাম সীতা না হরিনু তায়। দেখে গিয়া এই কথা জানাও সবায়। পায়ে পরি লংলকানাথ করিহে মিনতি। না করো সীতার চেষ্টা চল অন্তপুরী।

রাবণ - ইহি মারীচ মোরে মামু, তুমি যাবে আগে আগে আমি যাব পিছে। সীতাকে হরিব আমি দুর্গার সাহায্যে।

(রাম ও সীতার প্রসার খেলা)

গান - রাম সিতা প্রসার খেলিতে লাগিলো। আর হার এক প্রসার, দুই প্রসার প্রসার তিন বার ওহে। তিন না প্রসারে প্রভুর হইলো হার ওহে।

(সীতার গান)

সীতার গান - হারিলো-হারিলো-হারিলো রে স্বাম তুই হারিলো। ওরে এতয় রমনীর মাঝে প্রসারে রে স্বাম তুই হারিলো। ওরে এতয় রমণীর মাঝে প্রসারে রে স্বাম তুই হারিলো।

ডাক - প্রসার খেলিয়া প্রভু আনন্দ হইলো। হেন সময় ময়া মৃংগি যেন পন্থে দেখা দিলো।

সীতার গান - এহন সনার মৃংগি কভু নাহি দেখিহে প্রাণের নাথ। এতয় রূপ মৃংগি ধরে বিধি হে প্রাণের নাথ। ধইরে দেহ মকে লয়া যামু দেশ হে প্রাণের নাম। দুঃখ সুখ পাসরামু মিহিরিংগিক দেখিয়া হে প্রাণের নাথ। বোলো মৃংগি ধইরা দেহ মোকে লয়া যামু দেশ হে প্রাণের নাথ। দুঃখ সুখ পাসুরামু মৃংগিকে দেখিয়া হে প্রাণের নাথ।

গান - আহাহার আগে আগে ময়া মৃংগি দৌড়িয়া পলায় ওহে। যাছে পাছে প্রভু যেন যায় যাছে পিটায় ওহে আহার খনে খনে ময়া মৃংগি খনে ঘাস খায়, ওহে খনে খনে ময়া মৃংগি দৌড়িয়া পলায় ওহে। আ হা হার ধনুকে জুড়িলো প্রভু ব্রহ্ম অস্ত্র বাণ ওহে। বাণ দেখে রাইক্কসের উড়িলো পরান ওহে।

ডাক - ময়া না রাইক্কস যেন ময়া রাও ছাড়ে। না শুনে লক্ষ্মণ বীর শুনিলো জানকী নাথ হায় হায় রে কি দুক্ক লেখিলো হো হো বিধিরে। হায়রে কি দুক্ক লেখিলো হো হো বিধিরে।

(সীতা ও লক্ষ্মণের গান)

সীতা - ময়া না রাইক্কস মৃংগি ময়া না রাও ছাড়ে। তুমি যায়া কর লক্ষ্মণ হে প্রভুরে রে উদ্ধার রে হায়রে হায় আমাক ছাড়িয়া প্রাণের নাথ মোর গেলো হো বনেরে হায়রে হায়।

লক্ষ্মণ - গান - ওকি ও জানকী শুন জানকী ময়া না রাইক্কস যেন ময়া না রাও ছাড়ে বলো কার বাপের শইকতি আছেহে দাদাক মারি পারে রে। আমাক ছাড়িয়া গুনের ভাই মোর গেলো কুন বা দেশে রে হায়রে হায়।

সীতা - ওকি ও দেওর লক্ষ্মণ, শুন দেওর লক্ষণ, চণ্ডালিয়া লক্ষ্মণ, আমাক ছাড়িয়া প্রাণের নাথ মোর গেলো, হো হো কুন বনে রে হায়রে হায়।

লক্ষ্মণ - ওকি ও জানকী শুন জানকী ধরম কুরুম বাইশ মতি তোমরা রোহেন সাক্ষী। বলো দুহাই লাগে শিরাম দাদাহে। আমাক ছাড়িয়া গুনের ভাই মোর গেলোও কুন বা বনে রে

বোলো হায় রে হায়। এক রেখা দুই রেখা রেখা তিনবার, এই তিনটি রেখা পার হইলে জনম নাহি আর। হে জানকী।

ডাক - প্রভু গেলো আগে আগে লক্ষ্মণ গেলো পিছে। আর গাছের আড়াল হইতে দুষ্ট রাবণ দেখে।

রাবণ - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমার নাম রাবণ। বিধাতা এইবার আমায় সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে। এইবার জোড় করে সীতাকে নিয়ে যাবো লংকায়। তবে আমার নাম রাবণ। একি অদ্ভুত দৃশ্য। সামান্য ধনুকের রেখা। দেখি ধনুকের রেখা রাবণকে কি করতে পারে। ধনুকের রেখাকে চূড় মার করে সীতাকে নিয়ে যাবো লংকায়। তবে আমার নাম রাবণ। সীতে সীতে সীতে এইবার এইভাবে সীতাকে নেওয়া যাবে না। ভিখারীর ভেশ ধারণ করে সীতাকে নিয়ে যাবো লংকায়। তবে আমার নাম রাবণ হা-হা-হা-হা -হা -।

গান - ওই রাবণ সাজিয়াছেরে ওইযে ভাসাংগো ভুমুংগো রাবণ মোর অংগদে মাখিলো রাবণ সাজিয়াছেরে ওইযে হরি হরি বইলে রাবণ মোর হরি গুন গায়। হরি হরি বইলে রাবণ মোর পঞ্চবটি যায় রাবণ সাজিয়াছেরে।

রাবণ - ওরে বাপু সুমন আমি যে রঘুকুলের কুল বধূকে পুরণ করতে যাবো তুমি যেতে পারবে তো।

সুমন - কেনে পারনি মহারাজ একশবার পারম।

রাবণ - ওরে বাপু সুমন একশবার নয় একবার যেতে পারবে তো।

সুমন - হে পারবো মুহারাজ।

রাবণ - তবে চল যাবার আগে মা চন্ডীর চরণ সেবা করি।

গান - ও তুই ত ত্রি জগতের নাথ গো মা ওমা তোমার সঙ্গে কেহই পারবে না।

রাবণ - মা কালি আমি যে রঘুনাথের কুল বধূকে আনতে যাব। হরণ করতে যাবো। তুমি আমায় আশীবাদ দাও মা যেন নিরবিঘ্নে সীতাকে চুরি করতে পারি।

কালী - না আমি তোমায় আশির্বাদ দেবো না।

রাবণ - রাক্ষসের রাজা আমি লংকা নিকেতন। কুড়ি হস্ত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন। ভয় করি না তোমায় দেবতাগণ। দূর হয়ে যাও আমার সমমুখ হইতে। ওরে বাপু সুমন চল নিজের সাহসে নিজের বাহুরে বলে সীতাকে হরণ করতে যাব। বল হর হর বম - বম মাহাদেব শিব দুর্গা শিব দুর্গা

(সীতার কাছে রাবণের পাঠ)

রাবণ - ওমা সীতা সুরধনি চন্দ্রবদনী আমায় চাইরটি ভিক্ষা দাও মা।

সীতা - তুমি কে মহারাজ।

রাবণ - ওমা সীতা সুরধনি চন্দ্রবদনী। আমার পরিচয় চাইতেছ। জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী এই বনে আমি মাগো বহু দিন তপ করি রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে। সাফল্য হইলো মাগো তোমার দরশণে। সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে। সোনার ভূষন গো শোভে তোমার শরীরে। এমন সুন্দর যৌবন বন মাঝে একা। নিজ পরিচয় দাও মা তুমি কাহার বনিতা।

সীতা - কি বা নাম কিবা জাতি কেনে কর ভিক্ষাহে ঠাকুর। জনক নন্দিনী আমি নাম ধরি সীতাহে ঠাকুর। দশরথের পুত্র বধূ রামের বনিতা হে ঠাকুর।

রাবণ - ওমা সীতা কালি করেছি মাগো এত একাদশী। পারন করি নাই মা আজি উপবাসী। রামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি। হইলো স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী।

সীতা - বনে বনে বেরাই আমি বন ফুল খাইহে ঠাকুর। তোমার জন্যে অন্ন ভিক্ষা কথায় গেলে পাইহে ঠাকুর।

রাবণ - বনে বনে বেরাও তুমি বন ফুল খাও। আমার জন্যে অন্ন-ভিক্ষা কথায় তুমি পাও। বনের যা বিচিগুলি আছে মা তাই আমায় দাও। রেখার বাইরে এসে দাওমা।

সীতা - ওকি ও মুনি ঠাকুর শুন মুনি ঠাকুর। এক রেখা দুই রেখা রেখা তিন বার। এই তিনটি রেখা পার হইলে আমার জন্ম নাই মুনি ঠাকুর।

রাবণ - ধনুকের তিনটি রেখা স্বর্গ মুখে ধায়। ব্রাহ্মন ফকিরকে ভিক্ষা দিলে মা কিছুই নাহি হয়।

সীতা - ঠাকুর নাও ভিক্ষা।

রাবণ - রেখার বাইরে এসে দাওমা। সীতা তুমি আমার পরিচয় অবগত হলে বিশেষ আনন্দ হবে। এই হলো আমার পরিচয়।

সীতা - আপুনি কে মহারাজ।

রাবণ - আমি কে ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য বরুণ লক্ষ্মী সরস্বতী আমার হস্তে বন্দি।

সীতা - আপনি আমার এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

রাবণ - আমার প্রতাপে চরাচর কম্পমান, আমি দূর হয়ে যাবো? হা হা হা হা।

(সীতা হরণ)

ডাক - সীতাক লয়ে যবে রাবণ অন্তপুরে যায়। ওই সময় জটাউ পাখি দেখিবাক পায়।

গান - ও জটাউ সাজিলোরে। ওইযে পরবতের সহিতে জটাউ সাজিলোরে। ওইযে পাখা মারে জটাউ মোর রাবণের উদরে। ও জটাউ সাজিলোরে।

জটাউ - ওরে বেটা রাবণ, আমার ঠোঁট হইলো ভোতা নতুবা ফুলের মতন ছিড়ায় খাইতাম মাথা।

রাবণ - ওরে বেটা বিহংগ পাখি নিজের কালকে আহবান করিতেছিস, তবে আয় সমরে প্রস্তুত হও।

গান - ও জটাউ যুদ্ধ করেরে। রাবণের সহিতে ও জটাউ যুদ্ধ করেরে। ধনুকে জুড়িলো রাবণ ব্রহ্ম অস্ত্রবাণ, জটাউ পাখির পাখা কাটিয়া কোলে খান খান, ও জটাউ ও যুদ্ধ করেরে।

জটাউ - ওমা সীতা ওমা সীতা না কর ক্রন্দন সীতা না কর ক্রন্দন। তোমাক যে উদ্ধারিবে শিরাম লক্ষ্মন। (জটাউ প্রস্থান) (রাবণের লংকায় প্রবেশ)

রাবণ - ওরে ত্রিজটা রাক্ষসী রাণী মন্দোদরী। তোমরা সকলে আসরে।

গান - ওগে রাবণ দাদা আইনচেগে কইনা। চল যায়ি কইনাগে দেখিবা।

রাবণ - সীতাক হরিলাম আমি বড়ই আশ্বাসে, সেহ সীতা না ভজে শিরামের গৈরবে। তোরা বুঝাও সকলিরে। চল সবে আমার সনে সীতাক রেখে আসি অশকের বনে।

(অশোক বনে প্রবেশ ও প্রস্থান)

ডাক - সীতাক লয়ে রাবণ যবে অশক বনে গেলো হেন সময় লক্ষ্মণ যেন কুন্ডে প্রবেশিলো।

লক্ষ্মণ - ওকিও জানকী, সে তুমি গৃহে আছ কি নারে জানকী। হায় হায়রে দারুন বিধি আর কিনা হইলো। ফুলের কমল সীতা কুনটা বনে গেলে। দাদা আসিলে আমি কি বাত্রা বলিবো, না হয় কালন্তির বনে ছপিয়া রহিবো।

ডাক - সীতাক না দেখিয়া লক্ষ্মণ ছপিয়া রহিলো, হেন সময় প্রভু যেন কুঞ্জে প্রবেশিলো।

রামের গান - ও ভাইরে লক্ষ্মণ তুমি ভাই মোর ছাড়রে ছাড়। আমি যাছি গৃহ মাঝেরে ভাই। ওকি ও জানকী শুন জানকী সে তুমি গৃহে আছ কিনা রে জানকী।

ওকি ও ভাইরে লক্ষ্মণ শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।

সে তুমি গৃহে আছ নাকিরে ভাইরে লক্ষ্মণ।

হায় হায়রে দারুন বিধি আর কিনা হইলো।

ফুলের কমল সীতা কুন বা দেশে গেলো।

লক্ষ্মণের গান - মোরে কিছুই দোষো নাহিগো দাদা।

ওই যে তুমি গেলেন আগে আগে গো দাদা। আমি

গেহেলাম পিছে পিছে গো দাদা।

ওগো দাদা হস্তে ধরু পায়ে পরু দাদা মোরে কিছুই দোষো নাহিগো দাদা।

রামের গান - ওইযে বড়য় গুণের ভাইয়া ছিলোরে লক্ষ্মণ

আইস ভাই মোর কোলে রে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণের গান - ওইযে বড়য় গুনের ভাইয়া ছিলোগো দাদা।

ধুলা ঝাইরে কোলে লইলেন গো দাদা।

রামের পাঠ - ওকি ও ভাইরে লক্ষ্মণ এখন আমি কি উপাই করিরে ভাইরে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ - ওকি ও দাদা রঘুনাথ।

এখন আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী দাদা রঘুনাথ।

(রাম ও লক্ষ্মণের গান)

গান - আর একভাই সন্ন্যাসী হম একভাই বৈরাগী হম। দেশে দেশে মাংগিয়া খামরে। ওরে কালার বনে। অযুতায় ছাড়িলাম পিতা বনে আসি হারালাম সীতারে ওরে কালার বনে ওরে রাবণ রাজা হইলো বৈরী। আমার সীতাক করিলো চুরী ওরে কালার বনে।সেই হরিনী মইলো সেইটি দশা আমার হইলোরে ওরে কালার বনে। আনও ছুরী কপাল চিরি। কপাল চিরিয়া বিচার করিরে ওরে কালার বনে।

রাম - ওকি ও ভাইরে লক্ষ্মণ। এখন আমি কি উপাই করিরে ভাইরে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ - ওকি ও দাদা রঘুনাথ শুন দাদা রঘুনাথ, এখন আমি হনুমান জাম্পুবানকে ডাকাবরে দাদা রঘুনাথ।

গান - ওই আসিরে হে হনুমান।

ওইযে তুমিনা থাকিতে আমার সীতা হইল চুরীরে।

ওকি আয়রে আয়রে বাছা হনুমান।

ওইযে ছাড় কদলির বন বাছা রথে চরে আয়রে হনুমান।

হনুমান - ওগো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ সে আমাকে কেন ডাকলেন গো প্রভু রঘুনাথ

রাম - ওরে বাছা হনুমানরে বাছা হনুমান। তোর দেহাডা হোক বজ্রর সমানরে বাছা হনুমানরে বাছা হনুমান

হনুমান - ওগো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ। আমি বলি ওহে প্রভু দেখেছি অপার। অবশ হইবে তুমি রাজার কুমার। চন্দ্র সূর্য জিনি রূপ ব্রহ্ম ভুমিস্থলে। গগন মন্ডল ছাড়িয়া কুন রণস্থলে। আমার আগে কহ প্রভু সবে বিবরণ। সুগ্রীব বানর রাজা কিচকিন্দাতে ধাম। তাহার কিংকর আমি নাম হনুমান। মিত্রতা করিবার জন্যে বড়ই কইচে আশ। পাঠাইয়াছে সুগ্রীব আমায় তার পাশ। গো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - ওরে বাছা হনুমান রে বাছা হনুমান। সুগ্রীব রাজাকে নিয়ে আস আমার গৈচর রে বাছা হনুমান।

হনুমান - ওগো প্রভু রঘুনাথ গে। প্রভু রঘুনাথ। তোমার যদি আইগা পাই। তাহলে সুগ্রীব রাজাক আনতে যাই গো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - সে তুমি সত্বরে আন বাপফুরে।

গান - ও সুগ্রীব সাজিলোরে। কিচকিন্দা নগরে ও সুগ্রীব সাজিলোরে। সাজিলোরে সুগ্রীব রাজা হস্তেরে ধনুক বাণ ও সুগ্রীব সাজিলো রে।

সুগ্রীব - ওগো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ। আপুনার চরণে ভক্তি করি আমাকে আর্শীবাদ দাও গো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - ওরে বাছা সুগ্রীব রে বাছা সুগ্রীব। অগ্নিত না মরিস বাছা পানিত না যাইস তল। তোর দেহাডা হোক বজর সামানরে বাছা সুগ্রীব। রে বাছা সুগ্রীব।

সুগ্রীব - ওগো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ। আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্বতে। এক কন্যা দেখিলাম রাবণের রথে। গালাতে উদ্রোগী মালা গায়ে আভরণ। রত্ন যেন পড়িয়াছে স্বর্গের তারা গণ। এই লেহ তোমার সীতার আভরণ হয়কিনা হয় গো প্রভু রঘুনাথ গো প্রএভু রঘুনাথ।

রাম - সে নিশ্চয় হয় রে বাছা সুগ্রীব রে বাছা সুগ্রীব।

সুগ্রীব - ওগো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ। আমার ভাই বালি রাজা বড়য় যোদ্ধাপতি রাইজ্য ধন কারে লইয়া করেছে বনচারী। তোমার আইগায় পাই প্রভু যদি এই রাজ্য ভার, সাগর বান্ধিয়া করিমু সীতার উদ্ধার গো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - সেই বালি রাজাকে নিয়ে আস আমার গৈচর রে বাছা সুগ্রীবরে বাছা সুগ্রীব।

গান - ও বালি সাজিলোরে। কিচকিন্দা নগরে ও বালি সাজিলোরে। শালশুল মুষল বীর মোর হস্তেরে লয়া বাণ ও বালি সাজিলোরে।

(বালি ও সুগ্রীব যুদ্ধ) (সুগ্রীব হেরে রামের কাছে আগমন)

সুগ্রীব - ওগো দাদা বালিরাজ পিপাসায় আমার প্রাণ যায়গো দাদা বালি রাজ।

বালি - ভয় হইলো, পলাইলো হইস মম ভাই। প্রাণে মারিব তোরে যদি দেখা পাই।

(প্রস্থান)

(রামের কাছে সুগ্রীব আগমন)

সুগ্রীব - ওগো প্রভু রঘুনাথ বালি রাজার বাণ আমি সহিতে না পারি গো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - ওরে বাছা সুগ্রীব রে বাছা সুগ্রীব। বালি আর সুগ্রীব দেখি একই সমান। মিত্র হয়া আমি না ছাড়িলাম বাণ। আমার গলের মালা তোমার গলে দিই একবাণে বালি রাজার বধব জীবন রে বাছা সুগ্রীব।

সুগ্রীব - ওগো দাদা বালি রাজ এসেছি তোর দ্বারে শীঘ্র এসে যুদ্ধ দেহ, মোরে, গো দাদা বালিরাজ।

বালি- ভয় হইলো, পলাইল লইয়া জীবন। কি সাহসে কর সুগ্রীব মোর সনে রণ।

তারা - কোথায় আগমন হয়েছে প্রভু।

বালি - একি প্রিয়ে তুমি। আমি যে রণস্থলে আগমন করেছি প্রিয়ে।

তারা - সংগ্রাম রণে প্রভু না কর গমন। আমার বচন শুন জীবন কারণ। একদিন যুদ্ধে যাহ প্রভু বৎসর বিশ্রাম। কি সাহসে আইল সুগ্রীব করিতে সংগ্রাম। যুদ্ধ ভংগ দিয়া যে বুদ্ধিতে আহ্বান করে হইলো পন্ডিত লোক অবশ্য বিচারে। যুদ্ধে না যাইও প্রভু শুন মোর বাণী

(বালির কাছে রামের পাঠ)

রাম - শুন বালি হইয়া স্থির। বানর জাতির মধ্যে তুমি বড় বীর। আমাকে করেছ তুমি অনেক ভৎসর্না। তার যদি আছে কিছু বল কু কথা। করিয়াছি মিত্রালী পাবক সাক্ষী করি। কোথাও না রাখি যেন সুগ্রীবের অরি। ইন্দ্র পুত্র হও তুমি মহেন্দ্রের বেশ। আমার বাজিতে যাও আপুনার দেশ।

বালি - আমার বচন শুন তারা চন্দ্রমুখী। সুগ্রীব লাগিয়া বল আমি নাহি দুখী। দানব মারিতে যবে গেলাম পাতালে। রেখেছিলাম সুরংগের দ্বারে ঐ চন্ডালেরে। আমার মহিলা হয়ে জাতি নাহি রাখ তোমার কথায় তার না মারিব প্রাণ। হস্ত গলায় বেন্ধে দিব সুগ্রীব তব বিদ্ধমান।

তারা - প্রভু রামের সহায় করি যদি আসে। তবে বল প্রাণনাথ রক্ষা পাবে কিসে।

বালি - প্রিয়ে কেন বল অসত্য বচন। শ্রীরামকে না করি ভয় শুন তার মর্ম। সত্যে ধর্মে শ্রীরাম চন্দ্র সত্যে ধর্মে মন। সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন। সুগ্রীবের সাহায্যে যদি আসেন

শ্রীরাম। তবু রণে না দিব ভংগ প্রিয়ে করিমু সংগ্রাম। তবে তুমি অন্তপুরে যাও প্রিয়ে।

(সুগ্রীবের সহিত বালির যুদ্ধ)

বালি - রে দুষ্ট রাম রে পাপিষ্ঠ রাম ভাই ভাই যুদ্ধ করি দেখহ কৌতুক। আমাকে মারিয়া রাম কিনা পাইলে সুখ। আমাক রাখিয়া যদি সুগ্রীবক মারিল হয়। বিনা যুদ্ধে সীতাক তোর উদ্ধার করে দিনু হয়রে দুষ্ট রাম রে পাপিষ্ঠ রাম, (বালির কাছে রামের পাঠ) ওগো প্রভু রঘুনাথ ব্যাথিত হইয়া প্রভু বলিনু কুবচন ক্ষমা কর প্রভু। সুষেন দুহিতা তারা আছে গৃহ মাঝে। তারে যেন দুঃখ নাদেয় সুগ্রীব কোন কাজে। (রামের কাছে বালির পাঠ্য)

তারা - প্রভু একি প্রভু তোমার এদশা কেমনে হইলো প্রভু। পিছন হইতে কে মারিলো বাণ।

বালি - প্রিয়ে সতী তারা চন্দ্রমুখী। সীতাক হরে নিল লংকার রাবণ। রাবণের অপরাধে প্রিয়ে আমার মরণ।

তারা - রাজ্য লোভে সুগ্রীব করিলো হেন কাজ। কান্দাইলো কিচকিন্দার সমাজ। এতেক কান্দিয়া বলে তারা সুন্দরী। তাহার কান্দনে কান্দে কিচকিন্দা নগরী। বালক অঙ্গদ কান্দে মোর মির্তিকা শয়নে। পশু পাখি কান্দে আজি বালির মরনে। থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ। শিরাম সুগ্রীব দোহে বিরস বদন। আমি বলি রাম তব জন্ম রঘুকুলে। আমার স্বামিকে কেন বিনাশিলে ছলে। সন্মুখে মারিতে যদি দেখিতাম প্রতাপ। লুকাইয়া মারিলে বাণ পাইনু বড় তাপ। শিরাম তোমারে বলে সবে দয়াবান। ভালয় দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ। সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে। সীতাকে আনিবে ঘরে। বহু পরিশ্রমে। আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে। কান্দিবে সীতার হেতু কে খন্ডিতে পারে। সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন। যাহা বলি তাহা নাহি হোবে বিফলে। ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ণ। কর্মমত ফল ভোগ করে সর্বজন। স্বামী সেবা করে যদি হয় সতী। স্বামী বিনা স্ত্রিলোকের আর নাহি গতি। স্বামি কর্তা স্বামী ধর্তা স্বামি মাত্র ধন। স্বামী বিনা গুরু নাহি কহে গিয়ানীজন। এক পুত্রের মা যদি স্বামীহারা হয় তথাপি সকলে তারে অভাগানী কয়। আমি যে আজ স্বামি হারা অভাগিনী প্রভু।

বালি - আমি বলি সুগ্রীব তুমি ভাই সহদোর। তোমার সঙ্গে বিবাদ মোর হইলো বিস্তর। তোমার সঙ্গে বিবাদে মোর এই ফল হয়। তুমি রাজ্য কর ভাই আমি মরিহে নিশ্চয়। অঙ্গদেরে ভাই তুমি নাদিও যে তাপ। আমার বিহনে তুমি অঙ্গদেরে বাপ। (প্রস্থান) (অশোক বনে সীতার সহিত রাবণের কথোপকথন)

রাবণ - যাই আমি এখন সীতার কাছে অনুমতি নিতে। সুন্দরী নানা রত্নে পূর্ণ আমার আগার। যত দেখিতেছ সুন্দরী সকলে তোমার। তোমার সেবক আমি। তুমিতো ঈশ্বরী। অনুমতি দাও সুন্দরী চল আমার অন্তঃপুরী।

সীতা - আমার সেবক হন কহিলেন আপুনি। সেবক হইয়া কেন লংঘ ঠাকুরানী। সেবক হইলে সেতো হন গুরুজন। সেবক হইয়া কেন বল কুবচন। রামে প্রাণ নাথ মোর রামে দেবতা। রাম ছাড়া অন্য জনকে নাহি চায় সীতা।

রাবণ - রাম তো সামান্য নর অল্প তার ভক্ষণ। যুগে যুগে চির জীবি আমি দশানন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

সীতা - রামে প্রাণ নাথ মোর রামে দেবতা। রাম ছাড়া অন্য জনকে নাহি চায় সীতা। রাম থাকিতে তোরে দেখি বহুদূর। রামকে দেখে যে হিংসে সে তো হয় কুকুর।

রাবণ - রাক্ষসের রাজা আমি লংকা নিকেতন। কুড়ি হস্ত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন। ভয় করিনা তোমার শিরাম লক্ষ্মণ।

সীতা - রাম প্রাণের নাথ মোর রামে দেবতা। রাম ছাড়া অন্য জনকে নাহি চায় সীতা

রাবণ - সুন্দরী তোমার কাছে আমার মাত্র দুটি কথা। এক তোমার যৌবন। নতুবা তোমার জীবন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

সীতা - সীতা জীবন দিতে পারে। তবু যৌবন দেবেনা।

রাবণ - কি সুন্দরী যৌবন দেবেনা। তবে প্রস্তুত হয়ে যাও জীবন দেওয়ার জন্যে।

(সীতা প্রস্তুত, হেন সময় মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী - মহারাজ - একি মহারাজ আজ নারি হত্যা কেন মহারাজ।

রাবণ - মন্দোদরী হেন নারী বধিতে পারি শাস্ত্রের বিধানে। মন্দোদরী তুমি শুয়ে ছিলে আমার শয়ন কক্ষে। হেন সময় এখানে আগমন কেন মন্দোদরী।

মন্দোদরী - আপনার তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে এলাম মহারাজ। আজ নারি হত্যা কেন মহারাজ শুন শুন মুহারাজ শুন মোর বাণী। নারি হত্যা মহাপাপ সর্ব শাস্ত্রে শুনি। শত মুনি বধিয়ে যত পাপ হয়। এক নারি হত্যায় তত পাপ জানহ নিশ্চয়। মহারাজ, সীতা নাকি তোমার কাছে এক বৎসর সময় নিয়েছিলো। দশ মাস চলে গেছে মাত্র দুটি মাস বাকি। দুই মাস পরে সীতা হবে তোমার দাসি মহারাজ।

রাবণ - সত্য কহিলে মন্দোদরী। যখন সীতাকে হরে নিয়ে আসি। তখন আমার কাছে এক বৎসর সময় নিয়েছিলো। দশ মাস চলে গেছে মাত্র দুটি মাস বাকি। দুই মাস পরে সীতা হবে আমার দাসি মন্দোদরী হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। (প্রস্থান)

সুগ্রীব - ওরে বাপফু হনুমান। এক্ষনে লংকায় গিয়া কর সীতার অন্বেষণ।

হনুমান - যথা আইগা সুগ্রীব রাজ। জয় শিরাম চন্দ্রের জয়।

(অশোক বনে হনুমানের প্রবেশ)

সীতার গান -

গান - বাপ ছাড়ি লাম মাও ছাড়িলাম আপনার দেশেহে বিধি। স্বামীক হারালাম নিজ কর্মের দোষে হে বিধি।

(সীতার কাছে হনুমানের প্রবেশ)

সীতা - সে তুমি কেগো।

হনুমান - মাগো শ্রীরামের দূত আমি নাম হনুমান।

সীতা - যদি আমার সেবক হন দেখাও তোমার পরিচয়

হনুমান - জয় শ্রীরাম (হনুমানের রূপ ধরেন, সীতা বিশ্বাস করেন)

সীতা - ও বাছা হনুমান তুমিত বানর একা বাবা রাক্ষস বহু জন। তোমারে পাইলে বাবা করিবে ভক্ষণ।

হনুমান - কিছু ভয় নাই মা। ওমা সীতা, কথায় আছে অমৃতের বন কহত বিধান। খাইব সকল ফল তব বিদ্যমান।

সীতা - ওরে বাছা হনুমান এই দেখ অমৃতের বন। অমৃতের ফল তুমি করহ ভক্ষণ।

(হনুমান অমৃত বন ভাংচুর করে এমন সময় ইন্দ্রজিৎ-এর প্রবেশ)

ইন্দ্রজিৎ - ওবেটা বনের বানরা বলি আমি তোরে। কুনবাপ তোর আদেশ দিয়েছে ফল খাইবারে। বল বল শীঘ্রে প্রকাশ করে বল।

হনুমান - ওরে বেটা ইন্দ্রজিৎ তুই বলিস বিপরীত। ফল মুল খাইমোরা মুনি ব্যবহার। ডালে ডালে ভ্রমি মোরা নহে কুআচার। নিজের অনাচার না দেখ আপনি। তোর বাপের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি। চৌদ্দ হাজার নারী আছে তোর বাপের ঘরে এতনারী থাকিতে তবু পরদার করে। সর্বদানা ফল বৃক্ষের সময়তে ফলে। তোর বাপের ফলরে বাপু, ফলিচে এত কালে।

(ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ / হনুমান বন্দি/ লংকায় নিয়ে যায়/ লংকা দগ্ধ হয়)

রাবণ - ওভাইরে বিভীষণ, পুত্র গেছে মোর অশোকের বন। এখন না জানি পুত্রের কুন কুশল।

বিভীষণ - পুত্র গেছে মোর অশোকের বনে। এক্ষনে আসবে পুত্র মোর লংকার শিহরে।

ইন্দ্রজিৎ - ওগো পিতা লংকেশর। হনুমানকে বেধে এনেছি লংকার ভিতর। দেহ তারে প্রাণদন্ড।

রাবণ - সত্য কহিলে পুত্র দেহ তারে প্রাণ দন্ড।

বিভীষন - ওগো দাদা লংকেশর শুনহ বচন। যে জন মারিবে বনের বানর সেতো অধম। আগুন জ্বালাইয়া দেহ লেজে। আগুনে মরিবে বেটা অগ্নির তেজে।

রাবণ - সত্য কহিলে ভাই বিভীষণ আগুন জ্বালাও তড়িত। লেজেতে আগুন দিলে বেটা মরিবে নিশ্চিত।

(লংকা দগ্ধ করিয়া সীতার কাছে ফিরে আসিয়া প্রণাম।

হনুমান - ওগো মাতা জনক জননী না কর ক্রন্দন মাতা না কর রোদন। তোমাকে যে উদ্ধারিবে শিরাম লক্ষ্মণ।

সীতা - ওরে বাছা হনুমান গায়ের আভরণ প্রভুর জন্য করিলাম দান। অশোক বনে বন্দি আছিত নিশ্চিত। উদ্ধার করে যেন আমায় তড়িত।

(হনুমানের রামের কাছে আগমন)

হনুমান - গো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ এখে লম্ফে গেলাম প্রভু কদলির বন। সেহঠে নি পাইলাম প্রভু সীতার দরশন এখে লম্ফে গেলাম প্রভু লংকার ভিতর। রাবণের লংকাপুরী করিলাম লন্ডভন্ড। সেহঠে নি পাইলাম প্রভু সীতার দরশন। পথতে বসিয়া প্রভু জুড়িলাম ক্রন্দন। হেন সময় আইলো প্রভু দেবতা পবন। পবন বলে ওরে বাছা কান্দন খেমা কর। তোমার সীতা আছে বাছা অশোকের বন। এখে লম্ফে গেলাম প্রভু অশোকের বন। সেইঠে পাইলাম প্রভু সীতার দরশন। আমাক দেখিয়া সীতা জুড়িলো কান্দন। না কান্দ না কান্দ মাগো কান্দন খেমা কর। তোমাকে উদ্ধারিবে শিরাম লক্ষ্মণ। হাতের আংগুঠি সীতা আমায় কলে দান। এখে লম্ফে আইলাম প্রভু পঞ্চ বটির বন, এই লেহ তোমার সীতার আভরণ গো প্রভু রঘুনাথ

রাম - সে নিশ্চয় হয়রে বাছা হনুমানরে বাছা হনুমান।

সুগ্রীব - ওগো প্রভু রঘুনাথ গো প্রভু রঘুনাথ সাগর বান্ধিয়া করিমু সীতার উদ্ধার গো প্রভু রঘুনাথ।

(রামের পাঠ সুগ্রীবের সহিত)

রাম - সে তুমি সঁতরে যাওরে বাছা সুগ্রীব।

গান - ও সুগ্রীব সাগর বান্ধেরে। ওইযে গাছে আর পাথরে ও সুগ্রীব সাগর বান্ধেরে। ওইযে পুরুবের সেতু যেন মোর ঠেকিলো পশ্চিমে ও সুগ্রীব সাগর বান্ধেরে। ওই যে দক্ষিণের সেতু যেন মোর ঠেকিলো উত্তরে ও সুগ্রীব সাগর বান্ধেরে।

ডাক - সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য কলে পার। দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহংকার।

(রাবনের সিপাহির প্রবেশ।)

সিপাহি - আরে চুপ-চুপ-চুপ। আপ কৌন হ্যায় জী।

সারথি - আরে হাম গাওকা মন্ডল হ্যা জী। আরে আপ কৌন হ্যা জী।

সিপাহি - ও গাওকা মন্ডল হামকো নাহি পংহ চানতে হ্যায় জী। হাম রাজা লংকেশর কা সিপাহি হ্যায় জী।

সারথি - ও আপ রাজা লংকেশ্বরক সিপাহি হ্যায় জী। ও সিপাহি জী। আপ কাহা যায়গা জী।

সিপাহি - ও হাম কাহা যায়গা। দেখিয়ে জী হিয়া রাজা লংকেশ্বর আয়গা। রাজবাড়ী নির্মাণ করনে হোগা।

সারথি - ও সিপাহি জী ওতো হামসে নাহি হোতাহে ওতো মাঝি সে হোতাহে জী।

সিপাহি - ও আপসে নাহি হো তাহে। ওতো মাঝিসে হোনেবালা হ্যায় তো ফুকারে।

সারথি - ও সিপাহি জী আপ ফুকারিয়ে আপ ফুকারনেসে ও তুরন্ত আয়গা জী।

সিপাহি - উসিকা নাম কিয়া হ্যায় জী।

সারথি - দেখিয়ে সিপাহি জী উসিকা নাম কালুয়া কোট কোটু মাঝি হ্যায় জী।

সিপাহি - ঠিক হায় - আরে ও কালুয়া কোট কোটু মাঝি। তুম্ জলদি আও।

কালুয়া - আরে, রেইস যাছু।

গান - ও হামকো কোন ফুকারি হো বরকনদাজী হি যাছি যাছি চাটিক পনতা খাচি।

সিপাহি - আরে ও জী গাওকা মন্ডল কালুয়া কাহা আতা হ্যায় জী।

সারথি - ও সিপাহি জী উত আগিয়া হ্যায় জী।

সিপাহি - ও জী গাও কা মন্ডল উকাহা আয়া হ্যায় জী।

সারথি - ও সিপাহি জী দেখিয়ে। আপকা কুরসি পর জো বইঠাহে ওহিতো হ্যায় জী।

সিপাহি - আরে ও কালুয়া কোট কোট মাঝি

কালুয়া - আরে পেনেনেত পেনেনেত কিডা করচেরে।

সিপাহি - ওজী গাওকা মন্ডল উ পাগলা হ্যায় না কিয়া হ্যা।

সারথি - ও সিপাহি জী দেখিয়ে উ পাগলা নাহি উ আপসে দিললাগি করতা হ্যায়।

সিপাহি - ঠিক হ্যা উসিকা দিললাগি হাম ছুটাতাহে আরে ও কালুয়া

কালুয়া - উডা কায় বারে মুই দেউনিয়া

সারথি - এ কালুয়া উডা কায় চিনবা পালোনি।

কালুয়া - উহু মুই চিনবা পানুনি কায় উডা।

সারথি - এ কালুয়া দেখেক রাজা লংকেশ্বরের সিপাহি।

কালুয়া - উহু মুই বুঝবা নি পানু।

সারথি - আরে সিপাহি কাথা যখন বুঝবা নি পালো বরকনদাজত বুঝিস। এহে রাজা লংকেশ্বরের বরকনদাজ।

কালুয়া - হ্যা ঐডা কোহো এরে মোর দরকার। আজি ভেলেদিন তকা মুই অনছায় বেরাচু এক আজিনে পানু। চল বারে তমহারে মোর দরকার।

সিপাহি - আরে কিয়া ?

কালুয়া - তমহাদে বোলে বকরা লে তমহার দরকার।

সিপাহি - হাম বকরা হ্যারে। ভুসরী বালি তুমহারা চামড়া উতার লেগা সমঝো।

কালুয়া - ধুর বারে বকরা বোলে না হয়।

সারথি - কালুয়া বরকনদাজ কাথা তুই বুঝবা পালেনি।

কালুয়া - উহু মুই বুঝবা পানুনি।

সারথি - কালুয়া দেখ সেরয়ান বুঝিস এহে রাজা লংকেশ্বরের সেরয়ান।

কালুয়া - ওনোং কভা লাগেনা। হ্যা বারে তমহায় বোলে রাজা লংকেশ্বরের সেরয়ান। কহদি কেনে ডাকালন।

সিপাহি - কালুয়া দেখো হিয়া রাজা লংকেশর আয়গা রাজপুরি নির্মান করনে হোগা। নিচাকো উচাও উচাকো নিচা করকে সামান করণে হোগা।

কালুয়া - মোর দ্বারা হোবেনি বারে মোর পিছলাছে অমহারে দ্বারা হোবে।

সিপাহি - ওহি বোলোরে কালুয়া। তুম জাতমে ছোটাহে লেকিন বাতমে তো বরে বরা হ্যারে। জলদি পুকারো উলোককো।

কালুয়া - তমহায় ডাকাও বারে মুই ডাকালে হাসিমাজাক করবে।

সিপাহি - কিয়া নাম হ্যা উসিকা।

কালুয়া - ওমোর মাও।

সিপাহি - ওজি গাওকা মন্ডল ওমোর মাও কোইনাম হোতা হেজি।

সিপাহি - ওসিপাহিজি দেখিয়ে বাত বুঝনে কা আপকা ফের হ্যা জি দেখিয়ে উসিকা একঠে। হ্যা লেরকি লেরকিকা নাম রাক্ষেহে উসিসে পুকার তাহে ওমোর মাও। ও ওমোর মাও তুলোক জলদি আজাও। (কালুয়ার দুইটা বৌ বড় ও ছোট-র প্রবেশ)।

গান - ওহো ভাই ছটায় ছিনু মুই ভালয়গে ছিনু ও ভাই মাও বাপের দুলালি ছিনুগে ভাই। ওহো মোর ভাইগে সুন্দর দেহা মোর ধুলাতে লটানু গে ভাই। ও ভাই এখেত দুই পহরগে বেলা। কতয় করিম গৃহ জ্বালা গে ভায়ি।

বড় বৌ - এমাই তোক কুন কহে গিছে।

ছোট বৌ - মোক কুননি কহেগে ভাই।

বড় বৌ - চলধি এইডা বাড়িত পুছারি করমো কভা কভাবারচেন নি কাহ।

বৌয়ের কথা - দাদাগে দাদা হামার ওমোর বাপটা তমহার এইতি আসিচে না কিগে তমহা কাহ কভা পারবেন।

সারথি - কায় উলাগে মাই তমহার ওমোর বাপটা খোব বেহানে হামার এই পাড়ায় গিছে। দেখত আগাতি।

বড় বৌ - এ ওমোর বাপ লোকটা কুনঠে যাবে তে কহে নি গেলা, হামা অনছায় অনছায় হোদরে গেন।

কালুয়া - খরাক আইনচেন দেখাও।

ছোট বৌ - এওমোর বাপ আগুত বিরিডা খায়লে, শালাই মুই আনু নি কেনং করে খাবো।

বড়বৌ - খা বিরিডা লক্ষ্মীছাড়া বৈরাগী।

কালুয়া - দে খরাকলা। ধর বিরিডা ফুকে ফুকে রাখিম তাহে মুই খরাকলা খাউ।

ছোট বৌ - বিরিডা খাবো নি তাহলে। মুই সিপাইডার তানে চলে গেনু।

কালুয়া - চলে গেলো যা মুই খরাকলা খায়া লিনু পরে কি হোবে দেখা যাবে।

বড়বৌ - একটা মুই জিনিস দেখেচু দেখনোতে আয়।

কালুয়া - কিডাগে কি জিনিস।

বড়বৌ - দেখেচি দাদোডা আইসে না মাথা বান্ধিচে। এইতি তাহোইডা আসিছে এহ মাথা আর কান বান্ধিচে। দেখত মুখ কাহ বান্ধিচে না কি।

কালুয়া - ধেত তোর কাথালা কায় আর মুখ বান্ধিবে। সগায় মাথা আর কান বান্ধিচে।

বড়বৌ - দেখ দেখ উডা মুখ বান্ধিচে ঢবাডাংগাডার লাখা।

কালুয়া - কেনে বারে সগায় মাথা আর কান বান্ধিচে তমা আর মুখ বান্ধিচেন কেনে বারে।

বড়বৌ - কনেক খুলে দেখাও নাগে। সেনং হোলে হামারডার বান্ধিম।

সিপাহি - হামকো হাবা লাগতাহে ইসলিয়ে মুখ বান দিয়েহে।

বড় বৌ - হ্যা হ্যা তমহা কি মুখ খান মেলে রহচন হা করে তাতে হাবা ঢুকে চে কনেক খুলে দেখাও না। সেনং হলে হামারডার বান্ধে দিম। দেখাও খুলে (খুলে দিল) তাতে বারে হাবা ঢুকেচে। এ দেখ একটা চক্ষু উপরত একটা হেটত হেদেখ একখান দাড়ি উপরত একখান হেটত। মুখখান ব্যাকা তুই সনা কি পাপ করচিস পরমাত্মা তোক ব্যাকা করি বেনায় দিছে।

বড়বৌ - এই ও মোর বাপ কভায়নি। ভগবানের বেনা সগায়।

কালুয়া - হয় নাতে কভানি।

ছোট বৌ - এই গল্যা হোলো কি তুইহে হামার ভাল।

বৌয়ের কথা - এই ও মোর বাপ কেনে ডাকাইচিসতে

কালুয়া - ওই হামার রাজা লংকেশ্বর কলে আমাক খাল ডাংগালা কাটে সামান করবা হোবে। (প্রস্থান)

ডাক - সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য কোলে পার। দিনে দিনে রাবণ রাজার টুটে অহংকার

গান - আরে বোলো লংকারে রাবণ সাজেরে হে আরে লংকারে রাবণ সাজেরেহে।

(রাবণের প্রবেশ)

গান - ওরে তুইরে কাউহা কল কলাচি ঢেমনা ভাতারি পাইয়ারে। ঢেট কাউহা না, পাতি কাউহা। ওরে মোর নারীর মন জুড়াচে ঢেমনা ভাতার পাইয়ারে। ঢেট কাউহা না পাতি কাউহা।

রাবণ - ইহি সাহারথি আমার বাজিনিয়ারগণকে বিদাই কর বাফুরে।

সারথি - আইগা মহারাজ। আপনার যদি আইগা পাই। আপনার বাজিনিয়ারগণকে বিদাই করি মহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্বরে বিদাই কর বাফুরে। ইহি সাহারথি আমার জাগা বিস্তার কোথায় বাফুরে।

সারথি - আইগা মহারাজা আপনার জাগা বিস্তার পূর্ব ধারে মহারাজ।

রাবণ - ইহি সাহারথি আমার ভাই বিভীষন কে নিয়ে আস আমার গৌচরে।

সারথি - আইগা মহারাজা আপনার যদি আইগা পাই। তাহলে আপনারা ভাই বিভীষণকে সত্বরে আনি মহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্তরে যাও বাফুরে।

গান - বিভীষনকে আন যায়ারে একবার।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ - ইহি দাদা লংকেশর এত রাত্রে আমাকে কিজন্যে ডাকলেন দাদা লংকেশ্বর।

রাবণ - সে তুমি কে আইলে বাফুরে।

বিভীষণ - ইহি দাদা লংকেশ্বর সে তোমার বিভীষণ ভাই আইলাম, গো দাদা লংকেশ্বর।

রাবন - ওরে ভাইরে বিভীষণ। আইস আইস ভাই মোরে বস রত্ন সিংহা সনে ত্রিফুল তামাকু মোরে করহ ভক্ষনেরে ভাইরে বিভীষণ।

বিভীষণ - ইহি দাদা লংকেশ্বর বসিলাম বসিলাম তোরে রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু তোর করিলাম ভক্ষনে গো দাদা লংকেশ্বর। সে আমাকে কি জন্যে ডাকলেন গো দাদা লংকেশ্বর।

রাবণ - ওরে ভাইরে বিভীষণ ফুল তুলিতে গিয়াছিল ভগ্নী পঞ্চবটীর বনে। ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরাম ভাই অনুজ লক্ষ্মণে। সেই কোপে রামের সীতাক মুই করিচু হরণ। তোমাক যাইতে হবে বাপফু ওই বনেরে।

বিভীষণ - ইহি দাদা লংকেশ্বর অতি গর্বে পান্ডবের বনতে গমন। অতি গর্বে দুর্যধনের সবংশে মরণ। অতি গর্বে বালি রাজা পাতালে লিছে ঠাঁই। আমার কথাতে সীতাক নারাখিও ভাই। রামের সীতা রামকে দিয়া ভজহ চরণে। সুখে রাজ্য কর এসে এই লংকা পুরে গো দাদা লংকেশ্বর।

রাবণ - ওরে ভাইরে বিভীষণ। রাক্ষস হইয়া যে তুই কাঁপিস নরের ডরে। কি করিতে পারে আজি নর ও বানরে।

বিভীষণ - ইহি দাদা লংকেশ্বর রামের মহিমা দাদা চিনে কুন জন। এক অংশে চারি অংশ হইচে নারায়ণ। রামের মহিমা দাদা কে চিনিতে পারে। রামের সীতা রামকে দিয়া ভজহ চরণে। সুখে রাজ্য কর এসে এই লংকাপুরে গো। দাদা লংকেশ্বর।

রাবণ - ওরে ভাইরে বিভীষণ রাক্ষস হইয়া তুই কাপিস নরের ডরে। কি করিতে পারে আজি নর ও বানরে। রাক্ষস হইয়া তুই যে কাপিস নরের ডরে। দূর করিয়া দিব তোরে বুকে লাথি মেরে

বিভীষণ - ক্ষান্ত হও দাদা ক্ষান্ত হও। কুম্ভকর্ণ আদি যত বীরগণ। তাহাদের মারিবে শিরামের কপিগণ। উচিত কহিতে দাদা তুই মোর বুকে মালো লাথি। নিশ্চয় যামু দাদা ওই তপসিয়ার ভিতি গো দাদা লংকেশ্বর। ওগো দাদা লংকেশ্বর আজ থেকে তোমার ভাই বিভীষণ বিদাই গো দাদা লংকেশ্বর।

রাবণ - ইহি সারথি বিভীষণকে দূর কর যুক্তি হইলো সার। যুদ্ধ বিনা গতি নাই এ কিবিচার

সারথি - আইগা মহারাজা আপনার যদি আইগা পাই আপনার ভাই বিভীষণকে দূর করি মহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্তরে যাও বাপফুরে।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান রামকে বল গিয়া। যে রাবণের ভাই আমার নাম বিভীষণ। রামরে চরণে আমি লইব শরণরে।

হনুমান - ওরে রাক্ষস বিভীষণ তুমি থাক বাহার ভিতরা আমি যাই

বিভীষণ সে তুমি সত্তরে যাও বাপুফুরে।

হনুমান - ওগো প্রভু রঘুনাথ রাবণের ভাই বিভীষণ আইসচে আপুনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - ওরে বাছা হনুমান তাকে তিনটি সত্য করে নিয়ে আস আমার গৌচরে বাছা হনুমান।

হনুমান - ওগো বিভীষণ প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনটি সত্য খাইতে হোবে গো বিভীষণ,

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান প্রভুক যদি ভাড়েখাউ কলিযুগের রাজা হউ। প্রভুক যদি ভাড়েখাউ কলি যুগের ব্রাহ্মণ হউ। প্রভুক যদি ভাড়ে খাউ কলিযুগে আঠার ছুয়ার বাপ হউ। যাও তোমার প্রভুকে বল এই সত্য ঠিক হয়েছে কিনা বাপফুরে।

হনুমান - ওগো প্রভু রঘুনাথ বিভীষণ তিনটি সত্য খাইসে। সেই তিনটি সত্য আমার পছন্দ হয়নি গো প্রভু রঘুনাথ। প্রভুক যদি ভারে খাউ কলিযুগের রাজা হউ। প্রভুক যদি ভাড়েখাউ কলিযুগের ব্রাহ্মণ হউ। প্রভুক যদি ভাড়ে খাউ কলি যুগে আঠার ছুয়ার বাপ হউ।

রাম - ওরে বাপফু হনুমান বিভীষণকে নিয়ে আয় আমার গৌচরে বাপফু হনুমান।

হনুমান - ওগো বিভীষণ রামকে সাক্ষাতে করতে এখন যাইতে পারেন গো বিভীষণ।

(বিভীষণের গান রামের কাছে)

ওগো প্রভু বলি তোরে মুই চরণ ধইরে।

উদ্ধার কর রাক্ষস কুলেরগো প্রভু।

ওগো প্রভু রাঙ্গা চরণ দেহ মাথে।

আমি যাই বৌকুণ্ঠতে গো প্রভু।

ওগো প্রভু আমি তোমার সঙ্গে মিত্রালি করবো গো প্রভু রঘুনাথ।

(রামের সঙ্গে বিভীষণের মিত্রতা হয়েগেল এবং প্রস্থান)

রাবণ - ইহি -সাহারথি আমার স্বর্ণ লংকাপুরী কেন শব্দ করেরে।

সারথি - আইগা মহারাজা আপুনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হইতেছে মহারাজ। আপনার ভাই বিভীষণ রামের শরণ হইয়েছে। সেই জন্য আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হইতেছে মুহারাজ।

রাবণ - ইহি সারথি সে আমার ঘুটকারণ সুখসারণ বীরকে নিয়ে আস আমার গৌচরে।

সারথি - আইগা মহারাজা আপনার যদি আইগাপাই। আপনার ঘুটকারণ সুখসারণ বীরকে সত্তরে আনি মহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্তরে যাও বাপফুরে।

গান - ওইযে ভুবন পাইক তুই যারে ধায়ে ঘুটকারণকে আন যায়ারে একবার।

ঘুটকারণ ও সুখসারণ - আইগা মুহারাজা সে আমাকে কি জন্যে ডাকলেন গো।

রাবণ - ওরে ঘুটকারণ-সুখসারণ মোরে বীর। আইস আইস বীর সকলে মোর বৌস রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু মোরে করহ ভক্ষনরে।

রাবণ - ইহি সাহারথি সে আমার ইন্দ্রজিত পুত্রকে নিয়ে আস আমার গৌচরে।

সারথি - আইগা মুহারাজা আপুনার যদি আইগা পাই সে আমি সত্তরে আপুনার পুত্র ইন্দ্রজিতকে আনতে যাই মহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্তরে যাও বাপফুরে।

গান - ওইযে ভুবনপাইক তুই যারে ধায়ে ইন্দ্রজিতকে আন যায়া একবার।

ইন্দ্রজিৎ - ওগো পিতা লংকেশ্বর সে আপনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র আসিলাম গো পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ - ওরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ আইস আইস পুত্র তুই মোর বৈস রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণরে। (প্রস্থান)

(অঙ্গদের প্রবেশ)

গান - ওইযে দেখ দেখ পড়িয়া প্রভু বিপদে অঙ্গদ বলিয়া ডাকেরে ওহো। পড়িয়া প্রভু বিপদে রেহে অঙ্গদ বলিয়া ডাকেরে হে।

অঙ্গদ - ওগো প্রভু রঘুনাথ আপনার চরণে ভক্তি করি আমাকে আশীর্বাদ করগো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - ওরে অঙ্গদ যুবরাজরে অঙ্গদ যুবরাজ, অগ্নিতে না মরিস বাছা পানিত না যাইস তল।

তোর দেহাড়া হোক বজ্জর সমানরে অঙ্গদ যুবরাজ। রে অঙ্গদ যুবরাজ। ওরে অঙ্গদ যুবরাজ সুনহ বচন। লংকায় যায়া রাবণকে গালি দিয়া আইসহ এখন।

অঙ্গদ - ওগো প্রভু রঘুনাথ আপনার যদি আইগা পাই আমি এখনে লংকায় যাইগো প্রভু রঘুনাথ।

রাম - সে তুমি সত্বরে যাও বাপফুরে। (লংকাপুরীতে অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ - আরে তুইকে।

সুখসারণ - আমি রাবণ।

অঙ্গদ - আরে তুই কে।

রাবণ - আমি রাবণ।

অঙ্গদ - আরে তুই কে।

ইন্দ্রজিৎ - আমি রাবণ ।

অঙ্গদ - আরে সকলে রাবণ ভেশ নাহি একজনে। এক্ষণে বলিব কথা কুন রাবণের সনে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা। নিশ্চয় চিনিনু বেটা তুইহে ইন্দ্রজিৎ। আমি বলি সত্য করে কোহোরে ইন্দ্রজিতা। এইসব বসিয়াছে সবাই কি তোর পিতা। ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে। পুত্র হয়ে পিতার মূর্তি ধরিস কুন লাজে। ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে। এক যুবতী হয়া শতেক পতির ভাব কেমন করে রাখে রে।

ইন্দ্রজিৎ - ওরে বেটা বনের বানরা তোর দর্পে ইন্দ্রজিৎ না করিবে ডর। বাপক মারিয়া তোর মাক সুগ্রীব করিচে ঘর।

অঙ্গদ - আরে কুন বাপ তোর দিগ্বিজয় করিলো তিন লোকে। কুন বাপ তোর কথায় পরিচয় দে মোকে। কুন বাপ তোর চেরীর অন্ন খেয়েছিলো পাতালে। কুন বাপ তোর বান্ধা ছিলো অর্জ্জুনের অশ্ব শালে। কুন বাপ তোর যম জিনিতে গিয়াছিল দক্ষিণ। কুন বাপ তোর মান্ধাতারে দাঁতে করিলো ক্ষীণ। কুন বাপ তোর গিয়াছিলো ধনুক ভাঙ্গিতে। কুন বাপ তোর কৈলাশ তুলিতে। কুন বাপ তোর জব্দ হইল জমদিগ্নির তেজে। কুন বাপক তোর মোর বাপ বেন্ধেছিলে লেজে। একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা। এই সবারে কার্য নাই তোর নিজের বাপটি কথা।

ইন্দ্রজিৎ - ওরে বেটা বনের বানর তোর মুখে নাহি লাজ। যাহে তোর বাপক মারিচে তার কুলাইতে আইচিস কাজ।

অঙ্গদ - সূর্পনখা রান্ডি যারে করাইলো দীক্ষা দণ্ডকাননে সেতো মাঙ্গিয়া খায় ভিক্ষা। শঙ্খের কুন্ডল রত্ন বস্ত্র পইড়ে। ডুমুরি বাজায় ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে। সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই। এ সকলের কার্য নাই তো তোর নিজের বাপটিক চাই।

রাবণ - ওরে বেটা বনের বানরা। আমি তোরে বলি। কথা হোতে মরিবারে লংকাপুরে এলি। কে তোরে পাঠায় দিলো মরিবার তরে। বনের বানরা কেন রাক্ষসের ঘরে। কি নাম কাহার বেটা কুন দেশে বসিস। ভয় কি মারিবো নাই সত্য করে কহিস।

অঙ্গদ - এই দেখ লংকাপুরে রাম বেড়ালেক এসে। শ্রীরামের ডরে রাবণ কেন ঘরে রোহিস বসে। অরুণ নয়ান বরুণ অয়ান রামের সঙ্গে বাদ। বংশে কেহো না থাকিবে তোর মনে করিস সাধ। রামকে বলি গিয়া ইহা না করিলে নয়। সেতু বন্ধন ভেঙ্গে দেয় যেন দন্ড চারি ছয়। যা বলিলে তা করিতে মুসকিল কি আছে। যেইখানে পর্বত ছিলো যাবো তার কাছে।

রাবণ - কি বলিলি বানরারে লঙ্কাপুরে এসে। বুঝিবা রামের ডরে তুই ঘরে রোহিস বসে। এনেছি রামের সীতা বলে করে হরে। করুক এসে রাম তপসিৎ প্রাণে যত পারে। সুমেরু পর্বত যদি মক্ষিকায় নারে। সতী যে রমণী তার নিজ পতি ছাড়ে। গরুড়ের ধন যদি হরে লয় কাকে। খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে। খদ্যোদ উদয় যদি চন্দ্র হয় পাত। রাবণ জিয়ও সীতাক নিতে নারিবে রঘুনাথ। বল গিয়া বানরাবে তোর রঘুনাথে। সেতু বন্ধন ভেঙ্গে দেয় যেন আপনার হাতে। যেইখ্যানে পর্বত ছিলো যাবে তার কাছে। উপারিলো যত বৃক্ষ পুনরায় তা রোপে। বিভীষণ বেন্ধে এনে দিবি মোর কাছে। বুঝে পরে শাস্তি সব মনে যত আছে। নির্মাইয়া দিব লংকা যত গেছে পড়া। সূর্পনখার নাক কান কিসে যাবে জড়া রে।

অঙ্গদ - ওরে রাবণ হনু এসেছিলো হেথা। বলেছি লো খুড়া তারে গোটা চারি কথা। যাও লঙ্কায় হনুমান পবনকুমার। পালন করিয়া কথা আইসহ আমার। কুম্ভকর্ণের মাথাটা আনিবে চিরে। সাগরের জলে লংকা ফেলিবে উপারে। অশোকবনের সহিত সীতা আনিবে মাথায় করে। বাম হস্তে আনিবি রাবণের জটা ধরে। পাঠায় ছিলো খুড়া তারে চারি কার্যের তরে। চারি কার্যের এক কার্য কিছুই নাহি করে। কোপেতে সুগ্রীব রাজা কাটিতে ছিলো তায়। যত সব কর্পি ধরে রেখে ছিলো তার পায়। অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর। সুগ্রীবেরে আইগা দিলো না মার বানর। না মারে বানর শুনিয়া তার কথা। দূর করে দিলো

তারে মুরাইয়া মাথা। কুন দেশে পলাইলে আছে কিবা নাই। তার তদন্ত করিয়া মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই।

রাবণ - ওরে বেটা বনের বানরা ধিক জীবন তোর। বনের বানর হয়ে হলি মানুষের নফোর। পুত্র হয়ে তুই তার কুন কর্ম করিলি। বাপক মারিয়া তোর মাওক বিলাইলি। ওরে বেটা বনের বানরা তোর মুখে পোড়োক ছাই। আমার জন্যে দুঃখ পেয়ে মরিবি কেন ভাই। আমার তরে তোরা কেন ধরিবি রামের পায়। যুদ্ধ করে মরিব আমি তোর বাপের কিনা দায় রে।

রাবণ - হি উপদেশ বলি শুনরে বেটা গরু। তুই বাঁচিলে তোর বাপের কৃতি কল্পতরু। নইলে তারে মারিবেক শ্রাদ্ধ করে বালি। লোকেবলে এই বেটাকে বেন্ধে ছিলো বালি। পরে কিনা পরে মনে হইলো অনেক দিন। ভেবে দেখ হস্তে গলায় আছে লেজের চিন।

অঙ্গদ - বলি ওরে রাবণ, পরকে দিস খটা। সত্য করে বল দেখি তুই কাহার বেটা। ব্রহ্ম অংশে জন্ম তোর ত্রিভুবনে ক্ষেতি। বিশাসর্বার বেটা তুই পৌলস্তের নাতি। বিশাসর্বা মহা তপা বিশ্ব যার যশ। তুই যদি তাহার বেটা তবে কেন হয়েছিস রাক্ষস। মাও তোর রাক্ষসী ব্রাহ্মন তোর পিতা। তুই কেন বিহা করিলি দানব দুহিতা। রম্ভাবতী সতী যেন শ্বশুর বোলে তোরে। বলাকার করিলি বেটা পর্বতের ঝরে। তুই অতি দুরাচারী, হরিলি পরার নারী, নরলোকে নাহি তোর ভয়, দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা, শিরাম যে তাহার তনয়। যাহার দুর্জয় বাণ, হরে বিশ্ব কম্পমান, হেন রাম লংকার ভিতর। শুন রাজা লঙ্কেশ্বর, আমার বচন ধর, আইলাম দিতে সমাচার। শিরাম সাগর পার, নিস্তার নাহিক আর, সেই সকল হইল বিধাতার। রাজা হয়ে পরোদ্ধার, করিলিরে দুরাচার, যুদ্ধ মাত্র নাহি তোরে ঘটে। কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিলিরে পুরন্দরে, রাম নামে তোর বল টুটে। তোরে এক লাথি মারি, কাপাইম্ লংকাপুরী, কি করিবে তোর ইন্দ্রজিতে। মস্ক মাঙ্গ তোর ঠাঁই, ইহা বিনা গতি নাই, তবে তোর রোহিবে জীবন। মুকুট লইয়া যামু রামের সিংহাসনে। প্রসন্ন হইবে রাম ইহা দরশনে।

(অঙ্গদের রামের কাছে গমন) (প্রস্থান)

অঙ্গদ - ওগো প্রভু রঘুনাথ তোমার আইগা পেয়ে, লংকায় গেলাম ধেয়ে, প্রবেশিনু গড়ের ভিতর। সর্বক্ষণ আওয়াজ, জেন চন্দ্র পরকাশ, দেখি সবে পর্বত প্রমান। বিশ্বকর্মার কৃতি ঘর, দেখি অতি মনহর, চারি ভিতি কাঞ্চন দেওয়াল। সেতু রক্ত নীল তাহে দেখি রতন

মিশাল, সোনার খাটের পোরা, নানা বর্ণ দেখি ঘরা, হস্তী সকল পর্বত প্রমাণ। দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন, দ্বিকর্ণে রত্নের কুন্ডল। পারিজাত মালা হারে, তাহে নানা অলংকারে, যেন চন্দ্র গগন মন্ডল। নানা আভরণ পরি, যেন সর্গের বিদ্যাধরী, রূপে মোহে দেব অবতার। দেখিলাম পুষ্পক বন, ময়ূরা ময়ূরী গান, কেলি করে মধু কামরসে। কমুদর কুসুম পরে, কেলি করে মধু করে, রূপসী রাক্ষসী করে স্নান। যতেক কহিসন তুমি, দ্বিগুন শুনাইলাম আমি, কোপে জ্বলে রাজা লংকেশ্বর চারি জনে সংহারিয়া, রাবণকে গালি দিয়া, পথে আইনু সত্তর। গো প্রভু রঘুনাথ। (প্রস্থান)

রাবণ - ইহি পুত্র মোরে ইন্দ্রজিত সপ্ত স্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল। মম ডরে দেবগন কাঁপে সদাকাল। ইন্দ্র চন্দ্র যম ডরে নাহি আশে। এত দূর আসিয়া বানর বেটা বসে। সাবধান হইয়া বাফু কর গিয়া রণ। আগে মারো অঙ্গদেরে শেষে অন্যজন।

ইন্দ্রজিৎ - ওগো পিতা লংকেশ্বর আপনার যদি আইগা পাই অতি সত্বরে আমি যুদ্ধে যাই গো পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ - সে তুমি সত্বরে যাও বাপুর।

ইন্দ্রজিৎ - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ইন্দ্রজিৎ নাম আমার জানে সর্বজনে। ইন্দ্র আদি কাঁপে আমারে দেখিলে এইবার যাত্রা করিব আমি তপসিয়ার বনে। হে হে তপসিয়ার বনে যাবার আগে একবার অগ্নিদেবের সাধনা করে দেখি। ওং শান্তি অগ্নিদেবায় নমঃ ওং শান্তি অগ্নিদেবায় নমঃ ওং শান্তি অগ্নিদেবায় নমঃ। কে কে মম সন্মুখে।

অগ্নিদেব - ইন্দ্রজিৎ তোমার সাধনার দেবতা।

ইন্দ্রজিৎ - তহে মম সাধনার দেবতা। মম সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে এসেছে মোরে বর দিতে। দাও প্রভু মোরে বর। মারিতে পারি যেন নর ও বানর।

অগ্নিদেব - ইন্দ্রজিৎ হেন বর চাহ অকারণ। কেমনে মারিবে রাম তিনি নারায়ণ। স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন রাম অবতার রাবণের সবংশে করিতে সংহার

ইন্দ্রজিৎ - হেন বর নাহি দেবে মোরে। পারি যেন করিতে জয় নর ও বানরে। চলে যাও মোর সনমুখ হইতে।

অগ্নিদেব - ওরে ইন্দ্রজিৎ তোর এত অহংকার। নর বানরের হস্তে তোর নাহিক নিস্তার। হেন বর নাহি দিব তোরে। পারিবে না করিতে জয় নর ও বানরে। আর যজ্ঞত সভায় দেখা নাহি দিব তোরে। যাবার আগে বলে যাই তোরে।

ইন্দ্রজিৎ - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ অগ্নিদেব কহিল মোরে আর যজ্ঞ দেখা নাহি দেবে মোরে। দেখি দেখি হেন মন্ত্রে ডাকিব তোমায়। আসিতে হোবে মোর যজ্ঞৎ সভায়। দেখি অগ্নিদেব আসে কিনা মোর যজ্ঞৎ সভায়। ওম শান্তি ওম শান্তি অগ্নিদেবায় নমঃ ওম শান্তি ওম শান্তি অগ্নিদেবায় নমঃ ওম শান্তি ওম শান্তি অগ্নিদেবায় নমঃ

অগ্নিদেব - ওরে ইন্দ্রজিৎ তপস্যা খমহ। সনতুষ্ট হয়েছি বাপু বর চাহি লহ।

ইন্দ্রজিৎ - হে মম সাধনার দেবতা সনতুষ্ট হয়ে এসেছ মোরে বর দিতে। দাও দাও প্রভু মোরে হেন বর মারিতে পারি যেন নর ও বানর।

অগ্নিদেব - ওরে ইন্দ্রজিৎ এই বর ছাড়। কি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চাহিলে কি স্বর্গের বিদ্যাধরি চাহিলে আমি এক্ষণে দিতে পারি।

ইন্দ্রজিৎ - ওগো সাধনার দেবতা অন্য বরের মোর নাহি প্রয়জন। স্বর্গের বিদ্যাধারীর মোর নাহি প্রয়োজন। দাও মোরে হেন বর মারিতে পারি নর ও বানর।

অগ্নিদেব - ওরে ইন্দ্রজিৎ তোর এত অহংকার। আর যজ্ঞ দেখা নাহি হোবে আর। ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ পরে মোর কথা করিবে স্মরণ। লক্ষ্মণের হাতে তোর অবশ্যই মরণ।

ইন্দ্রজিৎ - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ অগ্নিদেব কহিলে মোরে লক্ষ্মণের হাতে মোর অবশ্যই মরণ। দেখি দেখি ছল বলে কৌশলে আমি নর বানরে করিব পতন। কথায় বিদ্যুতজিহ্বা।

বিদ্যুতজিহ্বা - যথা আহগা মুহারাজ।

ইন্দ্রজিৎ - শুন বিদ্যতজিম্ভা নানা মায়া ধারী। মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী। জনক নন্দিনী যেরূপ ধরে। সেইরূপে মায়া সীতা নির্মানি করে দাও মোরে। যাও অতি শীঘ্র মায়া সীতা নির্মাণ কর গিয়া।

বিদ্যুতজিহ্বা - শুন মায়া সীতা আমার বচন। শিরাম তোমার স্বামী দেবর লক্ষ্মণ। দশরথ তোমার শ্বশুর জনক তোমার বাপ। রাবণ হরিল তোরে পেয়ে বড় তাপ। ইন্দ্রজিত রথে যখন তুলিবে তোমায়। রাম রাম শব্দে তুমি করিও রোদন। এই নাও মহারাজ আপনার মায়া সীতা।

ইন্দ্রজিৎ - ধন্য ধন্য বিদ্যুতজিহ্বা তোমার মন্ত্র শক্তি। সেই চোখ সেইনাক সেই রূপ সেইরূপে তৈরী করেছ মায়া সীতা ধন্য বিদ্যুতজিহ্বা এই নাও তোমার পুরস্কার। চল মায়া সীতা মোর সনে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ এই মায়া সীতা কাটিম রামের সন্মুখে। এই সীতার শোকে রামের হইবে মরণ। রাম মরিলে মরিবে লক্ষ্মণ। পলাইবে সুগ্রীব গণিয়া প্রমাদ। বিনা

যুদ্ধে রামের সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ। চল মায়া সীতা রণস্থলে।

মায়া সীতা - বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও কে আছ কথায় হায় রাম কি করিলে ফেলাইলে বিপদতে

ইন্দ্রজিৎ - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কে বাঁচাবে তোরে, আমি তোমার রাম, আমি তোমার লক্ষ্মণ, আমি তোমার পরাণ। হে-হে আর বিলম্বের নাহি প্রয়জন অবিলম্বে মায়া সীতা দিয়ে যাই বলিদান। জয় জয় জয় মা চন্ডির জয়।

(হনুমানের সম্মুখে বলি দেওয়া হল)

ইন্দ্রজিৎ - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ এই সীতার শোকে রামের হইবে মরণ। রাম মরিলে মরিবে অবশ্যই লক্ষ্মণ। পলাইবে সুগ্রীব গণিয়া প্রমাদ। বিনা যুদ্ধে রামের সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ। ওরে বনের বানর এ খবর জানাও তোমার রঘুনাথে।

(হনুমান সীতার কাটা মুন্ড নিয়ে রামের কাছে প্রস্থান)

ইন্দ্রজিৎ - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ এইবার করিব আমি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পুর্ণ হলে পরে কার সাধ্য আছে আমায় মারিতে পারে। একবার করে দেখি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে। ওম শান্তি মাতা নিকুম্ভিলায় নমঃ। ওম শান্তি মাতা নিকুম্ভিলায় নমঃ। ওম শান্তি মাতা নিকুম্ভিলায় নমঃ। (বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও হনুমান এর যজ্ঞ কুন্ডে প্রবেশ)

বিভীষণ - এই দেখ দেখি গসাই ঠাকুর লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করে হয়ে একমন। মেঘবর্ণ বসে আছে বটবৃক্ষ তলে। ইন্দ্রজিতার যজ্ঞ ভঙ্গ করহ এক্ষণে।

ইন্দ্রজিৎ - একি কে যজ্ঞ কালে মোরে দিলো বাঁধা। একি খুড়া বিভীষণ।

বিভীষণ - হে হে খুড়া বিভীষণ

ইন্দ্রজিৎ - ধর্মেতে ধার্মিক তুমি সর্বলোকে জানে। পিতার মতন সেবা করি সবে মিলে। পিতার মতন তুমি পিতৃ সহোদর। পিতার মতন সেবা করি যে বিস্তর। রাক্ষস কুল ছেড়ে খুড়া আশ্রয় মানুষে। কেন তাহে আসিয়াছো আমায় মারিতে।

বিভীষণ - ওরে বেটা ইন্দ্রজিৎ তুই বলিস বিপরীত। ভাল মতে জান বাপফু আমার যে রীত। রাক্ষস কুলে জন্ম তোর নাহিক কদাচার। পর দ্রব্য না লই না করি পরদার। চৌদ্দহাজার দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে। এত স্ত্রী থাকিতে কি তবু পরদার করে। হরেছে অনেক নারী তপের তপসিনী। শাপ গালি পাড়ে তবু না ছারে কামিনী। নিকটে মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিৎ লংকা ছেড়ে সবাই পালাও তড়িত।

ইন্দ্রজিৎ - খাইলেক রাক্ষস কুল হইয়া নিষ্ঠুর। তোমাক দোখলে পাপ হয় প্রচুর। ভ্রাতৃ পুত্র মারিয়া খান্ত নাহি মন। দিয়াছ সন্ধান তুমি আমার মরণ। অন্য বীর নহি আমি নামে মেঘনাদ। এক বানে সবাকারে করিব বিনাশ। তবে ধর অস্ত্র কর রন বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

বিভীষণ - তবে ধর যুদ্ধ এই দেখ তোমার এই লক্ষ্মণের হাতে মৃতু।

লক্ষ্মণ - কত বাণ জান বেটা কত আছে শিক্ষা। আজি কার বাণে তোর মৃত্যু আছে লেখা তবে ধর অস্ত্র। (যুদ্ধ শুরু)

ইন্দ্রজিৎ - একি একি খুড়া অমিয়ে নিরস্ত্র খুড়া। একখানা অস্ত্র দাও। খুড়া আমায় একখানা অস্ত্র দাও।

বিভীষণ - এইয়ে তোমার অস্ত্র (ইন্দ্রজিতের মৃত্যু) (রাবণের প্রবেশ)

রাবণ - ইহি সাহারথি সে আমায় লংকপুরী কি জন্যে শব্দ করেরে।

সারথি - আইগা মহারাজ' আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হবে না মহারাজ। আপনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র মার' পড়িয়াছে। আপনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র মারা পড়িয়াছে সেই জন্য আপনার লংকাপুরী শব্দ করিতেছে মহারাজ

রাবণ - ইহি সাহারথি সে আমার পুত্র তরণীকে নিয়ে আসরে।

সারথি - আইগা মহারাজ' আপনার যদি আইগা পাই আপুনার তরণী পুত্রকে সত্বরে আনতে যাই মহারাজ।

রাবণ - সে তুমি সত্বরে যাও বাপফুরে।

গান - ওইয়ে ভুবন পাইক তুই যারে ধায়ে তরণীকে আন যায়ারে একবার।

তরণী - ওগো পিতা লঙ্কেশ্বর সে আমায় কি জন্যে ডাকলেন গো পিতা লঙ্কেশ্বর।

রাবণ - ওরে পুত্র মোরে তরণী আইস আইস পুত্রমোরে বইস রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণে পুত্র মোরে তরণী।

তরণী - ওগো পিতা লংকেশ্বর বসিলাম বসিলাম পিতা রত্ন সিংহাসনে। ত্রিফুল তামাকু তোর করিলাম ভক্ষণে গো পিতা লংকেশ্বর। সে আমাকে কি জন্যে ডাকলেন গো পিতা লঙ্কেশ্বর।

রাবণ - ইহি পুত্র মোরে তরণী শুনহ পুত্র তুই মোর দুঃখের কাহিনী। তর পিতা বিভীষণ ধর্মে ততপর হিত উপদেশ কত বুঝাইল বিস্তর। আমারে ছাড়িয়া ভাই বিভীষণ অনুরাগে লিয়াছে রামের শরণ। শত্রুর সন্মুখে আছে তব পিতে। মজিলেক কনক লঙ্কা তার মন্ত্রণাতে।

তরণী - ওগো পিতা লঙ্কেশ্বর ত্রিলোক বিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ। মহাগুরু পিতা মাতা সর্বশাস্ত্রে কয়। কহিতে পিতার কথা উচিত নাহি হয় গো পিতা লংকেশ্বর

রাবণ - ইহি পুত্র মোরে তরণী। রাক্ষস কুলের তুই হয়েছিস সুসন্তান। নর বানর মারিয়া রাখ আমার সন্মান।

তরণী - নানা জাতি শাস্ত্রে পুরাণে এই কয়। শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়। আপনার যদি আইগা পাই রণক্ষেত্রে অবিলম্বে ছুটে যাই গো পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ - ইহি পুত্র মোরে তরণী সে তুমি সত্বরে যাও বাপফুরে।

সরমা - তরণী - তরণী - তরণী - সে তুমি কথায় আগমন করিতেছো পুত্র।

তরণী - ওগো মাতা নিবেদি চরণে হয়েছে রাজার আদেশ মাগো আমি যাবো রণে। পুর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে। পবিত্র হইবে দেহ আমার রাম দরশনে। নিজের চোক্ষে দেখিতে পাইব জনকের কমল চরণ। দাও অনুমতি মাগো যাই বর্ণ পথ। আমায় হাসি মুখে বিদাই দাও মাগো।

সরমা - কি কথা শুনালে পুত্র প্রাণ কাঁপে শুনে। যেতে নাহি দিব তোকে নর বানরের রণে। দুরাত্মা রাক্ষসের ঘরে করিতে সংহার। জনমিলো দশরথের ঘরে রাম বিষ্ণু অবতার।

তরণী - ওগো মাতা শুনহ জননী বিষ্ণু অবতার রাম আমি ভালো জানি। তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নিয্যাস। মরিলে রামের হাতে মাগো গোলোকে নিবাস। শুনিয়াছি সর্বশাস্ত্রে বেদের লিখন। তুমি মাতা সর্বদা ভেবেছ কি কারণ। কেবা কারে মারিতে পারে। কেবা কার রিপু এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্য ভিন্য বপু। দাসের সন্তান বলে না মারিবে রাম। ফিরে আসিয়া মাগো তোমায় চরণে করিব প্রনাম। যাবার কালে আমায় হাসি মুখে বিদাই দাও মাগো। (তরণীর যুদ্ধে গমন)

তরণী - আমি চাই যুদ্ধ আমি চাই যুদ্ধ কথায় সে রাম চন্দ্র। (রামকে দেখে) তুমি সেইরাম তুমি সেই বিষ্ণু তুমি সেই মহেশ্বর। কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর। তুমি সেই চন্দ্র তুমি সেই সূর্য তুমি সেই দিবারাতি অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি। ওম বিষ্ণু নররূপী নারায়ণ নময় নমস্তুতেঃ তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয় সত্য রজ ত ম গুনে তুমি বিশ্বময়। মহেশ কুম্ভ বরাহ মীন রূপধারী। হিরণ্যকশিপু গোলোক বিহারী। কি জানি ভক্তি শক্তি আমি অতি মূঢ়। শুনিতে না পার চরাচর চন্দ্রচূড় রাখহে কান্ডারী বেকার বিহনে দিন যায় অনাথের নাথ। বহু যুগা যুগান্তরে মেনেছি অসাধ্য। জেনেছি রাক্ষস কুল নহে তব বধ্য।

আশীর্বাদ করহ তুমি স্বর্গজীবী হই যেন আমি।

রাম - আশীর্বাদ করিলাম আমি স্বর্গ জীবী হও তুমি।

তরণী - আমার বচন শুনে সন্তুষ্ট হয় রঘুবীর অস্ত্রবুঝি না পড়িবে আমার উপর। কেমনে রাক্ষস দেহ হইবে উদ্ধার। যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ না দেখি আর। কেমনে বুঝিলে রাম না করিব রণ। এক্ষণে পাঠাব তোরে যমের ভুবন। তবে ধর যুদ্ধ বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

(যুদ্ধে তরণী বধ) (প্রস্থান)

রাবণ - ইহি সাহারথি সে আমার স্বর্ণ লংকাপুরী কি জন্যে শব্দ করেরে।

সারথি - আইগা মহারাজা আপুনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হবেনা মহারাজ। সে আপনার তরণী পুত্র মারা পড়িয়াছে সেই জন্য আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হইতেছে মহরাজ।

রাবণ - এই কি শুনিলাম তোমার মুখে। বজ্র ভেঙ্গে পরে আমার মস্তকে। প্রাণ মোর অগ্নিহেন জ্বলে। আহা পুত্র ইন্দ্রজিৎ গেলি কোথা রারে। সন্মুখ সংগ্রামে এইবার পাঠাইব কারে। কথায় মামা কালনেমি।

কালনেমি - ওরে বাপফু রাবণ তোমার এত ডাকাহাকা কিসের বাপফুরে।

রাবণ - শুন মামা ধরি দুই চরণ। আজি রণে ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে। মরিবে তপসিবেটা যে রাত্রি পোহাইলে। যেমতে বানর বেটা ঔসধ না পায়। হেন যুক্তি কর মামা বিলম্ব নাহি সয়।

কালনেমি - ওরে রাবণ মায়া যুক্তি করে যদি যাই চিনে হনুমান। এক চাপরে বেটা বধিবে পরান। বানর প্রধান বেটা বুদ্ধে বড় শঠ। কেমনে যাইব বল তাহার নিকট। যত যুক্তি কর বাপু সব যুক্তি মিছে। কোন যুক্তি না খাটিবে বাপু ঘরপোড়ার কাছে।

রাবণ - শুন মামা এত ভয় কেন তারে। যুক্তি করে যাও যাতে চিনতেনা পারে। শুন মামা না হও চিন্তিত। হেন যুক্তি কর মামা মরিবে নিশ্চিত। গন্ধমাধবের আমি সব সন্ধি জানি। গন্ধ কালি নামে এক আছে কুম্ভরিনী। সরবরে পরে থাকে গন্ধমাধবেতে। কেহো নাহি যায় তার সরবরের নিকটে। লক্ষলক্ষ প্রাণি বোধ হইলো তার পেটে। সহজে বানর জাতি বীর হনুমান। গন্ধমাধবের এত না জানে সন্ধান। মায়া করি রাখ মামা যত ফুল ফল। কলসি ভরিয়া রাখ সুবাসিত জল। ওর আগে যাও মামা তপসির ভেশে আদর গৌরব করে তুষিবে তাহারে। নানা মতে হনুমানে করিবে আদর। স্নানহেতু পাঠাইবে সেই সরবর। অল্প বুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি। সরবরে গেলে ধরে খাবে কুম্ভীরিনী। ধরিয়া

খাইতে পবন নন্দনে। হনুমান মরিলে ঔষধ আনিবে কুন জনে। রাম মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে। পলাইবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে। হেন কাজ সাধিয়া মামা আস মোর আগে। লংকার অর্ধেক রাজ্য মামা দিব যে তোমাকে।

কালনেমি - ওরে বাপফু মরিবারে পাঠাও তুমি হনুমান আগে আমি যদি মরিয়া যাই। তাহলে কে লইবে তোমার কাছ হইতে লংকার অর্ধখানি বাপফুরে।

রাবণ - মামা যাবে না বধিতে হনুমান। এই অস্ত্র দিয়ে তোমার বধিব পরান।

কালনেমি - ক্ষান্ত হও তুমি ক্ষান্ত হও তুমিই মার আর হনুই মারুক আমার অবশ্যও মরণ। সে আমি চলিলাম এখন সেই গন্ধমাধন। (প্রস্থান)

কালনেমি - রাম রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম জয় জয় জয় জয় রাম রাম ।

হনুমান - ওগো গসাই তোমার শ্রীচরণে প্রণাম।

কালনেমি - ওরে বাপফু হনুমান শুনহ বচন। অতিথি হয়েছ বাপফু বরই মঙ্গল। স্নান করে আস বাপফু খাও ফুল ফল।

হনুমান - ওগো গসাই তুমি না জান কারণ। কোন মুখে খাব ফল নাহি লয় মন। দশরথ নামে রাজা জন্ম সুর্য বংশে। সত্য পালিতে দুই পুত্র দিলেন বনবাসে। পালিতে পিতার সত্য এসেছেন বন। দোসোরত লক্ষ্মণ বীর সীতা সুন্দরী। শূন্য ঘরে পেয়ে রাবণ বেটা করিলেন চুরী। বানর সহায় রাম বান্ধিল সাগর সবাই গেল লংকার ভিতর। সীতা লাগি রাম রাবণে বাজে রণ। রাবণের শেলে পরিয়া আছে ঠাকুর লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ বীর পড়িয়াছে রাবণের শেলে। প্রাণ দান পাবে লক্ষ্মণ ঔষধ নিয়ে গেলে। ফল মুল শিরে রাখহ আপনি। ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরনী।

কালনেমি - ওরে বাপফু হনুমান আশ্রমে আসিয়া কেহ যদি করে উপবাস। সব তপ যপ নষ্ট হয় সকলি বিনাশ। এই দেখ সরবর তপসার বরে। নামিয়া করহ স্নান ঘুচুক বিষাদে। কেহ যদি পান করে ওর এক কুন্ডালি পানি এক বৎসর খুধা তৃষ্ণা কিছুইনা জানি। যাও বাপফু তুমি স্নান করে এসো। (হনুমান স্নান করতে গেল কুম্ভারিনীকে শাপ থেকে মুক্তি করে)

হনুমান - একি কুম্ভীরিণী ছিলে তুমি এই সরবরে। কিবা নাম ধর মাগো পরিচয় দাও মোরে।

কুম্ভীরিণী - দেব কন্যা ছিলাম আমি নামে গন্ধ কালী। দেবতার বাড়ি বাড়ি করি নৃত্য কেলি। কুবের নিবাসে যাই নৃত্য গিত রঙ্গে। ঠেকিল আমার শাড়ী দক্ষ মুনির অঙ্গে। পথে মুনি তপকরে নাম তার দক্ষ। কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই শক্ত।না হইবে খন্ডন শাপ দিল মুনি।

গন্ধমাধবেতে হয়া থাক কুম্ভীরিণী। লক্ষ লক্ষ প্রানি মেরে বারিবেক পাপ। হনুমানেরে হাতে তোর মুক্তি হবে শাপ। হইবেন নারায়ণ রাম অবতার। তাহার সেবকের হাতে তোমার নিস্তার। চিরজীবি হয়ে থাক সাধ রামের কাজ। তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ আর এক কথা বলি শুন হনুমান। ভন্ড তপসীর কাছে হইও সাবধান।

(হনুমানের দেরি দেখে মনে মনে কালনেমি ভাবে)

কালনেমি - এখন আমি করি অনুমান। কুম্ভীরিণী ধরিয়া খাইয়াছে হনুমান। এখন আমি যাবো রাবণ গৌচর। লংকার অর্ধখানি লইব সত্বর। দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর পশ্চিমে। সাগরের বাদ যদি ভেঙ্গে যায়। রাবেণেরে দিব আমি ভাগে যতপায়। অশ্ব হস্তী সৈন্য। যত ভান্ডারের ধন। তার অর্ধ লইব আমি করিয়া যতন। নারী গণের মধ্যে আছে স্বর্গের বিদ্যাধরি। তার অর্ধ লইব আমি যে ভাগে মন্দোদরীরে সে আমি এদিক ওদিক লইবনা বাপফুরে।

হনুমান - ওরে বেটা ভন্ড তপসী পড়েছিস মোর হাতে যাবে যমপাশে।

কালনেমি - ওরে বেটা বানর তোরে পশু মধ্যে গণি. ত্রিভুবনে নাম মোর নাম কালনেমি । তবে ধর অস্ত্র। (প্রস্থান)

রাবণ - একি কালনেমিরে বধিয়াছে বীর হনুমান এখন পাঠাব কারে তপসিয়ার রনে। কি করিব কথায় যাব ভেবে কিছু পাইনা। এইবার দেবগণ নিয়ে করিব মন্ত্রণা। কথায় সূর্যদেব

সূর্যদেব - আদেশ করুন মহারাজ।

রাবণ - শুন সূর্যদেব আজি রণে ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে। মরিবে তপসী বেটা যে রাত্রি পোহাইলে। তুমি উদয় হও লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের শোকে রাম তেজিবে জীবন। যাও আর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

সূর্যদেব - একি মহারাজ অসম্ভব কথা। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইলো গগন। এক্ষণে উদয় আমি হইব কেমন

রাবণ - শুন সূর্যদেব হোক রাতি ক্ষতি কি তোমার। মনে বুঝি কুশল চিন্তা আমার।

সূর্যদেব - মহারাজ পারিবনা করিতে হেন কাজ। তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে কি দিব জবাব।

রাবণ - কি যাবে না বধিতে সূর্যদেব। এই অস্ত্র দিয়ে তোমায় পাঠাব যমলোক।

সূর্যদেব - আপনার আদেশ শিরধার্য্য মহারাজ। উদয় হইতে গেলাম উদয়গিরি পর্বত। পড়েছি মহা বিপদে উদয় হইতে যাই উদয়গিরি পর্বতে।

হনুমান - (হনুমান পথ আগলে ধরে)

সূর্যদেব - সে তুমি কে ছেড়ে দেহ পথ। উদয় হইতে যাই উদয় গিরি পর্বত।

হনুমান - আমি শিরামের দূত পবন নন্দন নাম হনুমান।

সূর্যদেব - আমি সূর্যদেব ছেড়ে দেহ পথ। উদয় হইতে যাবো উদয় গিরি পর্বত। বড় যুদ্ধ হয়েছে আজি কার বনে। পরেছে লক্ষ্মণ বীর শক্তিশেল বাণে। রজনী প্রভাত হইলে মরিবে লক্ষ্মণ। উদয় হইতে মোরে পাঠাইলো রাবণ।

হনুমান - শুন সূর্যদেব কর অবধান। সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ। রাবনের অনুরোধে যাবে যদি চলে। রথ সহ ডুবামুতোর সাগরের জলে।

সূর্যদেব - ওরে দেবগণ করি রামের কল্যাণ। দেবতার নিস্তার ভাবি এই ভয়ে। ভয়ের চোটে এলাম হোতে উদয়। শিরামের অনুরোধ ফিরে যদি যাই। রাবণের হাতে বল রক্ষা কিসে পাই।

হনুমান - শুন সূর্যদেব তব নাম ভানু। মমনাম হনু। নামে নামে মিলিয়াছি মিতার সমান। দুইদিকে রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি। হনু আর দুইজনে করিম মিত্রালী। (মিত্রালী করার সময় সূর্যকে হনুমান কর্ণে বন্ধ করিলেন)

হনুমান - জয় শ্রী রাম জয় শ্রীরাম।

রাবণ - ইহি সারথি সে আমার স্বর্ণ লংকাপুরি কেন শব্দ করেরে।

সারথি - আইগা মহারাজা আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হবে না মহারাজ। আপনার মামা কালনেমি হনুর হাতে মারা পড়িয়াছে। আর সূর্যদেব হনুমানের কাছে বন্দি হইয়াছে। সেই জন্য আপনার স্বর্ণলংকাপুরী শব্দ হইতেছে মহারাজ।

রাবণ - ইহি সারথি সে আমার পুত্র মহিকে নিয়ে আস আমার গৌচরে।

সারথি - আইগা মহারাজ। আপনার যদি আমি আইগা পাই তাহলে অতি সত্বরে আপনার পুত্র মহিকে আনতে যাই মহারাজ। সে তুমি অতি সত্বরে যাও বাপফুরে ।

গান - ওই মহি সাজে মহি সাজে মেদেনি কাঁপে রে। ওইযে সাজিলোরে মহি রাবণ মোর রাবণের নন্দন মহি ঐ। সাজিলোরে মহিরাবণ মোর দুর্জয়ে রাক্ষস মহি ঐ। সাজিলোরে মহি রাবণ মোর হাতে লয়।

মহি - ওগো পিতা লংকেশ্বর সে তোমার মহি পুত্র আইলাম গো পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ - ইহি পুত্র মোরে মহি আইস আইস পুত্র যে তুই মোর বস রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু মোর করহ ভক্ষণের

মহি - ওগো পিতা লংকেশ্বর বসিলাম বসিলাম পিতা তোমার রত্ন সিংহাসনে ত্রিফুল তামাকু তোর করিলাম ভক্ষণে গো পিতা লংকেশ্বর। সে আমাকে কেন ডাকলেন গো পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ - ইহি পুত্র মোরে মহি। শুনহ পুত্র যে তুই মোর দুঃখের কাহিনী। সূর্পণখা তব পিসী যে আমার ভগিনী হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক কান। কেমনে সহিব বল এত অপমানরে।

মহি - ওগো পিতা লংকেশ্বর কহ কহ পিতা শুনি বিবরণ। আচম্বিতে নাক কান কাটে কি কারণ।

রাবণ - ইহি পুত্র মোরে মহি। সপ্ত স্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল। মম ডরে দেবগণ কাঁপে সদাকাল। মম ডরে যম নাহি আসে। লংকাপুরী বেড়িলেক বানর বেটা বসে। সাবধান হইয়া বাপফু কর গিয়া রণ। বিপদে পরিয়া তোমায় করেছি স্মরণ। যে জন মারিয়া দিবে শিরাম লক্ষ্মণ। অর্ধ লংকা তারে আমি করিব সমর্পন।

মহি - ওগো পিত লংকেশ্বর এখানে যদি এসেছিলো শিরাম লক্ষ্মণ। তখনেনা কেন আমায় করিলে স্মরণ। ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে। শচী রে ভুলাইতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে। শিরাম লক্ষ্মণ বেরী দুই জন। বলি দিব লইয়া পাতাল ভুবন। আপনার যদি আইগা পাই শিরাম লক্ষ্মণেরে চুরী করতে যাই গো পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ - সে তুমি সত্বরে যাও বাপফুরে।

মহি - হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমার নাম মহিরাবণ কে জানেনা মহি রাবণের অনন্ত মহিমা। দেখি ছলে বলে কৌশলে শিরাম লক্ষ্মণকে চুরী করতে পারিকিনা। (প্রস্থান)

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান সাবধান হইয়া থাক বাপফুরের। মহি রাবণের অনন্ত মহিমা। যদি আসে তব পিতা। প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা।

হনুমান - ওগো বিভীষণ সে আমি সাবধানে আছি গো বিভীষণ।

দশরথ - ওরে বাপফু হনুমান। শিরাম লক্ষ্মণ আমার পুত্র করাও দরশন।

হনুমান - ওগো মহারাজা মহারাজা হন কুন জন। খানিক বিলম্ব কর আসোক বিভীষণ।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান এখন কে এসে ছিলো বাপফুরে।

হনুমান - ওগো বিভীষণ এখন রামের পিতা দশরথ এসেছিলো গো বিভীষণ।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান দশরথ রাজার যে মৃত্যু হইয়াছে সে কেমনে আসিবে। আমি তোমাকে বার বার বলে যচ্ছি যদি আসে তব পিতা। প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা।

হনুমান - ওগো বিভীষণ আমি সাবধানে আছি গো বিভীষণ।

জনকরাজা - ওরে বাপফু হনুমান শিরাম লক্ষ্মণ আমার জামাতা করাও দরশন।

হনুমান - ওগো মহারাজা চিনি না চিনি মহারাজ হন কুন জন। খানিক বিলম্ব কর আসোক বিভীষণ।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান এখন কে এসেছিলো বাপফুরে।

হনুমান - ওগো বিভীষণ এখন রামের শ্বশুর এসেছিলো গো বিভীষণ।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান কে জানে না মহি রাবণ চোর। কে জানে না তার অমন্ত মহিমা। আমি বার বার বার বলে যাচ্ছি যদি আসে তব পিতা। প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা সে অতি সাবধানে থাকো বাপফুরে।

হনুমান - ওগো বিভীষণ সে আমি সবাধানে আছি গো বিভীষণ। সে আমি কাউকে প্রবেশ করতে দিবনা গো বিভীষণ।

কৌশল্যা - ওরে বাপফু হনুমান শিরাম লক্ষ্মণ আমার সন্তান। তাহার সঙ্গে আমার করাও দরশন।

হনুমান - ওগো মহারানী চিনি না আমি হন কুন জন। খানিক বিলম্ব কর আসোক বিভীষণ।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান এখন কে এসেছিল বাপফুরে।

হনুমান - ওগো বিভীষণ এখন রামের মা এসেছিলো গো বিভীষণ।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান এখন তুমি প্রভুর চরণ সেবা কর রে বাপফু হনুমান।

হনুমান - ওগো বিভীষণ এখন আমি তাই করব গো বিভীষণ। (রামের চরণ সেবা করতে করতে এমন সময় মহির মন্ত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে এমন সময় মহি রাম লক্ষ্মণ কে চুরি করে পাতালে নিয়ে যায়)।

বিভীষণ - ওরে বাপফু হনুমান তোমার কি হয়েছে বাপফুরে।

হনুমান - ওগো বিভীষণ প্রভুর চরণ সেবা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি উঠে দেখি প্রভু নাই।

বিভীষণ - কি কথা শুনালে হনুমান আর না বল শুনি। নিভা ছিলো কষ্ট মোর জ্বালাইলে আগুনী। ওরে বাপফু হনুমান এখন তুমি পাতালে আগমন কর বাপফুরে

হনুমান - জয় শিরামের জয়। (পাতালে প্রবেশ)

(পাতালে মহির ঘরে কালী পূজা শুরু)

হনুমান - ওগো প্রভু রঘুনাথ। ধরিয়া এনেছে তোমায় পাতালে। এই হল রাজার ঘোষণা মহা কালী পূজা হবে বাজিবে বাজনা। ছাগল বলিদিবে রাজা মহিষ বিস্তর। আর বলি দিবে

দুইটি নর। ওগো প্রভু রঘুনাথ তিলকনা ছাড়িব। কি বলে কালী শুনিয়া এক্ষণি আসিব।

হনুমান - ওমা কালী তোমার মহি ধরিয়া এনেছে মাগো শিরাম লক্ষ্মণকে। একি আইগা দিয়াছ মা তোমার মহিকে। মহিক মারিমু মাগো তোমার সাক্ষাতে। তোমাক ডুবামু লয়ে সাগরের জলে।

কালী - ওরে বাছা হনুমান আমি তোরে বলি। পবিত্র হইল পুরী রাম দরশনে। অশেষ পাপের পাপী এই মহি রাবণ। দেবদ্বিজ ধর্ম হিংসা করে অনুক্ষণ। রাক্ষস মারিতে শিরাম অবতার। রামেরে আনিল মহি করিতে সংহার। মহির মরণ কথা শুন হনুমান। যখনে আনিবে রামে দিতে বলিদান। প্রণাম না জানি মোরা কহেন শিরাম। শিরাম কহিবেন ওরে মহিরাবণ দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন। প্রণাম করিয়া মহি দেখাইয়া দিবে। এই খর্গ দিয়া আমি মহিরে কাটিব। ওরে বাছা হনুমান যুক্তি হল সার। শিরামের কানে গিয়া দেহ সমাচার

হনুমান - ওগো প্রভু রঘুনাথ উপাই করিয়া দেবী দিলেক মন্ত্রণা। যখনে লয়ে যাবে তোমায় দোহাকারে। পক্ষীরূপ হয়ে থাকিব অলক্ষিতে। যখনে করিবে রাজা সামরিক পূজা। প্রণাম না জানি যেন রাজার পুত্র হয়া। যখন মহি প্রণাম দেখাইয়া দিবে। এই খর্গ দিয়া মহিরে কাটিমু তোমার সাক্ষাতে।

মহি - কথায় মহিরানী দীপা তুমি ফুল জল বাতাসা নিয়ে এসো আমার কালী মায়ের মন্দিরে। ওমঃ মাতা পাতাল মোহিনী ভদ্র কালী যাদেবী সর্ব ভূতে মাত্রি রূপে নমসস্থিতা। নমহঃ নমহঃ এই মন্ত্র তিনবার হবেক।

মহি - ওরে কপফু শিরাম লক্ষ্মণ। আমার চন্ডি মায়ের পূজার আয়োজন হয়েছে তোমরা চন্ডিমাকে প্রণাম কর।

রাম লক্ষ্মণ - আমরা রাজার সন্তান ভক্তি নিতে জানি কিন্তু ভক্তি দিতে জানি না।

মহি - তোমরা রাজার সন্তান ভক্তি নিতে পার কিন্তু ভক্তি দিতে জাননা। বেশ তাহলে কি ভাবে ভক্তি দিতে হয় আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ভাল করে দেখো। (মহির মৃত্যু ও দীপার সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ ও মৃত্যু মহি রাবনের মৃত্যু। রামলক্ষ্মণ উদ্ধার এবং কালী মায়ের উদ্ধার)। (রাবণের প্রবেশ)

রাবণের গান - এ প্রভু লেহ সীতা তোর হাতে হাতে আহা মরিরে। রাক্ষস কুলে মোক করহ উদ্ধার এ প্রভু রঘু নাথ রে। এ প্রভু তুইহে মাতা মোর তুইহে পিতা তুইহে হোলো মোর জনম

দাতারে হে। এ প্রভু অভাগিয়াডার আর কেহো নাই শুন প্রভু রঘুনাথরে। এ প্রভু ছিলো পুত্র মোর মেঘনাদ আহামরিরে হে। এ প্রভু ঘরে ঘরে মোর কান্দে রানীগণ শুন প্রভু রঘুনাথ রে। এ প্রভু সর্বনাখাডার কথা ধনু লংকাপুরী শূন্য করনু হে। বাতি দিবার মোর কেহ না রহিলো আর রে হে।

রাবণ - ওরে রাম রাবণ আমার নাম জানে সর্বজন। কেমনে জানিলে তুমি না করিব রণ। এই দেখ দেহ মোর বরজংগ শরীর। অন্য বীর নাহি আমি দুর্জয় বীর। তবে আয় যুদ্ধে প্রস্তুত হও ধর অস্ত্র কর রণ। বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। ধর যুদ্ধ।

(সীতা উদ্ধার ও রাবণ বধ)

গান - ওই যে দেখদেখ রামের সীতা উদ্ধার হইল, সর্বলোকে হরি বলরে। হে সর্ব লোকে হরি বোলে রে হে।

---

সংগ্রহসূত্র

রাজধারী লোকনাটকটি দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ী ব্লকের বগরিবাড়ী গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছি। বসন্ত সিংহ, রাজু মালাকার, শত মালাকার, পিওন সিংহ এবং হুদুম বর্মণের সহযোগিতায় 'রাজধারী' লোকনাটকটি খাতায় লেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো সহযোগিতা করেছেন বাঘাজোতের রাজেন্দ্রনাথ সিংহ এবং বুড়াগঞ্জের জিতেন্দ্রনাথ সিংহ। খড়িবাড়ী, বুড়াগঞ্জ এবং শিবমন্দিরে এই নাটকটির অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করি। এই রাজধারী লোকনাটকের পরিচয় ইতিপূর্বে কোথাও পাওয়া যায়নি।

## খন

# হরিহরের বিচার

চরিত্র: পুরুষ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | জগাই | — | গাও এর মাহাজন। |
| ২। | অভয় | — | লোক শিল্পী। |
| ৩। | হরিহর | — | গাও এর ক্ষুদ্র কৃষক। |
| ৪। | সবুজ | — | গাও শিক্ষার মেম্বার। |
| ৫। | বেঙ্গু | — | গাও এর কৃষক। |
| ৬। | ভুচিয়ান | — | মাহাজন। |
| ৭। | হালের গরু | — | দুটি। |
| ৮। | দুর্গা | — | হরিহরের বৌ। |

### প্রথম দৃশ্য

(সবুজ, বেঙ্গু, অভয় ও জগাই)

সবুজ শিক্ষা মানুষের অধিকার। সেই অধিকার অর্জন করিবা হইলে হামাক ইসকুলত্ যাবা হবে, ছায়ালাক্ ইসকুল পঠাবা হবে ।

সবুজ = শিক্ষা না থাকলে কিছুই হয়না। শিক্ষায় মানুষ জীবনের উন্নতি। শিক্ষায় দেশের উন্নতি শিক্ষায় গাও গেরামের উন্নতি। (বেঙ্গু সহ অন্যান্য ব্যাক্তিগণের প্রবেশ)

বেঙ্গু = নমস্কার সবুজ নমস্কার।

সবুজ = নমস্কার। ছোট ভাই খবর-সবর সব ভাল ত।

বেঙ্গু = হে - হে সবুজ দা। খবর খুবই ভাল। এই যে বাড়ি বাড়ি যাই খবর নিহি কাহার বেটা-বেটি স্কুল যাহা কাহার যায়নি। তাতে ভাল কাম হইলে - একুন সবাই বেটা-বেটি স্কুল পাঠাহা।

সবুজ = হে মুই পশ্চিম পাড়া থাকি আসিনু তাতে দেখনু। দুই এক জুন বাদে সবাই-ছুয়া স্কুল পাঠাহা।

বেঙ্গু = স্কুল ত জাগা দিবা পারেনি। কবুতরের মতন ছুয়া গিব-গিবাঁহা।

সবুজ = এই গাও শিক্ষা VEC কমিটি করি শিক্ষার ব্যাপারে ভাল কাম হইলে।

বেঙ্গু = গা এর মানুষ বুঝিবা পারিয়া শিক্ষা সবার দরকার।

(এই সময় গান করতে করতে অভয় এর প্রবেশ)

অভয় = শুনেন শুনেন দাদাগণ

শুনেন শুনেন বৌদিগণ

নেখা-পড়া করিতে ইসকুলে

পাঠান সবে বাচ্চাগণ।

ও দাদা গো ও বৌদি গো

তোমার ৫ থেকে ৯ বছরের ছেলে মেয়ে

পাঠাও সবে ইসকুলে (২ বার হবে)

এবার VEC ডাক দিয়েছে

কেন থাকবেন চুপ করে

৫ থেকে ৯ বছরের ছেলে মেয়ে পাঠান সবে ইসকুলে।

(এই সময় জগাই এর প্রবেশ)

জগাই = খুবেই ভাল, খুবেই ভাল। দাদা গো বৌদি গো। বেটা-বেটি সবে পাঠান ইসকুলে। আর বাড়ির কামলা কে করিবে। (পালাতে চাইবে)

বেঙ্গু = মাহাজুন দা আয় আয়। হই মাহাজুন দা তোর কাপড়ের ভিতর ঐ খান কি।

জগাই = কিছু নাহায় কিছু নাহায় একখান জানালার পাল্লা।

সবুজ = জানালার পাল্লা নিশ্চই হামার গা এর ইসকুলের?

জগাই = হে হে ইসকুলের জানালাট ভাঙ্গি গেলে ঐ তাংনে ছুটাই নিগাই। মোর বাড়ির কামে নাগিবে। আর সরকারের জিনিস থাকিলেই কি, না থাকিলেই কি। মোক যাবা দে।

বেঙ্গু = তোক যাবা দিম। তুই হলু দেশের শত্রু সমাজের শত্রু। গা এর শত্রু। তুই চোর-চোর।

জগাই = মুখ সামলি কাথা কহিস বেঙ্গু। খবরদার মোক চোর কহিস না। তোর না তোর বাপের ধন চুরি করি নিগাছ। সরকারের জিনিস কতঝনে নিগাহা, মহ নিগাহুং। তাতে তোর অত ফর-ফরানি কিসের।

সবুজ = মাহাজুন দা, বেঙ্গু ঠিকেই কহচে। কোন সাহসে তুই জানালাট ভাঙ্গি নিগাইস। চোর নাহিস কিন্তু চোরের মতন কাম করিহিস।

জগাই = ঠিক ছে, বিনা দোশে তমরা মোক অপমান কলেন। দেখা যাবে। মোক চোর বানালেন। মুইও একদিন এই এঞ্চলের মেম্বার ছিনু। মোর বুঝি দাম নাই, মোর কি টাকার অভাব ছে। ঐ রকম দশখান জানালা মুই তিয়ার করিবা পারিম। বিনা দোশে মোক চোর বানালেন।

অভয় = জগাই মাহাজুন চোর। চোর।

জগাই = এহ্ সবাই ত নেংটি পরা। এলা নেখা-পরি শিখি ভদ্দর নোক হ'বা চাহাচেন। এর উচিত শিক্ষা পাবেন। এই ন সাত আজার ধন। (প্রস্থান)

সবুজ = (জানালার পাল্লা দেখায়) দেখলেন ভাই বেন্দু, অভয় এরাই হইল সমাজের শত্রু। নিজের কত ধন সম্পত্তি কে খায়। আইজকা এর উচিৎ শিক্ষা হইল, দশের আগা ভালয় শরম খালে। দৃশ্য শেষ

**দ্বিতীয় দৃশ্য**

দৃশ্যে = হরিহর, দুর্গা ও সবুজ

(লাঙ্গল জুয়াল কাঁধে করে হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর = বিলত ত হাল বাহিবা যাছু। গিথ্থানিটাক কহি যাউ তাড়াতাড়ি যেন খরাক নিগায় ঐ চেতনার মা চেতনার মা রে শুনা পালু। (মুরগি ডাকবে)

দুর্গা = যাহুং। যাহুং। হায় ভগবান, তমার আরম্ভ হইল। পোহাতে উঠি ডাকাডাকি নাগালেন।

হরিহর = তমার এখন পোহাত ছে। দেখত সূর্য্য ঠাকুর নাল হবা ধরিচে।

দুর্গা = পারার মানুষলা শুনিলে কি কহিবে। কি কহচেন কহ।

হরিহর = মুই পূব পাথারত হাল ধরি যাহু। তুই টপ করি খরাক ধরি যাবু। গরম গরম ভাত নিগাবু। পতিদিন ঠ টরা পন্তা ভাল নাগেনি।

দুর্গা = ঠিক ছে। কোন দিন দেরী হইলে। বাসিয়া কামলা করিস। ছাগললা বান্ধিম। তারপর যাম ত নাকি তমাক ফের এত ভোক নাগেছে।

হরিহর = বুঝিবায় পারিহিস। বয়ষ হইলে চট করি জল খাবা মোনায়।

গান: ওনা সকালে উঠিয়া মুই
যাছু হাল খান ধরি-
তাড়াতাড়ি ওরে চেতনার মা
তুই যাইস খরাক দিবা।
ওনা সঙ্গে দুটা পিয়াইজ নিগাবু
আর নিগাবু আলুর ভাজা
এক দুফর বেলা হইলে—
ওরে চেতনার মা
ও মোক ভোক নাগে চন চন করিয়া।

শুনাত পালু, মুই পাথারত গেনু হাল ধরি টপ করি গটাকয় গরম ভাত আন্ধি নিগাবু।

(প্রস্থান)

দুর্গা = হালুয়াট কহি গেল। হাল বারি টপ করি গরম গরম ভাত আন্ধি নিগাইস। মোর হালুয়াটা বেজাই রগচটা। যেমন ভাল তেমন আগি। কাথা মতন কাম না করিলে আগাআগি করিবে। চটপট করি বাসি কামলা করু। (প্রস্থান)

(ঝাট দিবে) হাড়ি, পাতিল নিয়ে প্রবেশ ও রান্না-

(সবুজের প্রবেশ)

সবুজ = হরিহর-হরিহর-হরিহর- বাড়িত ছিস্।

দুর্গা = কেই উট কাইসিলেন কেই? ও ভাশুর তমরা আইস, আইস বস। এত সকালে। তালের উপর তাল দিবা আসিলেন।

সবুজ = কেনে ভাউসান কেনে। হামরা আসাতে তমার কোন অসুবিধা হইল নাকি?

দুর্গা = অসুবিধা কিছু নাহায়। ঔ তমার ভাই। টপ করি পুব পাথারে খরাক ধরি যাবা কহিলে। ঔ তাংনে তারা হুরা। তার পর গরম গরম ভাত খাবে। মোর মানুষটাক ত তমরা চিনেন।

সবুজ = এংনা বিরক্ত করিবা আসিন আর কি। হামার দুই একট কাথা। এলায় চলি যাম।

দুর্গা = কি কামে আসিলেন ভাশুর হামাক কহিলে হবা পাহা।

সবুজ = হবে হবে। তমার দ্বারায় কামটা হবে। আর তমাকে করিবা হবে। কামটা দরকার তমার।

দুর্গা = কি কহচেন ভাশুর তমরা আসিয়ান হামার দরকারে।

সবুজ = হে ভাউসান তমার দরকারে। খবর হচে এই, বেটা-বেটিলাক ইসকুলত পাঠাহাম।

দুর্গা = পাঠাই ফের না পাঠাই। ইসকুলত না যাইলে বাড়ির কাজ কামলা হাতাহাতি করি দেআর কি। ঔ তাংনে ইসকুলত পাঠাবার গতরত নাগাইনে।

সবুজ = এত ভুল করেহেন ভাউসান। এই দিনে তোমরা বেটা-বেটিলাক বকা করি থুবা চাহানে। শিক্ষায় মানুষ জীবনের উন্নতি। শিক্ষার তাংনি বেটা-বেটিলাক পতিদিনইসকুল পাঠাবা হবে। ভুল করেন না?

দুর্গা = হামরা ত বুঝি ভাসুর। যে দিন কাল আসিহা নেখা-পরি একান্ত দরকার। ঔ তমার ভাই একদম কাথা শুনেনি। বেটির পরার কাথা কনিলে ত তেলে বেগুনে জ্বলি উঠিবে। কহিবে বেটি পরাই কি হবে কি হবে। বেহা দিলে ত পরার ঘরত যাবে।

সবুজ = বেটি পরার ঘরত যাবে ঠিকেই। কিন্তু বুঝি দেখ বেটা তমার যেনং সংসার চালাবে তেমনি

বেটি তমার পরের ঘরত যাই সংসার করিবে। এইটা বুঝেন শিক্ষিত মায়ের সন্তান কোন দিন অসিক্ষিত থাকে নি।

দুর্গা = ভাশুর তমার কাথালা শুনি হামাক খুবেই ভাল নাগেহে। ছুয়ালাক পরার কাথা কহচেন না মনে হচে ছুয়ালা বুঝি তমারে। ঘরের মানুষ এনং না হইলে হয়। বস ভাশুর ক্যামার তাংনে চা করি আনি।

সবুজ = বসিবা কহচেন ভাউসান। তমার না দেরি হচে। হামাক আর দুই এক বারি ঘুরিবা হবে। (এই সময় ডাকতে ডাকতে জগাই প্রবেশ করতে গিয়ে আটকে যাবে দেখবে সবুজ আর দুর্গা গপ্প করছে সন্দেহ করে সব কিছু দেখে চলে যাবে।)

জগাই = হরিহর হরিহর। ওহো প্রেম জমিয়া ভালয়। প্রেম করা তোর ভাকরোছ সবুজ মেম্বার। ঔ দিন তোর জইন্য অপমান হনু। অপমানের শোধ ত মোক নিবায় হবে। মনে করেছি ফাকা বাড়ি কে দেখা পাবে চুপি চুপি বিড়ালে খাছে দহি। (প্রস্থান)

সবুজ = হামরা গেন ভাউসান। হামার কাথালা মনে থন। (প্রস্থান)

দুর্গা = ভাশুরট ঠিকেই কহি গেল। মোর মরদের কাথা শুনিলে হবানাহা। কি করিস ছুয়া দুটাক খিলাই দিয়া ইসকুলত পাঠাম। তার পর যাম খরাক দিবা। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(এই জায়গায় বা দৃশ্যে-এমন হবে দুর্গা খবার দিতে যাবে, অমনি হালের গরু দুটা বাড়িতে আসবে।)

দৃশ্যে - হরিহর, দুর্গা

(হাল ধরে হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর = এতট বেলা হইল-এলাও গিথানিট খরাক ধরি আসিল নি। নিশ্চই কাহারও সঙ্গে গপ্প গুজব করেহে। আসোকদি কতক্ষুণতে আসে। আইজ কা হাল বহা পানঠি খান দি ঝর-ঝরাম তারপর ভাত খাম। আসোক। (বসি খইনি খাবে)

(এই সময় খরাক ধরে দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা = হালুয়াট যে কুত্তি না হাল জুরিয়া- দেখায় যায়নি পুব-পাথারট গটায় ঘুরি দেখেনু। চেতনার বাবা ঐ চেতনার বাবা। তমরা কি এত্তি না। চেতনার বাবা। না খরাকলা ধরি এলায় বারিত চলি যাম।

হরিহর = ওই এত বেলায় ভাত ধরি আসি চেচাবা ধরিয়া। কি করিম আর না দিলে ঘুরি পালাবে।

আন এত্তি না আন। মুই এত্তি না।

দুর্গা = মজা দেখেছেন না? ভাতলা ধরি এলায় চলি গেনুহই। পুব পাথারত গটায় ঘুরি দেখেনু। আর তমরা চুপ করি বসি অংঠি দেখেহেন।

হরিহর = এত বেলায়। তমার একটা কাণ্ড-জ্ঞান ছে। অত করি কহি আসিনু। দিম নাকি হাল বহা পানঠি খানদি ঝর ঝরাই।

দুর্গা = মারনিতে। মাইর ছাড়া ত কিছু বুঝেন নি। সকালে বাসি কাম কি কম থাকে। ছাগললা বান্ধিনু। গাইটাক ঘাস খাবা দিনু। ভাত আন্ধিনু। আলু ভাজিনু। তার পর ত আসিনু। ধরধর এক্ষুণে হোচট খাই পরি গেনুহই।

হরিহর = অত ফর ফরাইসনা। ভাত বারেক।

দুর্গা = ন বস। যে রকম করেহেন মানুষট। কারো বুঝি দেরি হয়নি।

হরিহর = মোর যাইতে দেরি হবে। হাল ছারি কদালের কাম করিবা হবে। দিন আর পরি নাই বুনার সময় হই আসিল। চেতনা বেটিক গরুলার ঘাস কাটি আনিবা কহিবেন। আর একট কাম করেন ত বেটা সনাতনক হকাট ধরাই পাঠাই দেন। হকাট আনিবার মনে নাই। চুপ করি আছেন কেনে।

দুর্গা = চেতনা বেটি, সনাতন বেটা ,কেহই বারি নাই।

হরিহর = হাঁ কি কহিলেন। কেহ বারিত নাই। গেল কুন্না ছুয়া দুটার খালি খেল।

দুর্গা = ইসকুলত পরিবা গেলে।

হরিহর = হা। কার হুকুমে ইসকুলত পাঠালু। এত কাম ইলা কে করিবে।

দুর্গা = মুই নিজে পাঠানু। কিতে গাও শিক্ষা কমিটির মেম্বার ভাশুরটা কহিবা আসিয়াল সব ছুয়াক ইসকুলত পাঠাবা হবে।

হরিহর = মোর বেটা বেটি ইসকুলত যাবে, না নি যাবে মুই বুঝিম। সনাতনক পাঠালে হল হয়। বেটিটাক পাঠালেন কেনে?

দুর্গা = মোক কি কহচেন। পাড়ার সব বাড়ির বেটা বেটিলা ইসকুলত যাহা। মোর বেটা বেটি ইসকুলত যাবে। চেতনাক পড়াইতে তমার আপত্তি কিসের? বেটিটাক মূর্খ করি থুবেন।

হরিহর = থাউক। বেটি বেহা দিলে পরের ঘরত যাবে। তমার কি কামে নাগিবে।

দুর্গা = মুই কহচু যাবে। বেটি মোর ইসকুলত যাবে।

হরিহর = এই চুপ। মোর উপরে কাথা।

দুর্গা = চুপ করিম কেনে। মোর বেটাবেটি ইসকুলত যাবে।

হরিহর = যাবে? ফের উত্তরা উত্তরি। দেখি আইস পানঠি খান। দিম নাকি দিম দিম।

দুর্গা = দনিতে।

হরিহর = দনিতে। হুং হুং হুং। (মাইর দিবে)

দুর্গা = এত দিন হচে ঘর সংসার করিহি কোনদিন মারেনি। বেটিটাক নেখাপরার দোষে আইজ মোক মারিলেন। উ হু হু হু (কান্না)

হরিহর = তমার দোষে মাইর খাবে।

দুর্গার গান = ছুয়ার নেখা পড়ার দোষে
ও স্বামী ধন মোকে মারিলেন
শিক্ষার কি মূল্য স্বামী ধন
কেমনে জানিবেন।
ওনা - কুমার শালে মাটি শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ হয় চাষ দিলে
বিদ্যালাভে মানুষ শুদ্ধ হয় সুয়ামী
শাস্ত্রে নেখা আছে।

হরিহর = খুবত ভাল ভাল কাথা শিখিয়ান। মোক আর জ্ঞান দেন না। দু ক্লাস পরিহান না নিহি মোক জ্ঞান দেহেন।

দুর্গা = কোন দিন ইসকুলের দুয়ারত দেখিয়ান।

হরিহর = মুই দেখুনি, মোর বেটাবেটি অ দেখিবানাহা, শুনি ন।

দুর্গা = মোক যখুন মারিলেন। মোরহ জেদ, মোর বেটা-বেটি ইসকুলত যাবে।

হরিহর = যাবে। ভাল কাথা। খরচা পাতি তমাক চালাবা হবে। এক কানা করি পাবা নাহান।

দুর্গা = মুই চালাম। হাসের ডিমা বেচি। ছাগল বেচি। তাহাও মোর বেটি ইসকুলত যাবে। আর কোনদিন অ মোর গতরত হাত দিবা নাহান কহি দিনু।

## চতুর্থ দৃশ্য

দৃশ্যে-জগাই, হরিহর ও দুর্গা।

জগাই = মানুষে বিশ্বাস — মানুষে অবিশ্বাস। দিন কাল খুবেই খারাপ। আগাম টাকা দিয়া মানুষের বিশ্বাস নাই। হাটতে হাটতে ত হরিহরের বাড়ি চলি আসিনু। হরিহর হরিহর বাড়িত ছিস

'বাহে' হরিহর।

হরিহর = কাম হইলে। চেতনা বেটির কামের বাবদে জগাই মাহাজুনের ঠিতে ঠাকা নিয়ানু। নিশ্চই মাহাজুন আসিয়া টাকা চাহিবা। কেউ মাহাচুন কাকা। আয় কাকা আয় ভিতর আয়বোস।

জগাই = তোর ব্যাপার কি হরিহর।

= হে কি কাকা। মগাই জগাই চেমকি গেলু নাকি। ঠকবাজিত ভাল শিখিয়াইস। তোর বেটি চেতনা মোর বাড়ি ঝি খাটিবে কহি কামের বাবদ টাকা আনিলু আইজ কয়দিন হইল। চেতনাক ত কামত পাঠাইসনি হরিহর।

হরিহর = কামের উপর টাকা।

জগাই = ভুলি গেলিস নাকি? কাথাটা শুনি থরকি উঠিলু।

হরিহর = হে কাকা আনি আউ। তে কাকা ব্যাপারট কেনং যেন গোলমাল হই গেল। টাকালা তোক ফেরৎ নিবা হবে।

জগাই = টাকা ফেরৎ নিবা হবে। তার মানে?

হরিহর = হে কাকা। মানে মানে চেতনা বেটি মোর ইসকুলত পরিবা যাহা।

জগাই = ইসকুলত পরিবা যাহা।

হরিহর = ঔ তোর ভাতিজ পুতুহুর কাম। মুই কহুচু পরিবা নাহা তোর ভাতিজ পুতুহু কহচে পড়িবে। এই করি ত তোর পুতুহুক হালবারি একদিন ধরি দিনু মাইর। তাহাও বুঝোন।জোর করি ইসকুলত পাঠাহা।

জগাই = পরিবা যাহা। তাহায় কহিলু তোর দিন চলেনি, বেটিক পরের বাড়ি ঝি খাটাবু। তুই তোর বহুর কাথা ধরিয়াইস। ও হো বুঝা পানু এইলা গাও শিক্ষা কমিটির কাম। তোর দিন চলেনি। তার ফের নেখা-পড়ি। তোক নেখা-পড়ির ভুতে ধরিয়া তাইলে হরিহর মোর টাকার কি ব্যবস্থা হবে।

হরিহর = ব্যবস্থা হবে কাকা। তোর টাকা ফেরত পাবু।

জগাই = ফেরত পাবু। নেখা-পড়ি নেখা-পড়ি। চতুরভিতি ঝর উঠিয়া। সরকারটাক আর কি কহা যাবে। এর আগে শিখালেন যুয়ান যুয়ান ছোরা ছুরি বুড়াবুড়ি এলা ধরিয়ান ৫ থেকে ৯ বছরের ছুয়ালাক। কি কহিলু হরিহর ফেরত পাবু সে ত অনেক দূরের কাথা মোক এলায় আনি দে। না হয় ছুয়াক কামত পাঠা।

হরিহর = অবিশ্বাস করিসনা কাকা।

জগাই = বিশ্বাস করি তোক সর্বনাশ হচে। বহুর কাথা ধরিয়াইস ত ভায়া। বাড়ির খবর কিছু জানিস একদিন বুঝা পাবু- সবুজ মেম্বারের কাথা ধরিয়ান - মেম্বার তোর বাড়ি কি তাংনে আসে একদিন মুই নিজের চোখে দেখেনু। ইলা কাথা তো পরে কহিম। মোক টাকা আনি দে।

হরিহর = কাকা এই সপ্তাহের হাটট করিবা দে।

জগাই = হরিহর মোর বাড়িত ত টাকার গাছ নাই। বিনা কারণে তোর ঠিনা কুরি টাকা ফেলাই থুম। মোক এক্ষুণি ফেরত দে।

হরিহর = তোর দোহায় নাগে কাকা, জুলুম করিসনা। টাকা তোর খামনি ফেরত পাবু।

জগাই = ছিম বাপু , ইলা ত মোক ভাল নাগেনি। (দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা = এই ন শ্বশুর তমার টাকা।

জগাই = টাকা।

হরিহর = নে কাকা নে।

জগাই = তমার ত ভালয় টাকার গরম হইলে হরিহর। ঠিকছে। এক মাঘে শীত যায়নি। দেখা যাবে। মুই চলিনু। (প্রস্থান)

হরিহর = দুর্গা তুই মোক বাচালু। যে চিমঠা মাহাজুন মোক এলায় অপমান কলহয়। কি করা যাবে? বড় ঠেকায় যাবা হয়। (দৃশ্য শেষ)

## পঞ্চম দৃশ্য

(দৃশ্যে - পিওন, হরিহর ও দুর্গা)

পিওন = চিঠি চিঠি চিঠি হরিহরের চিঠি।
সুখের চিঠি দুঃখের চিঠি।
মুই করু বিলি
বহুদিন থাকি ভাইরে
করু পিওনের চাকিরি
চিঠিপাত্র হয় কথা বার্ত্ত
চিঠি পত্রে হয় প্রেম ভালবাসা
চিঠি বিলাইতে ভাইরে
বেলা যায় চলিয়া চিঠি - চিঠি - চিঠি।

'হরিহরের প্রবেশ'

হরিহর = ওই ভাই পিওন ঝহার চিঠি।

পিওন = সবুজ মেম্বারে চিঠি। (প্রস্থান)

হরিহর = সবুজ মেম্বারের চিঠি। নিশ্চই দুর্গার নামে। দুর্গা দুর্গা দুর্গা আইজ তোর সব চালাকি মুই ধরিবা পারিনু। যাবু কুনঠি। তলে তলে তমার প্রেম জমিয়া ভালয়। একবার বাড়িত আনি গপ্প। চিঠি পত্রে গপ্প। তলে তলে পানি খাউয়া তমার ভাকরাম। হায় ভগবান চোখ থাকতে অন্ধ। দুর্গা আইজ যদি তোর এই প্রেমের চিঠিখান পড়িবা পারিহিনুই। নিশ্চই নিখিয়া সকালে বারিত থাকিবেন ভাউসান- হামরা যাম -তমাক না দেখিলে ভাউসানি হামাক ভালয় নাগেনি।

দুর্গা = তমার এই চিৎঝর চেচামেচিলা মোক একদম ভাল নাগেনি কিনা কি হবে - না বুঝি না সুজি তোলপাল নাগাবেন। কি হইলে কহ?

হরিহর = কি হইলে কহ? ভালয়ত পারেহেন। এই খান কি ধর তমার প্রেমের চিঠি সবুজ মেম্বার দিয়া তমার গুণের ভাশুর।

দুর্গা = কি কহচেন। মুই কিছুই বুঝিবা পারুনি।

হরিহর = কিছুই বুঝিবা পারুনি। বুঝি সুঝি ঢেং করেহেন। ধর তোমার প্রেমের চিঠি। মোর সামনে তমাক প্রেমপত্র খান পরিবা হবে। কি নিখিয়া ঔ তাংনে সাত সকালে তমারঠিনা বেটা-বেটি ইসকুলত পাঠাবার কাথা কহিবা আসে। মোর, মোর পড়ার গরজ নাই। উয়ার এত গরজ কিসের। বুঝিনু গরজট অন্য জায়গাত।

দুর্গা = দত মোক চিঠিখান।

হরিহর = পড় পড় জোরে জোরে পড় সবাই জানুক শিক্ষিত বহু অশিক্ষিত সুয়ামীক ফাঁকি দি চিঠি পত্রেপ্রেম করেছে। ছিঃ ছিঃ মোর মাথাট হেট করি দিলেন।

দুর্গা = পড়িম। (চিঠি পড়ি চুপ করি থাকিবে)

হরিহর = পড় পড়। কি হইল। চুপ করি থাকিলেন কেনে।

দুর্গা = মুই পরিবা পারিম নি।

হরিহর = কি কহছিস দুর্গা পড়িবা পারিবুনি। প্রেম তাহলে জমিয়া ভালয়। পড়িতে সরম নাগেছে। দে দে মোক চিঠি কান। খবরদার বাড়ি থাকি এক পাও নরিবেন না। মুই জগাই কাকার ঠিনা যাম আর আসিম। কি নিখিয়া শুনি আসু। পালালে কিন্তু ভাল হবে নাহা। জগাহ কাকা অইলে ঐ দিন ঠিকেই কয়হাল। নিজের চোখে দেখিয়া।

দুর্গা = যাও নিতে যাও। তাহায় মুই বাড়ি ঘরলা ঝার ঝাপটা দু। (দৃশ্য শেষ)

## ষষ্ঠ দৃশ্য

(দৃশ্যে - জগাই, হরিহর)

জগাই = দিন কাল ত পালটি গেল। গা এর নোক সবাই নেখা পড়াত মন দিয়া। নেখা পড়ার জোয়ার আসিয়া। তারপর বিদেশী কি সব আইন দেশত চালু হচে। সেরকমেত শুনিনু সেদিনকা। মিটিংগত - ভাষণ শুনিত মোর পিঁলই চেমকি গেল। সব নাকি হামাক ফের বিদেশ থাকি কিনিবা হবে - ফসলের বিচি, সার ঔষধ-পত্র সব কিছু। বিদেশিরা কি ফের সুট সুট করি আসিবা ধরিয়া — এই সময় হরিহরের প্রবেশ।

হরিহর = জগাই কাকা মুই ন সুট সুট করি আসিনু।

জগাই = ও হো হরিহর।

হরিহর = হে মুই কাকা।

জগাই = আয় আয় মুই জানুং হরিহর তোক আসিবায় হবে। জানিস ত এক মাঘে শীত যায় নি।

হরিহর = হে কাকা একটা বড় দরকারে তোর ঠিনা আসিনু।

জগাই = দরকার ছাঁড়া ত কেহ মোর আসেনি। তে ভাতিজা হরিহর মানে মানে বাপু কাটি পরেক। মুই টাকা পাইসা তোক কিছু দিবানাহুং। সেদিন যে তমরা মোক অপমান করিয়ান ভুলি যাউনি।

হরিহর = কেনে কাকা টাকা ত তোক ফেরত দিন।

জগাই = টাকা ফেরত দিলু না মোক অপমান কলু। এত টাকার গরম। আইজ ফের বুঝি টাকা।

হরিহর = না কাকা অন্য দরকারে।

জগাই = তার মানে টাকা নিবুনি ধান নিবু। ধান টান বাপু কিছু পাবুনি। তুই পথ দেখেক।

হরিহর = না কাকা অন্য দরকারে।

জগাই = তোর দরকার মুই জানং। হাজারটা মিছা কথা কহি কিছু নিগাবু। পরে পালটি যাবু।

হরিহর = না কাকা না অন্য দরকার।

জগাই = এহ্ অন্য দরকার। কিছু বন্ধকি থুবু।

হরিহর = না কাকা এট অন্য দরকার। মুইত বাপু চোখ থাকতে অন্ধ। ঘরের কাথা কহিতে ফের সরম নাগেছে। দেখেক ত চিঠি খান কি নিখিয়া মোর বহুর প্রেম ভালবাসার চিঠি।

জগাই = প্রেম ভালবাসার চিঠি। দেখু দেখু।

হরিহর = কাকা তুই সে দিন ঠিকেই কয়হালু। তোর কাথা কানতে না নি মোর কি সর্বনাশ হইলে।

জগাই = আর বুঝিবু ভায়া। কেবল ত শুরু। মুই নিজের চোখে দেখেনু আর তুই মোর কাথা বিশ্বাস করিলুনি? কাথায় ছে বাপু জল জঙ্গল নারী এই তিনকে বিশ্বাস করতে নারি।

হরিহর = কাকা চুপ-চুপ করি চিঠিখান পড়ি মোক শুনাত কি নিখিয়া। কাহাক ফের কহিস না - তোর দোহাই নাগে। এমুন শিক্ষা দিম না সবুজ মেম্বারক, বাপের নাম ভুলাই দিম। মোক ত চিনে নি। চিনাই দিম।

জগাই = (চিঠি পড়িবে) হরিহর বাবু, এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী বুধবার বিকাল ২টায় আপনাকে গ্রাম শিক্ষা কমিটির মিটিং এ ডাকা হয়েছে কারণ আপনি নাকি আপনার বৌকে প্রায় মার ধোর করেন। তারপর ছেলে মেয়েদের ইসকুলে পাঠাতে চান না।তার জন্য দশ কমিটি মিটিং এ আপনার বিচার করা হবে।

গ্রাম শিক্ষা কমিটির পক্ষে:-

সবুজ মেম্বার

হরিহর = সর্বনাস মোক দশের মিটিংগত ডাকিয়া। হায় ভগবান কি যে হবে। কি কহিম কাকা।

জগাই = কি কহিবু। মোর বহুক মুই মারুং ধরুং মারি ফেলাইদুং তমার কি?

হরিহর = চিঠিখান শুনি ত কাকা মোর মাথাট ঘুরি গেল। হায় ভগবান মুই বুঝিনু এক, হইছে আর এক। মোর যে কি হোবে। না কাকা মুই যাউছ। না জানি-না শুনি দুর্গাক মুই সন্দেহ করিনু। হায় হায় ভগবান।(দৃশ্য শেষ)

সপ্তম দৃশ্য (ক)

দৃশ্যে - হরিহর, দুর্গা।

দুর্গার প্রবেশ

দুর্গা = চেতনার বাপ অনেক্ষণ হইল চিঠিখান পড়াবা গেলে এলাও আসিল নি। আসোক দি কোন মূর্তি ধরি আসে।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর = (হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ) হায় ভগবান বিচারে য়ে মোর কি হবে। কি সব আইন বাহির হইলে নিজের বহুক নাকি মার-ধোর করা যাবা নাহা। হঠাৎ করি মাথাট গরম হই গেল আর অমনি হাল বহা পানঠি খান দি দিনু ঝর ঝরাই। দশের বিচারে যে কি শাস্তি দিবে। দুর্গা-দুর্গা-তুই মোক বাচা দুর্গা।

দুর্গা = তমার ফের কি হইল। তমাক কি বাচাম।

হরিহর = মোর সর্বনাশ হইলে দুর্গা। তুই মোক বাচা।

দুর্গা = চিঠি খান ত পড়ালেন কি নিখিয়া।

হরিহর = কি নিখিয়া জানিস দুর্গা। তোক যে, পাথারত মারিয়ানু তার তাংনি দশের মিটিংগত মোক ডাকিয়া। এই বার মোর কি হবে দুর্গা।

দুর্গা = ঠিকেই হইলে। তমার মতন মরদের শিক্ষা দুয়া উচিত।

হরিহর = কি কহচিস দুর্গা ঠিকেই হইলে। এনং কাথা তুই কহিবা পারিলু।

দুর্গা = হে ঠিকেই হইলে। দশেই তমাক শিক্ষা দিবা পারিবে।

হরিহর = তোর দোহায় নাগে দুর্গা। এনং কাথা কহিস না মোক বাচা। দশের মিটিংগত কহিবু মুই তোক মারুনি।

দুর্গা = ভাল কাথা কহচেন। দশের আগা মিছা কাথা কহিম। তমার বেজাই জোর বারি গেলে। এই বার হইলে দশে ডাকিয়া দশের ঠিনা ক্ষমা চাহ। মোক কি কহচেন।

হরিহর = তোর ঠিনায় মুই ক্ষমা চাহাচু দুর্গা। এইট কেহ জানিবা নাহা তুই যদি কহিস মোক মারিনি- তাইলে দশের ঠিনা মোক ক্ষমা চাহিবা হয়নি। সুয়ামিক বাচাবার তাংনে মিছা কাথা কহিলে কি হবে। মুই যে, তমার সুয়ামি। অন্নদাতা।

দুর্গা = আঃ হাঃ রে অন্নদাতা। তমরা করিবেন ভুল। তমার মাইরলা কি মুই ভুলি গেলুং। আর তমার তাংনি দশের আগা মোক মিছা কহিবা হবে। কমত কাথাট কহচেন।

হরিহর = আর কোন দিন এনং ভুল হবা নাহা। চেতনার মারে, তমার দোহায় নাগে। দশের বিচারে কি যে, হবে। যদি মোক থানাত পাঠায়, তোক ভাল নাগবে?

দুর্গা = হে নাগবে।

হরিহর = এনং কহিস না চেতনার মা। মোর খুবেই ভয় করেছে। যাক বলে দশে ধরে। তাকে নাকি যমে ধরে। চেতনার মা - আর কোন দিন এনং ভুল হবা নাহা। এই মুই আর আগা কান ধনু।

দুর্গা = চল চল। দেখা যাবে। এবার কেনে। এই তমার মরদাংগি। এলায় জল হই গেলেন। মারিবার সময় ত মনে থাকেনি। (প্রস্থান)

দৃশ্য শেষ

সপ্তম দৃশ্য (খ)

জগাই মাহাজনের বাড়ি

দৃশ্যে - জগাই ও ভুচিয়াল।

জগাই = না ইয়ার একট ব্যবস্থা করিবায় হবে। গাও-শিক্ষা কমিটির নোকলা বেজাই বারি-গেলে। কার ছুয়া ইসকুলত পাঠাবে, না নি পাঠাবে, কে কাহার বহুক মারিবে তার জন্য অমরা মিটিং ডাকি বিচার করিবেন। মগের মল্লুক পায়হান। এমার বিরুদ্ধে মোক একট দল তিয়ার করিবায় হবে। তার জইন্য এলা মুই ভুচিয়ালের বাড়ি যাম।

(ভুচিয়ালের প্রবেশ)

ভুচিয়াল = জগাইদার বাড়িত চলি আসিনু। জগাই দা জগাইদা বাড়িত ছিস।

জগাই = কেই আসিলেন। দরজা খুলা। ভিতর আইস।

ভুচিয়াল = মুই জগাই দা, মুই ভুচিয়াল।

জগাই = ভুচিয়াল ভাই। আয় ভায়া আয়। তোর বাড়ি যাম বলে - আর অমনি তুই চলি আসিলু অনেক দিন বাচিবু।

ভুচিয়াল = হঠাৎ মোর বাড়ি যাবার চিন্তা - ব্যাপার কি।

জগাই = ব্যাপার ছে ভায়া ব্যাপার ছে। শক্ত কাম তুই ছাড়া আর কে পাড়িবে।

ভুচিয়াল = হে দাদা নাম মোর ভুচিয়াল, কাম মোর ভুচিয়াল,যেত্তি যাম সব শেষ। এই জইন্যে সবাই মোক ভয় ভয় করি চলে।

জগাই = এই তাংনি তোর দরকার - মানে খুবেই দরকার। গা এর খবর। সবর ত জানিস ভায়া, কি সব কাণ্ড ঘটেছে। এই সবের কি ব্যবস্থা করা যায় কহোত।

ভুচিয়াল = মানুষের মুখে কানা-ঘুষা মহ শুনুহু। কাথাট তাহলে সত্যি দাদা গাও শিক্ষা কমিটি হরিহরের বিচার ডাকিয়া বিচার হইবে।

জগাই = সত্যি মানে? ইতি মতন নটিশ করিয়া। কি দোষ না ছুয়া ইসকুলত পাঠায়নি। তার পর বহুক ধরি মারিয়া। বহু কাথা যদি না শুনে। এরকম হামার ঘরত কত হয়।

ভুচিয়াল = যত-সব ভুই-ফুটা দেউনিয়া। মোরহ বাড়ি দিন আইত অত্যাচার নাগায় আ। কি তাংনি জানিস মোর বাড়িত এতনা নেংগেরা বেটিছে- তাক ইসকুলত পাঠাবায় হবে - তার নাকি পড়াশুনা করা বেশি দরকার। ইলা ফের কাথা কহয়। এমনে ত নেংগেরা তার ফের কিসের পড়াশুনা। আর তেমনি হইলে তোর ভাউষানী এই নি সব সময় টেকের টেকের।

জগাই = না পাঠাইলে তোরহ একদিন মিটিং ডাকিবে। তখুন বুঝা পাবু কত ধানে কত চাউল।

ভুচিয়াল = তাইলে ইয়ার উপাই কি হবে দাদা।

জগাই = ইয়ার উপাই মোক একট গাও বাচাও কমিটি তিয়ার করিবা হবে।

ভুচিয়াল = কাথাট তুই ভাল কয়হাইস দাদা। গাও বাচাও কমিটি। কাহাক কাহাক নি করিবু দাদা, মুইত নোকে দেখা পাউনি।

জগাই = কেনে তমার পাড়ার হুদু - বুধু - যদু - সদু।

ভুচিয়াল = জিলা নাম কহিলু না দাদা - সবাই গাও শিক্ষা কমিটিত যোগ দিয়া। মুই ত কাহাক দেখা পাউনি। না ইলা ভাল নাহায়, নেংরা বেটিটক ইসকুলত পাঠাবায় হবে। না পাঠাইলে বিচার হবে - দশের আগা কে শরম খাবা যায়। মুই চলিনু দাদা। (প্রস্থান)

জগাই = ঔ ভুচিয়াল শুন শুন । যা বাব্বা- পালাই গেল। বুদ্ধিট মোর খাটিল নি। বড় মুসকিল। না যাউত মিটিংগত হরিহরের কি বিচার হচে। দেখি আসু। (প্রস্থান) (দৃশ্য শেষ)

## অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্যে - সবুজ, বেঙ্গু, হরিহর, দুর্গা, চেতনা আরো অনেকে।

(সবুজ, বেঙ্গু কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে)

বেঙ্গু = সবুজদা একট কিন্তু ভাল কাম হইলে। গাও গেরামের চেহারা একদম পালটি গেলে। দশটা বাজিলেই সব ছেলেমেয়ের দল ইসকুলত যাহা। আগে এরকম দেখা যায়নি। মানুষলা শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়া।

সবুজ = তাইলে বেঙ্গুদা তুই কহচিস গাও শিক্ষা কমিটি করি হামার খুবেই ভাল কাম হইলে।

বেঙ্গু = হে সবুজদা। ভাল মানে যে, ইসকুলত ছাত্র হচিল নি, সেই ইসকুলত এখুন ছাত্র ধরিবা পারেনি। আর পরা শুনাও ভাল হচে। তার মানে এলা গা এর মানুষ আর ইসকুলের মাষ্টারলার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল হইলে। মাষ্টার মশায়রা ঠিক সময় ইসকুলত আসেহে।

সবুজ = তাহাও গাওত কিছু অবুজ আর বোকা নোক ছে বেঙ্গু দা। এত কহি অ ছুয়াক ইসকুলত পাঠায়নি। সেই রকম এক জনাক নটিশ দিয়াও। এলায় আসিবে।

বেঙ্গু = কাহাক নটিশ দিয়াইস সবুজদা।

সবুজ = ঔ হামার পুব পাড়ার হরিহর। কি করিয়া জানিস উয়ার বহু- দুর্গা বেটা বেটিলাক ইসকুলত পাঠায় আ। এই কাথা শুনি বহুটাক ধরি মাইর দিয়া। সেই কারণে আইজ হরিহরের 'বিচার হবে'

= এই রকম কিছু বেকা - অবুঝ নোকের তাংনি সমাজের কোন উন্নতি হবেনি। জীবনে শিক্ষা যে একান্ত দরকার অমরা বুঝিবা চাহেনি।

বেঙ্গু = হরিহরের শিক্ষা দুয়া উচিত - না হইলে ভয় করিবানাহা (ঘারে গামছা - হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর = চল দুর্গা চল, মোর বড্ড ভয় করেহে। মোর কাছত আয় - আয়। এই ত দশ ঠাকুরলা তমাক সবার চরণে দন্ডোপোত দন্ডোপোত।

সবুজ = এইত হরিহর আসিল। আয় ভায়া হরিহর আয়, তমরাও আস ভাউসান। বস। দশের ভিতর বস।

হরিহর = দশ ঠাকুর ভগবান - এই বারের মতন মোক মাপ কর।

সবুজ = দশ ঠাকুরলা সবারে অনুমতি নি হরিহরের বিচার শুরু করি। হরিহর ভাই ঘটনা কি সত্যি।

হরিহর = না -না হে -হে। ঔ চেতনার মারে জিলা শিখা দিয়াউ মহোনি চুপ করি থাকিস না। দশ ঠাকুরলা মোর ভুল হইলে।

বেঙ্গু = তুই নিজে কহো হরিহর। ব্যাপার কি সত্যি তোর বহু বেটা - বেটিলাক ইসকুলত পাঠায় তার জইন্য ধরি মাইর দিয়াইস।

হরিহর = হে হে হে দশ ঠাকুরলা এংনা অলফ মারিয়াউ নি তে কি। ঘটনা কহনি দুর্গা চেতনার মারে কহনি।

সবুজ = কেনে মারিলু হরিহর ভাই। সব খুলাই কহো সব শুনি দোষ-গুণ বিচার করি তোর বিচার হবে।

হরিহর = মোর কোন দোষ নাই দশঠাকুরলা। ওই মোর কাথা শুনেনি। মুই কহচং উয়াই কহচে আর উত্তরা-উত্তরি। তাতে মোর মাথা গরম হইল। আর একট কাম করিয়া মোক না কহি বেটি টাক ইসকুলত পাঠায় আ। ওই তাংনে আর কোন দিন এনং হবা-নাহা। দশ ঠাকুরলা মোক ক্ষমা কর। কোর জোরে তমার ঠিনা ক্ষমা চাহাচং।

দুর্গা = দশঠাকুরের ঠিনা মোর অনুরোধ চেতনার বাপক উচিত শিক্ষা দে। বিনা কারণে মাঝেমধ্যে এই ভাবে মোক মারধোর করে। কোন দিন তাস-জুয়া খেলাই মদ খাই আসি মাতলামি, করে আর মোক ধরি মারে। বেটা - বেটিলাক ইসকুলত পাঠাবা চাহোনি। বিনা কারণে মোর দোষ বাহির করে।

বেঙ্গু = হরিহর ভাই তোর বহুর কাথালা কি সত্যি।

হরিহর = ঔ এক আধ দিন এনং হয়, নিতে কি। আর হবানাহা। তমার চরন ধরু দশ ঠাকুর লা। মোক

ক্ষমা কর। মোর বড্ড ভুল হইলে।

সবুজ = হরিহর ভাই এলা তুই তাইলে বুঝিবা পারিলু তোর ভুল হচে। ঠিক ছে তুই যখুন নিজের ভুল নিজে বুঝিবা পারিলু - তুই নিজে কহো কি শাস্তি তোক দুয়া যাবে।

হরিহর = দশঠাকুর, দশ ঈশ্বর ভগবান এই মুই তমার আগা পতিজ্ঞা কনু যা ভুল করিয়াউ আর করিম নি। বুঝিনু শিক্ষা না থাকি দশের আগা আইজ মুই নিজে বকা বনি গেনু। আইজ থাকি বেটি-বেটাক ইসকুলত পাঠাম।

**এক সঙ্গে গান**

আধারে জ্বালিয়ে আলো
গাও বাসী শিক্ষার দিকে এগিয়ে চলো.
মানব মন্দিরে জ্বালো শিক্ষার আলো।
লাঙ্গল জোয়াল কোদাল খুন্তি
যেমন কৃষক তোমার হাতিয়ার
হাতে কলম ধরো —
কলমটা হাতিয়ার।
তাই তো সব শিশুকে পাঠাতে হবে ইসকুলে
লেংড়া, খোড়, অল্পবুদ্ধি তারাও যাবে ইসকুলে
বিদ্যা লাভে আছে সবার অধিকার।
আধারে জ্বালিয়ে আলো
গাওবাসী শিক্ষা নিতে এগিয়ে চলো।

---

সংগ্রহসূত্র

অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের কুশমণ্ডির উষাহরণ রোডে বাস করেন খুশী সরকার। এখন কুশমণ্ডী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি ব্লক। খুশী সরকার বহু 'খন' পালা নাটকের রচয়িতা। তিনি নিজেই মূল চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর কাছ থেকেই এই 'খন' পালা নাটকটি সংগৃহীত। 'খন' নাট্যানুষ্ঠান অনেক জায়গায় দেখেছি। সংগৃহীত 'খন' লোকনাটকটির নাট্যানুষ্ঠান ইসলামপুর শহরে রাজ্যস্তরের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতউৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এই নাটকের অভিনয় দেখি।

# রাম বনবাস

গান

গায়ক — রাম তোর নবীণ জটাধারী হে রাম তোর নবীণ জটাধারী।
আদি কাণ্ডে রামের জনম, বিবাহ সীতার।
অযোধ্যা কাণ্ডেতে শ্রীরাম ত্যাজে রাজ্য ভার।
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিস্কিন্ধা কাণ্ডতে হয় সুগ্রীব মিলন।
সুন্দরা কাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কা কাণ্ডেতে হয় রাম রাবণের রণ।
উত্তরা কাণ্ডেতে হয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতা দেবী পাতালেতে করিলেন প্রবেশ।
এই সপ্ত ভান্ড সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপণ।
(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

রাম — শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে যাব আমি বন।
পিতা-মাতা ভাই সহ থাক একস্থানে,
চৌদ্দ বৎসরের জন্য যাব আমি ঐ অরণ্য কাননে।।

লক্ষ্মণ — শোন দাদা আমার বচন।
আপনার সঙ্গে আমিও যাব বন।

রাম — ভাইরে লক্ষ্মণ, সত্যই কি যাবি তুই আমার সাথে পিতৃসত্য করিতে পালন
লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর বনবাস দারুণ যন্ত্রণা নারিবি সহিতে প্রাণে।
তার চেয়ে থাক তুমি হেতায় গৃহ মাঝে। পিতৃ সেবা কর তুমি আনন্দিত মনে।

লক্ষ্মণ — বাঃ পিতৃসেবা যে পিতার স্বর্ন নির্মাণ পাষাণ।
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইতে পারে বিনা দোষে বন।

রাম — চুপ কর ভাই। পিতা যে পরম গুরু তাকি তুমি জান না।

কথায় বলে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তপঃ প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা।

পিতা যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সব দেবতা সন্তুষ্ট থাকে।

আমাদের পিতা অসন্তুষ্ট থাকায় তাই আমাদের বনে যেতে হচ্ছে।

সীতা সীতা তুমিও চাও সতী আমার সাথে যাইতে বনবাসে।

সীতা — হে দেবতা। স্বামী ছাড়া কি নারী একায় থাকতে পারে।

আমিও তোমাদের সঙ্গে বনে যাব স্বামী।

রাম — তবে চল ভাই লক্ষ্মণ আমরা এখন বনে গমন করি।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ — হরি বল মন হরি বল। শুন বাবা শ্রীরাম লক্ষ্মণ, দ্বারতে দাঁড়িয়ে আছি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

রাম — ভাইরে লক্ষ্মণ আমাদের যাত্রার সময় একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এসেছে তারে কি ভিক্ষা দিব ভাই।

লক্ষ্মণ — দাদা আমায় আদেশ দিন, আমি ঐ দার থেকে ভিক্ষা এনে দিই।

রাম — আমি থাকতে তোমায় যেতে হবে না ভাই। আমি নিজেই ভিক্ষা করতে চল্‌লাম।

লক্ষ্মণ — শোন দাদা আমার বচন। পিতা মাতার রাজ পোষাক ব্রাহ্মণকে কবির দান। আর আমরা ছদ্ম বেশে করিব গমন। ঠাকুর এই ভিক্ষা।

ব্রাহ্মণ — হরি বল মন হরি বল।

(ব্রাহ্মণের প্রস্থান)

রাম — তবে চল ভাই লক্ষ্মণ আমরা এখন বনে গমন করি। যাবার সময় মনের দুঃখে একটি গান গেয়ে বনে করিব গমন।

গান

ও ভাই লক্ষ্মণ চল যাই ভাই বনবাসে

বনে গিয়ে কাল কাটাবারে ভাই।

কিষ্কিন্ধ্যানগর (বালি, সুগ্রীব ও তারার প্রবেশ)

বালি — শোন ভাই সুগ্রীব আমার বচন। আজি নিশীথে দেখিলাম কুস্বপন। কোথাকার দানব এসে আমার ঐ মধুবন ভেঙে চুরমার করেছে। সেই দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাব ভাই দুইজন।

সুগ্রীব — তবে চল দাদা, বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। যুদ্ধ করিতে যাব ভাই দুই জন।

গান

মূল গায়ক — দানব রাজা মনে করে বনে এলেন বালির সম্মুখে কথা বলিতে লাগিল

ধূয়া —

(দানবের প্রবেশ)

দানব — যুদ্ধের কারণে বেড়াই ভুমণ্ডল ধরা হিমালয়। গিয়েছিলাম গন্ধমাদনে যুদ্ধের কারণ। সেই বালী তোমার বিক্রম। ব্রহ্মায় দিয়েছে বর নাহিক মরণ। বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। যুদ্ধে করহ গমন।

বালি — শোনরে দানব বেটা এই ধনুক টঙ্কারে তোর কাটিয়া লইব মাথা। যদি জীবনে ভয় থাকে কর পলায়ন। নতুবা ধর অস্ত্র কর রণ, বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

দানব — যদি যুদ্ধে না কর গমন তব রাজ্য আমার হস্তে কর অর্পণ। নইলে ধর অস্ত্র কর রণ। বৃথা বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

বালি — ভাই সুগ্রীব ধর অস্ত্র কর রণ। শত্রুকে পাঠায় দেই যমের ভূবন।

(যুদ্ধ করতে করতে দানবের প্রস্থান)

শোন ভাই সুগ্রীব আমার বচন। দানব মারিতে যাব পাতাল ভূবন। যতদিন দানব মেরে না আসবো ফিরে ততদিন থাকবে তুমি ঐ সুড়ঙ্গের দ্বারে। তুমি আমার কনিষ্ঠ ভাই। আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও ভাই।

তারা — তবে যাও প্রাণ নাথ। আমি তোমার হাসি মুখে বিদায় দিলাম ভালভাবে দানব মেরে ফিরে এস ঘরে। এই হতভাগিনীকে প্রিয়ে বলে স্মরণ করিবে।

বালি — শোন তারা যতদিন দানব মেরে না আসব ফিরে ততদিন থাকবে তুমি রাজ সিংহাসনে বসে।

(সকলে প্রস্থান)

গীত

গায়ক — শোন প্রভু দয়াময় দানব পলালে বালীভাবে মনে মনে। দানব মারিতে গেল পাতাল ভূবন। দানব পলালে বালীভাবে মনে মনে। ওহে দানব মারিতে গেল পাতাল ভূবনে। ওহে...

(আগে দানব পরে বালীর প্রবেশ)

বালি — শোনরে দানব বেটা আমার বচন। যুদ্ধ কবিতে এলাম পাতাল ভূবন। যদি জীবনের ভয় থাকে কর পলায়ন নতুবা ধর অস্ত্র কর রন। বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

দানব — আরে আরে চন্ডালিয়া বালি শোন আমার বচন। যুদ্ধ করিতে এলে পাতাল ভূবন। তবে এস যুদ্ধে হও অগ্রসর। বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

(যুদ্ধে দানবের পতন এবং বালীর প্রস্থান) (প্রজাগণের প্রবেশ)

প্রজাগণ — কেরানি সাহেব, কেরানি সাহেব।

কানা — ভায়া নেন্দাডুরে

বড় প্রজা — আরে হল কি, পিছন ডাক দিচ্ছ কেন।

কানা — যাচ্ছ কোথায়।

ছোট প্রজা — কেরানী সাহেবের বাসায়। কিছু সাহায্যের জন্য। ও কেরানী সাহেব।

কেরানী — আরে বাবা, তোমাদের হল কি। এই অফিসে এসে চিৎকার করছ কেন।

প্রজা — চিৎকার করছি কেন? দেশে খুব দুর্ভিক্ষ পড়েছে। তাই এসেছি কিছু সাহায্যের জন্য। আমাদের কিছু সাহায্য দিন।

কেরানী — সাহায্য, সাহায্য। আমি পাব কোথায়। এই অফিসে কোন সাহায্য নেই।

বড় প্রজা — এই কয়েকদিন আগে ৫ কুইন্টাল গম এসেছিল। সেইগুলো হল কি?

কেরানী — সেগুলো সব এই গ্রামের প্রজাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কিছুই নেই।

ছোট প্রজা — তাহলে আমরা কিছুই পাবনা। যে করে হোক আমাদেরকে সাহায্য দিতেই হবে। নইলে আমরা কিছুতেই যাবনা। আর বেশী করে চিৎকার করব।

কেরানী — শোনো প্রজাগণ তোমরা যতই চিৎকার করনা কেন, এই রাজ্যে কোনই সাহায্য মিলবে না।

বড়প্রজা — তাহলে কোথায় গেলে আমরা সাহায্য পাব সেখানে আমাদেরকে নিয়ে চলো না।

কেরানী — সাহায্য নিতে হলে তোমাদের অনেক দূর যেতে হবে। সেই কিষ্কিন্ধ্যা নগরে। যেতে পারবে তো।

ছোট প্রজা — কেরানী সাহেব আমরা তো কিষ্কিন্ধ্যা নগর দেখিনি। তবে পেটে যখন ক্ষুধা তখন আমাদের যেতে হবে। ও দাদা আপনি কি যেতে পারবেন?

কানা প্রজা — যেতেই হবে ভাই। নইলে যে পেট ভরবে না।

কেরানী — তবে চল প্রজাগণ। আর দেরী করে লাভ নেই। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

বড় প্রজা — তবে চলেন কেরানী সাহেব।

(সকলের প্রস্থান, তারা ও সুগ্রীবের প্রবেশ, পরে প্রজাগণের প্রবেশ)

কেরানী — (রাস্তায়) দাঁড়াও প্রজাগণ। এই হচ্ছে কিষ্কিন্ধ্যা নগর। আর এটাই হচ্ছে রাজধানী। তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি গিয়ে দেখে আসি রাজকুমার বাসায় আছে কি না। (আসরে গিয়ে) ছোট প্রজাগণ কিছু সাহায্য চায়। তাদেরকে কিছু সাহায্য দিয়ে দিন।

সুগ্রীব — শোনো প্রজাগণ আমি কবে হলাম রাজা আর তোমরা কবে হলে আমার প্রজা। আমার রাজ্য নেই। আমার সিংহাসন নেই। আমি দাদার বিনা অনুমতিতে কোন প্রজাকে সাহায্য দিতে পারব না।

কেরানী — শুনলে প্রজাগণ উনার দাদা বাসায় নেই। সে দাদার অনুমতি ছাড়া কোন প্রজাকে সাহায্য দিতে পারবে না।

ছোট প্রজা — কেন কোথায় গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে দেখেন।

কেরানী — ছোট রাজকুমার আপনার দাদা কোথায় গিয়েছে?

সুগ্রীব — দানব মারিতে পাতালে গমন।

কেরানী — শুনলে প্রজাগণ তিনি দানব মারিতে পাতালে গিয়েছেন।

প্রজা — শুনেন কেরানী সাহেব। পাতালে গেলে মানুষ আর ফিরে আসতে পারে না। এখন এক কাজ করি আমরা সকল প্রজা মিলে তাহাকে রাজা সাজিয়ে দিই।

কেরানী — ছোট রাজ কুমার আপনার দাদা পাতালে থেকে আর ফিরে আসবে না। তাই আমরা সকল প্রজা মিলে আপনাকে রাজা সাজিয়ে দিই। আর আমাদের কিছু সাহায্য দিয়ে দিন।

(সকল প্রজা মিলে রাজা সাজিয়ে দিল)

সুগ্রীব — তবে যাও প্রজাগণ। তোমরা ঐ জঙ্গল থেকে কিছু গাছ পাথর নিয়ে এস। ঐ সুড়ঙ্গের দ্বার বন্ধ করিতে হবে।

প্রজা — ও দাদা আপনি গাছ পাথর আনতে পারবেন তো।

কানা প্রজা — গাছ পাথর। কতগুলো আনতে হবে।

ছোট প্রজা — কতগুলো আনতে পারবেন।

কানা — ধরে নাও ৫-৭ গণ্ডা।

বড় প্রজা — ঐ হবে। চল আর দেরী করে লাভ নেই। (প্রজাগণের প্রস্থান)

সুগ্রীব — কোথায় বাবা অঙ্গদ। কোথায় বাবা অঙ্গদ।

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ — প্রণাম খুড়ো মহাশয়। আমায় আদেশ করেছেন।

সুগ্রীব — যাও বাবা অঙ্গদ ধন ভাণ্ডার হতে কিছু ধন নিয়ে এসো।

অঙ্গদ — তাই যাচ্ছি খুড়ো মহাশয়, প্রণাম তবে চরণে।

(প্রস্থান) (গাছ পাথর নিয়ে প্রজাগণের প্রবেশ)

কানা প্রজা — ভায়া নেন্দাড়ু রে বোঝাটা একটু পিছিয়ে দাও।

ছোট প্রজা — আরে ও দাদা বোঝাটা একটু পিছিয়ে দাও না। দেখ দেখি কাণ্ড। দাদার কেমন জ্ঞান। বোঝাটা দিয়েছি। তার উপর ব্যাগ ছাতাটাও দিয়েছেন।

বড় প্রজা — আরে কি করব ভাই। ক্ষুধা পেটে হাঁটতে হাঁটতে শরীর আর চলে না। তাই ব্যগ ছাতাটা দিয়েছি।

ছোট প্রজা — দেখ ভাই ওকেই ক্ষুধা লেগেছে। আর বুঝি আমাদের ক্ষুধা লাগেনি।

(বালির প্রবেশ)

সুগ্রীব — শোন্ দাদা আমার বচন। দানব মারিতে গিয়েছিলে পাতালে। পাত্র মিত্র প্রজাগণ মিলে সকলে এই অক্ষয় কালে করেছে রাজা। তাতে কি অপরাধী আমি।

বালি — অপরাধ। প্রজাগণ আবদ্ধ করে করেছে রাজা সুগ্রীব? তাড়াতাড়ি করে আমার রাজ্য থেকে বের হয়ে যাও। চৌদ্দ বৎসরের জন্য বানরগণকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে চলে যাও। তারা, তুমি এখান থেকে চলে যাও অন্তপুরে।

সুগ্রীব — না। এখন আমি কি করি। বনে যাবার সময় দাদার সঙ্গে রণ করে বনে করিব গমন। শোন্ দাদা আমার বচন। পিতার অর্ধেক রাজ্য আমার হস্তে কর অর্পণ। নতুবা ধর অস্ত্র কর রণ। বিলম্বের নাই প্রয়োজন। (যুদ্ধ করতে করতে উভয়ের প্রস্থান)

গীত

মূল গায়ক — স্তব করিতে এল মুনি পঞ্চবটির বনে।
ওহে ... তিন মুনি যুক্তি কষেণ স্তব করিতে ।।

(মুনিগণের প্রবেশ)

১ ম মুনি — তুমি কোন্ হে মুনি ঠাকুর।

২য় মুনি — আমি চোখ নেত্ড়া মুনি হে মুনি ঠাকুর।
তুমি কোন্ মুনি হে মুনি ঠাকুর।।

৩ য় মুনি — আমি শিক্ষা ধারী মুনি হে মুনি ঠাকুর।
তুমি কোন্ মুনি হে মুনি ঠাকুর।

১ম মুনি — আমি জটাধারী মুনি হে মুনি ঠাকুর।

গীত

তুমিও মুনি আমিও মুনি, মুনি তিন জন।
স্তব করিতে এলাম আমরা পঞ্চবটির বন।

পাঠ — ওহে মুনিগন এই বনে আমরা স্তব আরম্ভ করি।

গায়ক — ইন্দ্ররাজা মনে করে, ধেয়ে এলেম বনে। ওহে ...
হায়রে, মরি মরি, হায়? দারুণ বিধি। ওহে...

ইন্দ্র — শোন ওহে মুনিগণ। পিতৃসত্য পালিতে আসিবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। বিশ্বকর্মার ধনুক বাণ শ্রীরাম লক্ষ্মণকে করিবে দান। এই ধনুক দিয়া রাবণবংশ করিবে ধ্বংস। এই ধনুক বাণ দিলে আমরা সকল দেবতা থাকিব শান্তিতে। তবে ধর ওহে মুনিগণ। (ধনুক বাণ দান করিল)

মুনি — তবে দিন মহারাজ। ওহে মুনি চল অন্যবনে, স্তব আরম্ভ করি।

ইন্দ্র — ওহে মুনিগণ তোমাদের আর একটি কাজ করিতে হবে। ঐ দক্ষিণদিকে গোদাবরী নদীর তীরে একখানি কুটীর তৈরী করে দেবে। এখন আমি আসি। (প্রস্থান)

(রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

গীত

শোন হে তপসি গোঁসাই
তোমার চরণে আমরা করি যে মিনতি।
তোমার চরণে আমরা করিহে ভগতি।
শোনহে তপসি গোঁসাই।

মুনি — আরে আরে কোথাকার দুষ্টো ছেলে তোমরা। আমাদের তপ্ জপ্ সব নষ্ট করে দিলে। তোমরা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাও। ওহে মুনিগণ আবার আমরা স্তব আরম্ভ করি।

রাম — পুনরায় গীত আরম্ভ করে।

মুনি — আরে ছেলে মানুষ, তোমরা একবার থাম। তোমাদের কোথায় ঘর, কাহারি নন্দন। কি কারণে এলে তোমরা পঞ্চবটির বন।

রাম — শোন হে তপস্বী গোঁসাই অযোধ্যাতে বাড়ি মম দশরথের নন্দন। দশরথের চারিপুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। পালিতে পিতার সত্য এলাম পঞ্চবটির বন। শোন হে তপস্বী গোঁসাই।

মুনি — যার জন্যে স্তব করি এ বারো বৎসর তার নাগাল পেলাম আমরা পঞ্চবটির বন। মুনি ভালয় হলো। মুনি ভালয় হলো...

মুনি — শোন, বাবা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। আজ হইতে বিশ্বকর্মার ধনুক করিলাম প্রদান। রাবণ বংশ করিবে ধ্বংস এই ধনুক দিয়ে। আমরা সকল দেবতা সব থাকিব শান্তিতে।

গীত

রাম — ও ভাই লক্ষ্মণরে মুনিগণ চলে গেল
কালবন এবার আঁধার হলরে ভাই:
ও ভাই লক্ষ্মণরে বাঘ আইল, ভালুক এল

গণ্ডার দেখে ভয়না কররে ভাই

(সূর্পনখার প্রবেশ)

সূর্পনখা — আজ নিশীথে দুর স্বপ্ন দেখে মন বড় হয়েছে চঞ্চল। স্বপ্নে দেখতেছি বনে এসেছে মানবের সন্তান। এখন কি করি বনের চারি দিগে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখি, কোথায় আছে মানবের সন্তান দেখে আসিব এখন। আমি তো রাক্ষসের বংশ। রাবণের ভগ্নী কতই মায়া লীলা জানি গো আমি। এখন রাক্ষস মূর্তি রেখে দিয়ে সুন্দর মূর্তি ধারণ করে শিশু দুটির কাছে এসে একটি মন মাতানো গান গেয়ে তাহাদের মনকে গলিতো করে স্বামী করব। দেখি যদি স্বামী বরণ করতে পারি তাহলে মনের আনন্দে ভক্ষণ করিব আমি।

গায়ক — রাক্ষস মূর্তি রেখে দিয়ে সুন্দর মূর্তি ধরে ওহে ... হস্তে ফুলের মালা লয়ে ধেয়ে এল বনে ওহে।

সূর্পনখা — নানা আর কতদিন ধরে ঘুরবো বন মাঝে। দেখি তাদের মন ভুলিয়ে স্বামী বরণ করতে পারি কি না।

সূর্পনখার গীত — শোন হে সুন্দর যুবক আমায় কর বিবাহ আমায় কর সাধী।

রামের গীত — শোন হে সুন্দর যুবতী না করিব বিবাহ না করিব সাধী।

সূর্পনখার গীত — শোন হে সুন্দর যুবক কোথায় তোমার বাড়ী ঘর, কাহার নন্দন। কোথায় কি কারণে এসেছ তোমরা পঞ্চবটি বন।

গীত

রামের গীত — শোন হে সুন্দর যুবতী। অযুধ্যাতে বাড়ী মম দশরথের নন্দন। দশরথের চারিপুত্র জেষ্ঠপুত্র রাম। পালিতে পিতার সত্য এলাম পঞ্চবটি বন। শোন হে সুন্দর যুবতী। কোথায় তোমার বাড়ী ঘর কাহারো নন্দিনী কি কারণে বেড়াও তুমি হয়ে একাকিনী। শোন হে সুন্দর যুবতী।

সূর্পনখার গীত — শোন হে সুন্দর যুবক লঙ্কাতে বসতি মম

রাবণের ভগ্নী

স্বামী হারা হয়ে আমি বেড়াই একাকিনী

শোন হে সুন্দর যুবক।।

রামের গীত — শোন হে সুন্দর যুবতী। আমার ঘরে আছে ভার্য্যা ভাই করবে সাধী।

সূর্পনখার গীত — শোন হে সুন্দর যুবক আমায় কর বিবাহ

আমায় কর সাধী।

লক্ষ্মণের গীত — শোন হে সুন্দর যুবতী না করিব বিবাহ

না করিব সাধী।

গীত

সূর্পনখার গীত —শোন হে সুন্দর যুবক যেমন সুন্দর পুরুষ তুমি তেমনি আমি নারী।
মজিব আমরা দুইজন দেখবে নগর বাসী

লক্ষ্মণের গীত —তুমি তো যুবতী নারি হে কন্যা, আমি শিশু মতি গো
আমি কি রাখিতে পারি কন্যা তোমার পিরীতি গো।

সূর্পনখা — না তোমরা আমার কেহ বিবাহ করিতে রাজি হলে না। এখন কি করি। এই সুন্দর মূর্ত্তি রেখে দিয়ে রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে ঐ ভার্য্যাটিকে ভক্ষণ করিতে আসব। দেখি যদি ভক্ষণ করিতে পারি তাহলে শ্রী রাম লক্ষ্মণের অপমানের প্রতিশোধ আমি নিতে পারি কি না।

সূর্পনখার গীত —রক্ষা কর হে প্রভু রক্ষা কর মোরে রে
বিধি কি হল কপালে।
আমারে না খাইত আসে হে প্রভু।
ঐ বনের রাক্ষসীরে বিধি ... কপালে

রাম — ভাই লক্ষ্মণ ঐ রমনীকে আর যন্ত্রনা না দিয়ে
শিঘ্র বিবাহ করে ফেল।

লক্ষ্মণ — রমণী তোমার মাথার ঘোমটা দাও দেখি আমি তোমায় বিবাহ করলাম। রক্ত মাংস খাইবার বেটি বড়ই ছিল মন অসন্তিতে নাক কর্ণ করিলাম ছেদন।

(সূর্পনখার রোদন ও সকলের প্রস্থান)

(খর ও দূষণের প্রবেশ)

খর — ভাইরে দূসন বাহিরে দিকে করুণ সুরে কে করিছে রোদন। আপনার লোক হইলে আনিবে নিকটে। অন্য অপর হলে কশাঘাত করে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।

দূষণ — দাদা আজ্ঞা কর তুমি। শিঘ্র গিয়ে দেখে আসি আমি।

খর — মহাদেশ দিলাম আমি। শিঘ্র করে যাও তুমি।

দূষণ — ভগ্নী সূর্পনখা তোমার এমন দুঃখদশা কে করেছে। শিঘ্র গিয়ে বড় দাদার কাছে গিয়ে জানাও। শিঘ্র করে বল কথা। আমরা তাহার কাটিব মাথা।

সূর্প — শোন গো দাদা খরতূষণ ভ্রমিতে গিয়েছি পঞ্চবটির বনে। তথায় মুনি তুল্য কিন্তু নহে মুনি সঙ্গে লয়ে আছে এক সুন্দর সরল কামিনী। রামের কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ মহাবীর তাহার সহিত দাদা কেবা হবে থির।

খর —— ভাই রে দূষণ যাও ভগ্নী সাথে। কোন বেটা ভণ্ড তপস্বী আইল বনের ভিতর। যেমন করেছে অবিচার ভগ্নি সূর্পনখারে। উচিত শাস্তি দেহ তাহারে।

দূষণ — একায় না যাব দাদা, যাব ভাই দুই জন। যুদ্ধ করে বেটাদের বধিব জিবন।

(সকলের প্রস্থান)

গায়ক — ও বীর সাজিল রে খর আর তূষণ বীর সাজিল রে
এক লম্ফ দিয়া বীর সাগর কিনারে।
দুই লম্ফ দেও বীর সাগর ডেংগিল।
তিন লম্ফ দেও বীর পঞ্চবটির বনে। ও বীর

(খর দূষণ ও সূর্পনখার প্রবেশ)

খর — ভগ্নী সূর্পনখা কোথায় সেই দুষ্ট বেটারা দেখারে মোরে। এখনই উচিৎ শাস্তি দিব তাদেরকে।

সূর্প — ঐ যে দাদা ভণ্ড তপস্বিরা বসিয়ে আছে কুটিরের মাঝে। দেখ দেখ দাদা গো তোমরা দুই জনে চেয়ে।

খর — ভগ্নি সূর্পনখা তুমি এখান থেকে অন্তপুরে করহ গমন। ইহার বিহিত ব্যবস্থা করিতেছি এখন।

সূর্প — তবে চল্লাম দাদাগো ইহার বিহিত ব্যবস্থা কর গো এখন।

(প্রস্থান) (রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ)

দূষণ — কি রে পাপিষ্ঠ জটাধারী আজি কার রণে তোদের পাঠাব যমপুরী।

রাম — ফল মূল খাই মাত্র বাস করি বনে। বিনা অপরাধে যুদ্ধে চাও কি কারণে।

খর — মনুষ্য হইয়া তোর এতো অহংকার। দেবগন পদতলে তুমি কোন ছার। কত বান মারিবে তুমি অগ্রে যাক দেখা। আজি কার রণে তোর মৃত্যু আছে লেখা। ধর অস্ত্র কর রণ বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। (সকলের প্রস্থান)

লঙ্কা পুরী

(রাবণ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাবণ — মন্ত্রীবর বহুদিন ধরে রাজত্ব করে আসিতেছি, কোনদিন আমার মন চঞ্চল হয়নি। আজকে মন বড় চঞ্চল হওয়ার কারণ কি মন্ত্রীবর।

মন্ত্রী — উঃ চঞ্চল হওয়ার কারণ রয়েছে মহারাজ।

রাবণ — কি কারণ রয়েছে মন্ত্রিবর প্রকাশে বল।

মন্ত্রী — মহারাজ আপনার রাজ্যে বহুদিন ধরে রাজ সভা করা হয়নি। তবে রাজ সভা করিলে আপনার মন শান্তি হতে পারে।

রাবণ — তবে রাজসভার আয়োজন করুণ মন্ত্রীবর।

(বাহিরে সূর্পনখার রোদন)

মন্ত্রীবর দেখ তো বাহির দিকে করুণ স্বরে কে করিছে রোদন। আপনার লোক হইলে আনিবে নিকটে। অন্য হলে কশাঘাতে তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে।

মন্ত্রী — কে, ভগ্নী সূর্পনখা তোমার কি হয়েছে। তোমার এমন দশা কে করেছে। যাও তোমার বড় দাদার কাজে গিয়ে সব সমাচার জানাও।

(সূর্পনখার প্রবেশ)

রাবণ — কে ভগ্নি সূর্পনখা তোমার এমন দুঃখ দশা করেছে কে. বল প্রকাশে।

সূর্পনখার — শোন গো দাদা লঙ্কেশ্বর। ভ্রমিতে গিয়েছিলাম পঞ্চবটির বন। মুনি তুল্য কিন্তু নহে মুনি সঙ্গে লয়ে আছে এক সুন্দর সরলা কামিনী। রামের কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ মহাবীর। তাহার সহিত দাদা গো কেবা হবে স্থির। সীতার সমান রূপ আর নাই কোন নারী। তোমার সাক্ষাতে দাদা বলিলাম সত্য করি। যেমন মহত তুমি পুরুষ সমাজে, কেবল মাত্র রাজপাত্র সাজে গো তোমারে।

রাবণ — আমারে হাঃ হাঃ হাঃ ভগ্নী সূর্পনখা, তুমি এখান থেকে অন্তপুরে করহ গমন। ইহার ব্যবস্থা করিতেছি এখন।

সূর্পনখা — তাই যাচ্ছি দাদাগো ইহার ব্যবস্থা করোগো এখন।

(প্রস্থান)

রাবণ — কোন বেটা ভণ্ড তপস্বী আইল বনের ভিতরে, অপমান করেছে ভগ্নী সূর্পনখারে। না না এখন কি করি মারীচের কাছে গিয়ে পরামর্শ করি। এস মন্ত্রীবর।

(প্রস্থান)

(মারীচের প্রবেশ ও পরে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — শোন হে মারিচ প্রবীন, লঙ্কায় পাত্র না দেখি তোমার সমান।

গীত

রাবণ — হস্তে ধরি পায়ে পড়ি রে, মামা করি নিবেদন। ওহে মায়া মৃগ বেশে যাহ কুটিরের পাশে। সোনার বরণ দেহখানিরে এ মামা, রূপার মস্তকখানিরে নাচিতে নাচিতে যাহ কুটীরের পাশে ওহে। তুমি যাহ আগে আগেরে এ মামা আমি যাব তোমার পিছেরে।

পাঠ — মামা অতি সত্বরে যাও তুমি ঐ কুটীরের পাশে।

মারীচ — প্রাণ প্রিয়া রামের সুন্দরী, হরিলে কি তোর রইবে সোনার লঙ্কাপুরী। পায় ধরি হে লঙ্কার নাথ

করি হে মিনতি, ক্ষমা কর রক্ষ কর লঙ্কার বসতি। পরস্ত্রী দেখে তুমি বড় হও সুখি। সবংশে মারিবে রাজা শেষে করবে দোষী।

রাবণ — মামা অতি সত্বর তুমি যাও ঐ কুটীরের পাশে,। যদি আমার কথা করহ লংঘন এই অস্ত্রাঘাতে তোর বধিব জীবন।

মারীচ — হে লঙ্কেশ্বর মৃগ বেশে যাব তার কাছে, অগ্রে মৃত্যু আমার, শেষে মৃত্যু তোমার। আমায় যেন না কর দোষী।

রাবণ — হাঃ হাঃ হাঃ যাও যাও বড় প্রীতি হলাম তোমার প্রতি আজি। এস মামা আমার রথের উপর। (উভয় প্রস্থান) (রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

গীত

গায়ক — রাবণ রাজা রথে করে দেখাইল সীতারে।
ডাইনে শ্রী রাম রামে লক্ষ্মণ মাঝে সীতা বসে।

ধুয়া — রাবণ ..... বসে।

(মৃগ প্রবেশ করে)

সীতা — দেখ দেখ নাথ, কি সুন্দর স্বর্ণ মৃগ কুটীরের পাশে করিছে খেলা। আহা কি সুন্দর ঐ দেখ নাথ।

গীত

সীতা — অকি প্রান নাথ বার বৎসর গতরে হইল। দুইও বৎসর বাকি প্রাণনাথ দেশে যাবার মন হয়েছে। মন হইল উদাসী প্রাণনাথ। অকি প্রাণনাথ ঐ যে সোনার মৃগ ধরে দেহ মোরে প্রাণনাথ, বড়ই মনের আশা করে পুষিব তাহারে প্রাণ নাথ। অকি প্রাণনাথ না মারিও না বধিও, জীয়ান্তে ধরিও প্রাণনাথ। বড়ই মনের আশা করে পুষিব তাহারে প্রাণনাথ।

রাম — সত্যই তো অতি সুন্দর স্বর্ণ মৃগ স্বর্ণ কায়, নয়ন রঞ্জন। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ চেয়ে দেখ ভাই হেন মৃগ দেখিনি কভু।

লক্ষ্মণ — যেওনা যেওনা ওগো দাদা মৃগ ধরিবারে গো মৃগ, ধরিতে গেলে, ওগো দাদা ঘটিবে বিপদ গো।

রাম — ভয় কি ভাই ঐ মৃগ যদি না হয় স্বর্ণ মৃগ, হয় যদি কোন্ মায়াবী রাক্ষস রাক্ষসী পরিত্রান পাবে না কেহ আজি। রহ তুমি সীতার রক্ষায় যাবত না আসি আমি এখনই ধরে আনব স্বর্ণ মৃগ।।

গীত

ধরা দে ধরা দে, ওরে মৃগ, ধরা দে আমারে ওরে মৃগ ধরা দে

যদি ধরা দিবে ওরে মৃগ সীতার সোহাগিনিরে ওরে ....

না মারিব না বধিব ওরে মৃগ জীয়ন্তে ধরিব রে। ওরে ....

যদি ধরা নাহি দিবে ওরে মৃগ বধিব পরানে রে। ওরে....

রাম — কোথায় আছ ভাই, প্রাণের লক্ষ্মণ, রক্ষা কর রাক্ষসের হস্তে পড়েছি। (বলতে বলতে প্রস্থান)

সীতা — ঐ ঐ প্রভু রঘুনাথের আত্ম কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যাও যাও লক্ষ্মণ রক্ষা কর গিয়ে।

লক্ষ্মণ — অধৈর্য হইওনা দেবী, কে নাশিবে রামের প্রাণ হেন শক্তিবাণ কে আছে জগতে।

গীত

সীতা — যারে যারে লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ দেওর তোর ভাইএর উদ্দেশেরে বিধি কি হইল কপালে।।

তোর ভাইকে খেয়ে ফেলবেরে লক্ষ্মণ ঐ বনের রাক্ষসী রে। বিধি ...

গীত

লক্ষ্মণ — তুমি কি জান না, সীতা গো দেবী ধনু ভঞ্জন গো শ্রী রাম দাদা মোরে, সীতা গো দেবী মারিতে পারে কে।

গীত

সীতা — বুঝিলাম বুঝিলাম লক্ষ্মণ দেওরা তোর মনের চাতুরীরে

বিধি কি হল কপালে।

ভরত নিল রাজ্য, ওরে লক্ষ্মণ তুই নিবি সীতারে

বিধি কি হল কপালে।

লক্ষ্মণ — না এখন আমি কি করি, রেখা দিয়ে যাই।

গীত

এক রেখা দিলাম আমি চন্দ্র সূর্য নামে

দুই রেখা দিলাম আমি মাতা পিতার নামে

তিন রেখা দিলাম আমি শ্রী রাম দাদার নামে

ওগো জানকী সীতা দেবী

দোহাই ধর্মে বলি, সীতা গো দেবী রেখা না হও পার গো

রেখা পার হলে, সীতা গো দেবী ঘটিবে বিপদ গো।

(ছদ্মবেশে রাবণ প্রবেশ)

গীত

ভিক্ষা দেরে শ্রী রাম লক্ষ্মণ দরিদ্র ব্রাহ্মণে
কাল করেছি নিরামিসি। আজকে আছি উপবাসি হে
ভিক্ষা .... হে

রাবণ — মা মা তোমার কুটীরে কিছু ভিক্ষা পাই

সীতা — শুন হে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আমি বলি তোরে। কি দিয়ে
বুঝাব তোমায় অন্ন নাহি ঘরে।

গীত

রাবণ — ওরে আমার কপালে ভিক্ষা হলনা রে
বৈশাখ মাস ধর্ম মাস ভগদই ছিটাছিটি
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম, খাইতে বড় স্বাদ
আষাঢ় মাসে অনাবিষ্টি, বিনা মেঘে কাছ
শ্রাবণ মাসে ঘন মেঘ চুয়ায় পড়ে ব্যাঙ
ভাদ্রমাসে মনসা পূজা, জলে ভুরা ভাসে
আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, ঘরে ঘরে জ্বলে
কার্ত্তিক মাসে কালি পূজা পাঠা বলিদান
অগ্রাহণ মাসে নতুন ধান ঘরে ঘরে নবান
পৌষ মাসে পৌষ আলো চিড়ায় লেপন
মাঘ মাসে মাঘি জার ঝাপ টানাটানি
ফাল্গুন মাসে দোলের চাঁদ রং ছড়াছাড়ি।
চৈত্র মাসে চৈতা বালী ঠাকুর মেলা লাগে
বারো মাসে তের চাঁদ সর্বলোকে জানে
বারো মাসে তের চাঁদ গেলরে চলিয়া।

পাঠ — মা-মা তোমার কুটীরে কিছু ভিক্ষা পাই।

সীতা — ওহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলি যে তোমায় কিছু বিলম্ব কর
আসুক লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ আসিলে ফল আনিবে প্রচুর।

রাবণ — ওহে দেবী শ্রীরাম লক্ষ্মণ আসিতে বহু বিলম্ব দেখি।

হয়েছে স্নানের বেলা। ঐ দেখ চন্দ্রমুখি। যদি আমার

ভিক্ষা দাও আন সত্বরে নতুবা উত্তর দাও ফিরে যাই ঘরে।

সীতা — ঠাকুর তবে দিতেছি ভিক্ষা। এই যে ধর ভিক্ষা।

রাবণ — দূর হইতে কেমনে লইব ভিক্ষা সুন্দরী। কাছে এসে ভিক্ষা দিয়ে যাও।

সীতা — ঠাকুর রেখা লঙ্গিয়া যাইবার নাহিক আদেশ।।

রাবণ — তবে চল্লাম দেবী।

সীতা — তাইতো তপস্বী ফিরে গেলে স্বামীর যে মহাপাপ হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও দিতেছি ভিক্ষা।

গীত

যা হক তা হক আমার কপালে

ভিক্ষা দিব রেখার বাহিরে

হায়রে মরি মরি

এ ছিল কপালে লেখারে।।

রাবণ — হাঃ হাঃ হাঃ এমন সুন্দরী নরের কামিনী, তোমায় লয়ে যাব আমার সোনার লঙ্কাপুরী। তুমি হবে আমার প্রধান মহিষি। হাঃ হাঃ হাঃ।

সীতা — কে কে তুমি দুর্জয় দানব ছাড়ো ছাড়ো ছেড়ে দাও আমারে।

যে মুখে বলিলে মা সেই মুখে তোর শত পদাঘাত।

রাবণ — স্তব্ধ হও সুন্দরী। ছাড়িব না তোমায়, লয়ে যাব আমার সোনার লঙ্কাপুরি। তুমি হবে আমার প্রধান মহিষী। হাঃ হাঃ

উভয় প্রস্থান

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ — ঘরে আছ কিনা গো জানকী সীতা। শ্রীরাম দাদা এলে আজিরে মুই কি উত্তর দিবরে। শ্রীরাম দাদার ভয়ে আজিরে মুই থাকিবো লুকায়েরে।

রাম — ঘরে আছ কিনা গো জানকী সীতা

তোর কি মনে এই ছিল রে লক্ষ্মণ লয়ে গো সীতারে লক্ষ্মণ

ভরত নিল রাজ্য ওরে লক্ষ্মণ তুই নিলি সীতাকে

যদি গুণের ভাই হরিরে লক্ষ্মণ এসে দেখা কর লক্ষ্মণ

যদি দেখা নাই দিবিরে লক্ষ্মণ এ প্রাণ ত্যাজিব রে লক্ষ্মণ

গীত

লক্ষ্মণ — হস্তে ধরি পায়ে পড়ি গো দাদা ক্ষমা কর মোরে গো
তুমি গেলে আগে গো দাদা আমি গেলাম পাছে পাছে
ফিরে এসে দেখি ওগো দাদা, সীতা নাই মোর ঘরে গো দাদা

গীত

রাম — তুই আমার গুণের ভাই ওরে লক্ষ্মণ
ও ভাই লক্ষ্মণ রে। সীতা মলে সীতা গো পাব
গুণের ভাই কোথায় পাব।

পাঠ — ভাইরে লক্ষ্মণ, কুটীর অন্ধকারময় দেখিতেছি, বোধ হয় সীতা আমার নেই। হায় সীতা হায় জনক নন্দিনী কোথায় গেলে আমারে ছাড়িয়া। এসে একবার দেখে যাও, এই যে তোমার মনমতো মৃগ চর্ম এনেছি।

লক্ষ্মণ — দাদা জানকী বোধ হয় বারি আনিবার জন্য গোদাবর নদীর
তীরে গিয়েছে। না না কলসি যে দেখছি কুটীরে, জানকী
বোধহয় কুসুম চয়নে ভ্রমণ করছে। চল চল দাদা
বনের চারিদিকে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখি।

রাম — তবে চল ভাই লক্ষ্মণ আর বিলম্ব কর না। বনের চারিদিকে
পাতি পাতি করে খুঁজে দেখি।। (প্রস্থান)

(রাবণ ও সীতার প্রবেশ)

সীতা — ছেড়ে দে, ছেড়ে দে রাক্ষস। দশরথ শ্বশুর মম জেষ্ঠ পুত্র রাম, দেওরা গুণের লক্ষ্মণ। সবংশে তোরে করিবে নিধন।

রাবণ — হাঃ হাঃ হাঃ ছারিব না সুন্দরী, তোমার লয়ে যাব আমার সোনার লঙ্কাপুরী। আর তুমি হবে আমার প্রধান মহিষী।

সীতা

সীতা — কোথায় আছ লক্ষ্মণ দেওরা রে, এসে রক্ষা কর মোরে রে
কোথায় আছ জঠাই পাখিরে এসে রক্ষা কর মোরে রে

(জটায়ু পাখির প্রবেশ)

জটায়ু — আরে আরে, নারী চোর কোথায় যায় সীতারে লইয়া
কি জন্য হরিলি তুই রামের সুন্দরী। দশরথ রাজা সতী
ধর্মে তত্পর পুত্র বধু হরিলি তোর কি নাইরে ডর।

রাবণ — দূর হয়ে যা আপদ জঠাই আমার সম্মুখ থেকে।

জটায়ু — আরে আরে নিশাচর সীতাকে না যেতে দিব আমি লঙ্কার ভিতর।

রাবণ — আরে পাখি, না করিস বড়াই পড়েছ আমার হাতে রক্ষা তব নাই।

জটায়ু — আরে আরে পাপ আত্মা রাবণ, এই পাখার আঘাতে তোর বধিব জীবন।

রাবণ — তবে আয়রে পাখি তোর যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিই। (যুদ্ধ)

জটায়ু — একি একি পাখা আমার করিলে ছেদন, এই চঞ্চুর আঘাতে তোর বধিব জীবন। ধর অস্ত্র কর রণ অধিক বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। (যুদ্ধে পাখির পক্ষাঘাত)

রাবণ — একে একে কাটিলাম দুই পাখা, বীরের পরিচয় গেল দেখা। বৃথা মারিতে আসিয়েছিলে সীতা উদ্ধার করিবার তরে।

জটায়ু — উঃ যাই মা, এই দুরন্ত রাবণের হাত থেকে আর তোমার রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি বলি মাগো সীতা নেই আমার হাত, যত যুদ্ধ করিলাম মাগো দেখলে সাক্ষাত।

সীতা — আমার জন্য পাখি মরল রে, শ্বশুর বাবা স্বর্গে গেলরে। হায়রে এই ছিল কপালে লেখা রে।

(রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ)

গীত

রাম — বৃক্ষলতা বলহে কথা বলহে কথা।
বলতে পার সীতার কথা হে
সীতা নাই কাল বনেতে।।
সীতা বিনে উড়াল মাথার জটারে
সীতা নাই কাল বনেতে

রাম — প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ, কোথাও কি পেয়েছ দেবীর অনুসন্ধান।

লক্ষ্মণ — দাদা আমি বনের চারিদিগে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখলাম।
কোথাও না পেলাম আমি দেবীর অনুসন্ধান।

রাম — হায় এখন কি করি। কোথায় যাই। কোথায় গেলে আমার হারানো নিধিকে ফিরে পাব। কে আমার মণির ফণি হরণ করিলে। হে বনের তরুলতাগণ তোমরা কি কেউ দেখছ আমার জানকীকে। হে অশোক তোমার কাছে আশ্রয় নিলে যদি শোক নিবারণ হয় তাহলে আমর ধন সীতাকে ফিরিয়ে দাও।

জটায়ু — হে প্রভু রামচন্দ্র আজ থেকে পাখি জন্ম সার্থক হল। পাখি জন্মে মৃত্যু হয়ে স্বর্গে চল্লাম।
জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয়।

রাম — একিরে কি ভয়ানক পাখির মূর্ত্তি ভাই লক্ষ্মণ। এ পাখি বোধ হয় আমার সীতাকে করেছে ভক্ষণ। আরে পাখি আজ তোরে কে রক্ষা করে।

গীত

জটায়ু — মেরনা মেরনা বাপরে ও বাপ মেরনা আমারে, আমি তো খাই নাই বাপরে হরেছে রাবণ।

গীত

রাম — জটায়ু পাখি বলো হে কথা বলতে পার সীতার কথা হে।
সীতা নাই কাল বনেতে।
সীতা বিনে মাথার জটারে সীতা নাই কাল বনেতে।

পাঠ — তারপর কি হল পাখি রাজ।

গীত

জটায়ু — ঐ তোমার পিতার মিত্র বাপরে, ও বাপ তাহার লেগে মরি।
তোমার সীতা লয়ে গেছে বাপ সোনার লঙ্কাপুরী।(প্রস্থান)

রাম — ভাই লক্ষ্মণ ইনি হল আমার পিতৃ বন্ধু। ইহার দেহ অগ্নি করব পিতার ন্যায় পিন্ডদান করব।
চল এই দেহখানি লয়ে গোদাবর নদীর তীরে যাই।

গীত

রাম — ওহে পাখি হে রাজ তুমি স্বর্গে কর বাস হে
ওহে পাখি হে রাজ
গয়া কাশি ফাল্গু নদী, পাখির করব সেবা স্বস্তি
ভিক্ষা দাও গো নগর বাসি।
পাখির কবর সেবা শান্তি (প্রস্থান)

(রাবণ সীতা প্রবেশ)

সীতা — কোথায় আছ প্রভু রঘুনাথ এসে রক্ষা কর মোরে।
কোথায় আছ লক্ষ্মণ দেওরা এসে রক্ষা কর মোরে।
কোথায় আছ বনের বানর এসে রক্ষা কর মোরে রে।

রাবণ — হাঃ হাঃ বনের বানর রক্ষা করবে তোমায় সুন্দরী হাঃ হাঃ হাঃ
চলে এস আমার সঙ্গে। (প্রস্থান)

(সুগ্রীব বানরগণের প্রবেশ, পরে রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ)

গীত

রাম — ও ভাই লক্ষ্মণরে চল যাই ভাই কিচকিন্দাতেরে
সুগ্রীব রাজা বনবাসীরে ভাই
ও ভাই লক্ষ্মণরে সুগ্রীব রাজা মহাবীর রে
ও ভাই লক্ষ্মণরে সে পারিবে সীতা উদ্ধার করিতে

সুগ্রীব — দেখে আয় তুই, নর মনে করি বালি রাজা পাঠাইল রে।
বুদ্ধির সাগরে বালি বুদ্ধি ধরে নানা। এই বার সত্য মিথ্যা তবে যাবে যানা।

হনু — প্রভু না হও চিন্তিত। বালিরে দেখে কেন এতো হও ভীত। বানর জাতি লোকে উপহাসে। চঞ্চল রাজা লোকে আরো দেখে। আমি গিয়ে দেখে আসি কোথাকার বীর। তথ্য না যেনে কেন হইলে অস্থির।

সুগ্রীব — দেখিয়া তপস্বীর ব্যাস মনে লাগে ভয়, হব কোন্ রাজার কুমার। যাও হনুমান আন সমাচার।।

হনু — প্রভু যে দেখি আকার হবে কোন রাজার কুমার। চন্দ্র সূর্য রূপ যেন ভ্রম ভূমি তবে গগন মণ্ডলী কেন এই বনস্থলে। কোথায় ঘড় কি কারণে হেথায় আগমন। তোমার সহিত মিত্রতা করিতে অভিলাস আমায় পাঠান সুগ্রীব তোমার পাশ।

রাম — শোন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের পাত্রসহ করো সম্ভাষণ।

লক্ষ্মণ — মহারাজ দশরথ পৃথিবী ভুস্বামী, আমরা তাহার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভ্রমিতেছি আমরা সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে, দয়া করে লয়ে চল সুগ্রীবের পাশে।

সুগ্রীব — মিত্রতা করিবে রাম পশুর সহিত, মিত্রতা বলে বীর হও অনুগ্রহ, মিত্রতা বলে বীর হস্তের উপর হস্ত দেহ (মিত্রবন্ধন)

রাম — শুন মিত্র আমার কথা, বনে এসে হারালাম সীতা।
কি প্রকার উদ্ধার করব জনক নন্দিনী সীতা।

সুগ্রীব — শোনো মিত্র আমার বচন, আমরা বানর জাতি ছিলাম পাহাড় পর্বতে এক কন্যা দেখিলাম রাবণের রথে, হাত পা আছড়ায় কঙ্কনের ধ্বনি। যেমন চলে তারাগুলি। অবশেষে বুঝিলাম তোমার রমণী। যত্ন করে রেখেছি ভূষণ উত্তরি, অজ্ঞা করহ প্রভু আনিতে এখন, দেখাব সীতার ভূষণ, যাও হনুমান ভূষণ নিয়ে এস (হনুমান ভূষণ আনিতে প্রস্থান)।

সুগ্রীব — ধর মিত্র সীতার ভূষণ।

রাম — হা মিত্র এ আমার সীতার ভূষণ।

সুগ্রীব — শোন মিত্র আমার বচন, আগে করিব বালী বধ তারপর করিব সীতা উদ্ধার।

রাম — তাই হোক মিত্র আগে করিব বালী বধ। চল মিত্র রণস্থলে (সকলে প্রস্থান)

(বালি ও সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব — শোন্ দাদা আমার বচন পিতার অর্দ্ধেক রাজ্য আমার হস্তে করহ অর্পণ। নতুবা ধর অস্ত্র কর রণ। বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

বালি — আরে আরে চণ্ডালিয়া শোন্ আমার বচন, চৌদ্দ বৎসর গত না হতে আইলে আমার গোচর তবে ধর অস্ত্র কর রণ বিলম্বের নাই প্রয়োজন। (এবার যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব — আজি যদি মরিতাম বালীর সংগ্রামে কি করিবে রাজ্য ধন কি করিবে রামে।

রাম — উভয় দেখিলাম মিত্র যুদ্ধে একই সমান। আপন মিত্র মরিবে বলে না ছাড়িলাম বাণ। মিত্র এইবার যুদ্ধে করহ গমন, বালী রাজার ঠিকেই বধিব জীবন।

গীত

পুষ্প মালার চিহ্ন আজিরে মুই পরাম মিত্রের গলে রে। ওরে গুণের লক্ষ্মনরে।। (প্রস্থান)

(বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ। যুদ্ধে রামের বাণে বালী পতন এবং তারার প্রবেশ)

তারা — একি স্বামী আমার অচেতন দেখছি কেন্। বোধয় স্বামী আমার বেঁচে নেই। ওগো স্বামী (২)

গীত

গুণের স্বামী হে ধন আজি যাবার কালে দেখাগো দিলে না গুণের স্বামী হে ধন। অঙ্গত পুত্ররে মোর শিশুরে মতি কেমনে চালাবে পুত্র রাজ্যগতি গুণের স্বামী হে ধন। সুগ্রীব দেওয়ারে মোর হয়া বাদি; শ্রীরাম মারলেন আমার গুণের স্বামী। গুণের স্বামী হে ধন।

পাঠ — আমি যদি হই সতী ভারত ভিতরে। সীতা লাগি শ্রীরাম, লক্ষ্মন কাঁদিবে সারা জীবন। চল পুত্র অঙ্গদ ফিরে যাই ঘরে। (সকলে প্রস্থান)

( সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মনের প্রবেশ )

সুগ্রীব — কোথায় বাবা অঙ্গদ (অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ — প্রণাম হই খুব মহাশয় আমার কি জন্য আদেশ করেছেন।

সুগ্রীব — যার বাবা অঙ্গত পূর্ব উত্তর পশ্চিম নানা দেশ খুঁজিয়ে সীতারে এনে দেবে।

অঙ্গত — তবে চললাম খুড়া মহাশয়, প্রণাম তব চরণে।

সুগ্রীব — কোথায় বাবা হনুমান (হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান — প্রণাম তব চরণে।

সুগ্রীব — যাও বাবা হনুমান দক্ষিণদিকে আছে রাবণের ঘর। সত্বর সীতার সংবাদ লোয়ে এস আমার গোচর।

রাম — বাবা হনুমান যাবার সময় আমার একটি চিহ্ন লয়ে যাও (রামের অঙ্গুরি প্রদান)

হনু — প্রণাম হই তব চরণে জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয় (সকলের প্রস্থান)।

(রাবণ সীতার প্রবেশ)

রাবণ — কোথায় মন্ত্রীবর (মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী — কি জন্য আদেশ মহারাজ।

রাবণ — মন্ত্রীবর হরিয়ে এনেছি রামের সুন্দরী কোথায় রাখিব কন্যারে বল শীঘ্র করি।

মন্ত্রী — মহারাজ এই কন্যাকে অশোক বনে রাখা হোক।

রাবণ — তবে তাই হোক মন্ত্রীবর (প্রস্থান করে আবার প্রবেশ)

রাবণ — মন্ত্রীবর এই তো অশোক বন। এই কন্যাকে ভালোভাবে দেখিবে। যেন আমার কথা ধরে। আমি এখন চললাম অন্তপুরে।

গীত

সীতা — কোন বনে আনিলে দুষ্ট রাবণ, কোন বনে আনিলে রে বিধি, কি হল কপালে। কোথায় আছো প্রভু রঘুনাথ এসে রক্ষা কররে। বিধি কি হল কপালে। (রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — হাঃ হাঃ ... সুন্দরী রামের সেবা করিতে জন্ম গেল দুঃখে। ইয়ে আমার ভার্যা থাক মহাসুখে। কই উত্তর যে দিলে না। কোথা রে সু-সারণ (সু-সারনের প্রবেশ)

শুক সারণ — প্রণাম হই মহারাজ আমার কি জন্য আদেশ করেছেন।

রাবণ — যাও সুক সারণ আমার চেরিগণকে নিয়ে আস।

শুক — তবে চললাম মহারাজ প্রণাম হই তব চরণে (প্রস্থান)

চেড়ীর প্রবেশ

চেড়ী — প্রণাম হই মহারাজ আমাকে কি জন্যে আদেশ করেছেন।

রাবণ — শোন্ চেড়ী, হরিয়ে এনেছি রামের সুন্দরী। এই কন্যাকে ভালোভাবে দেখিবে আর ভালোভাবে দেখিবে আর ভালো করে বুঝাবে যেন আমার কথা ধরে। আর যদি কথা না ধরে লাঠি দিয়ে প্রহার করিবে তারে চললাম আমি অন্তঃপুরে। এস মন্ত্রীবর আমার সাথে। (প্রস্থান)

চেড়ী — ওগো সীতা শোন্ মোর হিত বাণী, রাবণের মত তুমি আর না পাবে স্বামী। অল্প ধন ধরে রাম

অল্প আয়ু জীবন। চৌদ্দ যুগ রাজ্য রক্ষা করিবে রাবণ। ওগো সীতা রামনাম ভুলে যাও রাবণ নাম করগো স্মরণ, সুখে যাবে দিন।

সীতা — ওগো দিদি রাম বিনে অন্য কাউকে স্বামী বরণ করিতে পারব না।

চেড়ী — ওগো দিদি আর আমার সুখের কথায় হবে না। এখন লাঠি দিয়ে প্রহার করি। (প্রস্থান)

হনুমানের প্রবেশ

হনু — জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয়, মা সীতা, শ্রী রামচন্দ্রের জয়। মা সীতা আমি হলাম শ্রীরামচন্দ্রে চর। উদ্ধার করিতে এলাম তোমার গোচর।

সীতা — স্বরূপে হও যদি শ্রীরামের চর আমার বরতে তুমি হইবে অমর।

হনু — রামের সেবক আমি নাম হনুমান। আমার কথায় যদি না হয় প্রত্যয় রামের অঙ্গুরি হইবে নিশ্চয়। (অঙ্গুরি প্রদান)

গীত

সীতা — এইতো প্রভুর চিহ্ন, চিহ্ন রে বিধি এই তো প্রভুর চিহ্ন। কোথায় আছো প্রভু রঘুনাথ এসে রক্ষা করো রে। বিধি কি হইল কপালে।

হনু — মা সীতা খুধায় আকুল মম প্রাণ। কিছু অন্ন দেহ মোরে করিব ভজন।

সীতা — বাবা হনুমান আমি তোমায় কি খেতে দিব, একটি ফল খাও বাবা।

হনু — মা সীতা, এই ফলে আমার উদর পূরণ হবে না মা, এই ফলের বাগান কোথায় আছে মা।

সীতা — ওই যে বাবা ফলের বাগান তুমি গিয়ে ফল খাও।

হনু — জয় শ্রী রামচন্দের জয়। (প্রস্থান)

রাবণের প্রবেশ

রাবণ — কোথায় রে শুক সারণ, (শুক-সারণের প্রবেশ)

শুক সারণ — প্রণাম হই মহারাজ আমার কি আদেশ করেছেন।

রাবণ — যাও শুক-সারণ আমার ওই অমৃত বাগান পাহারা দাও। যেন কোন শত্রু আক্রমণ করিত না পারে।

শুক — মহারাজ বাগানতো পাহারা দিতে যাব তাহলে আমাকে কিছু চিড়া মুড়কি খেতে দিন।

রাবণ — এই নাও চিড়া মুড়কি ভালোভাবে বাগান পাহারা দেবে। আমি এখন চললাম অন্তঃপুরে।

শুক — লেরে ভাই সারণ তাড়াতাড়ি করে খেয়ে লে। (প্রস্থান)

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু — আরে শুক সারণ তোমাদের মহারাজের মামা এসেছে। কতকগুলো খাজা গজা নিয়ে। তাই তোদেরকে খেতে যেতে বলেছে।

শুক — আরে কি বললে, আমাদের মহারাজার মামা এসেছে তাতে তোর কি হয়েছে।

হনু — তাতে আমার কিছুই হয়নি। আমি বলছি মহারাজের মামা এসেছে কতকগুলে খাজা গজা নিয়ে, তাই তোদেরকে খেতে যেতে বললেন।

সারণ — আরে ভাইয়া সুক খাজা গজা আবার কি রকম জিনিস। তুই যাবি আমি কিন্তু যাব না। এই হনুমান তুই আমাদের নাম কি করে জানলি রে।

হনু — আমি তোমাদের মহারাজের বাড়ির পাশ দিয়ে আসছিলাম। আমাকে দেখে বললে যাও আমার বাগানে দুইজন চাকর সুক সারণ বাগান পাহারা দিচ্ছে। যাও তাড়াতাড়ি করে পাঠিয়ে দাও।

শুক — আরে ভাইয়া ও যখন এতো করে বলছে তাহলে চল
তাড়াতাড়ি খাজা গজাগুলো খেয়ে আসি।

সারণ — আরে ভাইয়া তুই যাবি যা। আমি ততক্ষণ বাগানটা পাহারা দিই।

হনু — আরে শুক সারণ তোমরা কি যাবে না।

শুক — আমি তো যাব, ও যাবে না।

সারণ — আরে ভাইয়া আমরা যে যাব তাহলে বাগানটা কে পাহারা দিবে।

হনু — আমি দেব যাও তোমরা আর দেরি করো না।

শুক — ঠিকই দিবে তো। দেখো এই যে ফলগুলা আছে এ ফল যেন একটাও নরে না, বুঝতে পারছো নইলে একেবারে মা কালীর দ্বারে। চলরে ভাইয়া চল (শুক সারণ প্রস্থান)

হনু — সুক সারণ তোমাদের বাগান এখন পাহারা দিচ্ছি আমি। জয় শ্রী রামচন্দ্রের জয়। (প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ)

শুক — মহারাজ মহারাজ আপনার বলে মামা এসেছে। কতগুলো খাজা গজা নিয়ে তবে দিন আমাদেরকে খেতে দিন।

রাবণ — কে বলেছে, কে বলেছে আমার মামা এসেছে।

শুক — আপনিতো একটা লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রাবণ — তবে এসো তোমাদের খাজা গজা দিচ্ছি (চুল ধরে আছার) যাও বাগান পাহারা দিতে যেন কোন শত্রু আক্রমণ করিতে পারে না। আমি এখন চললাম অন্তঃপুরে।

শুক — আরে ভাইয়া আমি যে বললাম খাজা গজা খেতে যাব না। (প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ এবং পরে সুক সারণের প্রবেশ)

শুক — মহারাজ মহারাজ কোথাকার একটা বানর এসে আপনার বাগানটি চুরমার করেছে।

রাবণ — আর তোমরা এসেছিলে খাজা গজা খাইবারে যাও আমার পুত্র ইন্দ্রজিতকে নিয়ে এসো আমার সম্মুখে।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

ইন্দ্র — পিতা পিতা প্রণাম তব চরণে। আমার কি জন্য আদেশ করেছেন পিতা।

রাবণ — পুত্র ইন্দ্রজিত বলি যে তোমারে কোথাকার বানর আসিয়াছে অমৃত বাগানে বাগানটি চুরবার করেছে শীঘ্র করে যাও। তাহাকে বাধিয়া আন আমার নিকটে।

ইন্দ্র — পিতা তব যদি আজ্ঞা পাই শিঘ্র করে সেই বানরের রণে যাই।

রাবণ — তোমায় আজ্ঞা দিলাম, শিঘ্র যাও তুমি (প্রস্থান)

(আগে হনুমান পরে ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

ইন্দ্র — আরে বাপু বল তোমার নাম, কি জন্য আসিয়াছ এই বন, যদি জীবনের ভয় থাকে কর পলায়ন। নতুবা ধর অস্ত্র কর রণ, বিলম্বের নাই প্রয়োজন।

হনু — জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয় (যুদ্ধ)

ইন্দ্র — এইভাবে হনুমানের না হবে মরণ তাকে আমি ব্রহ্মবাণে করিব বন্ধন। জয় শিবদুর্গার জয়।

হনু — জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রে জয় (যুদ্ধে হনুমান বন্দী ও সকলের প্রস্থান)

( রাবণের প্রবেশ পরে হনুমানকে নিয়ে সুক সারণের প্রবেশ )

সারণ — এই নিন মহারাজ বানরটা, এটাকে ভালো করে শাস্তি দিন।

রাবণ — আরে বাপু হনুমান বলি যে তোমারে কিভাবে হইবে মৃত্যু বলহ আমারে।

হনুমান — মহারাজ আপনার মাথার কেশে আগুন লাগিয়ে দিলে আমার মৃত্যু হইবে।

রাবণ — স্তব্ধ হও পশু, বলো কিভাবে তোমার হইবে মৃত্যু।

হনুমান — মহারাজ আপনার রাজ্যে যত পাট কাপড় আছে আমার লেজে পেচিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে আমার মৃত্যু হবে।

রাবণ — যাও সুক সারন আমার লঙ্কায় যত পাট কাপড় আছে হনুমানের লেজে বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে দেবে যেন নিস্তার না পায়। (প্রস্থান) (হনুমানের লঙ্কা দগ্ধ)

শুক — কে কোথায় আছো রক্ষা কর, রক্ষা কর সোনার লঙ্কা পুড়ে ছাই হলো।

(সীতার প্রবেশ পরে হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান — মা সীতা আমার লেজের আগুন কি প্রকারে নিবরে মা।

সীতা — বাবা হনুমান যাও সমুদ্রে ঝাপ দাও, তাহলে লেজের আগুন নিবরে।

হনুমান — জয় শ্রীরাম চন্দ্রের জয়। তবু যে নিবলো না মা আগুন।

সীতা — বাবা হনুমান তোমার মুখের অমৃত দাও তাহলে লেজের আগুন নিবে।

হনুমান — জয় শ্রী রাম চন্দ্রের জয়, মা সীতা আমার যে মুখখানা পুড়ে গিয়েছে মা। আমার যে আর জাতি বন্ধুরা নিবে না।

সীতা — বাবা হনুমান তোমাদের বংশের সকলের মুখ পোড়া গিয়েছে।

হনুমান — মা সীতা আমি এখন প্রভুর কাছে ফিরে যাব। আমায় কিছু চিহ্ন দাও মা।

সীতা — বাবা হনুমান এই যে আমার মাথার মণি লইয়া যাও।

হনুমান — জয় শ্রী রাম চন্দ্রের জয় (উভয়ের প্রস্থান)

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও পরে হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান — প্রভু প্রণাম তব চরণে। এই যে মা সীতা আপনাকে চিহ্ন দিয়েছে।

রাম — ধন্য ধন্য হনুমান ত্রিভুবনে বীর নেই তোমার সমান।

গীত

এই তো আমার সীতার মণিরে লক্ষ্মণ করে ঝিকিমিকিরে দেখে প্রাণ মোর বাচে না। কোথায় গেলে পাবো ওরে লক্ষ্মণ চন্দ্রমুখী সীতারে। দেখে প্রাণ মোর বাচে নারে।

সুগ্রীব — সখা এরূপ ভাবে রোদন না করে চল লঙ্কায় গিয়ে সীতা দেবিকে উদ্ধার করি।

রাম — তবে চল সখা আর বিলম্ব কর না। (সকলে প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — কোথায় রে শুক সারণ।

শুক সারণ — যাই মহারাজ প্রণাম হই কি জন্য আদেশ করেছেন।

রাবণ — যাও শুক সরণ যাও আমার ধার্মিক ভাই বিভীষণকে নিয়ে আস আমার সম্মুখে। ধর্ম করিলে চলিবেনা, সোনার লঙ্কা পুড়ে হয়েছে ছাড়খার।

(বিভীষণকে নিয়ে সুক সরনের প্রবেশ)

বিভীষণ — কেন ভাই দশানন আমার কি জন্য আদেশ করেছেন।

রাবণ — ভাই বিভীষণ হরিয়ে এনেছি রামের সুন্দরী, কোথা কার বানর এসে পুড়ে দিল আমার সোনার লঙ্কাপুরী। শীঘ্র করে যাও তুমি ঐ নর বানরের রণে। তাহাদেক মারিয়ে আমার শান্তি কর প্রাণে।

বিভীষণ — শোন্ ভাই দশানন, রাম হন বিষ্ণু রূপী স্বয়ং নারায়ণ। তাহাকে বধিবে হেন আছে কোন্ জন। তবে চল সকলে মিলে সীতা দেবীকে ফেরৎ দিয়ে আসি।

রাবণ — কি দুষ্টু বিভীষণ, রামের এতো ডর। কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর।

বিভীষণ — হিৎ বাক্য শোন্ ভাই দশানন সীতাকে রাখিলে তোমার সবংশে হইবে মরণ।

রাবণ — কিরে কাপুরুষ, তুই আমার রাজ্য থেকে বের হয়ে যা। তোর বুকে শত পদাঘাত।

(রাবণের প্রস্থান)

বিভীষণ — আমার ভাই দশানন, আমাকে অপমান করে বের করে দিলে। এখন আমি কি করি। রাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়া যোগদান করব। শোন্ প্রভু রামচন্দ্র আমার বচন, বিপদে পড়িয়ে তোমার লইলাম স্বরণ।

সুগ্রীব — ওহে বিভিষণ, মন্ত্রণা করিতে পাঠায়েছে রাবণ।

রাম — সখা কাতর হয়ে যেবা লইবে স্বরণ; উক্ত হেতু ভাবে তাদের করিব পালন।

বিভীষণ — প্রভু শোন মোর বাণী লঙ্কার রাবণ হরণ করেছে রমণী। অনেক প্রকারে আমি বুঝাইলাম তারে, ক্রোধেতে উঠিয়া আমার বক্ষে লাথি মারে। অপমান হইয়া আমি এলাম তোমার আলয়। যদ্যপি বিশ্বাস না হয় মিতালী করিব নিশ্চয়। (মিতালী বন্ধন)

রাম — মিত্র বিভীষণ, প্রকাশে বলিবে সাক্ষাত আমার, কি প্রকারে ঐ সাগর হইব পার।

বিভীষণ — মিত্র ইহার সুযুক্তি আপনার কাছে আছে, আপনার যে নল নীল হনুমান রয়েছে। তাহাদেক পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে আনিতে বল, তা হইলে সাগর বন্ধন হইবে।

সুগ্রীব — যাও বাবা হনুমান যাও বাবা অঙ্গদ তোমরা ঐ জঙ্গল থেকে কিছু গাছ পাথর নিয়ে এস; ঐ সাগর বন্ধন করিতে হইবে। (সকলের প্রস্থান)

(রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ)

গীত

রাম — ব্রহ্ম বাণ দিয়ে আজিরে মুই সাগর বান্ধিরে ওরে গুণের লক্ষ্মণরে ব্রহ্ম বাণ দিয়ে আজিরে মুই সাগর, তুমি মোরে ওরে গুণের লক্ষ্মণের ব্রহ্ম বাণ দিয়া মুই সাগর বান্ধিরে।

(গঙ্গার প্রবেশ)

রাম — অধম করিলে স্তবফল নাহি দেখে, মারিব সাগর আজি কার বাপে রাখে। তিন দিন উপবাসী আছি তব তীরে। মারিব সাগর আজি অগ্নি জাল বাণে।

গঙ্গা — এতো ক্রোধ মোরে কে শোনো গদাধর, তব পুর্ব বংশ এই করিল সাগর। তুমি মারে মারো এ নহে বিচার, কোন্ অপরাধ করিনু তোমা।

রাম — তিন দিন উপবাসী আছি তব তীরে, মোর সীতা চুরি করে পাপিষ্ঠ রাবণ লঙ্কায় যাব তার উদ্দেশ্য কারণ।

গঙ্গা — নলের পরশে জলে ভাসিবে পাষাণ, সাগর বান্ধিতে কর্ত্তা করহ সে নলে, ভাবিওনা প্রভু তুমি মন কর স্থির। (সকলে প্রস্থান)

(সাগর বন্ধনে গীত)

ওকি ভাইরে পাকুড়ের ডালে সাগর বান্ধিল রে নলে। সে আইলে পার হয়ে যাব সোনার লঙ্কা পুরী গো নলে ওকি ভাইরে। সাগরের জল রে খালি করে টলমল ভাইরে, সে আইলে পার হয়ে যাব শোনার লঙ্কা পুরী গো নলে ওকি ভাইরে ঐ দেখা যায় লঙ্কা পুরী, করে ঝিকিমিকি ভাইরে। সে আইলে পার হয়ে যাব সোনার লঙ্কা পুরীগো নলে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — কোথায় রে শুক-সারণ, একে একে যে সব শত্রু করিল পলায়ন। নইলে তাদের বধিতাম জীবন শুক-সারণ যাও, ভালো ভাবে দ্বার পাহারা দিবে, যেন কোন শত্রু আক্রমণ করিতে না পারে।

শুক সারণ — ঠিক আছে মহারাজ আমরা ভালোভাবে দ্বার পাহারা দিচ্ছি।

মূল গায়ক

অল্পতে পোহায়ে যেন রে অল্পতে রজনী
হেনকালে লঙ্কা এসে ঘেরে রঘুমণি
পশ্চিম দক্ষিণ দ্বারে বীর হনুমান
পূর্ব উত্তর দ্বারে প্রভু রঘু মণি হে
নল নীল সুগ্রীব মিলে সাগর বান্ধল
সাগর বান্ধিয়া তারা এপারে আসিল

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের প্রবেশ)

রাম — কি হল কি হল বিধিরে এ বিধি আমার কপালে ইন্দ্রজিৎ বন্দী করে রে নাকপাশে দিয়া। কোথায় আছো সখা সুগ্রীব এসে উদ্ধার করো হে।

সুগ্রীব — সখা এভাবে রোদন না করে গরুল পাখির নাম স্মরণ করো।

গীত

রাম — কোথায় আছো গরুল পাখি হে পাখি এসে রক্ষা করো ইন্দ্রজিৎ বন্দী করে নাকপাশ বানেরে।

(গরুল পাখির প্রবেশ)

রাম — ওহে গরুল পাখি ইন্দ্রজিৎ আমাদের বন্দি করেছে আমাদেরকে উদ্ধার করো।

গরুড় — হে প্রভু রামচন্দ্র এই তোমাদের নাকপাশ বাণ হতে উদ্ধার করলাম। যখন আপনি এরূপ বিপদে পড়িবেন তখন আমাকে স্মরণ করিবেন আমি বিপদ থেকে উদ্ধার করিব। জয় প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের জয়। (প্রস্থান)

সুগ্রীব — তবে চলো সখা এখান থেকে প্রস্থান করি। (সকলের প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — পুত্র ইন্দ্রজিৎ বন্দি করে নাকপাশ বাণে। তবু না মরিল শ্রীরাম বাঁচিল সে প্রাণে। কোথায় সুক-সারণ।

(শুক সারণের প্রবেশ)

শুক সারণ — যাই মহারাজ, প্রণাম কি আদেশ করেছেন মহারাজ?

রাবণ — যাও সুক সারণ, আমার ভ্রাতুষ পুত্র তরণী সেনকে নিয়ে আস।

শুক সারণ — তাই যাচ্ছি মহারাজ প্রণাম হই।

(তরণীর প্রবেশ)

তরণী — জ্যাঠা জ্যাঠা প্রণাম তব চরণে। আমায় কি জন্য আদেশ করেছেন জেঠা।

রাবণ — বাবা তরণী সেন, এক এক করে লঙ্কা পুরী হইবে শ্মশান। শীঘ্র করে যাও তুমি যেন নর বানরের রণে। তাহাদেক মারিয়া শান্তি কর প্রাণে।

তরণী — জ্যাঠা যদি তব আজ্ঞা পাই, শীঘ্র করে সেই নর বানরের রণে যাই।

রাবণ — তোমায় আজ্ঞা দিলাম আমি। শীঘ্র করে যাহ তুমি।

তরণী — তবে আমি চললাম প্রণাম তব চরণে। জয় শিব দুর্গার জয়।

রাবণ — নেস্তার যেন না পায় তব হাতে। (প্রস্থান)

(সরমার প্রবেশ)

তরণী — মাতা নিবেদি চরণে। আজ্ঞা কর যাব আমি রণে। আশীর্বাদ করো মাতা জয়ী হই যেন সেই নর বানরের রণে।

সরমা — না বাবা তরণী সেন রণে যেতে হবে না বাবা।

গীত

যেও না যেও না বাপরে ওবাপ নর বানরের রণে

নর বানরের রণে গেলে বাচিবে না প্রাণে।

(তরণীর গীত)

বিদায় দাও বিদায় দাও দাওগো মাতা বিদায় দেহ মোরে

রণ করিতে যাব ওগো মাতা শ্রীহরির সনে।

(গীত সরমার)

তুমি আমার একটি ছেলে ওবাব কেমনে বিদায় দিব।

তোমায় বিদায় দিলে বাপরে কোন প্রাণে বাচিব।

তরণী — বিদায় জননী বিদায় (উভয়ের প্রস্থান)

(রাম লক্ষ্মণ হনুমান ও বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ— শোন মিত্র বলি যে তোমারে, তরণী সেন বীর আসিবে আপনার সঙ্গে রণ করিতে। আমি দেখি রাবণ কি যুক্তি করে।

(তরণী সেনের প্রবেশ)

তরণী — প্রভু নিবেদি চরণে,না মারিও না বাধিও জীয়ন্তে রক্ষা কর মোরে।

রাম — মিত্র বর, মিত্র বর কেমন করে এই ভক্ত বীরকে করিব বিনাস।

তরণী — নানা এইভাবে আমার না হবে মরণ, তবে আয় রে দুষ্ট শ্রীরাম লক্ষ্মণ। এইবার পাঠাব জমের ভুবন।

রাম — ভাই লক্ষ্মণ ধর। অস্ত্র কর রণ শত্রুকে পাঠাই দেই যবের ভূবন।

(যুদ্ধ)

তরণী — পিতা, পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা কর পিতা।

বিভীষণ — পুত্র যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, কর গিয়ে যুদ্ধ।

তরণী — তবে আয় রে দুষ্ট শ্রীরাম লক্ষ্মণ আজিকার রণে তোরে পাঠাই জমের ভূবন।

রাম — তবে এস যুদ্ধে হও অগ্রসর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

বিভীষণ — শোন্ মিত্র আমার বচন, অন্য অস্ত্রে ইহার না হবে মরণ, ব্রহ্ম অস্ত্রে ইহার হইবে মরণ।

তরণী — পিতা, পিতা অগ্রে কেন বলিলে না আমার মৃত্যু বাণের কথা। নইলে এই ধনুক টংকারে তাদের কেটে লইতাম মাথা। তবে আয় রে দুষ্ট শ্রীরাম লক্ষ্মণ আজ কার রণে পাঠাই যমের ভুবন।

(যুদ্ধে তরণী সেনের পতন)

বিভীষণ — আয় আয় রে, আমার ভক্তের বীর স্নেহের সন্তান আয় আমার বক্ষে আয়।

রাম — মিত্র বর, আগে কেন বলিলেন না, তাহা হইলে পুত্র শোক না হত সইতে।

বিভীষণ — প্রভু আমি সৌভাগ্যবান, তব হস্তে মৃত্যু আমার সন্তান।

রাম — ভাইরে লক্ষ্মণ, সীতা উদ্ধার নাহি প্রয়োজন আগে করিব আমরা তরণী সেনের শত কাজ। চল এই দেহখানি লয়ে যাই। (সকলের প্রস্থান)

(রাবণ, সুক-সারণের প্রবেশ)

শুক — মহারাজ, আপনার তরণী সেন বীর রণে পতন।

রাবণ — একি শুনালে শুক সারণ মোরে। তরণী সেন বীর মোর গেল যম ঘর। যাও পুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে এস আমার সম্মুখে।

শুক — তবে চল্লাম মহারাজ প্রণাম হই।

(ইন্দ্রজিৎকে লয়ে শুকসারণ প্রবেশ)

ইন্দ্র — পিতা প্রণাম তব চরণে; আমায় কি জন্য আদেশ করিয়াছেন পিতা।

রাবণ — পুত্র ইন্দ্রজিৎ বলি যে তোমারে, একে একে বীর শূন্য হইল লঙ্কা পুরে। শীঘ্র করে যাহ তুমি। সেই নর বানরের রণে তাহাদেক মারিয়ে আমায় শান্তি কর প্রাণে।

ইন্দ্র — পিতা তবে যদি আজ্ঞা পাই শীঘ্র করে সেই নর বানর মারিতে যাই।

রাবণ — তোমায় আজ্ঞা দিলাম আমি শীঘ্র করে যাহ তুমি।

ইন্দ্র — তবে আমি চল্লাম পিতা সেই নর বানরের রণে। জয় শিব দুর্গার জয়। (সকলে প্রস্থান)

(রাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — শোন মিত্র আমার বচন, বড় ভয়নক ইন্দ্রজিৎ। ছিনিয়া নাম যার ইন্দ্রজিৎ, তৃতীয়বার সমরে সে হবে উপস্থিত। দেখি রাবণ কি যুক্তি করে। (প্রস্থান)

(ইন্দ্রজিৎ-এর প্রবেশ)

ইন্দ্র — আরে বাপু শুক সারণ, যাও তোমরা ঐ পশুর রণে প্রস্তুত হও।

শুক — মহারাজ আর আমরা যুদ্ধ করিতে পারব না।

ইন্দ্র — আরে বাপু শুক সারণ, তোমরা ঐ পশুর রণে পরাজয় হইয়ে আসলে না, না আমি নিজেই যাই, তবে আয় রে দুষ্ট শ্রীরাম লক্ষ্মণ আজকার রণে তোদেক পাঠাব যমের ভুবন।

রাম — আরে আরে প্রথম বারে হনুমানকে বেন্ধে করেছ বড়াই। পড়েছ আমার হাতে রক্ষা তব নাই। এস যুদ্ধে হও অগ্রসর বিলম্বের নাই প্রয়োজন।

ইন্দ্র — জয় শিব দুর্গার জয়।

(যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ-এর পতন ও সকলে প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ পরে সুক-সারণ)

শুক — মহারাজ মহারাজ আপনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র একে বারে মর গিয়া।

রাবণ — আরে শুক সারণ, কি কথা শুনালে মোরে ইন্দ্রজিৎ পুত্র মোর গেল যম ঘরে।

গীত

রাবণ — কি হল কি হল বিধিরে, এ বিধি আমার পানে ইন্দ্রজিৎ পুত্র মোরে রে ....ঘরে।

পাঠ — কি করি কোথায় যাই, আজি কার রণে কাহারে পাঠাই না না নিজেই রণে করিব গমন কোথায় আছে বেটা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

(বুড়ির প্রবেশ)

বুড়ি — কাঁদিতে যে কহিনু বাপু না শুনিলে কান্দে, মজিল রাক্ষস পুরী শ্রীরামের বাণে। আর এক যুক্তি আছে কহিনু তোমারে। পাতালে আছে পুত্র সর্ব্বগুণ মান, সে ও হতে পারে সুখের আসন।

(প্রস্থান)

রাবণ — সত্যই আছে পুত্র মোর পাতাল ভিতরে, মারিতে বৈরী সেই জন পারে। কোথায় রে।

(মহীরাবণ প্রবেশ)

মহি — কোন্ কাজে পিতা মোরে করিল স্মরণ, আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন প্রয়োজন। প্রণাম তব চরণ।

রাবণ — আমি বলি শোন্ বাবা, দুঃখের কাহিনী সূর্পনখা তব পিসে আমার ভগ্নী। হইয়ে মানুষ বেটা কাটে নাক কান কেমনে সহিব ইহা অপমান।

মহি — কহ পিতা শুনি বিবরণ, অবিলম্বে নাক কান কাটে কিসের কারণ।

রাবণ — শোন্ পুত্র বলি যে তোমারে এতেকো প্রথম হবে আগে নাহি জানি। শ্রীরাম লক্ষ্মণ এমন করে অসম্ভিতে নাক কান্ কাটিল লক্ষ্মণে। বনের বানর রসহায় বান্ধিল সাগর গাছ পাথর দিয়ে।

মহি — স্বর্ণ লঙ্কাপুরী লণ্ড ভণ্ড হইল তব বুদ্ধি দোষে, কি পশ্চাতে শেষে ডাকিয়ে করিলে বিনাস। কটাক্ষে মারিব না জানে কোন্ জন প্রনাম চরণে এই করিলাম গমন। (প্রস্থান)

রাবণ — নেস্তার যেন না পায় তবে হস্তে। (প্রস্থান)

(নিদ্রাগত রাম লক্ষ্মণ, হনুমান ও বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — শোন হে পবন নন্দন, বলি যে তোমারে, ভরত আসিবে শ্রীরাম লইবারে। না দিবে দরশন করিতে। দেখি রাবণ কি যুক্তি করে।

(ছদ্মবেশী ভরতের প্রবেশ)

ভরত — শোন হে পবন নন্দন, শ্রীরাম লক্ষ্মণের সনে করাও দরশন সে আমার ভাই হয়।

হনুমান — কিছুক্ষণ বিলম্ব করুন, আসুক বিভীষণ, তার পরে দেখাব তোরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

(ভরতের প্রস্থান)

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — শোন হে পবন নন্দন, বলি যে তোমারে, জনক রাজ আসিবে শ্রীরাম লইবারে। না দিবে দেখা করিতে।

হনুমান — এখনি আসিবে শ্রীরাম লইবারে ?

বিভীষণ — হ্যাঁ এখনি আসিবে শ্রীরাম লইবারে। না দিবে দরশন করিতে। দেখি রাবণ কি যুক্তি করে।

(প্রস্থান)

(ছদ্মবেশী জনকের প্রবেশ)

জনক — শোন হে পবন নন্দন, শ্রীরাম লক্ষ্মণের সাথে করাও দরশন। সে আমার জামাতা হয়।

হনুমান — ক্ষনেক অপেক্ষা করে আসুক বিভীষণ। তারপরে দেখাইব শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — শোন হে পবন নন্দন বলি যে তোমারে। মহি রাবন আসিবে শ্রীরাম লইবারে।

হনুমান — হ্যাঁ এখনি এসেছিল শ্রীরাম লইবারে।

বিভীষণ — না দিবে দরশন করিবার, দেখি রাবন কি যুক্তি করে। (প্রস্থান)

(মহিরাবণের প্রবেশ)

মহি — শোন হে পবন নন্দন, চোর মায়া কত জানে সেই মহি রাবণ যার ধ্যানে থাক তুমি আজকার নিশি, রাম লক্ষ্মণের কাছে রক্ষা পেতে আসি।

(নিদ্রাগত হনুমান ও রামলক্ষ্মণ নিয়ে মহিরাবনের প্রস্থান)

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — শোন্ পবন নন্দন নিদ্রাতে কেন তুমি হও অরতন।

হনুমান — শোন্ রাক্ষস বিভীষণ, এতো সত্বর বঞ্চিত গেলে যে এখন, আজি নও চর হয়ে যাও নিতি, কটাক্ষ করে রামের সঙ্গে করিলে মিতালী।

বিভীষণ — শোন বিচারের পণ্ডিত, বিচার করিয়ে কেন বল অনুচিত। ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভব-সন্ধি কেবা জানে। যুক্তি দিয়ে বাঁধিলাম আপন সন্তান। যত কিছু হয়ে এল ঐ মহিরাবণ, ভুলাইতে না পারে সেই

হল হনুমান — একি কোথায় সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ। জয় শ্রীরাম চন্দ্রের জয়। (প্রস্থান)

(পাতাল পুরীতে রাম- লক্ষ্মণ নিয়ে মহিরাবণের প্রবেশ ও মহিরাবণের প্রস্থান, পরে নিকষা বুড়ির প্রবেশ)

নিকষা — আনিয়াছে শিশু দুটি পরম সুন্দর, না দেখি এমন রূপ ভুবন ভিতর। কোন্ অভাগীর গর্ভে করেছে ধারণ বেলা ছয় প্রহরে সময় দিবে বলিদান। (প্রস্থান)

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান — এই তো পাতাল ত্রিভুবন; এখানে থাকিতে পারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ — শোন হে পবন নন্দন, সুগ্রীব অঙ্গদ কোথায় বিভীষণ।

হনুমান — শোন প্রভু পাশরিলে চিতে, মহিরাবণ হরিয়ে এনেছে পাতালে।

রাম — শোন ওহে পবন নন্দন, বিপদে পড়িয়া হেথায় হইব কেমন। নাহি গেল সেনাপতি নাই যে ধনবীর কেমনে রাক্ষসের হাতে পাই নিস্তার।

হনুমান — উপায় না পাইয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা। যখন না সাড়ে যাবে তোমা দোহাকারে। তখনি আমি অলক্ষিত প্রবেশিব গহ্বরে। মক্ষিরূপে থাকিব আমি দেবীর আড়ালে। আসিবে মহি বেলা দেবী পূজিবারে। প্রণাম করিতে কবে সমপ্রিয়া পূজা, প্রণাম না জানি মোর রাজপুত্র রাজা।

(কালী পূজার ধ্বনি ও পরে মহিরাবণের প্রবেশ)

মহি — শোন্ বাবা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, দেবীর তোমরা করহ প্রণাম।

রাম — সখারূপে পরিধান। আমরা না জানি দেবী প্রণাম।

মহি — শোন্ বাবা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এতো বড় হয়েছ না জান দেবীর প্রণাম, এই আমি প্রণাম করিলাম।

(সকলে প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — একি, একি, কি স্বপ্ন হেরিলাম আজি। দেবীরে পূজিতে মহি গেল যম ঘরে।

(গীত)

কি হল, কি হল বিধিরে এ বিধি আমার কপালে
দেবীরে পূজিতে মহি গেল যম ঘরে
মরেরে, সোয়া লক্ষ নাতী
এক জন না রইল, বংশে দিতে বাতি।
না, এখন কি করিতে কোথা যাই। আজিকে রণে কাহাকে পাঠাই।

নিজেই রণ ক্ষেত্রে করিব গমন কোথায় আছে দুষ্ট শ্রীরাম।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী — আমি বলি শোন্ লঙ্কাধিপতি, কেন হলে ছিন্নমতি। শ্রীরাম দুষ্ট নহে, বিষ্ণু অবতার, ফিরিয়ে দাও সীতাকে, যুদ্ধের নাই আর কাজ।

রাবণ — সীতা ফিরাইতে লঙ্কার তরে, যাহোক প্রাণ ক্ষতি নাই তাতে। তব পূর্ণ করিব হরণ, এই যুদ্ধেই বিদায়। (উভয়ের প্রস্থান)

(রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুমান ও পরে বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — শোন্ মিত্র যার বচন, আজিকার রণে আসিবে রাবণ। আপনি রণে হয়ে থাক সাবধান; দেখি রাবণ কি যুক্তি করে। (প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — আরে দুষ্ট শ্রীরাম- লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরী মোরর করিয়াছিস্ শাসন। আজিকার পাঠাব যমের ভুবন।

রাম — বেইমান, না জানিয়ে সীতারে করিলে চুরি, আজিকার রণে তোকে পাঠাব যমপুরী। যত কর্ম করিলে তুমি এ জীবনে তার প্রতিফল পাবে এই ধনুকের বাণে।

রাবণ — ধনুকের বাণ, ছড়িয়ে দে তোর ধনুকের বাণ, এস যুদ্ধে হও অগ্রসর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

রাম — পিপীলিকার ডানা গজে মরিবার তরে, তোমায় মারার জন্য রাবণ এসেছি লঙ্কার ভিতরে।

রাবণ — তবে আয়রে দুষ্ট শ্রীরাম লক্ষ্মণ, তোর যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেই। (যুদ্ধ করিতে প্রস্থান)

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান ও বিভীষণের প্রবেশ)

রাম — আমার হাতে রাবণ না হল সংহার, জনক নন্দিনী সীতা না হল উদ্ধার। ইহার সুযুক্তি মিত্র বলহ আমায়।

বিভীষণ — শোন্ মিত্র আমার বচন, দেবীর পূজার কর আয়োজন দেবীকে পূজিলে রাবণ হইবে নিধন।

রাম — শোন আমার বচন, কিরূপে দেবী পূজিতে হবে কহ অনুক্রম।

বিভীষণ — শোন্ মিত্র আমার বচন, একশত আটটি নিল পদ্ম ফুল কর আয়োজন। দেবীকে পূজিলে রাবণ হইবে নিধন।

রাম — দেরি কর না হনুমান, স্বর্গ হইতে ১০৮ টি নিল পদ্ম কর আয়োজন। দেবীর পূজা করব, তুমি কর আয়োজন।

হনুমান — প্রণাম তব চরণে, এই করিলাম গমন। জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয়। (সকলে প্রস্থান)

(দেবী দুর্গা পূজা করে রাম - লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনু, বিভীষনের প্রবেশ)

রাম — অলঙ্ঘ্য সাগর বান্ধিয়ে আসিলাম এপারে তব কৃপা বিনা সীতা না হবে উদ্ধার। পড়েছি বিষম দায়ে জানকী উদ্ধারে। অনুমতি দাও রাবণ সংহারে।

দেবী — শোন্ প্রভু দয়াময় অখিলে ব্রহ্মাণ্ডে হও তুমি ব্রহ্মা সনাতন তুমি আদি ভগবান করিলে বোধন, পূজা করিলে তুমি দশ পূজা বিধি মতে, করিলাম বিশ্বাস, রাবণ ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি।

বিভীষণ — পূর্ব কথা প্রভু হইল স্মরণ, চাইল অমর বর রাজা দশানন। ব্রহ্মা বলে দশানন দুঃখ কেনো দিয়ে বর অমর করিব। অন্য অস্ত্র প্রবেশ না হবে শরীরে, তব মৃত্যু অস্ত্র রহিল তব স্বরে।

রাম — সে অস্ত্র আনিতে কারো নাহি শক্তি, শোন্ মিত্র না মরিবে লঙ্কার অধিপতি।

হনু — কেন ভাব রঘু মণি। আমি গিয়ে মৃত্যু বাণ আনিব এখনি।

রাম — পরিশ্রম করিলে বারে বারে; না হইল সীতা উদ্ধার সকলে এপারে।

হনুমান — প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দাস হইল পবন নন্দন প্রণাম চরণে এই করিলাম গমন।

(সকলের প্রস্থান) (মন্দোদরীর প্রবেশ)

হনুমান — জয় হোক রাবণ রাজার জয় হোক। হরি বল হরি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হবে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

মন্দোন্দরী — কে বাবা তুমি রাম নাম নিচ্ছ।

হনুমান — কেনো মা, এই রাজ বাড়িতে কি রাম নাম করা চলবে না?

মন্দ — হ্যাঁ বাবা এই রাজ বাড়িতে রাম নাম করা চলবে না।

হনুমান — ঠিক আছে মা, আর কখন রাম নাম নেব না। জয় হোক রাবণ রাজার জয় হোক। এবার হল তো মা।

মন্দোদরী — হ্যাঁ এবার হয়েছে। তুমি কে বাবা, তোমার পরিচয় কি?

হনুমান — আমি হচ্ছি গণক ঠাকুর মা।

মন্দোদরী — তুমি কি গণনা জান বাবা?

হনুমান — গণনা জানি মানে, গণনা করায় আমার পেশা। কেন মা গণনা করবে বুঝি; বল মা কি গণনা করতে হবে।

মন্দোদরী — আচ্ছা, বলতো বাবা, রাবণ রাজা কোথায় গিয়েছে।

হনুমান — আপনি বসুন মা, আমি গণনা করে দেখি। (উপরের দিকে তাকিয়ে) এতো দেখা কথা, এই কথার জন্য আবার গণনা করিতে হবে। তাই নয় কি মা? আমি দেখতে পাচ্ছি রাবণ রাজা যুদ্ধ করিতে গেছে। তাই কি মা?

মন্দোদরী — হ্যাঁ বাবা, তা সত্য।

হনমানু — বলতো মা, আর কিছু গণনা করতে হবে?

মন্দোদরী — হ্যাঁ বাবা, আর একটি গণনা করতে হবে। বলতো বাবা, আমর হাতের মধ্যে কি আছে?

হনুমান — এইবার সেরেছে। যদি বলতে পারি তাহলে তো ভালয়, আর যদি না বলতে পারি তাহলে তো বুঝতেই পাচ্ছেন। আচ্ছা মা আপনি বসুন আমি গণনা করে দেখি। ভীষণ আশ্চর্য্য কথা, কথা শুনে লাগে তাগ; সেই কথাটি দেখে এসেছি ভুবনীপুর মধুপুরের ধারে সমস্ত বর্ষায় বিষ্টি হয় তার কুঁড়ি খাই ,খাইনা ভরে। মা আমার গণনা হয়েছে হস্তের মধ্যে দুটো ফুল রয়েছে তাই না মা?

মন্দোদরী — হ্যাঁ বাবা, আচ্ছা বলতো বাবা ফুল দুটি কি? কোন্ ফুলটি জয় আর কোন্ ফুলটি পরাজয়।

হনুমান — আপনি বলুন আমি গণনা করে দেখি। যখন ঐ গণনাটা বলতে পারলাম, তখন এটা বলতে কি পারব না? বগাটা কালো। বগিটা ধলা। আর এই বাড়ির উপর দিয়ে মহি চক্র চলে গেল, আনতো মা, চাল ডাল কুমড় বড়ি। ঐ পুকুরের জলে মাছ ধরি। মা আমার গণনা হয়েছে। আপনার দক্ষিণ হস্তে জবাফুল আর বাম হস্তে গোলাপ ফুল। বাম হস্তের জয় আর দক্ষিণ হস্তের ফুলটি পরাজয় কি মা?

মন্দোদরী — হে বাবা সে সত্য।

হনুমান — আর কিছু আছে মা।

মন্দোদরী — হ্যাঁ, বাবা আর একটি গণনা করতে হবে। বলতো বাবা রাবণ রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে কি পরাজয় হয়েছে?

হনুমান — আচ্ছা আপনি বসুন, আমি গণনা করে দেখি, পোষ মাঘে ভীষণ ঠান্ডা খড় পুড়ে পোঁড়ায় আঁচ পূর্বে সেতপুরে দেখে এলাম পুকুরের মাঝে তিনটি খেজুর গাছ। হ্যাঁ মা আমার গণনা হয়েছে। রাবণ রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, রাম - লক্ষ্মণ উত্তর দক্ষিণ সটাং সট।

মন্দোদরী — সে কি সত্যি বাবা।

হনুমান — সত্য ছাড়া মিথ্যা গণনা করিনা মা, যদি আর গণনা থাকে তাহলে বলুন।

মন্দোদরী — আচ্ছা বলতো বাবা, রাজা কবে ফিরে আসবে?

হনুমান — আবার বলতে হবে, ঠিক আছে। আপনি বসুন আমি গণনা করে দেখি।

(জের) কথা বলবো কারে শুনবে কেরে ফকির দরবেশের কথা, রাজার বাড়ি চুরি ডাকাতি পুকুরের পাড়ে সিং। গাছের আগায় বিছানা বালিস পানিত পাড়ে নিন। মা আমার গণনা হয়েছে। রাবণ রাজা কার্ত্তিক মাসের তের তারিখে ফিরে আসবে।

মন্দোদরী — সেকি সত্য বাবা,

হনুমান — সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিনা মা, আর কি গণনা করতে হবে মা।

মন্দোদরী — না বাবা আর কিছুই নেই। বলতো বাবা গণনার মূল্য কি দিতে হবে?

হনুমান — না মা আমার গণনার মূল্য কিছু দিতে হবে না। তবে একটি কথা বলতে চাই রাবণ রাজার মৃত্যু বাণটি কোথায় আছে মা।

মন্দ — সে তো আমি বলতে পারব না বাবা।

হনুমান — কেনো মা? রাবণ রাজা ঐ দাদাকে দশলক্ষ টাকা দিয়েছে সে কি জান না?

মন্দোদরী — তা জানি বাবা।

হনুমান — টাকার মায়া ভুলতে পারে না, কিন্তু সে স্বামির মৃত্যুবাণের কথা জানে না। দেখ মা আমি হচ্ছি রাবণ রাজার দেব, আমার কাছে বলিলে তোমার কোন ভয় নেই , কারণ অনেক দিন ধরে আসতে পারি না, এখন তো আর কম বয়স হয়নি; বুড়ো হয়ে গেছি। এই রাবণ রাজার যুদ্ধ দেখে আর থাকতে পারিলাম না তাই ছুটে আসতে বাধ্য হলাম। ও বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি।

মন্দোদরী — না বাবা তুমি যতই বল, কিছু আমি জানি না।

হনুমান — ঠিক আছে মা, এতো করেও বলতে তোমার যখন বিশ্বাস হচ্ছে না। তখন চলেই যাচ্ছি। যাবার আগে বলে যাচ্ছি যে এই ব্রাহ্মণ ফিরে গেলে রাবণ রাজার কুমঙ্গল হবে মা, কুমঙ্গল হবে।

মন্দোদরী — দাড়াও ব্রাহ্মণ।

হনুমান — কেন্ মা আবার? পিছন ডাকটা খুব ভাল নয়।

মন্দোদরী — বাবা ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তুমি কারো কাছে বলবে না বাবা।

হনুমান — না, মা, আমি কারো কাছে বলবো না। একি বলার কথা। আমি সত্য করে বলছি আমি কারো কাছে বলব না।

মন্দোদরী — এই যে বাবা ফটিকের শেতাম্ব।

হনুমান — সেটাকে কি করতে হবে মা?

মন্দোদরী — সেটাকে লাথায়ে ভাঙ্গতে হবে। তার পর সেটা থেকে মৃত্যু বাণ বের হবে।

হনুমান — অঃ খুব সাবধানে দেখবে মা যেন আমার রামের চর এসে চুরি করতে না পারে। আর একটি কথা মা, আমায় একটু জল খাওয়াবে। সেই তখন থেকে গণনা করতে করতে গলাটা শুকিয়ে গেছে।

মন্দোদরী — জল খাবে বাবা। একটু দাড়াও, আমি জল নিয়ে আসি।

হনুমান — দাঁড়াও মা দাঁড়াও, শুধু জল নিয়ে আসবে? তার সঙ্গে কি কি আনবে?

মন্দ — তার সঙ্গে রসগোল্লা। পানিতাওয়া চমচম এসব আনব বাবা।

হনুমান — না আমি এসব আমি চিবাইতে পারব না। কারণ বুড়ো হয়ে গেছি তো দাঁতগুলো সব নড়ে গেছে। তাই আমি বলছিলাম কি, আমার জন্য চাল ভাজা, কলাই ভাজন, পাঁপড় ভাজা এসব খাইতে কি মজা। এগুলোই নিয়ে আসবে কেমন।

মন্দোদরী — ঠিক আছে বাবা। আমি ওগুলোই নিয়ে আসব। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি এখনই আনিতেছি। যেওনা যেন। (প্রস্থান)

হনুমান — মন্দোদরী তুমি আমাকে চিনতে পারবোনি, আমি কে এই বার চিনে নাও। জয় প্রভু শ্রীরাম চন্দ্রের জয়। (মৃত্যু বাণ নিয়ে প্রস্থান)

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী — এনেছি ব্রাহ্মন ঠাকুর, এই যে আপনার জন্য জল এনেছি, একি কোথায় সেই ব্রাহ্মন ঠাকুর। কোথায় আমার স্বামির মৃত্যুবাণ। ওগো স্বামি,আর তোমার মৃত্যুবাণকে রক্ষা করতে পারলাম না। (প্রস্থান)

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ — একি আমার মৃত্যুবাণ নাই, আমার মৃত্যুবাণ নাই।

(মূর্ছাগত)

সীতার লাগি এতো দুঃখ হইল আমার।

(রাম, লক্ষ্মন, সুগ্রীব ও বিভীষণ প্রবেশ)

রাম — ওহে রাবণ কি ভাবিছ বসে মরণ নিকটে তোর যুদ্ধ দেহ এসে।

রাবণ — ওরে শিশু মরিবার তরে আসিয়াছ; লঙ্কার ভিতরে বলছি ফিরে যাও মায়ের কোলে, বৃথা মরিস না লঙ্কার ভিতরে।

রাম — শিশু বলিয়া রাবণ করনা অহংকার, মোর বাণ সহ্য করে এতো শক্তি আছে কার। এসো যুদ্ধে হও অগ্রসর। অধিক বিলম্ব না করিও আর।

রাবণ — তবে আর রে দুষ্ট শ্রীরাম - লক্ষ্মণ আজিকার রণে তোদের পাঠাই যমের ভুবন।

রাম — ভাই লক্ষ্মণ, ধর অস্ত্র পাঠাই দেই যমের ভুবন। (যুদ্ধ)

(মৃত্যু বাণ নিয়ে হনুর প্রবেশ)

হনুমান — এই বাণ ধর প্রভু, রাবণের মৃত্যু বাণ।

রাবণ — একি, একি হেন কালে আনিলে রাম আমার বাণ, তবে আয় শ্রীরাম- লক্ষ্মণ পাঠাই দেই যমের ভুবন।

(রাম- রাবণের যুদ্ধ ঃ যুদ্ধে রাবণের পতন)

রাম — মিত্র বিভীষণ, সীতার উদ্দ্যেশে করহ গমন।

বিভীষণ — প্রণাম তব চরণে এই করিলাম গমন। (প্রস্থান)

(সীতা ও বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — শ্রীরাম পাঠাল মোরে আমি বিভীষণ। এতোদিনে হইল দেবী রাবণ নিধন তোমায় নিতে আমি আসিয়াছি বিভীষণ। (উভয় প্রস্থান)

(রাম - লক্ষ্মণ সীতা, সুগ্রীব ও বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ — আমার মিত্রবর আমার মিত্রবর, বলি যে তোমাদের তব জানকী সীতা আনিলাম তব ঘরে।

রাম — আমার না ছিল কে সীতা তব পাশে ব্যবহার না জানী তোমায় দশমাসে, সূর্য বংশে জন্ম আমার দশরথের নন্দন, তোমা হেন নারিতে নাহি প্রয়োজন।

সীতা — জনক রাজবংশে আমার উৎপত্তি, দশরথ শ্বশুর মম তুমি যে মম পতি। ভালো মতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি। জানিয়ে শুনিয়ে কেন করিছ দুরগতি। বাল্যকালে দেখিলাম বালক মিশালে। স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়াল। হনুমানকে পাঠালেন আমার কাছে যখন, কেনো বর্জন না করিলে তখন বিষ খাইতাম। অগ্নিতে করিতাম প্রবেশ। লঙ্কার ভিতর প্রভু না পেতাম ক্লেশ। কৃপা কর লক্ষ্মণ করহে প্রসাদ বলি যে তোমায় সাজাও অগ্নি কুণ্ড ঘুচুক অপবাদ।

(সীতার অগ্নি পরীক্ষা এবং শ্রী রামচন্দ্রের সীতা গ্রহণ)

---

সংগ্রহসূত্র

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাট থেকে তপন যেতে মাঝামাঝি জায়গায় সরনগ্রাম বলে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে রামবনবাসের মূল গীদাল হরেন্দ্রনাথ বর্মণ বাস করেন। তিনিই এই লেকনাটকটি লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এ ব্যাপারে সহায়তা করেন বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুলের শিক্ষক এবং লোকশিল্পী কমলকৃষ্ণ রায়। হরেন্দ্রনাথ বর্মণের নাট্যানুষ্ঠান দেখারও সুযোগ মেলে। ইসলামপুর শহরে রাজ্যস্তরের ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান উৎসবেও 'রামবনবাস' নাট্যানুষ্ঠানটি হয়। সেই অনুষ্ঠানেও এটিকে দেখার সুযোগ হয়।

# গম্ভীরা

**প্রস্তাবনা**

১। ব্যাবসায়ি ঃ-

আমি ব্যাবসা করে পাড়ার খরিদ্দারে

পন্য দিলাম ধার, দোকান গেল রসাতলে

চোখে দেখি অন্ধকার।।

২। সাইকেল চোর ঃ-

বিনা পুঁজির ব্যবসা আমার

বুদ্ধি আর সাহস দরকার, তিনটা সাইকেল

করতে পারলে মার মাসে দের হাজার।

৩। পকেটমার ঃ-

মাত্র দুই আঙ্গুলে, সংসার চলে

৪। নেতার চামচাদার ঃ-

আমি নেতার চামচাদার, পালন

করি নেতার যত অর্ডার, নেতার মদমাংস জোগাড়

করার পেয়েছি দায়িত্বভার

**বন্দনা**

শিব হে —

হে ভারত বিধাতা এই স্বাধীনতা

চায়নি জনগণ

দমন, পীড়ন, অত্যাচার অনশন অবিচার

এই কি শিব তোমার স্বাধীন শাসন।

১। বৈচিত্র্যময় ভারত বুকে বিচিত্র রাজনীতি-শিব হে

শকুনের মত নেতাদের দৃষ্টি মৃতদেহের প্রতি হে

মরা দখল করার তরে - ঝান্ডা উড়ায় মরার উপরে

লুটে রাজনৈতিক কায়দা - ধন্য পলিটিক্সের কায়দা

সব দলের মতবাদ - ভারতে আজ বরবাদ

নীতি বিহীন রাজনীতি চালায় নেতাগণ।।

২। ঘুসখোর সমিতির সংগঠন ভারতে জোরদার

পুলিশ, ডাক্তার, অফিসার, মাস্টার এই সমিতির মেম্বার

মোটা টাকা ডনেশন দিলে বিদ্যালয়ে সিট মিলে

ঘুস ছাড়া হাসপাতালে রক্ত মিলবে না কপালে

বাঁ হাতেব মন্তরে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ব্লাড ওড়ে

জনসেবার নামে এরা করে গরীব শোষণ।।

৩। ছদ্মবেশী শয়তান আর ভন্ডদের যোগসাশোসে

ডাইনি নামে নারীহত্যা চলছে এই দেশে হে

কু-সংস্কারের ফলে নরবলি আজও চলে

ভন্ডরা ছলে, বলে, কৌশলে-শোষণ করছে গরীব দলে

প্রশান্ত শেঠ কয় হে মৃত্যুঞ্জয়

নিরক্ষরতা এই হত্যার কারণ

তাইতোভারতে সাক্ষরতার প্রয়োজন ।

**চার-ইয়ারী**

১। লেবার কমিশনার ঃ-

পুঁজিপতি ব্যাবসাদার,

করছে অবিচার তাই,

রক্ষা করবো শ্রমিকের অধিকার

২। মহিলা সমিতীর নেত্রী ঃ-

মোদের সমিতী নারীদের প্রতি, সইবেনা অত্যাচার।

৩। শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা ঃ-

কর মোদের ইউনিয়ন শ্রামিক বন্ধুগণ

৪। উচিত বক্তা ঃ-

জনদরদী নেতা তোদের ক্ষুরে নমস্কার।

গদীর লোভে আর নিজেদের স্বার্থে যত ভাষণ চিৎকার।

রাজনৈতিক ডুগডুগির তালে নাচে।

এই বানরের যদি ভঙ্গ হয়রে তাল।

হবে ডাল ভাঙ্গা বানরের হাল।

শ্রমিক মাঝে দাঙ্গা লাগায় তোদের মতো নেতারাই।

মারামারির সময় তোদের পাত্তা নাই।

১। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আমাদের সাথে সহযোগিতা চাই ইউনিয়ন নেতার।।

২। সমাজ বিরোধী ধর্ষণকারীরা হও হুসিয়ার

৩। শ্রমিক শোষণ তাই করছি আন্দোলন।

৪। (ক) কত সরকার এল গেল স্বাধীনতার পরে

তবু মোরা রইলাম পরে একই আস্তাকুঁড়ে হত্যা কিংবা ধর্ষণ হলে বুক ভাসাই

চোখের জলে, ধন্য অভিনয়ের খেল, বচ্চন শ্রীদেবী-মাধুরী ফেল

শ্রমিক দরদ বুঝবি কি আর, বাস্ করে অট্টালিকায়

কত শত শ্রমিকের বাসস্থানই নাই।।

(খ) শ্রমিক ইউনিয়নে নাই আজ শ্রমিকের মতামত রাজনৈতিক, স্বার্থে অবরুদ্ধ শ্রমিক কৃষকের পথ তোরা সবাই রাজনীতির দালাল, পেতেছিস্ তোরা বিভেদ হাল তোরা ধান্দাবাজের দল ভাঁওতাবাজী তোদের সম্বল হও আগুয়ান শ্রমিক বন্ধুগণ, নিজ হস্তে ধর হাল নৈলে আন্দোলন তৈরী হবে বেসামাল।

**ডুয়েট**

(স্বামী গম্ভীরা শিল্পী, স্ত্রী আধুনিকা)

স্ত্রী ঃ আমি তোমাকে বিয়ে করে মরলাম জ্বলে পুড়ে।

না জেনে শুনে বিবাহ বন্ধনে হলাম আবদ্ধ।

কত ভাল পাত্র দিলাম ছেড়ে।

পুরুষ ঃ তোমার বাবা এসেছিল বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।

দিনে শতবার বাবার পায়ে যেত তেল মাখিয়ে।

বাড়ীর মাটি দিয়েছিল বসিয়ে বাবাকে সোজা পেয়ে।

তোমার বাপে মায়ে দিল গছিয়ে।

এমন রণচন্ডি আমার ঘাড়ে।

স্ত্রী ঃ রিহার্সাল কর গম্ভীরা, তোমার ষাঁড়ের মতো চিৎকার।

শিল্পী বন্ধুদের জন্য চা করে দাও তিনবার।

যেন কেনা দাসী তোমার।

পানের পিকে পোড়া বিড়িতে ঘর করে একাকার।

চলবে না সব ঐ ঘরে সব ফেলব ছুড়ে

পুরুষ ঃ তোমার ভাই, বোন, দাদা পরিজন আত্মীয় যত।

আমার বাড়ীকে করেছে হোটেলে পরিণত।

এখানেই আব্দার যত।

সম্মানের খাতিরে বিছানা ছেড়ে ঘুমাই মেঝেতে।

আমিও দিব এবার বের করে।

স্ত্রী ঃ পরনিন্দা, পরচর্চা এই তো গম্ভীরা

ছেড়া কাপড়ে রাস্তার ধারে গায় ছোট লোকেরা

শোনেনা ভদ্র যারা

অসভ্যের মতন তোমাদের নাচন কি বিচ্ছিরী ভাষা

নাই মান সম্মান এই কালচারে গম্ভীরা দাও ছেড়ে।

পুরুষ ঃ এই পোষাক, ভাষা, নৃত্য আর গম্ভীরা গানে

আঘাত হেনেছিল ভারতে বৃটিশ শাসনে

গম্ভীরা শিল্পীগণে

সুভাষচন্দ্র, কবি রবীন্দ্র, মনীষীগণের

গম্ভীরা কেটেছিল দাগ অন্তরে।

**টনটিং**

(নেতাদের প্রতি)

জয় জয় শ্রীরাম আউর রাম কা গোলাম

শুক্রিয়া জনাব।

আপলোক কা ভাষণ - আউর আচরণ

সব হনুমান কি তরাপ।।

১। বেকারত্ব ঘুচবে ভারতে মন্দির নির্মাণ হলে

কাজ কর্ম্ম আর উন্নতির পথ ভারতে যাবে খুলে

চুরি ছিনতাই করবো টাকা লুটবো

মন্দিরে গেলে ক্ষয় সর্ব্বপাপ।

২। অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলি নির্বাচনে

তোদের স্পর্শে সাধু বলল লম্পট গুন্ডাগণে

টাকা কামাল গুরুয়া গরলা

ভণ্ডামী করাই তোদের স্বভাব।

দাপর যুগে আবির্ভূত কৃষ্ণ অবতার

কলিযুগে আবির্ভাব ইটকাল দেবতার

ইটকাল করব পূজা হব রাজা

থাকবে না ঘরে অভাব।।

৩। ভারত বুকে আদিবাসী আর হিরজনে

উচ্চবর্ণের লোকেরা মারছে পুড়িয়ে জ্বলন্ত আগুনে

কোন প্রতিবাদ নাই হরিজন হত্যায়

নাইকো তোদের অনুতাপ।।

**রিপোর্টিং**

নানা —

আমরা সদর্পে গম্ভীরা গাই

করব না মাথা নত, কাপুরুষের মত

গোবিন্দ গোপিনাথ বলেছে তাই।।

১। আপ্পায়ারা পিল্লু রিপোর্টার তেপান্ন বছর বয়স তার

হোটেলে বিদেশিনী বুড়ার জাগাল শিহরণ

রসে পরিপূর্ণ বুড়ার যৌবন সুন্দরীর জন্য আত্মহারা
হোটেল কর্তৃপক্ষ বুঝল না দুঃখ
বুড়াকে দিল বিদায়।।

২। প্রতিবাদের নতুন ধারা কয়েদী গাছে গেল চর্য্যা
সিপাহীদের দুর্ব্যবহারে আত্মহত্যা করবে হুঙ্কার ছাড়ে
বহু আবেদন নিবেদন তারপর নামে কলিরঞ্জন
সকাল ৯টা থেকে রাত্রী ১৩টা তের ঘন্টা গাছে কাটায়।

৩। নাতীর চাকরী করার সাধ দিদিমা টাকা দিতে নারাজ
দিদিমার সোনার দাঁতের প্রতি নাতীর লোভ হল অতি
এক বক্সিং মারল কস্যা সোনার দাঁত গেল খস্যা
দিদিমা গেল স্বর্গধামে নাতী গেল জেলখানায়

৪। ধর্মতলার ঘটনা আমি জীবনে ভুলবনা
কাকা পাতিয়া যাওয়ায় সরবৎ খাইয়া করল আমাকে বধ
দু'গ্লাস সরবৎ ২২ টাকায় গাল ফজুত খেলাম বিনা পয়সায়
ঠকের খেলা চলে দুইবেলা
কলকাতার ধর্মতলায়।

৫। মানুষের রক্ত করছে পান স্বয়ং মাকালি মশান
দুপুর ১২টার পরে চুল শুকায় নদীর ধারে
যদি বাঁচতে চাও গোবর চুন লাগাও
তাছাড়া অন্য গতি নাই।।

৬। মালদা বিচিত্রা এক ছুঁড়ি পড়ল সমস্যায়
অন্ধকারের মধ্যে সিনেমার হলে - ছুঁড়ি বসল ছোড়ার কোলে
ছুঁড়ির মূলে কোন দোষ নাই
যত দোষ ছোড়ার বেলাই

৭। কোসানী ভিডু পরিবার ফ্যামিলির ৭০০ জন মেম্বার
কর্তা নির্বাচনের তরে ভোট হয় পরিবারে

৩৩ বছর ধরে পরিবারে অন্মদ কোয়া শাসন চালাই।

৮। জনগণের অশেষ অবদান ছুঁড়ি পটাতে চাম্পিয়ান
জনসনের শয্যা সঙ্গিনী ১২ হাজার রমণী
মরণের দিন গুনছে প্রতিদিন
মরণ রোগ এইডসের ঠেলায়।

৯। মহিলা শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ বাধা দেয়
পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুচ্চ্যা, রক্ত বাহির কোচিনে করে
সাব ইন্সপেক্টর হালার্কান এক মাইয়া কামড়া দিল কান
লজ্জার ব্যাপার খেল মাইয়ার মার
পুলিশদের মুখ দেখান দায়।

১০। এ যুগে আশ্চর্য্যের শেষ নাই আজব ঘটনা ঘটছে দুনিয়ায়
ধন্যকলির লীলা খেলা ব্যাটা চ্যাংরার গর্ভে ছেল্যা
এমন ঘটনা ঘটলে আমার কপালে
তখন কিবা হবে হায়।।

১১। রাজনৈতিক দল দেশে প্রবল
মালিক শ্রেণী পুঁজিপতির দল
সুখী নয় কেউ তাই অন্তর্দ্বন্দ্ব
দেখে অবস্থা কয় গোবিন্দ, না হলে বন্ধ অন্তর্দ্বন্দ্বে
স্বাধীনতায় কোন সুখ নাই।

১২। মন্ত্রী এম.এল.এ. এম.পি-গণ
ভোট দেয় মুর্খের মতন
রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন
ভুল ভোট দেয় ৬৭ জন
স্বনামধন্য মন্ত্রী এম.এল.এ ভারতের সুনাম বাড়ায়।

## প্রস্তাবনা

১। হায় কি হলোরে ও কি করবো রে

কি করি উনাই

জমি বেচালু বিশ হাজার টাকা

হয়্যা গেল ছিনতাই।

২। গ্রামে থ্যাকা টাউনে এ্যাসা

একেবারে গেনু ফ্যাসা

আত্মীয় স্বজন খ্যাছে চষ্যা

পড়্যা গেছি দেনায়

৩। বৌয়ের মেকাপ কিনতে মাথা খারাপ

৪। লকাপে করব ফিটিং কারবার

সাপ্লাই করব পাখা ওয়াটার

ত্রিশ টাকা পার পিস পাখা

৫০ টাকা গ্লাস ওয়াটার

মানত কর্যাছি থানে ব্যারা যায় ম্যানে

খুন জখম অত্যাচার।।

**বন্দনা**

বল না কি দোষ কর্যাছি ভোলা

চোখ নাই কেনে হামাদের বেলা

বুনছিস মরণ জাল-খ্যায়া কলাচাল গাঁজাতে দিচ্ছিস ঠেলা

১। ষাঁড়ে চড়্যা বেরাস ঘুর্য্যা, পড়্যা বাঘ ছাল হে

সিদ্ধি গাঁজা খায়্যা দু'চোখ কর্যাছিস তুই লাল হে

ত্রিশুল হাতে শ্মশানেতে, ছাঁই মাখা গোটা গায়েতে

নন্দী ফিরিঙ্গি সঙ্গে - মেতেছিস তুই রঙ্গে

কত রস রঙ্গে নানীর সঙ্গে খেলেছিস তুই প্রেমের খেলা।

২। বেলপাতা, গাঁজা, সিদ্ধি, ধুতরা দিচ্ছি আদর করা্য হে

প্রতিদানে পাচ্ছি ভুমিকম্প বন্যা করা হে

ভাইসা গেল কত সংসার বলতো এটা কেমন বিচার

চাল কলা খাওয়ানোর ফল এখন ফেলছি চোখের জল

যদি চাহিস ফুল জল সোজা হয়ে চল বন্ধ কর এ ধ্বংস লীলা।

শিব হে —

শুন বলি ওহে ভোলা চলছে হত্যালিলা

বিশ্ব ধুকছে দ্যাখা কাণ্ডকারখানা

স্বভাব যায় না মোলে ইজ্জত যায় না ধুলে

গুজরাট দাঙ্গা তারই নমুনা।

১। স্বাধীনতার স্বাদ বড়ই তিতা দিন কাটছে অনাহারে শিব হে

কোটি কোটি টন খাদ্য শষ্য পচছে গুদাম ঘরে

বাজেট পাশ একবার বছরে মূল্য বৃদ্ধি বারে বারে

রেল ভাড়া পেট্রল, ডিজেল, আর

দাম বাড়ে বছরে ছয়বার

চাল, গম, তেল, রেশনে চড়ছে দর দিনে দিনে

থ্যাকা থ্যাকা রেশন ভাগ্যে জুটেনা।।

২। ১৩৭ নম্বরে ভারতের অবস্থান

পার পারিয়া উঠিবে ভারত লিবে প্রথম স্থান

জ্যোতিষ চর্চ্যা কলেজ স্তরে ভাগ্যের চাকা যাবে ঘুরে

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম্ম-সংস্থান-পাথর ধারণেই সমাধান

কোটি কোটি টাকা ঢালতে চাহিস তোরা বুজরুকিতে

তার জন্য কত রকম পরিকল্পনা।

৩। এতদিন ধর্য্যা গম্ভীর গান করছি গাধার মতন

অটল বন্দনা করব পাব পদ্মভূষণ

সুর দিব বাজপেয়ির কবিতায় কোন মতে যদি মন গলে যায়

প্যায়া যাব ভারত রতন পাব সম্বর্ধনা আমন্ত্রণ

প্রশান্তর প্রার্থনা করিস না আর ছলনা

ঘুর্য্যা দেশের দিকে তাকানা।

## চার ইয়ারী

পুত্র হারা আমেরিকাবাসী ঃ-

১। আমার একমাত্র সন্তান অকারণে গেল প্রাণ

সন্ত্রাসবাদী হামলায়

২। ইরাকের মহিলা ঃ- মার্কিন সরকার আফগানিস্থানে হত্যা লীলা চালায়

৩। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঃ- জর্জ বুশ

আমি লাদেনকে ধরব, শায়েস্তা করব।

৪। উচিৎ বক্তা ঃ-

লাদেনের থাপ্পর খ্যায়া হয়্যাছে গাল লাল

সন্ত্রাসবাদ দমনের কথা ছিল না এতকাল

কত যত্নে লাদেনকে পুষলি, বিশ্বমাঝে শের বানালি

অবশেষে হালকা দিল এমন হালকার জ্বালা বলত কেমন

আফগানিস্থানে মার্কিন সরকার চালায় বর্ব্বর আক্রমণ

ছি ছি করছে বিশ্বজনগণ।

১। পুত্রহারা আমেরিকাবাসী ঃ-

আফগান আক্রমণের বিরুদ্ধে আমেরিকা সরকারকে

ধিক্কার জানাই

২। ইরাকের মহিলা ঃ

বুশ প্রশাসন বিশ্বমাঝে দাদাগিরী ফলায়।

৩। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঃ- জর্জ বুশ

সন্ত্রাসবাদ হটাও বিশ্ব বাঁচাও

৪। উচিৎ বক্তা ঃ-

সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ব গড়তে কত রকম ফরমান

পৃথিবীতে দাদাগিরীর আছে বহু প্রমাণ

মুখে ওদের শান্তির বাণী, দেশে দেশে দিস উস্কানি

আসলে তোরা ধান্দাবাজ, অস্ত্র বেচাই তোদের কাজ

অর্থনৈতিক অবরোধ করিস, যদি করে প্রতিবাদ
তোরাই পয়লা নাম্বার সন্ত্রাসবাদ।
বিশ্বমাঝে লাদেন হিরো তোদের আসকারাতে
তর্জন গর্জন আর আস্ফালন পারলিনা ধরতে
স্বামী পুত্রহারা নরনারী ধ্বংস করলি ঘড়বাড়ী
তোরা পশুর অধম আফগান তারই নিদর্শন
হিরোসিমা, নাগাসাকি বিশ্ব আজও করে স্মরণ
চাই-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

ডুয়েট

(পণপ্রথা)

স্ত্রী ঃ খেয়েছে শ্যামের মাথা পেঁচি মুখি মিতা
রাস্তার মোড়ে, পুকুর পাড়ে সদা সর্বদা
মিতার প্রেমে মত্ত তোমার ভ্রাতা।।

পুরুষ ঃ তোমার দেওর অতি ভদ্দর যত দোষ মিতার
মায়ের কাছে মাসীর গল্প কোবনাকো আর
তোমার দেওরায় কুলাঙ্গার
তাই বলি শ্রীমতি সেজোনা সতী আমার কাছে
বেশী দেখায়না ভদ্রতা।

স্ত্রী ঃ অতি বাড় বেরেছে শ্যামের তোমার আসকারায়
নচ্ছার, মেয়ের পাল্লায় পরে ফালতু টাকা উড়ায়
রেষ্টুরেন্ট, থিয়েটার, সিনেমায়
যদি বিয়ে করে ছোট লোকে ঘরে দিব বের করে
আমিও দিবনা আশ্রয় হেথা।

পুরুষ ঃ চেয়েছিলে শ্যামের সাথে তোমার বোনের বিয়ে দিতে
মিতা এসে ছোবল মেরেছে সেই আশাতে
তাই জ্বলছ শোকেতে

বেশী ভাষণ দিলে দিব তুলে অন্নপ্রাশনের ভাত।

জানা আছে তোমাদের সভ্যতা।

স্ত্রী ঃ তোমাকে বিয়ে করে শখ আহ্লাদ সব গেল চুলাই।

খাটতে খাটতে জীবন গেল, তবু সুনাম নাই।

দুঃখেই, কাটল জীবনটাই।

যদি চাও টি.ভি. আলমারী পাকা বাড়ী আমার কথা শোন।

অন্যত্র কর বিয়ের ব্যবস্থা।

পুরুষ ঃ নারী নির্যাতন করছে সমাজ বিরোধীর দলে।

কত জীবন যাচ্ছে ভারত পণের কবলে।

লোভ আর নীরবতার ফলে।

তাই নারী সমাজ তোল আওয়াজ ভারত বুকে।

রুখতে হত্যা ধর্ষণ পণপ্রথা।

সাথে পুরুষ সমাজ তোল আওয়াজ।

রুখতে পণপ্রথা।

রুখতে নারী ধর্ষণ ড্রাগ মাদকতা।

**ডুয়েট**

(স্ত্রী রক্তদানের পক্ষে স্বামী বিপক্ষে)

স্ত্রী ঃ গিয়েছিলাম ক্লাবেতে, মিটিং শুনতে

রক্তদান শিবির হবে যেতে হবে রক্ত দিতে

আলোচনা হলো সভাতে

পুরুষ ঃ শুন্যাছি জমি বস্ত্র গরু দানে হয় পুণ্যবান

রক্তদানের কথা কোন শাস্ত্রে নাই প্রমাণ

বহু ব্যারাম হতো আরাম, রক্তে স্নান করলে

শুন্যাছি ঠাকুরমার মুখেতে।

স্ত্রী ঃ রক্তের অভাবে লক্ষ লক্ষ করছে মৃত্যু বরণ

তাইতো রক্তদান এখন অতি প্রয়োজন

রক্ষা পাবে বহু জীবন।

যে করে রক্তদান, মহাপুণ্যবান সর্ব্বশ্রেষ্ট দান

এর তুল্য কোনদান নাই পৃথিবীতে

পুরুষ ঃ শরীর থাকলে ব্যারাম হবে তার জন্য ডাক্তার

চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল খুল্যাচ্ছে সরকার

সভা সমিতির কি দরকার

প্রয়োজন হলে হাসপাতালে দিবে রক্ত

কেনে যাব মাথা ঘামাতে

স্ত্রী ঃ বিজ্ঞানের উন্নতি সারা পৃথিবীতে

রক্ত তৈরী হয় না আজও ল্যাবটারিতে

মানুষকে হবে রক্ত দিতে

হাজারে দুজন ভারতে জনগণ দিচ্ছে রক্ত

সংখ্যাটা হবে বাড়াতে।

পুরুষ ঃ রক্ত দিলে দুর্বল হবে, পারবেনা খাটতে

রক্ত পূরণে সময় লাগবে হবে ভাল খ্যাতে

গরীব মরবে প্যাটে ভাতে

রক্তের অভাব নাই আমার কথায় চললে পরে

রক্ত পাবি কষাই খানাতে

স্ত্রী ঃ অতিরিক্ত বেরিয়ে যায় মল মূত্রের সাথে

রক্ত দিলে শরীর দূর্বল হয় না কোন মতে

বলছে চিকিৎসা শাস্ত্রেতে

কাল সকালে দু'জনে মিলে দিব রক্ত

তোমার লিখিয়েছি নাম খাতাতে

পুরুষ ঃ নাম লেখানোর কথা শুনা জীউ করছে ধরফর

ভয়েতে বন্ধ হয়্যা আসছে গলার স্বর

শরীর কাঁপছে থরথর

সুঁচ ঢুকাবে রক্ত টানবে ওরে বাপরে

কাটবো না বুঝি জানেতে

স্ত্রী ঃ রক্ত না দেওয়ার মূলে ভয় প্রধান কারণ

সমীক্ষার মাধ্যমে হয়েছে উৎঘাটন

সচেতনতার প্রয়োজন

ইনজেকশান করলে যেমন ব্যাথা লাগে তেমন রক্ত দিতে

ভয়ের কোন কারণ নাই এতে।

(সংযোজন)

বয়স ১৮-১৬ ওজন ৪৫ কে.জি তারা রক্ত দিতে পারেন।

পুরুষের শরীরে প্রতি কে.জি.তে ৭৬ মি.লি ও মহিলার

শরিরে ৬৬ মি.লি রক্ত থাকে। ৪৫ কে.জি ওজন থাকলে

তার শরীরে তলিটার রক্ত থাকে। যতই পরিনাম হোক

২ লিটারের বেশি রক্ত কাজে লাগে না। ২ লিটার রক্ত বেশী থাকে

সে রক্ত মল মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়। আবার রক্ত শরীরে

তৈরী হয়। কাজেই ২৫০ মিলি লিটার রক্ত দান মানুষের কোন

ক্ষতি হয় না। ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মানুষের শরিরে রক্ত তৈরী হয়ে যায়।

**টনটিং**

প্রশাসনের প্রতি :-

মানুষের আস্থা নাই তোদের পুলিসি ব্যবস্থায়

করছিস তোরা দুর্নীতি পোষণ

অপরাধী যারা পড়ে না ধরা

বাড়ছে খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ

১। হাসপাতাল, স্টেশন, বাসষ্ট্যান্ড চত্বরে

বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রী করে

পুলিশ যখন আইন ফলায় এই মদের ব্যবসায়

দু'গ্লাস মদে বন্ধ হয় গর্জন।

২। যানজটে মানুষ হচ্ছে তালচোনা।
দিনে দিনে গড়ছে পথ দুর্ঘটনা
ট্রাফিক ব্যাস্ত হাত মিলাতে গাড়ীর ড্রাই ভারের সাথে
পুলিশ ড্রাই ভারের অপূর্ব মিলন।

৩। ভি.ডি.ও পর্দায় সিনেমা হলে
বে আইনী অশ্লীল বই চলে
সভ্যতা ধ্বংসের কলে পিষছে কিশোর বালক দল
তোদের কার্যকলাপ অন্ধের মতন।

৪। র‍্যাতের বেলাই চোর ছিনতাইয়ের ডর
তার চাইতে পুলিশ ভয়ঙ্কর
বিনা দোষে লিছে ধর‍্যা ডাকাতি কেসে দিছে ভর‍্যা
নিরাপরাধি ফাঁসছে বহু এমন।

৫। চাল, ডাল, তেল, চিনি, কেরোসিন
বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে প্রতিদিন
সুরক্ষা আরক্ষার মদতে চোরা কারবার চলছে জেলাতে
ধন্য তোদের পুলিশ প্রশাসন।

৬। রাজনৈতিক নেতাদের টেলিফোনে
ছারা পাচ্ছে খুনী গুন্ডাগণে
হাজতে পুলিশ হত্যা চালায় ধর্ষণেও পিছিয়ে নাই
হাজতের খাবারে ধন্য হয় জীবন।

রিপোর্টিং

নানা — আমরা সদর্পে গম্ভীরা গাই।
করবো না মাথা নত।
কাপুরুষের মত।
গরু গোবিন্দ গোপীনাথ বলেছে তাই।

১। চার টাকায় বাসমোতি, ১৫ টাকা মুরগী কেজি প্রতি
মনে দারুন আসার সঞ্চার
বাংলা ছারা খাব চাইনিস্ বিয়ার
মাল কিনতে কোলকাতায় পারি
তিন হাজারে করলাম ভাড়া গাড়ী
ডান্ডা খ্যায়া, ঠান্ডা হলেম
ভাড়ার টাকা গেল চুলায়

২। মালদার বিখ্যাত আম, দিনে দিনে হারাচ্ছে সুনাম
তাইতো গবেষণা চাই,
চিনি লটনট আম বাড়ছে সংখ্যায়
আম সংরক্ষণের মালদায় কোন ব্যবস্থা নাই।

৩। রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ টি.ভি.তে মাত্র ৩৬ টাকাতে
বাস্তবে অন্য চিত্র খরচ হাজার টাকা মাত্র
যদি হয় নাবালিকা, জুতা সায়া পড়লেই সাবালিকা
গোঁড়ালি চ্যাড়া নাবালিকাকে সাবালিকা বানায়
রেজেষ্ট্রি অফিসের পিওন চুল ভরে পায়ের তলায়

৪। কংগ্রেস তৃণমূলের জোট ইংলিশ বাজারে ঝঞ্ঝাটে
মমতা গনিখানের লড়াই প্রার্থী দিল দু'জনাই
কৃষ্ণেন্দু গৌতমের কামড়া কামড়ি
কায়দা লুটল সমর রায়।

৫। স্ত্রী ভ্রূণ হত্যার কারণে
মহিলা সংখ্যা কমছে দিনে দিনে
সমস্যা আগামী দিনে বর পাবে না কনে
একটা মেয়ে তিনটা ভাতার করলে কোন সমস্যা নাই।
চাহিনা ভাষণ শুনতে। যাব জমিতে
লেখা পড়া শিখবে যারা বুঝবে তারা

হামাকে হবে যে খ্যাটা খ্যাতে

৬। দুর্গাপূজা কালী পূজা, যেমন সবার
লেখা পড়াটা তেমনি সকলের দরকার
নারী পুরুষের অধিকার
নয় বছর পর্যন্ত, ছেলে মেয়ে যত আছে প্রাণে
তাদের স্কুলে হবে পাঠাতে।

৭। রান্না বান্না ঘড় কন্না কাম বেটি ছেলার
তার আবার লেখা পড়ার আছে কি দরকার
উচ্ছন্নে যাবে যে সংসার
মায়ের হাতে হাতে, মহসারেতে বোট করে কাজ
সময় নষ্ট লেখাপড়াতে।

৮। আগামী দিনের মা আজকের শিশু কন্যা
শিক্ষিত মায়ের সন্তান নিরক্ষর হয় না
কভু নিরক্ষর হয় না
কেবল পুরুষী, দখলে, মিথ্যা গেলে হবে।

৯। লেখা পড়া শিক্ষা কিবা হবে উন্নতি
হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম। অভাব অনটন চাষীর নিয়তি
গরীবের এই তো দূর্গতি
শিক্ষা পড়াশুনা কলম ঘুরাতে যাবো না,
কি লাভ লেখা পড়াতে

১০। যতদিন থাকবে দেশে অশিক্ষার অন্ধকার
ভারতবর্ষে ঘুচিবে না কুসংস্কার
ঘুচিবেনা কুসংস্কার
পরিবার পরিকল্পনা সফল হবে না
পারবে না অস্পৃশ্যতা ঘুচাতে

১১। টিপসহী দিয়া লিলে ঠকিয়া হামার জমিটা
চড়া সুদে কলা গেল বাস্তু ভিটাটা
মূলে হামার মূর্খতা
স্কুলে পাঠাবো ভর্ত্তি করবো বেটাবেটিকে
সব শয়তানদের জব্দ করতে।

১২। অগ্রিম বাসে টিকিট কাটলে পিছন দিকে সিট মিলে

১৩। যার হৃদয়ে প্রেম নাই বৃহৎ জন্ম তাহার ভাই
বুকেতে প্লাসটিক হার্ট বসাই তাতে
তখন প্রেমের বন্যা বইবে বুকে প্রেমিকা ডাকে ইসারাই

১৪। গর্ভে আসে যদি সন্তান কর অন্যে গর্ভে চালান
যখন ভূমিষ্ট হবে কাকে মা বলে ডাকবে
গর্ভ যন্ত্রণা সইতে হবে না বিনা কষ্টে মা হওয়া যায়

১৫। আশ্চর্য্য খবর শুনলাম ভাই
পুরুষ মাইয়া হইয়া যায়
শুন্যা লাগছে ভীষণ ভয়
কপালে যদি এমন হয়
তখন বলবে না বউ প্রাণনাথ
দুজনারই স্বামী নাই।

১৬। সাই বাবার কন্যা হলে সোনা দানা চাকরী মিলে
ইঞ্জিনীয়ারকে দিল উপহার হাত ঘুরিয়া সোনার হার
মন্ত্রী, যন্ত্রী ছিল যত অলৌকিক ঘটনায় অভীভূত
বাবাজীর ধান্দাবাজী আর কার সাথী
ধরা পড়ল টি.ভি ক্যামেরায়

---

সংগ্রহসূত্র

'গম্ভীরা' লোকনাট্য বিভিন্ন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে অনেকবার দেখেছি। সংগৃহীত 'গম্ভীরা' মালদার কুতুবপুরের মিস্ত্রীপাড়ার। কুতুবপুর গম্ভীরার জন্য বিখ্যাত। গম্ভীরা শিল্পী গোবিন্দ শেঠ ও গোপীনাথ শেঠের নাম বহু পরিচিত। তাঁদের বংশধর প্রশান্ত শেঠ এই গম্ভীরা লোকনাটকটি সংগ্রহ করে দেন। সংগৃহীত গম্ভীরা লোকনাটকটির নাট্যানুষ্ঠান বালুরঘাট শহরে রাজ্যস্তরের ভাওয়াইয়া উৎসবে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি।

# নির্বাচিত আঞ্চলিক শব্দের পরিচিতি

## কুশান
### লক্ষ্মণের শক্তিশেল

| | | |
|---|---|---|
| ভালেভালে | — | ভালোয় ভালোয় |
| এ্যাঁও | — | এটা |
| দোয়ারী | — | দোহার |
| কাতোন | — | ক্রন্দন |
| কাউরহাটি | — | গোলমাল |
| ফাওফ্যাচাল | — | মিছেমিছি ঝগড়া |
| কইচ্চোং | — | করেছি |
| শেলপাট | — | শল্যময় পট্ট |
| চান্দের বাজার | — | চাঁদের হাট |
| পত্তমটা | — | প্রথমটা |
| আল্লাপ শাল্লাপ | — | আলাপটালাপ |
| ডন্ডোবোধ | — | প্রণাম |
| কও | — | বলছি |
| এ্যালাও | — | এখনও |
| হোর | — | আরে-এই জাতীয় অব্যয় পদ |
| আচুল | — | আঁচল |
| কাঁয় | — | কে |
| মাই | — | মেয়ে |
| উকড়ী | — | সম্পূর্ণ তুলে আনা |
| বক্‌ড়ী | — | স্ত্রী ছাগল |
| ডাবরী | — | নীচু খোলা জায়গা |
| বাখানি | — | কথা |
| কাউসা কাউলি | — | কথার ঝামেলা |

## দোতরা
### আলম সাধু

| | | |
|---|---|---|
| আগাল | — | অগ্রভাগ |
| ধুয়া | — | ধ্রুবপদ |
| পয়দেশ | — | পয়দা বা সৃষ্টি |
| ডোর | — | বাঁধন |
| পুচ্চুং | — | পৌঁছেছি |
| ফাফর | — | শ্বাসবন্ধ হয়ে যাওয়া বা দোটানা অবস্থায় পড়া |
| নিয়র | — | শিশির |
| ময়াল | — | বিস্তীর্ণ জঙ্গল |
| টং | — | উঁচু করে বাঁশ দিয়ে তৈরী শোয়ার জায়গা |
| ডেরা | — | ঘর |
| নোয়াং | — | নই (আমি নই) |
| এলুয়া | — | খর |
| কাশিয়া | — | কুশ |
| চাংরা | — | কিশোর ছেলে |
| হাঁটুয়া পারি | — | হাঁটু পেতে |
| হুড়া জুড়া | — | এদিক ওদিক দৌড়ঝাঁপ |
| ফাড়া | — | বিপদ |
| বৈনী | — | বোন |
| কাগা | — | কাকপাখী |
| ঝেচই | — | এক প্রকার পাখী |
| জিটি | — | টিকটিকি |
| টেঁও টেঁও | — | এক প্রকার শব্দ |
| ঠ্যাল | — | গাছের ডাল বা শাখা |
| সুয়া পাখী | — | শুক পাখী |

## চোর-চুন্নী

নৈজ্জা — লজ্জা
দুফোর — দুপুর
হিলা — এইরূপ
বাদে — জন্য
ফেকেনা — অকারণ জটিলতা
হাউস — ইচ্ছা
ফেসটানি — অকারণ ঝামেলা
কতলা — কতখানি
আটুস — আবদার
কছিত — বলিস
শুয়াতি — সোহাগী
ঝঙ্কার ঝঙ্কার — বকাঝকা
গাও — শরীর
তৎকরায় — তাড়াতাড়ি
সগাক — সকলকে
পৈতাবে — বিশ্বাস করবে
চরা — চোর
হিলাখালি — এই সকল কিছু
বিরিবার — বের হতে দেওয়া
সিঙ্গ — সিং
নিত্যকী — নর্তকী
অলন — আলিঙ্গন
পেন্দাম — পড়িয়ে দেওয়া
হুসকিবার — খুলতে পারা
উমরা — তারা
হোকোর কাম — হিসাবের কাজ
ফোঁক — ফুঁ দেওয়া
শুট করিয়া — চুপ করে বা লুকিয়ে
সাম কালী — সন্ধ্যাকালী
সুহারণ — স্মরণ
পাসুরিম — অতিক্রম করিবো
তিষ্যা-ভোক — ক্ষুধা-তৃষ্ণা
মনুরা — মানুষ
গোরত — কাছে
ফম করা — মনে করা
চোদন খাওয়া — ঠেলা বা ধাক্কা খাওয়া
আজেলা — বুদ্ধিহীন
জিঠি — টিকটিকি
দেউনিয়া — মাতব্বর
দহলা — নীচুজমি
কাচানি দমকানি — জল-কাদা মিশ্রিত মাটি
দোসরা — দ্বিতীয় বা অন্যপ্রকার
আগিলা — আগের
ঝাকুয়া — অনেক
ছাওয়া — সন্তান
দেখান শুয়ান — দেখতে শুনতে
হুলাক — ঐগুলোকে
এইসন — এখন
হুটা — ঐটি
হাতাস — ভয় পাওয়া
বেজার — অভিমানী হওয়া
ছিনিমা — সিনেমা
হাল্লাক — উদাসীন বা আনমনা।
কবাম — কাকে বলবো
সোন্দাইলো — প্রবেশ করলো
বোদ — চেতন
জান — প্রাণ
ঝাপ্পি উঠিল — লাফ দিয়ে উঠলো
সিপাইগিলা — পুলিশগুলো
দুরদুরি — মার দেওয়ার শব্দ
মুত — পেচ্ছাব
টুটি — গলা

## বিষহরি

ভাসংকর — ভাস্কর
তারণী — তারণ করেন যিনি
বানিয়া — বেনে
বিবাদিয়া — বিবাদ করেন যিনি
হিংগুলিয়া রথ — শুভ্রবর্ণ রথ
ডারাইস — দারাস সাপ
বালা — বালক
হ্যাস — হাস্য
ছেরী — মেয়ে
আটুয়া — গরম দুধ
অন্ধেলা — অন্ধ
বাটা — পানের পাত্র
দুল্যব নখাই — দুর্লভ লক্ষ্মীন্দর
তোল্লাশিয়া — উদ্বিগ্নসহকারে
সুত — অনুসরণ
দেখাচ — দেখাচ্ছি
ঠাহই — নিকটে
চেওয়ারী — বিষাক্ত পোকা
মেন্ডঘর — বাসর ঘর
সুজিবার — শোধ করা
চান্নি — বাঁশ দিয়ে তৈরী চাইলন
বর্ত্তীয়া — বর্তে উঠে
সামটিয়া — ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করা
বালি — বালিকা
কৈতরের ছাও — কবুতর ছানা
পহনা — মাছের পোনা
হালী হালী — একটার পর একটা মাছ গেথে রাখা

গবিন — গবিন্দ
আগুশান — আগে এসে
ধামাই — একপ্রকার সাপের নাম
ভিরিয়া বসিল — ভালো করে বসা
কন্দল — কলাগাছ
পানের সপুরা — পানপাতা রাখার পাত্র
ঝিয়ারী — কন্যা
জামুরী — বাতাবী লেবু
টেনটেনি — মুখে মুখে উত্তর দেয় যে
কপুরা — মুরগী
সনে — সঙ্গে
কদলী — কলাগাছ
ভুরা — কলাগাছ দিয়ে তৈরী ভেলা
সোলার মঞ্জুস — সোলা দিয়ে তৈরী ঘর
খলই — মাছ রাখার পাত্র
আহেলা — ছোট
ডারিকা — দারকা মাছ
সড়া — বাসী জিনিস
চাটি — ঘরের বেড়া
মারেয়া — গৃহস্থ যার বাড়ীতে পূজা হয়।
টিকর — ডাঙ্গা
ঘসা — আবৃতির সুরে বলা
টেনা — যুবক
গাভুর — প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি
চেহর — মূল গায়কের ব্যবহৃত চমরী গাইয়ের লেজ

## মান পাঁচালী
## দসুকন্যা কালিন্দী

| | | |
|---|---|---|
| কোপাল | — | কপাল |
| তুহার | — | তোমার |

## খাস পাঁচালী
## লোভী জোতদার

| | | |
|---|---|---|
| চেংরা | — | ছেলে |
| বাগে | — | বাপুহে |
| হইচু | — | হয়েছি |
| নান্ধা | — | রান্না |
| উপজিল | — | জন্মিলো |
| অয় | — | উনি |
| অচাক | — | অবাক |
| সেলাবা | — | তখন |
| অঠায় | — | উঠিয়ে দেওয়া |
| লচকা লোদি | — | লচকা নামে নদী |
| সেলা | — | তখন |
| কিতায় | — | কি কারণ |
| নিকিলিয়া | — | বার হওয়া |
| যাসু | — | যাচ্ছি |
| কনেক | — | কিছু |
| ঝুলুংগিরা | — | কাপড় রাখার ঝোলনা |
| ধোদর খোদর | — | তাড়াহুড়ো |
| বাউ | — | ছেলে |
| ছুয়াডা | — | ছেলেটা |
| তহকি | — | তোমরা কি |
| কাচাল | — | ঝগড়া |
| ছু | — | আছি |
| মায়াডা | — | বউটি |
| ময়হা | — | মায়া |
| ভুকুবা | — | ভাঙ্গানো |
| কুত্তি | — | কোথায় |
| উসাংসাং | — | উদ্বেগ |
| আড়ি | — | স্বামীহীনা |
| কভা | — | কথা কওয়া |
| ভোজি | — | ভাউজি |
| সেইলা | — | সেগুলো |
| গিথ্যানি | — | বাড়ীর মলিকানী |
| এনং | — | এই রকম |
| হেল্লেদি | — | অব্যয়রূপ |
| মাই | — | মেয়ে |
| অক | — | ওকে |
| পিন্দেক | — | কাপড় পড়া |
| রভার বাদে | — | থাকার জন্য |
| জুয়াই | — | জামাই |
| আঈ | — | মা |
| অমহা | — | উনি |
| খোপে | — | খুবই |
| লিসিত | — | নিয়েছিস |
| অঠায় | — | উঠিয়ে দেওয়া |
| পেন্নাঠি | — | বাঁশ দিয়ে তৈরী লাঠি |

## শাস্তরী
## জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই

| | | |
|---|---|---|
| বন্দু | — | বন্দনা করি |
| দশমনি | — | দশজন (উপস্থিত ব্যক্তিগণ) |
| বাউ | — | ছেলে |

কায় — কে
গোপাল ডাং — গোপালের লাঠি
পাটাভাত — মাংসভাত
টাবালং টুবুলং — জলের শব্দ
কান্দেছে — কাঁদছে
চিতল — অল্পবয়স
নান্দিল — রান্না করিলো
বৈরাগী — বিবাগী
কিতায় — কী কারণে
স্যানম — সেইমতন
নিন্দের ছোঁয়া — ঘুমের বাচ্চা
গোসা — অভিমান
ধাই — কথার যুদ্ধ
ছোয়াপাত — এঁটোপাতা
মানযা — পাঁজর
আড়ি — বিধবা নারী
আচাংচা — অদ্ভুত
সিঞ্জার বেড়া — পাটকাঠির বেড়া
ছেকা — সোডা দিয়ে তৈরী খাবার
লেথানি — ঘরমোছা
মিতিংগা — মাটির কলস
ডোর — কোমরের সূতো
পুকদুর — হাতুড়ি
ফাকারফুকুর — ফিক ফিক করে হাসি
শিপা — শিকড়
ডাঙ্গুয়া — যে বিধবাকে গ্রহণ করে

## নটুয়া

মৃদিঙ্গা — খোল
যুগুনি — কালীর সঙ্গে যক্ষ্মিণী
দোনো — দুই
বাটা — পানপাতা রাখার পাত্র
হামা — আমরা
বিত্তা — জিনিস বা বস্তু
ছালেবা ছালেবা — ছাল বা খোলস
নি — নেই
ওংসাবার — খোঁজ করতে
একাশরে — একাকী
রহালনি — থাকতে না পারা
জার — ঠান্ডা বা শীত
নকুন — উঁকুন
পাশুরিয়া — অতিক্রম ক'রে
সায়া — স্বামী
আংসাং — আবোল তাবোল
জাবরা — আবর্জনা
ডিমা — ডিম
ফাকরি — শ্লোক
জনটা — জটা
বেবুত — সম্পূর্ণ
বতেয়া — যে বিশ্লেষণ করে
বিচন পাখা — বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী পাখা
আংগুঠি — আংটি
বিছুয়া — কোমরের বিছা
চুড়িয়া — চুড়ি
পিয়া — প্রিয়া
আবরাত্তি জাবরাত্তি — এলোমেলো আবর্জনা
বিলাই — বিড়াল
বিধুতা — বিধাতা
পিয়াস — পিপাসা
বুরুক — বরং

| | | |
|---|---|---|
| কুহেলি | — | কোকিল |
| তেজেলা | — | ত্যাগ করলো |
| হাংগেসা | — | হংস |
| পাহুর | — | সাঁতার দেওয়া |
| ভিটিস | — | ভট্‌করে শব্দ |
| আখা | — | উনুন |
| জুয়াই | — | জামাই |
| ছুবা | — | পোড়া দেওয়া |
| বাও | — | বাতাস |
| ট্যারোত ট্যারোত | — | কোনোরকম দায়সারা |
| ঘোল | — | ঘোলাজল |
| উলটিপুলটি | — | এপাশ ওপাশ |
| মিরিঙ্গা | — | একটি পাখী |
| তিতির | — | তিতির পাখী |
| ফুকুরদম ফাকাশ | — | বীরত্ব শেষ |
| লদী | — | নদী |
| হিবরা হে জিরবা | — | এদিক সেদিক |
| গিদায় | — | গান করে |
| দরই মাছ | — | দারিকা মাছ |
| গুংগি | — | বোবা মেয়েছেলে |
| বেয়েরী | — | বাঁধন |
| ঠেংগা | — | পা |
| বেহান | — | খুব সকাল |
| শুন | — | নিস্তব্ধ |
| বাংলা | — | ঘর |
| খরবর খরবর | — | খরখর করা |
| ছোয়া | — | বাচ্চা |
| দুরামাছ | — | ছোট কচ্ছপ |
| ভিজালনি | — | যা ভিজে যায়নি |
| ছাতি | — | বুকের ছাতি |
| দাড়ি ছুলবুল | — | দাড়ি ভরতি |
| ভাকুরা | — | গোমরা |
| রোহচুরে | — | রয়েছি |
| অরুনার জঙ্গলে | — | অরণ্য জঙ্গলে |
| সেন্দুর | — | সিঁদুর |
| কুঠে | — | কোথায় |
| কহয়া | — | বলে দাও |
| ঠনা | — | এক প্রকার মাছ |

## রাজধারী

| | | |
|---|---|---|
| গৌচন | — | গৌরচাঁদ |
| কৈশিলা | — | কৌশল্যা |
| কেংকোহি | — | কৈকেয়ী |
| গয়ুর | — | গৌর |
| থলে | — | স্থলে |
| গিয়ান | — | জ্ঞান |
| হুলাস | — | আনন্দিত |
| পাইকামবর | — | পয়গম্বর |
| অযুতা | — | অযোদ্ধা |
| বাফু | — | বাপু |
| বাকুল | — | বাকল |
| গটেডায় | — | সম্পূর্ণ |
| রাইকস | — | রাক্ষস |
| ঘোট | — | থাকার জায়গা |
| ইড়াকাথা | — | এই কথা |
| ঝটা বাকুল পইরি | — | জটা বাকল পরিধান করে |
| গিদাচিস | — | গাইছিস |
| অঝাড়া | — | ওঝাটা |
| আউসত | — | ঔষধ |
| কাটিচে | — | কেটে দিয়েছে |
| দিমদিম | — | যুদ্ধের শব্দ |
| চামড় | — | চামড়া |

নান্ধন — রান্ধন
দন্তের বারা — দাঁতের পাটি
মৃংগি — হরিণ
জটাউ — জটায়ূ
শিরাম — শ্রীরাম
সয়ানসি — সন্ন্যাসী
গৈচর — গোচর, সম্মুখে
লেংখ — লংঘন করো
ঢেমনা — উপ পতি
নফোর — চাকর
তামাকু — তামাক
আইগা — আজ্ঞা
বনু — ভগ্নিপতি
ইমায় — এই ব্যক্তি
জামরী — বাতাবী লেবু
বাঘ মরচি — ঝাল লঙ্কা
তাহনি — তবুও
গান গিদাচিস — গান গেয়েছিস
রোভো — থাকবে
ছে — আছে

## 'খন'

ছুয়া — ছেলে
তাংনে — হইলে
নিগাই — লই
চনচন — খুবই
আন্ধি — রান্না করি
ভাউসান — ছোট ভায়ের বৌ
হাতাপতি — হাতে হাতে
নাগাইনি — লাগাচ্ছি না
যেনং — সেই রকম
এনং — এই রকম
তাংনি — জন্যে
ভারকাছ — বের করা
সার না দিলে — কথা না দিলে
গেল কুন্না — কোথায় গেল।
কিতে — ঐতো
দেহেন — কোনোকিছু দেওয়া
নাহান — না
ভাকরাম — বের করি
পাড়িবা পাবিহিনুট — পড়তে পারতাম
দত — দেও
মদোংগি — ভূমিকর্তন
ে উনিয়া — মাতব্বর

## রাম-বনবাস

চণ্ডালীয়া — চণ্ডাল
বিবালিকা — বিবাহ
সাদি — বিবাহ
লম্ফা — লাফ
দেও — দেবতা বা অপদেবতা
ভগদই — ভোগদই / ভোগের নিমিত্তে দই
চুয়া — কুয়ো
নবান — নবান্ন
জঠাই — জটায়ূ
বিপলা — বিপুলা
বান — তীর
শসাংশট — মৃত অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা।
সিং — সিঁধ

## গম্ভীরা

ব্যারাম — অসুখ
খ্যাছে — খেয়েছে
অ্যাসা — এসে
হ্যাসা হ্যাসা — হেসে হেসে
লিল — নিল
চ্যাড়া — চাড়িয়ে, গোড়ালি উঁচু করে
কর‍্যাছি — করেছি
ভোলা — শিব
টনটিং — ব্যঙ্গ করা
ডুয়েট — দু'জনে কথা বলা
চারইয়ারি — চারজনে কোনো কথার বিষয়ে অংশগ্রহণ করা
লিছে — নিচ্ছে

# গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা

## গ্রন্থপঞ্জী


১। অধিকারী, গুণেশ্বর, ময়নার চখুর জল, ঘরজেয়া, অধিকারী প্রকাশনী, ভাটিবাড়ী, জলপাইগুড়ি, ১৯৯৮।

২। ইসলাম, মজহারুল, ফোকলোর ঃ পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৩। ইসলাম, মজহারুল, ফোকলোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, লোকলৌকিক প্রকাশনী, ১৯৮২।

৪। ইলিয়াস, মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপ গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

৫। খাঁ, চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমেদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, ১৯৩৬/১৯৯০।

৬। ঘোষ, অজিতকুমার, নাটকের কথা, সাহিত্য লোক, ২০০৬।

৭। ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৫।

৮। ঘোষ, প্রদ্যোৎ, গম্ভীরা লোকসঙ্গীত ও উৎসব, একাল ও সেকাল, চিত্রা এন্ড কোং, কোলকাতা, ১৩৭৫।

৯। ঘোষ, শম্ভুনাথ, সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত, গান্ধার প্রকাশনী, কোলকাতা-১২, ১৯৭৭।

১০। চক্রবর্ত্তী, বরুণ, লেটো, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প:ব: সরকার।

১১। চক্রবর্ত্তী, বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১৯৭৭।

১২। চক্রবর্ত্তী, বরুণকুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কোলকাতা-৯।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ও হালদার, গোপাল, মধ্য বাঙলা ব্যাকরণ, বাক্-সাহিত্য প্রা:লি:, কোলকাতা-৯, ১৯৮৯।

১৪। চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, বৈশাখ, ১৪০৮।

১৫। চৌধুরী, দুলাল, সম্পাদনা, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কোলকাতা, ২০০৪।

১৬। চৌধুরী, নারায়ণ, বাংলার সংস্কৃতি, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৫৬।

১৭। চৌধুরী, সুবোধ, ডোমনি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প:ব: সরকার, ১৯৯৯।

১৮। চৌধুরী, দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-৯, ২০০৩।

১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, ১৯৬১।

২০। দাশ, সচীকান্ত, গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান, বইওয়ালা, কোলকাতা-৪৮, ২০০৭।

২১। দাশ, নির্মল, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, অরিন্টোল বুক কোম্পানি, কোলকাতা, ১৯৮৪।

২২। দাশ, গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীরসাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা, কোলকাতা, ১৯৯৮।

২৩। দাশ, সুকুমার, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, কোলকাতা-৪০, ১৯৮২।

২৪। দাশ, ধ্রুব, ভারতের লোকনাট্য, প্রতিভাস, কোলকাতা-২, ১৯৯২।

২৫। দে, সরকার, দিগ্বিজয়, কোচবিহারের লোকনাটক, অনিমা প্রকাশনী, কোলকাতা-৯, ১৯৯৭।

২৬। দেব, চিত্তরঞ্জন, বাংলার লোক-গীত-কথা, প্রকাশক, কোলকাতা-৯, ১৯৮৯।

২৭। নাথ, সঞ্জীব, বাংলার লোকনাট্য, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কোলকাতা-৯, ২০০৩।

২৮। পাল, স্নিগ্ধা, নৃত্ত-নৃত্য-নাট্য, বিভা প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৯০।

২৯। পাল, হরিশচন্দ্র, উত্তরবাংলার পল্লীগীতি, (ভাওয়াইয়া খণ্ড), কোচবিহার, ১৩৮০।

৩০। পাল, হরিশচন্দ্র, উত্তরবাংলার পল্লীগীতি, (চটকা খণ্ড), কোচবিহার, ১৩৮২।

৩১। পোদ্দার, সুস্মিতা, লোকসংস্কৃতি ঃ ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প:ব: সরকার, ২০০১।

৩২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বিষয় প্রবন্ধ, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

৩৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতি, বাকশিল্প, কোলকাতা-৩১, ১৩৯৭।

৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ, কোচবিহারের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ২০০৬।

৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, দে বুক স্টোর, কোলকাতা, শ্রাবণ, কোলকাতা-১২, ১৩৯৩।

৩৬। বর্মা, সুখবিলাস, ভাওয়াইয়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প:ব: সরকার, ১৯৯৯।

৩৭। বর্মা, সুখবিলাস, জাগ গান, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-৯, ১৯৯৭।

৩৮। বাৎসায়ন, কপিলা, ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য বিচিত্র প্রবাহ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৫।

৩৯। বিশ্বাস, রতন, (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের ভাষা, বইওয়ালা, কলকাতা-৪৮, ২০০৪।

৪০। ভকত, দ্বিজেন্দ্র, কুশান গান, ধুবুরী শাখা সাহিত্য, অসম সাহিত্য সভা, ২০০১।

৪১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, কোলকাতা-৭৩, ১৯৮২।

৪২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, এ. মুখার্জী কোং প্রা:লি:, কোলকাতা, ২০০৪।

৪৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বঙ্গীয় লোকসাহিত্য সঙ্গীত রত্নাকর, প:ব: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কোলকাতা, ১৯৬৭

৪৪। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড ঃ গীতি ও নাট্য, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কোলকাতা, ১৯৬৫

৪৫। ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা-৯, ১৯৮৪।

৪৬। ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর, বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭, ১৯৭২।

৪৭। ভৌমিক, নির্মলেন্দু, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, কলকাতা, ১৩৮৪।

৪৮। মজুমদার, শিশির, উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-৯, ১৯৮৬।

৪৯। মজুমদার, শিশির, লোকনাট্য-নাটক-কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৫।

৫০। মজুমদার, মানস, লোক-ঐতিহ্যের দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৩।

৫১। মজুমদার, মানস, লোক-সাহিত্য পাঠ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৯।

৫২। মিত্র, সনৎ কুমার, বাঙলায় গ্রামীণ লোকনাটক, আলোচনা এবং সংগ্রহ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ২০০০।

৫৩। মিত্র, সনৎ কুমার (সম্পাদিত), বাংলা লোকভাষা বিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কোলকাতা-৩৪, ২০০১।

৫৪। রায়, বীরেন্দ্রনাথ, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প:ব: সরকার।

৫৫। রায়, পুষ্পজিৎ, গম্ভীরা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প:ব: সরকার, ২০০০।

৫৬। রায়, বুদ্ধদেব, লোকসাঙ্গীতিকী, ফার্মা কে এল এন প্রা:লি:, কোলকাতা, ১৯৯৮।

৫৭। রায়, গিরিজাশংকর, প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ ঃ লোকসাহিত্য (প্রথম পর্ব), বীনাপানি পুস্তকালয়, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, বুক সোসাইটি, ১৩৮৮।

৫৮। রায়, গিরিজাশংকর, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, এন এল পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, ১৯৯৯।

৫৯। রায়, ধনঞ্জয়, তেভাগা আন্দোলন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কোলকাতা-৯, ২০০০।

৬০। লাহিড়ী, অপরেশ, উত্তরবঙ্গের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ইতিহাস, বইওয়ালা, কোলকাতা-৪৮, ২০০৫।

৬১। শ' রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-৯।

৬২। শর্মা, সত্যেন্দ্রনাথ, অসমীয়া নাট্য সাহিত্য, প্রকাশন, ১৯৮৩।

৬৩। সরকার, ইছামুদ্দীন (সম্পাদিত), ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন এল পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, ২০০২।

৬৪। সরকার, পবিত্র, ভাষা জিজ্ঞাসা, বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির, কোলকাতা-৯।

৬৫। সিদ্দিকি, আসরাফ, লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মুক্ত ধারা, ঢাকা, ১৯৮৭।

৬৬। সেন, সুকুমার, নট নাট্য নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কোলকাতা, ১৩৯১।

৬৭। সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-৯, ১৯৯৫।

৬৮। সেনগুপ্ত, প্রদ্যোত, বাংলা নাটক নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ, বর্ণালী, কোলকাতা-৯।

৬৯। হালদার, গোপাল, সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, মনীষা, কলিকাতা-৬, ১৯৮৬।

৭০। Ashmore, HarryS, The New Encyclopaedia Britanica, 15th Edition, Vol. 7, Encyclopaedia Britanica, London, 1975.

৭১। Barma, Sukhbilas, Indian Folk Music Bhawaiya Ethnomusicological Study, Global Vision Publishing House, New Delhi-02 (India), 2004.

৭২। Bauman, Richard, Differential Identity and the Social Base of Folklore, ed. Richard M. Dorson, Bloomington, Indiana, University Press, 1983.

৭৩। Bhattacharya, Asutosh, Folklore of Bengal, National Book Trust, India, 1978.

৭৪। Chattopadhyay, Tushar, Towards a Defination of Folklore/Folklore, Bangladesh, Vol. 1, January, No.1.

৭৫। Dorson, Richard M, Folklore and Fakelore, Harvard Univ. Press, Cambridge.

৭৬। Dutta Prafulla, Folklore/V-1, No. 3, Calcutta, 1960.

৭৭। Frazer James George, Golden Bough, Macmillan, London, 1963.

৭৮। Hatler, Theodore, Orientation to the Theatre, Peter Owen, London.

৭৯। Keith, A.B., The Sanskrit Drama, Oxford Unviersity Press, 1964.

৮০। Leach, Maria, Standard Dictionation of Folklore, Mythology and Legand, New English Library, London, 1975.

৮১। Mandal, Panchanan, Folklore/V-I, No. 1, Calcutta, 1960.

৮২। Murray, Gilbert, A History of Ancient Greek Literature, Fredrick Unger, New York.

৮৩। Taylor, Archer, Folklore and the Student of Literature, The Pacific Spectator, Vol-2, 1948.

৮৪। Sanyal, Charuchandra, The Rajbansis of North Bengal, The Asiatic Society, Calcutta-16, 1965.

৮৫। Vatsyayan, Kapila, Tradition of Indian Folk Dance, Indian Book, New Delhi, 1976.

## পত্রপত্রিকা


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | অনুষ্টুপ<br>নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা | সম্পাদক | অনিল আচার্য |
| ২। | উত্তরবঙ্গ লোকযান সংবাদ<br>লোকনাট্য সংখ্যা-১, ১৩৯১<br>রায়গঞ্জ | সম্পাদক | শিশির মজুমদার |
| ৩। | উত্তরবঙ্গ লোকযান সংবাদ<br>লোকনাট্য সংখ্যা-২, ১৩৯২<br>রায়গঞ্জ | সম্পাদক | শিশির মজুমদার |
| ৪। | কালবৈশাখী<br>লোক ও লৌকিকতা সংখ্যা<br>দিনহাটা, কুচবিহার, ১৯৯৯ | সম্পাদক | রমণীমোহন বর্মা |
| ৫। | কালবৈশাখী<br>লোক ও লৌকিকতা সংখ্যা<br>দিনহাটা, কুচবিহার, ১৯৯৯ | সম্পাদক | রমণীমোহন বর্মা |
| ৬। | কালবৈশাখী<br>কুচবিহার লোকসাহিত্য সংখ্যা<br>দিনহাটা, কুচবিহার, ১৯৯১ | সম্পাদক | রমণীমোহন বর্মা |
| ৭। | কালবৈশাখী<br>লোকশ্রুতি ও ভাষা সংখ্যা<br>দিনহাটা, কুচবিহার, ১৯৯৭ | সম্পাদক | রমণীমোহন বর্মা |
| ৮। | কালবৈশাখী<br>রাজবংশী, লোকশ্রুতি ও ভাষা সংখ্যা<br>দিনহাটা, কুচবিহার, ১৯৯৭ | সম্পাদক | রমণীমোহন বর্মা |
| ৯। | কালবৈশাখী<br>রাজবংশী, লোকশ্রুতি ও ভাষা সংখ্যা<br>দিনহাটা, কুচবিহার, ২০০১ | সম্পাদক | রমণীমোহন বর্মা |
| ১০। | কুচবিহার লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মারক গ্রন্থ<br>কুচবিহার, ২০০১ | সম্পাদক | ভগীরথ দাস |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১। | দ্যোতনা, ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা<br>জলপাইগুড়ি<br>জানুয়ারী, ২০০৪ | সম্পাদক | গৌতম গুহ রায় |
| ১২। | চতুষ্কোণ, বিশেষ নাটক সংখ্যা<br>কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৩ | সম্পাদক | শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী |
| ১৩। | চতুষ্কোণ<br>কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ | সম্পাদক | শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী |
| ১৪। | চতুষ্কোণ<br>কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৩৮৩ | সম্পাদক | শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী |
| ১৫। | পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার জেলা সংখ্যা<br>জুলাই ২০০৬ | সম্পাদক | তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ১৬। | বৈতানিক<br>শিলিগুড়ি, ফেব্রুয়ারী ২০০৪ | সম্পাদক | গৌতম রায় |
| ১৭। | মূল্যায়ন<br>কার্তিক অগ্রহায়ণ ১৩৮১ | সম্পাদক | নরহরি কবিরাজ |
| ১৮। | মূল্যায়ন<br>নববর্ষ, ১৩৯৭ | সম্পাদক | নরহরি কবিরাজ |
| ১৯। | মধুপর্ণী<br>উত্তরবঙ্গ সংখ্যা<br>বালুরঘাট, ১৩৮৪ | সম্পাদক | অজিতেশ ভট্টাচার্য |
| ২০। | মধুপর্ণী<br>মালদহ জেলা সংখ্যা<br>বালুরঘাট, ১৩৯২ | সম্পাদক | অজিতেশ ভট্টাচার্য |
| ২১। | মধুপর্ণী<br>পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা<br>বালুরঘাট, ১৩৯৯ | সম্পাদক | অজিতেশ ভট্টাচার্য |
| ২২। | মধুপর্ণী<br>জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা<br>বালুরঘাট, ১৯৮৭ | সম্পাদক | অজিতেশ ভট্টাচার্য |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩। | মধুপর্ণী<br>কোচবিহার জেলা সংখ্যা<br>বালুরঘাট, ১৯৯০ | সম্পাদক | অজিতেশ ভট্টাচার্য |
| ২৪। | মধুপর্ণী<br>দার্জিলিং জেলা সংখ্যা<br>বালুরঘাট, ১৯৯৬ | সম্পাদক | অজিতেশ ভট্টাচার্য |
| ২৫। | লোকশ্রুতি<br>অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৫ | সম্পাদক | প:ব: রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ২৬। | লোকশ্রুতি<br>জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫ | সম্পাদক | প:ব: রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ২৭। | লোকশ্রুতি<br>ডিসেম্বর ১৯৮৬ | সম্পাদক | প:ব: রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ২৮। | লোকশ্রুতি<br>সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ | সম্পাদক | প:ব: রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ২৯। | লোকশ্রুতি<br>মার্চ ১৯৯০ | সম্পাদক | প:ব: রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ৩০। | লোকশ্রুতি<br>মার্চ ১৯৯১ | সম্পাদক | প:ব: রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ৩১। | লোকশ্রুতি<br>ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ | সম্পাদক | লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী<br>সংস্কৃতি কেন্দ্র<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩২। | লোকশ্রুতি<br>জুলাই ১৯৯৭ | সম্পাদক | লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী<br>সংস্কৃতি কেন্দ্র<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ৩৩। | লোকশ্রুতি<br>আগস্ট ১৯৯৮ | সম্পাদক | লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী<br>সংস্কৃতি কেন্দ্র<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ৩৪। | লোকশ্রুতি<br>ডিসেম্বর ২০০৩ | সম্পাদক | লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী<br>সংস্কৃতি কেন্দ্র<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ৩৫। | লোকশ্রুতি<br>জুন ২০০৬ | সম্পাদক | লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী<br>সংস্কৃতি কেন্দ্র<br>তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ<br>পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| ৩৬। | লোকসংস্কৃতির গবেষণা পত্রিকা<br>'যাত্রা' বিশেষ সংখ্যা<br>সপ্তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা,<br>কলকাতা, ১৯৯৪ | সম্পাদক | সনৎ কুমার মিত্র |
| ৩৭। | লোকসংস্কৃতির গবেষণা পত্রিকা<br>গ্রামীণ নাটক ঃ আলোচনা ও সংগ্রহ বিশেষ সংখ্যা<br>অষ্টম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা<br>কলকাতা, ১৪০২ | সম্পাদক | সনৎ কুমার মিত্র |
| ৩৮। | লোকসংস্কৃতি<br>আকাদেমি অব ফোকলোর<br>কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৩ | সম্পাদক | দুলাল চৌধুরী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৯। | সাম্প্রত<br>পুনরুত্থান সংখ্যা<br>শিলিগুড়ি, ২০০৪ | সম্পাদক | আনন্দ সরকার |
| ৪০। | সাম্প্রত<br>বইমেলা সংখ্যা<br>শিলিগুড়ি, ২০০৬ | সম্পাদক | আনন্দ সরকার |
| ৪১। | স্মরণিকা<br>১৩তম রাজ্য ভাওইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা<br>বলরামপুর, কুচবিহার,<br>২০০২ | সম্পাদক | স্মরণিকা উপসমিতি |
| ৪২। | স্মরণিকা<br>১৭তম রাজ্য ভাওইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা<br>ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর<br>২০০৬ | সম্পাদক | স্মরণিকা উপসমিতি |
| ৪৩। | স্মরণিকা<br>১৮তম রাজ্য ভাওইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা<br>ভূটানিরঘাটা, জলপাইগুড়ি<br>২০০৭ | সম্পাদক | স্মরণিকা উপসমিতি |
| ৪৪। | স্মরণিকা রাজ্য লোকউৎসব<br>মালদহ শহর<br>১৯৯০ | সম্পাদক | স্মরণিকা উপসমিতি |
| ৪৫। | গণনাট্য<br>জানুয়ারী ১৯৯২ | সম্পাদক | শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় |